প্রেমেন্দ্র গ্রন্থাবলী

প্রেমেন্দ্র মিত্র

প্রথম সংস্করণ
কার্ত্তিক, ১৩৫৯



বসুমতী - সাহিত্য - মন্দির
১৬৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির,
১৬৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

মূল্য আড়াই টাকা

প্রকাশক ও মুদ্রাকর
শ্রীশশিভূষণ দত্ত
বসুমতী প্রেস,

ভূমিকা

বুদ্ধি ও আবেগের নিখুঁত সমতা যা সাহিত্যে, বিশেষ করে গল্প-উপন্যাস সাহিত্যে রম্যতা সৃষ্টি করে, প্রেমেন্দ্র মিত্র তার নিখুঁত শিল্পী। অতিশয়োক্তি-বর্জ্জিত বর্ণনা, নিরাড়ম্বর শব্দবিন্যাস, চরিত্রগুলির সম্বন্ধে গভীর সহানুভূতি ও অন্তর্দৃষ্টি এবং ঘটনা ও সংলাপের মধ্যে আশ্চর্য্য অন্তরঙ্গতাই তাঁর গল্পকে জীবন্ত ও বিচিত্র ক'রে তোলে। দৃষ্টি তাঁর ওস্তাদ জীবন্দাজের দৃষ্টি, সে দৃষ্টিতে ব্যক্তি ও বস্তুর খুঁটিনাটিও লক্ষ্যভ্রষ্ট নয়। একদেশদর্শিতা কোথাও তাঁকে স্পর্শ করেনি। তাঁর রচিত গল্প উপন্যাসের মধ্যে বিষয়বস্তুর নতুনত্ব গঠনধারার স্বকীয়তা ও সূক্ষ্ম মানসিক অবলোকন বিশেষভাবে নজরে পড়ে। "কল্লোল" নামক পত্রিকাকে কেন্দ্র ক'রে বঙ্গসাহিত্যে যে এক নবযুগের সূচনা হয়েছিল, শিল্পীপ্রবর প্রেমেন্দ্র মিত্র ছিলেন সেই যুগেরই অগ্রদূত, সেই 'কল্লোল' গোষ্ঠীরই অন্যতম শক্তিশালী লেখক। তাঁর প্রাথমিক রচনা 'পাঁক'এর মধ্য দিয়েই এই শক্তির সূত্রপাত দেখা দেয়। উক্তরূপ অন্যান্য আরও কয়েকখানি গ্রন্থের প্রকৃতি-পরিচয় এই গ্রন্থাবলীর মধ্যে নিবদ্ধ আছে, বিদগ্ধ পাঠক তার রসোপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন।

এদেশের বহু খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের মত প্রেমেন্দ্র মিত্রকেও দীর্ঘদিন সাংবাদিক জীবনযাপন করতে হয়। সম্পাদকতা সহঃ সম্পাদকতা প্রভৃতি কার্য্যে নানাভাবে সংবাদ-পত্রিকাদির সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। 'বাংলার কথা', 'নবশক্তি', 'বঙ্গবাণী' সংবাদ, 'কালিকলম', 'নিরুক্ত' 'রংমশাল' (ছেলেমেয়েদের মাসিক) প্রভৃতিগুলি উল্লেখযোগ্য। কবি হিসাবেও প্রেমেন্দ্র মিত্রের খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'প্রথমা', 'সম্রাট' ও 'ফেরারী ফৌজ' বাংলা-কাব্য সাহিত্যে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করে। এ ছাড়া ছেলেমেয়েদের রচনাতেও তিনি সিদ্ধহস্ত।

১৯০৫ সালে বারাণসীতে প্রেমেন্দ্র মিত্র জন্মগ্রহণ করেন এবং শিক্ষালাভ করেন ঢাকা ও কলিকাতায়। বর্ত্তমানে সাহিত্য অপেক্ষা ছায়াচিত্রের প্রতি তাঁকে বেশী অনুরাগী বলে মনে হলেও, এবং কয়েকখানি গ্রন্থের পরিচালক হিসাবে কাজ করলেও, মূলতঃ তিনি সাহিত্যিক এবং সাহিত্যের প্রতি তাঁর দৃষ্টি সর্ব্বদাই সজাগ আছে। তাঁর প্রকাশিত বিবিধ গ্রন্থগুলির মধ্যে পুতুল ও প্রতিমা, ধূলিধূসর, নিশীথ নগরী, ভাবীকাল, বেনামী বন্দর, প্রথমা, সম্রাট, ফেরারী ফৌজ, মৃত্তিকা, আগামী কাল প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রেমেন্দ্র গ্রন্থাবলী

সুচিপত্র

মিছিল

উপন্যাস

হঠাৎ কখন তন্দ্রা আসে।

আধো ঘুম আধো জাগরণের ভিতর মনে হয় নীচে যেন সমুদ্র গর্জন করিতেছে।

চমকিয়া জাগিয়া উঠি।---সমুদ্র গর্জনই বটে,---ভাষার সমুদ্র!

পৃথিবীর বিচিত্র বিপুল জীবনলীলার প্রতি-মুহূর্ত্তের কাহিনী কলকল্লোলে কাগজের উপর কালো আখরে ফেনাইয়া উঠিতেছে।

ভিজে 'গেলি'টা টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া অবিনাশ বলে, "দিন একটু তাড়াতাড়ি সেরে দিন। আর্টিকেলটার জন্যে ফর্ম্মা আটক রয়েছে।"

শচীন কোণ্ হইতে ধমক দিয়া বলে, "আট্‌কে রয়েছে ত থাকুক। ফর্ম্মা তোমার সব কিছুর জন্যেই আট্‌কে থাকে! একে ত ওই কাগজ, তায় ভিজে, কলম ত ছোঁয়াতে না ছোঁয়াতে ছিঁড়ে যায়। ওতে তাড়াতাড়ি প্রুফ্ করেক্‌শন্ হবে কি করে শুনি?"

সুরে সুর মিলাইয়া কাশীনাথ বলে, "প্রুফের কাগজ বদলাতে বোলো, বুঝেছ? নইলে তাড়াতাড়ি আমরা পারব না।"

ছাপার কালিমাখা হাত দুইটা হতাশার ভঙ্গিতে চিৎ করিয়া দিয়া অবিনাশ বলে, "আমি কি করব বলুন, আমার কি হাত?"

"হাত নেই ত চুপ করে থাক, মাথার কাছে টিক্‌টিক্ কোরো না।" বলিয়া কাশীনাথ ভিজে গেলিটা টানিয়া লয়।

ধমক খাইয়া ব্যথিত হইয়া একমাত্র আমাকেই বোধ হয় দরদী মনে করিয়া অবিনাশ তাহার দুঃখের কথা বুঝাইবার চেষ্টা করে।

"আমাকে ধমকালে কি হবে বলুন, আমি কি সাধ করে তাড়া-হুড়ো করি! কাল 'ষ্টিরিও' ভেঙ্গে গিয়ে দেরী হয়ে কাগজ ডাক ফেল করলে আর আমাদের হয়ে গেল দু'টাকা করে জরিমানা! পুরোনো মান্ধাতার আমলের মেশিন, ওত বিগড়েই আছে। কিন্তু সব দোষ হবে আমাদের। তাই না জরিমানার ভয়ে তাড়াতাড়ি সারতে চাই!"

অবিনাশ আমাদের প্রিণ্টার। কাগজের উপরে ছাপার অক্ষরে তাহার নাম নিত্য সম্পাদকের নামের পাশে শোভা পায়। কাগজের দোষ-ক্রটি ঘটিলে আদালতে কাঠগড়ায় গিয়া তাহাকে দাঁড়াইতে হয়। দরকার হইলে বুঝি জেলেও যাইতে হয়। কিন্তু দুঃখ সেজন্য তাহার নাই।

দড়ির মত পাকানো চেহারা। গোঁফদাড়ি-কামানো শুকনো মুখ দেখিয়া বয়স তাহার আন্দাজ করা কঠিন। নির্দ্দিষ্ট কোন সংখ্যায় আসিয়া বয়স আর তাহার যেন বাড়িতে চাহে নাই।

লুকাইয়া নেশাটা আশ্‌টা করিয়া থাকে। জিজ্ঞাসা করিলে অম্লান বদনে উত্তর দেয়, "রোজ রোজ রাত জাগা কি নইলে সয়।"

নেশার দরুণ বা অন্য যে কারণেই হোক রাতের পর রাত সে যে জাগিতে পারে, এ বিষয়ে সন্দেহ কাহারও নাই। আজ পঁচিশ বৎসর ধরিয়া এমনি নাকি সে রাত জাগিয়া আসিতেছে। সুবিধা পাইলে ও হাঁপ ছাড়িবার সময় থাকিলে সে-কথা শুনাইতে সে ছাড়ে না। বড়াই করিয়া বলে, "আজই না হয় এলাহি কাণ্ড চলেছে---তিনটে রোটারী, তিনশ' লোক দেখছেন। কিন্তু যখন একখানা ঘরে হ্যাণ্ডপ্রেসে কাগজ বেরুত তখন রাতের পর রাত একলা সমস্ত কাগজ বার করেছে এই অবিনাশ।"

অপরূপ ভঙ্গিতে নিজের হাড়-বাহির-করা বুকটার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া সে বলিয়া যায়, "বললে বিশ্বাস করবেন না এক একদিন রামবাবুর লেখার ফুরসৎ থাকত না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুখে বলে যেতেন আর অমনি শুনে শুনে কম্পোজ করে যেতুম।" তাহার পর অসংলগ্ন-ভাবে মন্তব্য করে 'তেমন এডিটার আর হবে! এরা কি লিখতে জানে নাকি!'

পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে 'নির্ভীক' যখন কলিকাতায় এক অধুনাবিলুপ্ত গলির বর্ত্তমানে-চিহ্নহীন ভাঙ্গা পুরাতন একটি বাড়ীর একটিমাত্র ঘরে সেকেলে একটি হ্যাণ্ডপ্রেসের গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হয় তখন তাহাকে লালন ও পালন করিয়াছিল মাত্র দুটি লোক---সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী রামবাবু এবং প্রিণ্টার আমাদের অবিনাশ। তাহার পর 'নির্ভীক' বলিতে গেলে দ্বিতীয়ার শশিকলার মতই দিনে দিনে বাড়িয়া উঠিয়াছে---দুই পাতার কাগজ ষোলপাতা হইয়াছে, হ্যাণ্ডপ্রেসের জায়গায় তিন তিনটা রোটারীতে পর্য্যন্ত কুলায় না। বাঙ্গলার সুদূরতম দুর্গম পল্লীতে পর্য্যন্ত 'নির্ভীকে'র নির্ভয় বাণী নিত্য পৌঁছায়। হাতের পর হাত ফিরিয়া দিনের পর দিন ঐশ্বর্য্য প্রভাব প্রতিপত্তি তাহার বাড়িয়াই চলিয়াছে।

'নির্ভীকের' জয়যাত্রার পাশে এতদিন ধরিয়া সঙ্গী হইয়াছে একমাত্র ওই অবিনাশ।

জরিমানার কথাটা কিন্তু তাহার মিথ্যা। বলি "ওটা তোমার মিথ্যে কথা অবিনাশ। তোমায় কি ওরা জরিমানা করতে পারে!"

তৎক্ষণাৎ অবিনাশের সুর বদলাইয়া যায়। শীর্ণমুখে একগাল হাসিয়া বলে, "যা বলেছেন। তা হলে কি আর ধর্ম্মে সইবে। বলে---"

কিন্তু কথা তাহার শেষ করিবার সময় মেলে না।

আর্টিক্‌লের প্রুফ্‌টা সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া দাঁত খিঁচাইয়া কাশীনাথ বলে, "আচ্ছা আর বলতে হবে না, ওই নাও। আর একশ গণ্ডা রংফাউণ্ট,---ওসব কি আমরা শোধরাব।"

অবিনাশ উত্তর দেয় না। প্রুফ্‌টা লইয়া সবেগে সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া যায়। টেবিলের উপর পা তুলিয়া দিয়া চেয়ারে মাথা হেলান দিয়া কাশী কোন রকমে একটু ঘুমাইয়া লইবার আয়োজন করে।

নীচের প্রেস হইতে রাত্রির স্তব্ধতা মথিত করিয়া রোটারী মেশিনের অবিশ্রাম শব্দ উঠিতে থাকে। ঘুমের ভিতর যাহা সমুদ্রগর্জন বলিয়া মনে হইতেছিল এখন তাহা ভিন্ন রকম শোনায়।

কালির আখরে চিরকালের মত স্তব্ধ হইয়া যাইবার পূর্ব্বেও যেন শব্দময়ী ভাষার শেষ আর্ত্তনাদ।

সকালে আবার ভিন্নরূপ।

অতৃপ্ত নিদ্রা লইয়া ক্যাম্পখাট হইতে উঠিতে ইচ্ছা করে না। নীরবে শুইয়া শুইয়াই সমস্ত শুনিতে পাই।

পাশের ঘরে গতরাত্রির কাগজের জঞ্জাল ঝাড়ুদার ঝাঁট দিয়া স্তূপাকার করিতে থাকে। নীচে রোটারী মেশিন তখনও থামে নাই। কিন্তু ঠিকাদারের হট্টগোল, সাইক্ল পিয়নদের কোলাহল তাহাকেও ছাপাইয়া উঠে।

অনেকক্ষণ পরে বিছানা হইতে উঠিয়া যখন নামিয়া যাই, তখন আফিসে দরজাতে কাগজ-ফেরিওয়ালাদের ভীড় অনেকটা হাল্কা হইয়া আসিয়াছে। পিঠে পোষ্টার-মারা-বোর্ড বাঁধিয়া

বোধ হয় শেষ পিয়ন আমার সম্মুখ দিয়া বাহির হইয়া যায়। বড় বড় রীল কাগজের বাণ্ডিল-ভর্ত্তি পিপেগুলি গরুর গাড়ী হইতে নামান চলিতে থাকে। সঙ্কীর্ণ বাহিরে যাইবার পথে বৃহদাকার পিপে-গুলিকে পাশ কাটাইয়া যাইতে যাইতে দেওয়ালে আঁটা পোষ্টারের রক্তবরণ ঘোষণা চোখে পড়ে---'ভারতে যুবক জাগরণ।'

রাত্রি জাগরণ-ক্লান্ত অবসন্ন দেহে এ ঘোষণা পড়িয়া ম্লান একটু হাসি মুখে আসে। অথচ একদিন ইহাতেই উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে। চোখের উপর সেদিন যেন দেখিতে পাইয়াছি এই অগ্নিবরণ ঘোষণা বাঙ্গলার প্রান্ত হইতে প্রান্তে 'নির্ভীক' বহিয়া চলিয়াছে। বাঙ্গলার যৌবনের কানে বৃহত্তর জীবনের ডাক পেঁাছাইয়া দেবার এই যে মহান্ প্রচেষ্টা ইহাতে যত নগণ্যই হোক একটু হাত আমারও আছে, এ কথা মনে করিয়া গর্ব্বও বুঝি একটু সেদিন অনুভব করিয়াছি।

পাড়াগাঁয়ের ছেলে, গ্রামের ক্ষুদ্র পরিধির ভিতর দেশসেবার স্বপ্ন দেখিয়াছি। ঘরে বসিয়া চরকা কাটিয়াছি, নিজের হাতে বোনা এক কাপড়ে থাকিয়া দুঃসহ শীতের দিনে দেশের জন্য কৃচ্ছ্র-সাধন করিতেছি ভাবিয়াছি, পল্লী-সংগঠনের উৎসাহে গভীর রাত্রে দল বাঁধিয়া পরের বাগানে বাঁশঝাড় কাটিতে গিয়া ও পরের ডোবায় কেরাসিন তেল ঢালিয়া দিয়া মার ও ভর্ৎসনাও যে খাই নাই তাহা নয়।

তারপর অসহযোগ আন্দোলনের প্লাবনে ভাসিয়া কলিকাতায় আসিয়াছিলাম জেলে যাইতে। জেলেই শচীনের সঙ্গে আলাপ।

লম্বা একটা ঘরের ভিতরে জন পঁচিশ শুইতাম।

ভোরের বেলা একদিন ঘুম ভাঙ্গিতেই শুনি ঘরের ভিতর হট্টগোল পড়িয়া গিয়াছে। আমার পাশের বিছানায় যে ছেলেটি শুইত সে শশব্যস্ত হইয়া আমার গা ঠেলিয়া বলিল, "আরে উঠুন মশাই! কে আবার গলায় দড়ি দিয়েছে।"

তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া দেখি সত্যই সুউচ্চ জানালার গরাদে হইতে লম্বমান একটি কাপড়ের ফাঁস গলায় আটকাইয়া একজন ঝুলিতেছে এবং তাহার চারিদিকে ভীড় জমিয়া গিয়াছে।

দূর হইতে দেখিলে মুখ তাহার অত্যন্ত বীভৎস বলিয়াই মনে হয়। জিভ খানিকটা বাহির হইয়া পড়িয়াছে। নিমীলিত চোখের কোলে কালি।

ছুঁইতে কেহ সাহস করে না। পাগলা-ঘণ্টি তখনও দেওয়া হয় নাই। জেলারকে খবর দিয়া ওয়ার্ডার সেই অভূতপূর্ব্ব ঘটনায় হতভম্ব হইয়া ভয়ে ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে।

কে একজন বলিল, "মরে গেছে অনেকক্ষণ।"

ওয়ার্ডারকে বলিলাম, "হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন? নামিয়ে ফেলতে পার না?"---সে সাহস তাহার নাই দেখিয়া নিজেই নামাইতে গেলাম। চোখের উপর ওই বীভৎস দৃশ্য কতক্ষণ ধরিয়া দেখা যায়!

লোহার খাটটার উপর দাঁড়াইয়া তাহার গলার ফাঁস খুলিতে যাইতেছি, হঠাৎ তাহার গায়ে হাত ঠেকিতে চমকিয়া উঠিলাম। গায়ের উত্তাপ তাহার স্বাভাবিক দেহের মত! সন্দিগ্ধ হইয়া বুকে কান পাতিয়া দেখি হৃদ্‌পিণ্ড তাহার বুকের ভিতর সোৎসাহে নৃত্য করিতেছে।

বিস্মিত হইয়া সকলকে একথা জানাইব কি না ভাবিতেছি এমন সময় অকস্মাৎ গালে এক চড়!

নিজেই ফাঁস হইতে মাথাটা গলাইয়া বাহির করিয়া খাটের উপর ছেলেটি নামিয়া পড়িল। কি কৌশলে গলায় সে অমন ফাঁস লাগাইয়াছিল, সেই জানে। নামিয়াই সে বলিল--"কোথাকার গাধা এটা? দিলে সব মজাটা মাটি করে। সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্টকে কি নাচানটাই নাচান যেত।"

চারিদিকে তখন হাসির রোল পাড়িয়া গিয়াছে। শুধু ওয়ার্ডার বেচারী সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্টকে কি কৈফিয়ৎ দিবে বোধ হয় ভাবিয়া না পাইয়া কাতর-ভাবে সকলের দিকে চাহিতেছে।

ল্যাম্পের কালি চোখের কোল হইতে কাপড়ে মুছিতে মুছিতে আত্মঘাতী ছেলেটি আমাকে আবার সহাস্যে ভর্ৎসনা করিয়া বলিল, "কি দরকার ছিল তোর মোড়লী করে নামাতে যাবার বল ত?"

এই শচীন!---ওয়ার্ডারদের ব্যতিব্যস্ত করিবার এমন ফন্দি সে নিত্য একটি করিয়া আবিষ্কার করিত। জানিতও সে অনেক কিছু; গান বাজনা, ম্যাজিক জিমনাষ্টিক ইত্যাদি করিয়া সারাদিনরাত্রি সে একাই সমস্ত ওয়ার্ড মাতাইয়া রাখিত।

এত বেশী প্রাণের প্রাচুর্য্য ইহার পূর্ব্বে আর কাহারও ভিতর দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না।

পরিচয় তাহার সহিত গভীর হইল জেলের বাহিরে আসিয়া। একই দিনে আমরা দুইজনে মুক্তি পাইয়াছিলাম।

ঠিকানা একটা অবশ্য ছিল কিন্তু জেল হইতে ফিরিয়া সরকারী চাকুরেদের বাড়ীতে সাদর অভ্যর্থনা যে পাইব না তাহা জানিতাম। আমাকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া সে নিজে হইতে নিমন্ত্রণ করিয়া বসিল, বলিল, "চ আমার ওখানে।"

তাহার 'ওখান' সম্বন্ধে কোন কথা না জানিয়াই তাহার সহিত রওনা হইলাম।

কলিকাতার এক প্রান্তে দরিদ্র পল্লীর ভিতর ধ্বংসোন্মুখ একটি মেটে বাড়ীর চেহারা দেখিয়াই অনুমান করিয়াছিলাম যে, কলিকাতায় একটা আস্তানা থাকিলেও শচীনের অবস্থা আমার অপেক্ষা বিশেষ ভালো নয়।

পরে জানিয়াছিলাম বাড়ীটিও তাহার নিজেদের নয়---একটি ঘরে সে ভাড়া দিয়ে থাকে মাত্র।

দরজার কড়া নাড়িতেই একটি বছর আঠার-উনিশের মেয়ে আসিয়া দরজা খুলিয়া দিয়া সরিয়া গেল।

শচীন বক্তৃতার স্বরে বলিল, "দেখলি ত ব্যাপার? এতে আর স্বদেশ-সেবা করতে ইচ্ছে করে। কোথায় জেল থেকে বেরুতে না বেরুতেই রোল উঠবে---'জাগ জাগ পুরনারী, জিনিয়া সমর আসিছে অমর বীরকুল তোমারি,' তার বদলে রাস্তায় ত একটা লোক ডেকেও শুধোল না। বাড়ীতে ঢুকতে একটি মাত্র পুরনারী চোখে পড়ল, তিনিও চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে সরে পড়লেন। নে, আয় তুই।"

মেয়েটি তাহার কোনও আত্মীয়া হইবে ভাবিয়া তাহার কথায় হাসি পাইয়াছিল।

কিন্তু তাহার ঘরে গিয়া বসিবার পর তাহার কথায় অত্যন্ত বিস্মিত ও বিরক্ত হইয়া উঠিলাম। ঘরের একধারে গুটানো একটা ছিন্ন মাদুর সে পাতিতেছিল।

যে মেয়েটি দরজা খুলিয়া দিয়াছিল সেই বোধ হয় দরজার সম্মুখ দিয়া ত্রস্তপদে পার হইয়া গেল।

হঠাৎ আমার দুই চোখে হাত চাপা দিয়া শচীন বলিল, "এই গাধা, ও দিকে চাইছিস্ যে বড়! ঘরে আশ্রয় দিলাম, আবার আমারই সর্ব্বনাশের চেষ্টা। দোহাই ভাই, দুটি বছর সাধনা করে সিদ্ধির কূল ধরি ধরি হয়েছে। এখন যদি সব ভেস্তে দাও ত ভাল হবে না বলে রাখছি।"

তারপর আমার মুখের ভাব দেখিয়া উচ্চহাস্যে ঘর মুখরিত করিয়া সে বলিয়াছিল, "ওই যা, তোরা যে এক একটি ঋষ্যশৃঙ্গ তা ভুলেই গেছলাম।"

ভাবিয়াছিলাম, সেই দিনই তাহার আশ্রয় ছাড়িয়া যাইব, কিন্তু পারি নাই।

শুধু যে যাইবার জায়গা কোথাও ছিল না তাহা নয়---শচীনকে ছাড়িয়া যাওয়াও কঠিন।

শচীনের অনেক দোষ।

এক এক সময়ে মনে হয়, জীবনের কোন আদর্শেরই মূল্য বুঝি তাহার কাছে নাই। মাঝে মাঝে তাহার লঘু তরলতায় পীড়িত হইয়া উঠি। তবু তাহাকে কেমন যেন ভালবাসিয়া ফেলিয়াছি।

তাহার আশ্রয়েই দিন কাটিতেছিল। প্রথম কয়েকদিন বুঝিতে পারি নাই---তাহার পরে বুঝিলাম, আর একজনের ভার লওয়া দূরের কথা, নিজের খরচ চালাইবার মত সংস্থানও তাহার নাই।

লজ্জিত হইয়া একদিন দেশে ফিরিয়া যাইবার প্রস্তাব করিলাম।

শচীন খানিক গম্ভীর হইয়া রহিল, তাহার পর হাসিয়া উঠিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল, "মনু---"।

মনু নিকটেই কোথায় ছিল, আসিয়া দাঁড়াইতেই গম্ভীরভাবে ভর্ৎসনা করিয়া শচীন বলিল, "তুমি

রবীনকে পেটভরে খেতে দাও না শুনলাম, বড় অন্যায় কথা। পাড়াগাঁয়ের ছেলে দেশ-উদ্ধারই না হয় করতে এসেছে, তা বলে উপোস করে ত আর থাকতে পারে না। ও-ত রেগে মেগে দেশেই চল্ল।"

অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইয়া বলিলাম, "বাঃ, আমি সেই জন্যেই দেশে যেতে চাচ্ছি বুঝি?"

কয়েকদিন ধরিয়া মনু অসঙ্কোচে আমার সম্মুখে বাহির হইতেছিল। এই কয়দিনের পরিচয়েই বুঝিয়াছিলাম, দুষ্টামিতে এই চঞ্চল মেয়েটি কাহারও অপেক্ষা কম নয়।

হাসিয়া সে বলিল, "না খেতে পেয়েই ত ওই দত্যির মত চেহারা---দেখলে ভয় করে! পেট ভরে খেতে দিলে আর রক্ষা থাকবে!"

মনু চলিয়া যাইতেছিল, ডাকিয়া ফিরাইয়া শচীন বলিল, "দেখ মনু, রবীন জোয়ান মানি, কিন্তু তুমি বরাবর ওর চেহারার ওরকম প্রশংসা আমার সামনে কোরো না। আমার ঈর্ষ্যা হয় তা জান!"

"হোক্" বলিয়া মনু চলিয়া গেল।

শচীনকে চিনিতাম। কথাটা সে যে এমনি করিয়া চাপা দিল, তাহাও বুঝিলাম। কিন্তু এমন করিয়া কতদিন সে আর চালাইবে ভাবিয়া উৎকণ্ঠিত না হইয়াও থাকিতে পারলাম না।

আয় তাহার নিজের কিছুই নাই। সে নিজে বহুদিনের পরিচয়ের সূত্রে বা যে কারণেই হউক এই দরিদ্র পরিবারের উপর ভর করিয়া থাকিতে হয় ত পারে; কিন্তু ইহার উপর অকারণে আর এক বন্ধুর ভার তাহাদের স্কন্ধে চাপাইয়া দেওয়া তাহার কখনই উচিত নয়। সে কথা তাহাকে বলিতে যাওয়া অবশ্য বৃথা। একদিন জোর করিয়া বলিয়াছিলাম। সে পরিহাস করিয়া উত্তর দিয়াছিল, "মানুষকে অত ঘেন্না করিস কেন, বল্ ত। আমরাই সকলের উপকার করব, আমাদের উপকার করবার সুবিধে কাউকে দেব না---এত বড় অহঙ্কার!"

কিন্তু উপকার করিবার সুবিধা দেওয়া আমার পক্ষে এবার অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। একটি মাত্র লোকের রোজগারে মনুদের সংসার কোন রকমে চলে। কোন মোটরের কারখানার মোটরমিস্ত্রীর কাজ করিয়া মনুর বড় ভাই যাহা রোজগার করিয়া আনে, বিধবা মাতা ও ভগ্নীর ভরণপোষণের পক্ষেই তাহা যথেষ্ট নয়। তাহার উপর এই দুটি অতিরিক্ত লোকের বোঝায় সংসার তাহাদের প্রায় অচল হইয়া উঠিয়াছে বুঝিতে পারিতেছিলাম।

তাহাদের দিক হইতে বিরক্তি বা অসন্তোষের কোন লক্ষণ অবশ্য দেখি নাই। এই কয়দিনের ব্যবহারে বুঝিয়াছিলাম এই সমস্ত পরিবারটিরই নিকট শচীন দেবতা বিশেষ।

কাজ শেষ করিয়া বাড়ী ফিরিতে অক্ষয়ের রাত্ হইত। দেখা তাহার বড় পাইতাম না। শচীনের সঙ্গে যে দু'একবার তাহাকে কথা কহিতে দেখিয়াছিলাম তাহাতেই বিস্মিত না হইয়া পারি নাই। মানুষ যে মানুষকে অত শ্রদ্ধা করিতে পারে ইহার পূর্ব্বে কোনদিন কল্পনা করিতে পারি নাই।

শচীনের পক্ষে এ শ্রদ্ধা গ্রহণ করা হয় ত অন্যায় নয় মানিলেও এ শ্রদ্ধা ভাঙ্গাইয়া দিন যাপন করিতে মন আমার গ্লানিতে ভরিয়া উঠিতেছিল।

আমার দেশে যাইবার কথা চাপা দিয়া নিশ্চিন্ত মনে শচীন বিছানায় শুইয়া পড়িয়া কি একটা বই পড়িতেছিল।

বইটা টানিয়া লইয়া বলিলাম, "দোহাই তোমার; খানিকক্ষণের জন্যে হাসিঠাট্টা রেখে আমার একটা কথা শুনবে?"

আমার দিকে একবার চাহিয়া কি ভাবিয়া উদ্যত হাসি দমন করিয়া সে বলিল, "কি বল্ না?"

"এই রকম কুড়ের মত দিনের পর দিন কাটাতে তোমার ভাল লাগে?"

"এত গেল ভূমিকা, তারপর---"

"তারপর এখানেই যদি রইলাম, তাহলে কোন রকমে কিছু রোজগারের চেষ্টা করা যায় না? তুমি না কর আমি করতে পারি না?"

অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সহিত উঠিয়া বসিয়া শচীন বলিল, "ঠিক বলেছিস্, রোজগার কিছু করা দরকার হয়ে পড়েছে। বীরের এ বসুন্ধরা--অলস কুড়ে পরগাছাদের এখানে স্থান নেই। দেহের ঘামে

পৃথিবীর মাটি যারা সরস উর্ব্বর করে তুলেছে, নখর দিয়ে পৃথিবী বিদারণ করে খনির গুপ্তধন যারা ছিনিয়ে আনছে, আমরা তাদের দলে। পরগাছা আমরা নই, যে হাত আমরা মুখে তুলি সে হাতময় কঠিন কাজের কড়া পড়েছে।---মনু।"

বিরক্তির মধ্যেও বক্তৃতার শেষে তাহার মনু ডাকে হাসিয়া ফেলিলাম। বলিলাম, "আবার মনুকে দরকার হ'ল কেন?"

"বাঃ ওদেরই ত দরকার আগে। পৃথিবীর সকল কর্ম্মের ওরাই প্রেরণা--ওরা শক্তি।"

"বক্তৃতাটা শুনেছি, এখন কিসের শক্তি প্রয়োজন শুনি?" মনু দরজায় আসিয়া দাঁড়াইয়া হাসিতে লাগিল।

"শুনতে পেয়েছ তা জানি। এখান থেকে দেখতে পেয়েই বক্তৃতাটা দিয়েছি। আচ্ছা, তোমার সেই বালাগাছটা এখনও আছে না গেছে? মাস কয়েক আগে মনে হচ্ছে একবার নিয়েছিলাম। ফিরিয়ে দিয়েছি কিনা মনে নেই।"

"ফিরিয়েই দিয়েছ। দাঁড়াও এনে দিচ্ছি।" বলিয়া মনু চলিয়া গেল।

সত্যই রাগ হইয়াছিল। বলিলাম, "তুমি কি একেবারে নির্লজ্জ শচীন? এদের ওপর এত অত্যাচার করেও তোমার হয় নি! কোন্ মুখে মনুর বালাটা তুমি চাইলে?"

"পরম সহাস্য-সুন্দর-মুখে। চেয়েই দেখ্ না।" খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া আবার সে বলিল, "আহা, চটিস্ কেন ভাই! কি করি আগে, তাই দেখ্ না।"

মনু বালাটা আনিয়া দিবার পর আমাকে লইয়া শচীন বাহির হইয়া পড়িল।

অত্যন্ত অপ্রসন্ন মনে তাহার সঙ্গে যাইতেছিলাম। পথে কাগজে-মোড়া বালাটা একবার বাহির করিয়া সে বলিল, "ভাগ্যিস্ তুই রোজগারের কথা বল্লি, নইলে আমার খেয়ালই হত না।"

"খেয়াল ত খুব হয়েছে, চলেছ একটা অসহায় মেয়ের গয়না বেচতে।"

শচীন একটু হাসিল, তারপর আমার পিঠ চাপড়াইয়া বলিল, "মোট বইতে পারবি? খবরের কাগজের বোঝা নিয়ে ফিরি করে বেড়াতে লজ্জা করবে না ত?"

আমাকে নীরব থাকিতে দেখিয়া আবার বলিল, "ওরে পাগলা, রোজগার করতে হ'লেও যে টাকার দরকার! এই বালার টাকা কাগজের অফিসে জমা দিয়ে রোজ দু'জনে কাগজ বিক্রি করব। দু'মাসে বালা ত বালা, মনুর সোনার হার গড়িয়ে শোধ দেব'খন। বুঝলি!"

বুঝিয়াও একেবারে প্রসন্ন হইতে পারিলাম না।

তাহার সঙ্গে সহরের অপর প্রান্তে এক স্যাক্‌রার দোকানে যখন পৌঁছিলাম তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। বলিলাম, "এতখানি পথের মধ্যে আর স্যাক্‌রার দোকান ছিল না?"

কথার উত্তর না দিয়া সে দোকানে গিয়া প্রবেশ করিল। কিন্তু এত দূরে আসিয়াও দাম লইয়া বনিবনাও কিছুতেই হইল না। স্যাকরা যাহা দিতে চাহিয়াছিল, তাহা নাকি অত্যন্ত অল্প। বালাটি আবার কাগজে মুড়িয়া লইয়া সে উঠিয়া আসিতেছিল। হঠাৎ কি ভাবিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া মোড়কটা ফেলিয়া দিয়া বলিল, "দিন, যা আপনাদের ধর্ম্মে হয়। অনেক হেঁটেছি আর ঘোরাঘুরি করতে পারি না।"

স্যাকরা বুঝি সত্যই দাঁও মারিয়াছিল। পাছে আবার মত বদলায় সেই ভয়েই বোধ হয় তাড়াতাড়ি সে টাকাটা বাহির করিয়া দিল।

পথে আসিতে আসিতে বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "এত দূরে ভালো দামের জন্যে এসে অত কমে রাজী হলে কেন?"

"কি করব, আর ঘুরতে ভাল লাগল না।" বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

বাড়ী ফিরিয়া কিন্তু তার হাসির অর্থ বুঝিয়া বিস্ময়ে ঘৃণায় বিরক্তিতে একেবারে নির্ব্বাক হইয়া গেলাম।

মনুকে ডাকিয়া শচীন বলিল, "টাকাগুলো আজ তুলে রাখ ত' মনু---কাল থেকে এই টাকায় রোজগার সুরু হবে। আর তোমার বালাটা

আজ আর দরকার লাগল না, এটাও তুলে রাখ্।"

কাগজের মোড়ক খুলিয়া বালাটা সে মনুর হাতে তুলিয়া দিল।

মনু চলিয়া যাইবা মাত্র আমার মুখের ভাব দেখিয়া তাহার স্বাভাবিক উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া সে বলিল, "অবাক্ হয়ে গেছিস্ না রে রবি? ম্যাজিক রে ম্যাজিক, হাতের কসরৎ কি মিছামিছি শিখেছিলাম!"

"অবাক্ তোমার ম্যাজিক দেখে হইনি শচীন; কিন্তু সে কথার আর দরকার নেই। কাল থেকে আমি আর এখানে থাকব না।" বেদনায় গলার স্বর বুঝি সত্যই ভারী হইয়া আসিয়াছিল।

আমার কাছে ঘেঁসিয়া আসিয়া আমার মুখের দিকে খানিক তাকাইয়া থাকিয়া সে আবার হাসিয়া ফেলিল। তাহার পর কৃত্রিম দুঃখের স্বরে বলিল, "তোরা সব কার্ল মার্কস্, বাকুনিন, লেনিন পড়িস, মুখে রাশিয়ার মত পৃথিবীতে সকলকে সব-ধন সমান ভাগ-বাঁটোয়ারা ক'রে সব সমতল করে দেওয়া উচিত বলিস্। আর আমি সোজা মানুষ, তাই শুনে হাতে-নাতে ম্যাকরা বেচারার টাকার পাহাড়ের চূড়োর ডগাটুকু যেই খসিয়েছি অমনি গেলি চটে! লেনিনের দল না হয় মেরে ধরে খুন করে কাজ হাঁসিল করেছে; আমার বেলা কি শুধু হাতসাফাই বলেই দোষের হ'য়ে গেল?"

এ সময়ে তাহার ভাঁড়ামী আর সহ্য করিতে পারিতেছিলাম না। শুধু বলিলাম, "না শচীন, এখানে আমি আর থাক'ত পারব না।"

খাইতে ডাকিবার জন্য আসিয়া মনু শেষের কথাগুলি বোধ হয় শুনিতে পাইয়াছিল।

জিজ্ঞাসা করিল, "থাকতে পারবে না! কে থাকতে পারবে না?"

শচীন বলিল, "রবীন কাল এখান থেকে চলে যাবে মনু। তা যাক্। চেহারাটা ওর বড্ড ভাল; ঈর্ষ্যায় হিংসেয় শয়নে স্বপনে আমার আর সোয়াস্তি ছিল না কদিন।"

মনু হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, "কি যে ঠাট্টা কর রাতদিন!"

খাইবার সময় সেরাত্রে বিশেষ কোন কথা আর হয় নাই। দু'একবার রসিকতা করিবার চেষ্টা অবশ্য শচীন করিয়াছিল, কিন্তু অবশেষে কাহারও দিক হইতে কোন সাড়া না পাইয়া সেও চুপ করিয়া গেল।

অকস্মাৎ এ বাড়ী ছাড়িয়া যাইবার সঙ্কল্প জানাইয়া ফেলিয়া অকারণেই কেমন যেন লজ্জা বোধ করিতেছিলাম। মনে হইতেছিল মনুও যেন কেমন একটু অস্বাভাবিকভাবে আমার দিকে চাহিতেছে। ভাত দিতে আসিয়া একবার চোখাচোখি হইতেই সে হাসিয়া বলিল, "আমাদের বিশ্রী রান্নায় বিরক্ত হয়েই বুঝি পালাচেছন?"

"আর যা কিছু বলো ও-অপবাদ তুমি রবিকে দিতে পার না মনু। তোমার রান্না ত ছার, জেলের লাপ্‌শির সঙ্গে ফরাসী 'শেফের' রান্নার তফাৎ রবি বুঝতে পারে, এত বড় নিন্দে ওর অতি বড় শত্রুও করতে পারে না" বলিয়া শচীন হাসিতে লাগিল।

পরদিন সকালে যখন ঘুম হইত উঠিলাম তখন বেলা বেশী হয় নাই কিন্তু সাধারণতঃ বেলা নয়টার পূর্ব্বে শয্যাত্যাগ করা যাহার নীতিবিরুদ্ধ, সেই শচীনকে অত সকালেও ঘরে দেখিতে পাইলাম না।

নিজের সামান্য যে জিনিষপত্র ছিল তাহাই একটি পুঁটলিতে বাঁধিয়া ফেলিতেছি, এমন সময় মনু আসিয়া ঘরের চৌকাঠের উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল, "ও কি করছ?"

অকারণে সঙ্কুচিত হইয়া বলিলাম, "আজকে আমায় যেতে হবে।"

আর কিছু সে বলিল না, শুধু খানিকক্ষণ অদ্ভুত-ভাবে আমার দিকে চাহিয়া থাকিয়া নীরবে উঠিয়া গেল। তাহার নূতন সম্বোধনের বিস্ময় তখনও কাটাইয়া উঠিতে পারি নাই।

জিনিষপত্র বাঁধা তখন হইয়া গিয়াছে। শুধু শচীনের সঙ্গে দেখা না করিয়া এবং আর একবার মনুদের নিকট ভাল করিয়া বিদায় না লইয়া একেবারে চলিয়া যাওয়া সঙ্গত হইবে কি না ভাবিয়া পাইতেছিলাম না। এক একবার সন্দেহ হইতেছিল,

অপ্রত্যাশিতভাবে সকালে উঠিয়া শচীনের অন্তর্দ্ধানও বোধ হয় আমায় ধরিয়া রাখিবার একটা ছল।

কিন্তু খানিক পরেই মনু আবার ফিরিয়া আসিল এবং দরজা হইতে আমার দিকে না চাহিয়াই বলিল, "যদি একান্তই যেতে চাও তাহলে এবেলায় খাওয়া-দাওয়া না সেরে যেও না। আমি রান্না চড়িয়ে দিয়েছি।"

কিন্তু মনুর কথাতে সঙ্কল্প আমার যেন হঠাৎ স্থির হইয়া গেল। আর বেশীক্ষণ থাকিলে এ বাড়ী ছাড়িয়া যাইবার মত মনের জোর থাকিবে কি না সে বিষয়ে একটু ভয়ও বুঝি মনের ভিতর ছিল।

তাড়াতাড়ি বলিলাম, "না না, এবেলা খাওয়া আমার আর হবে না মনু; আমায় এখনি যেতে হবে।" পুঁটলিটি হাতে করিয়া উঠিয়া পড়িলাম।

মনু হঠাৎ হাসিয়া উঠিল; বলিল, "এত ভয় পাচ্ছ কেন। আমরা জোর করে ধরে রাখব না।"

শচীন হইলে একথার জবাব বোধ হয় কিছু একটা দিতে পারিত। অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইয়া কিছুই বলিতে পারিলাম

মনু আবার হাসিল, বলিল, "ভদ্রতার খাতিরেও আমার কথার একটু প্রতিবাদ করতে ত হয়। এমন মুখচোরা লোক আসে দেশ উদ্ধার করতে? তুমি তাড়াতাড়ি দেশে ফিরে যাও, বুঝেছ।"

বোবা সত্যই নই, কিন্তু সেদিন এই মেয়েটির সামনে কণ্ঠ যেন রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। অত্যন্ত অপরাধীর মত পুঁটলিটি লইয়া দরজা দিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। মনু প্রথমে দরজা ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইয়াছিল কিন্তু এক পা যাইবার পূর্ব্বেই হঠাৎ আগাইয়া আসিয়া খপ্ করিয়া ডান হাতটা ধরিয়া ফেলিল।

ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলাম। এ কী অদ্ভুত ব্যবহার। আমার বিমূঢ় সন্ত্রস্ত মুখের দিকে চাহিয়া মনু আবার হাসিয়া উঠিল।

"এখন যদি জড়িয়ে ধরে রাখি।"

এই অপ্রত্যাশিত অবস্থায় বলিবার মত কিছু ভাবিয়া উঠিবার পূর্ব্বেই আবার বলিল, "ভাবছ, কি বেহায়া নির্লজ্জ এই মেয়েটি,---না? ঘৃণায় সর্ব্বশরীর শিউরে উঠছে বোধ হয়।"

তাহার পর হাতটা আবার ছাড়িয়া দিয়া বলিল, "নাঃ, তোমার মত লোককে নিয়ে ঠাট্টা করাও পাপ।" এবং বাহিরের দরজা পর্য্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে গিয়া দরজায় ঠেসান দিয়া দাঁড়াইয়া গম্ভীর হইয়া বলিল, "আমায় যা খুসী মনে কোরো, কিন্তু আমার ব্যবহারে সমস্ত মেয়েমানুষ জাতটাকে যেন বিচার করে বোসো না, তোমার মত লোকের পক্ষে তা যদিও স্বাভাবিক।"

তাহার দিকে ভাল করিয়া চাহিতে পারি নাই। শুধু দেখিয়াছিলাম তখনও সে হাসিতেছে কিন্তু আচ্ছন্নের মত পথ দিয়া যাইতে যাইতে মনে হইতেছিল, এমন হাসি তাহার মুখে কখনও যেন দেখি নাই।

কোথায় যাইব ঠিক কিছুই করি নাই লক্ষ্য-হীন হইয়াই পথ চলিতেছিলাম।

শচীন কখন হইতে পিছু লইয়াছে বুঝিতে পারি নাই। পিছন হইতে অকস্মাৎ পিঠে চাপড় মারিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "কি এমন ভাবতে ভাবতে যাচ্ছিস্ বল্ ত? আমি যে পাঁচ মিনিট তোর পেছু পেছু আসছি

যাহা ভাবিতেছিলাম তাহা শচীনকে বলিবার নয়, নিজের মনের কাছেই তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল এমন কথাও বলিতে পারি না। তাই তাহার দিকে ফিরিয়া শুধু জিজ্ঞাসা করিলাম, "এত সকালে কোথায় গিয়েছিলে?"

সে কথার জবাব না দিয়া শচীন বলিল, "তাহলে সত্যিই চল্লি। ভেবেছিলুম আমার সঙ্গে শেষ দেখা না করে অন্ততঃ যেতে পারবি না, কিন্তু তোরা হলি ভীষ্মের জাত, সব পারিস।"

মনুও যেন এমনি কথাই বলিয়াছিল। উত্তর না দিয়া চলিতে লাগিলাম।

সঙ্গে যাইতে যাইতে শচীন জিজ্ঞাসা করিল, "কিন্তু চলেছিস্ কোন্ চুলোয়? তোর সে আগের আস্তানায় ত ওঠবার উপায় নেই জানি।"

সত্য কথাই বলিলাম---"এখনো ভেবে কিছু ঠিক করিনি।"

সে হাসিয়া বলিল, "ঠিক করবারই বা কি

আছে? কলকেতার রাস্তায় ফুটপাথগুলো যথেষ্ট চওড়া, ভালো দেখে একটা গাড়ী-বারান্দা বেছে নিলে দেখেছি ঝড়বৃষ্টিও গায়ে লাগে না। মাথায় দেবার জন্য একটা ইট? তাও দুষ্প্রাপ্য নয়। সুতরাং ভালোই থাকবি।"

তাহার কথার ধরণে হাসিয়া ফেলিলাম।

সে আবার বলিল, "আমার সংস্রবে থাকতে ত আর পারবি না; কিন্তু আমার একটা কথা শুনলে মহাভারত অশুদ্ধ বোধহয় হবে না, কি বল?"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি কথা?"

"ফুটপাথের চেয়ে সামান্য একটু ভাল জায়গা আমার জানা আছে। একান্তই ফুটপাথে শয়নের শপথ না নিয়ে থাকলে যেতে পারিস। বেশী কিছু নয়, একটা মেস। তবে নেহাৎ খারাপ লাগবে না। শুনেছি দেশের সেবায় অন্ততঃ তিনবার যে না জেলে গিয়েছে তার সেখানে প্রবেশ নিষেধ। সুতরাং সান ইয়াৎ সেন, ডি ভ্যালেরার দলে ভালই থাকবি বলে আশা করি।"

মেসের ঠিকানা ইত্যাদি সমস্ত সে বলিয়া দিল। প্রস্তাবটা মন্দ নয়, কিন্তু তবুও একটু ইতস্ততঃ করিতেছিলাম।

শচীন নিজে হ'তেই আমার মনের কথা বুঝিয়া বলিল, "না না, টাকাকড়ির জন্যে ভাবতে হবে না। যখন সুবিধে হবে তখন দিলেই চলবে। শুধু নগদা চাই দেশপ্রেম। তা যে তোর আছে, সে তারা দেখেই বুঝবে। আচ্ছা আসি তাহলে।" বলিয়া হঠাৎ বিদায় লইয়া শচীন চলিয়া গেল।

পথ খুঁজিয়া সে-মেসে গিয়া যখন পৌছিলাম, তখন দু'পহর হইয়া গিয়াছে। খদ্দরের গান্ধী টুপি পরিহিত একটি খর্ব্ব ক্ষীণকায় ছেলে মেসের দরজায় দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিলাম মেসে থাকিবার জায়গা আছে কি না।

পুরু চশমার কাঁচের ভিতর দিয়া আমায় খানিকক্ষণ সন্দিগ্ধভাবে নিরীক্ষণ করিয়া ছেলেটি বলিল, "আপনার নামই কি রবীনবাবু?"

আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম, "হাঁ"।

পরমুহূর্ত্তেই সাদর অভ্যর্থনা করিয়া ছেলেটি বলিল, "বাঃ! আপনার জন্যেই ত অপেক্ষা ক'রে দাঁড়িয়েছিলাম। দেরী হল যে?"

ব্যাপারটা বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু কোন প্রশ্ন করিবার পূর্ব্বেই ছেলেটি তাড়াতাড়ি বলিল, "আসুন এই ওপরেই আপনার সীট ঠিক হয়েছে।" এবং পুঁটলিটি আমার হাত হইতে এক প্রকার কাড়িয়া লইয়াই নিকটের সিঁড়ি দিয়া সবেগে উপরে উঠিয়া গেল।

বাধ্য হইয়াই তাহার পিছু পিছু গেলাম কিন্তু রহস্যের তখনও সমাধান করিতে পারি নাই। এক-মুহূর্ত্তের পরিচয়ে বুঝিয়াছিলাম ছেলেটি কথা বলে বড় বেশী। সে অনর্গল বকিয়া চলিতেছিল। সিঙ্গল সীটের রুম ত আর এ মেসে নেই। ডবল সীটও এই একটি; আপনি থাকবেন বলে নরেনকে জোর-জবরদস্তি করে তুলে নীচে পাঠিয়ে দিলাম। সে কি সহজে যেতে চায়! জানেন ত, ওইখানেই ছিল রজনীবাবুর সীট, রাজবন্দী রজনী মুখুজ্যে, বুঝেছেন ত?---

তাহার এ বাক্যস্রোতের ভিতর সামান্য একটু প্রশ্ন করিবার ফাঁক পাওয়া অসম্ভব জানিয়াই চুপ করিয়া ছিলাম। কিন্তু তাহার কথাতেই রহস্য শেষে পরিষ্কার হইয়া গেল।

সে বলিতেছিল---"আপনি আবার একটু নিরিবিলি ভালবাসেন শুনলাম, কিন্তু কি করবো বলুন, ঘর ত আর নেই, সব ঘরেই পাঁচ ছজন করে লোক। শেষকালে শচীনবাবু বল্লেন, তাহলে আর কি হবে, এই সীটটাই তাকে দিও। তিনি ত একেবারে পুরো মাসের চার্জ্জই দিচ্ছিলেন, আমরা বল্লাম তা কি হয়, এখানে কি আমরা ব্যবসা করতে বসেছি---"

ছোট একটি বাড়ী---

তাহারই ভিতর শচীনের কথায় বলিতে গেলে ভারতের ভাবী জন কুড়ি ডি ভ্যালেরা ও সান্ ইয়াৎ সেন ভীড় করিয়া বাস করি।

কিন্তু ছোট হইলে কি হয় বাড়ীটি অশেষ স্মৃতি-সমৃদ্ধ।

এই বাড়ীরই কোন ঘরে নাকি দেশবন্ধু আসিয়া

কবে ছেলেদের সহিত আলাপ করিয়া গিয়াছেন। এই বাড়ী হইতেই সুদূর মান্দালয়ের কারাগারে কোন দেশপ্রেমিক স্বদেশের জন্য আত্মবলি দিতে গিয়াছেন।

বৎসরে অন্ততঃ দুইবার নাকি এ বাড়ীতে পুলিশের পদধূলি পড়ে।

বিনয়ের কাছে সে সমস্ত কাহিনী ইতিমধ্যেই কয়েকবার শুনিয়াছি! তাহার অনর্গল কথা বলিবার অভ্যাস সত্ত্বেও ছেলেটিকে বড় ভালো লাগে। সেই আমার ঘরের সঙ্গী।

তাহাকে দেখিয়া মনে হয় কোন্ দিক দিয়াই কৈশোরের স্বপ্ন কাটাইয়া উঠিতে সে পারে নাই। সে যেন বাড়ে নাই—কোন দিনই বুঝি বাড়িবে না। বালকের মত খর্ব্ব কৃশকায় এই ছেলেটির ভিতর এমন একটি আত্মবিলোপের ভাব আছে যাহাকে কাপুরুষতা বলিয়া ভুল করা অত্যন্ত সহজ। নিজেকে সে সকলের কাছেই ছোট করিয়া রাখিতে চায়। শুধু স্বপ্ন ও শ্রদ্ধাতেই বুঝি তাহার জীবনের সার্থকতা।

আকাশে চোখ তুলিয়াই সে চিরদিন মানুষের দিকে চাহিয়াছে—চোখ নামাইয়া কাহাকেও দেখিতে সে শেখে নাই।

তাহার সহিত আলাপ করিয়া বিস্মিত হই।

অবস্থা তাহাদের ভালো নয়। দেশে তাহার বিধবা মা আছেন। ছোট কটি ভাইবোনও আছে। অনেক আশা করিয়া নিজেদের সকল দিক দিয়া বঞ্চিত করিয়া বিধবা মা বুঝি ছেলেটিকে কলিকাতায় লেখাপড়া শিখিতে পাঠাইয়াছিলেন। সে ছেলে তাঁর ঘরে ফেরে নাই। বাঁচিয়া আছে কি না সে খবরটুকুও সে পাঠায় না।

বিনয় করুণভাবে একটু হাসিয়া বলে—"ঘরে মা উপোসী আর আমি করছি দেশের সেবা—বিদ্রূপ করবার কথাই বটে!—না রবি-দা?"

তাহার পর নিজে নিজেই বলিয়া যায়—"কিন্তু সমস্ত বাঙলা মায়ের ছেলেরাই যে মরে গেছে রবি-দা। আমার মায়ের দুঃখু তার মাঝে আর কতটুকু।"

এমনি রঙীন বিনয়ের মন।

আর কাহারও মুখ হইতে শুনিলে বুঝি ন্যাকামিই মনে হইত কিন্তু তাহার মুখে কেমন যেন বেমানান মনে হয় না।

বিনয় বলিতে থাকে—"নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে আমার মনে কোন ভুল ধারণা নেই রবি-দা। দেশ দূরের কথা, হয়ত আমার এক মায়ের দুঃখ দূর করবার ক্ষমতাও আমার নেই—আমি যে দুনিয়ার অপটু অক্ষমদের দলে তা আমি জানি, কিন্তু জীবনের ছোট কাজে ব্যর্থ হয়ে নিজের অক্ষমতাকে উপলব্ধি করতে আমি চাই না রবি-দা।"

তারপর খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলে—"পাখা যখন পুড়বেই তখন এইটুকু সান্ত্বনা যেন থাকে যে প্রদীপ নয়, সূর্য্যকে আলিঙ্গন করতে গিয়েই তা পুড়েছে।"

দুজনেই খানিক চুপ করিয়া থাকি।

জানালা দিয়া লক্ষ্যহীন দৃষ্টিতে বাহিরের দিকে তাকাইয়া বিনয় বোধ হয় তাহার অক্ষমতাকে কাব্যের রঙে রঙীন করিয়া তুলিতে থাকে।

আর আমি নিজের চিন্তার প্রচ্ছন্ন গতি সম্বন্ধে সহসা সচেতন হইয়া নিজের কাছেই লজ্জিত হইয়া পড়ি।

এই কয়দিন ধরিয়া আমার সমস্ত চিন্তা যে আবর্ত্তে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফিরিতেছে সে আবর্ত্তের কেন্দ্র যে কোথায় নিজের কাছে কোনমতেই আর তাহা গোপন রাখা যায় না।

শুধু লজ্জিত নয়, ভীতও হইয়া উঠি।

নারীকে বাদ দিয়া জীবনের পরিপূর্ণতার স্বপ্ন অবশ্য কখন দেখি নাই। কিন্তু জীবনকে ছন্দোপতন হইতে যে বাঁচাইবে তাহাকে যে ভিন্নরূপে কল্পনা করিয়াছিলাম। নিজের কল্পনা ও পৃথিবীর কাব্যলোক হইতে চয়ন করিয়া মনের ভিতর যে তিলোত্তমাকে গড়িয়াছিলাম, দ্বিধায় জড়িত তাহার মৃদু গতি, ব্রীড়াবনত তাহার লাজরক্ত মুখ, আনত দৃষ্টিতে তাহার একান্ত নির্ভরতা—লতিকার মত সে আমার ঋজু সবল জীবনকে জড়াইয়া উঠিয়াই সার্থক।

কিন্তু সমস্ত জীবনের উপর অসীম স্নিগ্ধতা বিস্তার করিয়া যে আসিবে ভাবিয়াছিলাম, সে কি আসিল সমস্ত জীবন মথিত করিয়া প্রচণ্ড প্লাবনের মত।

নিজের ভিতরে চাহিয়া দেখি, দিগ্‌দিকে মনের সমস্ত কূল বিলুপ্ত নিশ্চিহ্ন করিয়া, বিচার, বুদ্ধি, সংস্কার, সমস্ত ভাঙ্গিয়া উন্মত্ত বন্যা চলিয়াছে—এই কি প্রেম।

—এই কী জীবনে নারীর আবির্ভাব?

আমার কল্পনার নম্রনেত্র সঙ্গিনী সে নয়। এত দূরে আসিয়াও তাহার সে দৃষ্টির জ্বালা অন্তরের মাঝে অনুভব করিয়া শিহরিয়া উঠি। লতার মত জড়াইয়া উঠিতে সে চায় না, দুই সবল হাতে জীবনের সমস্ত মূল ধরিয়া সে যে আকর্ষণ করে।

ভীরু পাখীর মত যে নারী আসিয়া বুকের ভিতর আশ্রয় খুঁজিবে ভাবিয়াছিলাম, সভয়ে চাহিয়া দেখি তাহারই প্রবল আকর্ষণের বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করিয়া নিজের পথে চলিবার স্বাধীনতা আমায় বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে ;—অথচ এ সংগ্রামে জয়ী হইবার মত দুর্ভাগ্যও বুঝি আর কিছু নাই।

তবু সেই শপথই গ্রহণ করি।

হঠাৎ শচীনের কথায় আমার চমক ভাঙ্গে। কখন সে আসিয়া দরজার পাশে দাঁড়াইয়াছে লক্ষ্য করি নাই।

হাসিতে হাসিতে হঠাৎ গম্ভীরতার ভাণ করিয়া বলে—"আমি সন্তুষ্ট হলাম বিনয়। দেশের জন্য এম্‌নি তন্ময় হয়ে ভাবাই প্রয়োজন। নীচে বাড়ীওয়ালা মেসের ভাড়া চাইতে এসেছিল- - -তা আসুক। ভাড়ার বদলে তোমাদের পালোয়ান ঠাকুর তাকে অর্দ্ধচন্দ্র দিয়েছে—তা দিক। তোমাদের মেসের গোলমালে অর্দ্ধেক কল্‌কাতা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে—তা উঠুক, তোমাদের ধ্যান যে ভাঙ্গেনি এইটুকুই আনন্দের কথা।"

বিনয় অপ্রতিভ হইয়া কি বলিবার চেষ্টা করে। তাহাকে হাত নাড়িয়া থামাইয়া শচীন বলিয়া যায়—"দেশের সেবা করতে এসে কেউ কেউ শুধু হাত দুটোই এগিয়ে দেয়—হাতকড়া পরতে, কিন্তু মাথাও যে ঘামাতে হয় একথা তারা জানে না—"

শচীনের বক্তৃতা শেষ হয় না। একমাথা ঝাঁকড়া চুল লইয়া অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন একটি বিশাল-কায় ছেলে শশব্যস্তে ঘরে ঢুকিয়া বলে—"দেখ্‌ দিকি বিনয় কি আছে তোর বাক্সে? যা আছে সব বার করে দে। আজ বেটার নাকের ওপর সব টাকা ধরে দিয়ে কাল উঠে যাব। যা আছে দাও রবি-দা, তোমরা বার করে রাখ আমি এখনি আসছি।"

শেষ কথাগুলি তাহার বাহির হইতেই শোনা যায়।

জিজ্ঞাসা করিয়া ব্যাপার যাহা জানিতে পারি তাহাতে বাড়ীওয়ালার বিশেষ অপরাধ আছে বলিয়া মনে হয় না। মাস আষ্টেকের ভাড়া বুঝি তাহার পাওনা হইয়াছে। তাহাই চাহিতে আসিয়া স্বদেশী ছেলেদের বাড়ী ভাড়া দিবার ঝকমারী সম্বন্ধে কি একটা অপ্রিয় মন্তব্য সে অসাবধানে বুঝি করিয়া ফেলিয়াছিল। দেশের এ-অপমান আর সকলে হয়ত সহ্য করিতে পারিত, কিন্তু আমাদের ঠাকুর পারে নাই। সেইখানেই গোলযোগের সূত্রপাত।

শেষ পর্য্যন্ত সকলের যথাসর্বস্ব একত্র করিয়া যাহা সংগ্রহ হয়, তাহাতে দুই মাসের বেশী ভাড়া দেওয়া যায় না। কিন্তু বাড়ীওয়ালার মুখের ভাব দেখিয়া মনে হয় নিজের এ সৌভাগ্য সে যেন বিশ্বাসই করিতে পারিতেছে না।

দুই মাসের ভাড়ার সঙ্গে কোন কোন লোকের অন্যায় লোভ সম্বন্ধে দুইশত বাছা বাছা মন্তব্য করিয়া বাড়ীওয়ালাকে শোভান বিদায় দিয়া আসে। তাহার পর আমাদের ঘরে ঢুকিয়া ঝাঁকড়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়া বলে—"আজ কিন্তু হরি-মটর!"

কয়দিনেই মেসের রীতিনীতি বুঝিয়া লইয়াছিলাম। সকালে আহারের পর বিকালে আর রান্না হইবে কিনা নিশ্চিত করিয়া কেহ এখানে বলিতে পারে না। একসঙ্গে দুই বেলা আহারের ভরসা এখায়ে খুব কম লোকই রাখে। সুতরাং বিস্মিত না হইবার কথা।

কিন্তু তবু আর কয়েকজনের মুখ চিন্তাকুল হইয়া ওঠে।

মেসের তহবিলের অবস্থা অন্য দিন অপেক্ষা আজ বুঝি একটু বেশী রকম খারাপ ছিল। বাঙ্গালীর খাদ্যের অভ্যাস পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন, দেহের শক্তির সঙ্গে প্রটিনের সম্পর্ক, হিন্দুস্থানীদের স্বাস্থ্য ও শক্তির উৎস কোথায়, ইত্যাদি সম্বন্ধে বক্তৃতা

দিয়া শোভান সকলকে খাদ্য হিসাবে ছাতুর উপকারিতা পরীক্ষা করিতে রাজী করাইয়াছিল। উপায়ান্তর না থাকায় পরীক্ষা অবশ্য সকলেই করিয়াছিল, কিন্তু পরীক্ষায় সন্তুষ্ট বোধ হয় অনেকেই হইতে পারে নাই। সেই ছাতুর পর রাত্রে উপবাসের সম্ভাবনায় প্রসন্ন হইবার কথা নয়।

মেসের পরিচালনা শোভানই করিয়া থাকে। অতি বড় দুর্দ্দিনেও পরাজয় স্বীকার করিতে তাহাকে দেখা যায় না। আজ তাহাকেও হতাশ দেখিয়া মন সকলেরি একেবারে দমিয়া যায়।

ম্লান হাসিয়া শোভান বলে, "চটে গিয়ে ভাড়াটা না চুকিয়ে দিলেই ভালো হ'ত। সব কটাকে বেচলেও এখন একটা পয়সা হবে না।"

বিনয় দরজার দিকে মুখ করিয়া বসিয়াছিল। হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া বলে, "কিন্তু ধোঁয়া আসছে কোথা থেকে! ঠাকুর উনুনে আঁচ দিলে নাকি?"

উনুনে আঁচ! এখানকার হালচাল ঠাকুরের অজানা ত' নয়! তিন বৎসর সে কাজ করিতেছে তাহার ভিতর এক বৎসরের মাহিনা তাহার বাকী। আহার্য্য সংগ্রহের পূর্ব্বে উনুন ধরাইবার মত মূর্খতা সে ত করিতে পারে না।

কিন্তু সত্যই উনুনে আঁচের ধোঁয়া উঠিতেছে। কৌতূহলী হইয়া সকলে নীচে নামিয়া যাই।

ঠাকুর লজ্জিতভাবে জানায় যে, সে আজ মাহিনা পাইয়া মুদিখানা হইতে চাল ডাল কিছু কিনিয়া আনিয়াছে।

আমাদের এখানে কাজ করা ছাড়া সকাল-বিকাল রাস্তার দমকলের জল দিবার কাজ করিয়া ঠাকুর মাসে মাসে কিছু পায় বটে।

শোভান রাগিয়া বলিতে যায়---"এ তোমার ভারী অন্যায় ঠাকুর। তোমারই এক বছরের মাহিনা আমরা দিতে পারছি না---"

শচীন তাহাকে বাধা দিয়া বলে, "চুপ কর শোভান, মানুষের মহত্ত্বকে নীরবে সহ্য করতে হয় ---প্রশংসা দিয়ে তাকে অহঙ্কারী করে তোলা পাপ!"

বিনয় এতক্ষণ যেন অভিভূত হইয়া ছিল, বুঝি একটু বিরক্তির স্বরেই সে বলে---"শচীন-দার সবেতেই ঠাট্টা।"

সেদিন চলিয়া যাইবার সময় হঠাৎ শচীন সিঁড়ি হইতে হাঁকিয়া বলে---"ওরে, মনু তোকে ডেকেছে, একবার যাস।" এবং বাহিরে গিয়া আর একবার চীৎকার করিয়া বলে---"বিশেষ জরুরী, সেই জন্যেই এসেছিলাম।"

মনুর সহিত দেখা করিতে যাই নাই। কিন্তু দেখা করিতে যে যাই নাই, সে কথা ভুলিতেও কোনমতে পারি নাই।

দেখা করিয়া আসিলে বুঝি ব্যাপারটা ইহা অপেক্ষা অনেক সহজে চুকিয়া যাইত। দেখা না করার আত্মসংযমকে এমন করিয়া ক্ষণে ক্ষণে আত্মবঞ্চনা বলিয়া সন্দেহ করিয়া নিজের সহিত নিষ্ফল দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হইতে হইত না।

কিন্তু তাহা হইলে শপথ রক্ষা বুঝি হয় না।

চুপ করিয়া একাকী ঘরে বসিয়া সারাদিন মনু কেন ডাকিয়াছিল তাহা ভাবিয়া কাটাইলেও দোষ নাই। দোষ শুধু সেখানে একবার গেলে।

মনকে এমনি করিয়াই চোখ ঠারি।

দিন-তিনেক বাদে হঠাৎ সকালবেলা শচীন আবার আসিয়া হাজির। ভাবিয়াছিলাম মনুর ডাকে না-যাওয়ার কথাই বুঝি বলিতে আসিয়াছে, কিন্তু সে-ধারও সে মাড়াইল না।

তাহাতে আশ্বস্ত হওয়াই হয়ত উচিত ছিল কিন্তু কেমন যেন একটু হতাশই হইলাম।

বিছানার ধারে বসিয়া পড়িয়া শচীন বলিল ---"তুই এমন নির্লজ্জ, তা ত জানতাম না রবি।"

তাহার নূতন পরিহাসের মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া সবিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিতেই সে হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "অবাক্ হবার কিছু ত নেই বাপু। বলি এ মেসটা কি ধর্ম্মশালা না অনুছত্র? বসে বসে চিরদিন অন্নধ্বংস করলেই চলবে?"

"কিন্তু নগদ দেশে গ্রাম ত এখনও আমার আছে শচীন! এখানে আর কিছুরই দরকার নেই তুমিই ত বলেছিলে।"

শচীন দমিবার নয়, বলিল---"কিন্তু তখন

ঠাকুরের রোজগারে মেস চলেছে তা ত আর জানতাম না।"

শোভান বুঝি বাহিরেই ছিল। শচীনের গলা শুনিতে পাইয়া ভিতরে আসিয়া বলিল---"যা-তা অপবাদ দিও না শচীন-দা।---আজকাল আমাদের দস্তরমত সল্‌ভেণ্ট অবস্থা ; দরকার হলে মাসখানেক 'গেষ্ট' হয়েও থাকতে পার।"

"ঠাকুর দিনে ত দমকল চালায়। রাত্রে তোমাদের জন্যে সিঁদকাটিও চালাচেছ না কি?"

"উঁহু---সে বড় দুঃখের কথা শচীন-দা! ঠাকুর আমাদের ছেড়ে গেল।"

শচীন সত্যই বিস্মিত হইয়া বলিল---"কি রকম? এ মেসের ভেতর সেই ত ছিল সবচেয়ে বড় পেট্রিয়ট---মাইনে না পেয়েও যে দু'বছর সখের চাকরি করেছে, সে হঠাৎ তোমাদের ছেড়ে গেল! এ ত বিশ্বাস করা যায় না।"

একটু থামিয়া শচীন আবার বলিল---"নিশ্চয়ই তোমরা তার মাইনে চুকিয়ে দিতে চেয়েছিলে। সেই অপমানেই সে দেশত্যাগী হয়েছে।"

সকলের হাসি থামিলে বিনয় বলিল---"না শচীন-দা, ঠাকুর গিয়ে সত্যি ভারী অসুবিধে হয়েছে, এ-মেসের প্রত্যেকটি লোকের অমন যত্ন আর কেউ করতে পারবে না। আর গেল ত শুধু শোভানের দোষে।"

শোভান উত্তেজিত হইয়া বলিল---"আমার দোষে কি রকম?"

তাহার জবাব না দিয়া বিনয় বলিয়া চলিল---"হঠাৎ ওঁর ধর্ম্মভাব জেগে উঠল ; শুধু-মেজেতে থালা রেখে আর ভাত খাবেন না, তলায় গামছা পাততে সুরু করলেন। তাতেও কিছু হ'ত না। ঠাকুরের শোভানের ওপর অগাধ ভক্তি। আমরা মোছলমান বলে ক্ষেপালেও সে ঠাট্টা ভেবে হাসত। কিন্তু শেষে সকাল সন্ধ্যে ওঁর নমাজের বহর দেখে তার একটু সন্দেহ হল। তখনও তার বিশ্বাস একমাত্র শোভানের ওপর। অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে একদিন শোভানকেই জিজ্ঞেস ক'রে বল্লে---'সকাল সন্ধ্যে ওসব আপনি কি করেন বাবু?' তখনও যদি শোভান কথাটা উড়িয়ে দেয় তাহলেও হয়। কিন্তু ও একেবারে সটান জবাব দিলে---'আরে তাও জানিসনে? ওসব নমাজ পড়িরে---আমি যে মোছলমান।' তবু কি ঠাকুর বিশ্বাস করতে পারে।---শোভান তার কাছে একটা অবতার বিশেষ! অত্যন্ত সঙ্কুচিত হয়ে হেসে বল্লে, 'আপনি ঠাট্টা করছেন!' কিন্তু শোভান একেবারে নাছোড়বান্দা। তাকে বিশ্বাস করিয়ে---"

তাহার কথায় বাধা দিয়া শোভান বলিল---"আর তখন শচীন-দা, তোমার পেট্রিয়টের রাগ দেখে কে! আমাদের চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করে ছাড়লে। এতদিনকার দেশভক্তি ধর্ম্মের স্রোতে একেবারে তলিয়ে গেল।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া শোভান গম্ভীরভাবে মন্তব্য করিল---"চিরদিন হিন্দুর দেশ এমনি করেই তলিয়ে গেছে।"

আমরা হাসিয়া উঠিলাম। বিনয় বলিল---"সব কথাটা বলতে দাও শোভান। তারপর শচীন-দা ঠাকুর ত রেগে মেগে চলে গেল। আমরা ভাবলাম, বেচারা প্রায়শ্চিত্ত-টিত্য করে একেবারে দেশেই ফিরে যাবে। কিন্তু তার পরদিন সকালেই আবার এসে হাজির, এবং একেবারে সটান্ শোভানের ঘরে। সেখানে গিয়ে শোভানকে শুধু পায়ে ধরতে বাকী রাখলে ;---শোভানকে শুদ্ধি ক'রে সে হিন্দু করবে। তাদের গাঁয়ের একজন মুসলমানকে সে অমনিভাবে হিন্দু হতে নাকি দেখেছে। বলে---আপনি বাবু আসলে খাঁটি হিন্দু। সে আপনার আচার-ব্যবহার দেখেই আমি বুঝেছি। আর-জন্মের সামান্য কি দোষ-ত্রুটির ফলে এজন্মে ম্লেচ্ছ হয়ে জন্মেছেন। আপনাকে শুদ্ধিতে রাজী হতেই হবে।"

শচীন উচ্চৈস্বরে হাসিয়া উঠিয়া বলিল---"বাঃ সব সমস্যার এত চমৎকার সমাধান! এমন আইডিয়াটা এল কিনা ঠাকুরের মাথা থেকে! তোমার ঠাকুরের কাছে কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত শোভান।"

শোভান কিন্তু হঠাৎ গম্ভীর হইয়া গেল। বলিল, "ঠাট্টার ব্যাপার নয় শচীন-দা। তোমাদের ওই নিরীহ ঠাকুরের প্রস্তাবে সত্যি আমি

ভয় পেয়েছি। মেসের উনুনের আগুন জ্বালতে জ্বালতে ও একদিন দেশের আগুন জ্বালিয়ে তুলবে দেখো, ওই ঠাকুর সাধারণ হিন্দুমনোভাবের মূর্ত্তরূপ আর শুদ্ধি-আন্দোলন সে মনোভাবের বিকৃতি প্রকাশ। এ আন্দোলনে মানুষ শুদ্ধ হয় কিনা জানি না, কিন্তু দেশের মুক্তির দ্বার যে সকল দিক দিয়ে রুদ্ধ হবে তা নিশ্চিত করে বলতে পারি।"

শচীন একটু যেন অন্যমনস্ক হইয়া গিয়াছিল। কথা কহিল না। তাহার পরিবর্ত্তে জবাব দিল শরৎ। শোভানের সহিত একই জেলার গ্রাম হইতে সে কলিকাতায় আসিয়াছে। মনের মিল তাহাদের যেমন নিবিড়, মতের ভেদও তেমনি গভীর। দুইজনকে কোন দিন কোন বিষয়ে একমত হইতে কেহ বুঝি দেখে নাই।

বিদ্রূপ করিয়া শরৎ বলিল, "তোমার অনুপাস বা যুক্তি কিছুরই তারিফ করতে পারলাম না শোভান। তোমরা যত খুশী হিন্দুকে মুসলমান করবে আর আমরা আজ যদি কটা মুসলমানকে হিন্দু করবার চেষ্টা করি তা হলেই দেশের সর্ব্বনাশ হ'বে এ যুক্তিটা কেমন যেন বেয়াড়া ঠেকছে।"

উত্তেজিত হইয়া শোভান বলিল, "শুধু মুসলমানকে হিন্দু করতে চাইলেই দেশের সর্ব্বনাশ হবে এমন কথা আমি ত বলিনি শরৎ। হিন্দু তোমার যত খুশী কর কিন্তু তোমার ঠাকুর ত আমায় শুধু হিন্দু করতে চায়নি, সে চেয়েছে আমার শুদ্ধি। আমরা ধর্ম্ম-প্রচার করতে গিয়ে বলি, তোমার ধর্ম্ম খারাপ, আমার ধর্ম্ম ভালো, আমার ধর্ম্ম নাও। তোমরা আজ ধর্ম্ম-প্রচারে বেরিয়ে বলছ, তোমার দেহ অশুচি, তোমার স্পর্শ অপবিত্র, তোমায় শোধন করব। আমি ছুঁলে তোমার অন্নজল নষ্ট হয়, আমি চৌকাঠে পা দিলে তোমার মন্দির পর্য্যন্ত অপবিত্র হয়ে ওঠে; পাশা-পাশি বাস করেও এসব অপমান অনেক দিন ধরে সহ্য করে এসেছি। কিন্তু আমায় ধর্ম্ম দিতে এসেও নাক সিঁট্‌কে তুমি বলবে, আগে তোমায় শোধন করতে হ'বে--এত বড় অপমানে আমার ধর্ম্ম শুধু নয়, আমার মনুষ্যত্ব পর্য্যন্ত বিদ্রোহী যদি হয়ে ওঠে, তা হলে সেটা কি খুব আশ্চর্য্যের কথা হবে?"

বিনয় বুঝি কি বলিতে যাইতেছিল, তাহাকে বাধা দিয়া শোভান আবার বলিল, "ফলে হবে এই, রেষারেষিতে ধর্ম্মের পাঁচিল আমরা এত উঁচু করে তুলব যে, সে পাঁচিল ডিঙ্গিয়ে দেশকে আর দেখাই যাবে না। এ অবস্থা দাঁড়াতেও বোধ হয় আর দেরী নেই; আর এর জন্যে দায়ী একমাত্র তোমাদের সঙ্কীর্ণ হিন্দুত্ব।"

শরৎ হাততালি দিয়া ব্যঙ্গ করিয়া বলিল, "বাহবা মৌলবী সাহেব! মুখ যে বেশ খুলেছে দেখছি। এই জন্যেই বুঝি কদিন ধরে কাণি পেতে খাওয়া আর কাছা খুলে ওঠ্‌বোস করার ধূম পড়ে গিয়েছিল। আচ্ছা আপাততঃ শুদ্ধি আন্দোলনে ত দেশের সর্ব্বনাশ হবে বুঝলাম কিন্তু দেশের মুস্কিল-আসান করবার দাওয়াইটা কি হবে বাৎলে দিন।"

শোভান এবার হাসিয়া ফেলিল। শরতের মাথায় একটা চপেটাঘাত করিয়া বলিল, "মিছি-মিছি তোদের সঙ্গে এতক্ষণ বকে মরলুম, ফাজিল কোথাকার। কিন্তু দেখিস্ এই বলে রাখছি এদেশ যদি স্বাধীন কোন দিন হয়ত মুসলমান হয়েই হবে।"

আমরা সকলে হাসিয়া উঠিলাম। শচীন বলিল, "কথাটা নেহাৎ মিথ্যে বলেনি শোভান। পৃথিবীর আর সব ধর্ম্মগুলোর কেমন যেন স্যাঁৎসেঁতে ভাব; প্রাণটা মিইয়ে নিউড়ে দেওয়াই তাদের কাজ। এই একটিমাত্র ধর্ম্ম আছে, যা রক্ত গরম করে তোলে। দেখলে না ইস্‌লাম আঁতুড়ঘর থেকে বেরিয়েই দিগ্বিজয় করে ফেললে; কাবুল থেকে স্পেন পর্য্যন্ত সব কাবার।"

শরৎ বলিল, "বেশ ত শচীন-দা, মুসলমান হলেই যদি স্বাধীন হওয়া যায় তাহলে এস না সবাই মিলে একবার কলমা পড়ে ফেলি। তারপর স্বাধীন হয়ে না হয় আবার শুদ্ধি করে থুড়ি অশুদ্ধ-ভাবে হিন্দু হওয়া যাবে।"

শোভান হয়ত পাল্টা জবাব দিত, কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই কথাটা বুঝি পাল্টাইবার জন্যেই শচীন জিজ্ঞাসা করিল, "কিন্তু আসল রহস্যটারই যে এখনো মীমাংসা হ'ল না। তোমাদের মেসের

হঠাৎ অবস্থা ফিরল কেমন করে তা ত বুঝলাম না।"

"বাঃ তাও জান না ; আমাদের গোপাললাল যে বিয়ে করছে। গোপালকে মনে আছে ত? সেই যে দিনকতক খুব কোমর বেঁধে স্বদেশ উদ্ধারে লেগেছিল। তুমি বলতে ওটাকে বিশ্বাস নেই—ওটা ভিজে বেড়াল।" বলিয়া মুখ টিপিয়া শোভান হাসিতে লাগিল।

"মনে তাকে খুব আছে ; কিন্তু তার বিয়ে করার সম্ভাবনার সঙ্গে তোমাদের অবস্থা পরিবর্ত্তনের কোন সংস্রব ত খুঁজে বার করতে পারছিনে।"

"এমন আর কি সংস্রব। বিয়ে করার আনন্দে পুরোনো বন্ধুদের সাহায্যে শ'তিনেক টাকা দিয়ে ফেলেছে আর কি।"

শচীন কিছু বলিবার পূর্ব্বেই বিনয় বলিয়া উঠিল, "সব মিছে কথা শচীন-দা।—শরৎ আর শোভান দু'জনে পরামর্শ করে গোপালের এই টাকাটি খসিয়েছে। একেবারে ডাহা 'ব্ল্যাকমেল'। সে বেচারী খদ্দর টদ্দর ছেড়ে ভাল ছেলেটি হয়ে কোথায় কোন্ পুলিশ ইনসপেক্টারের একটিমাত্র মেয়ের সঙ্গে বুঝি বিয়ের সম্বন্ধ যোগাড় করেছে। টাকা-কড়ি বেশ কিছু নাকি পাবে, ভালো চাকুরীর আশাও বুঝি আছে। শরৎ সেই খবরটি কোথা থেকে পেয়ে শোভানকে এসে যেই বলা, ও বললে, 'দাঁড়া মেসের হাল তাহ'লে ফিরিয়ে দিচ্ছি।' দুজনে মিলে তারপর পরামর্শ করে গোপালকে চিঠি লিখলে যে, মেসে তিনশ'টি টাকা পত্রপাঠ না পাঠালে গোপালের ভাবী শ্বশুরের কাছে শোভান নিজে গিয়ে বলে আসবে যে, গোপাল বিপ্লববাদীদের দলের লোক। স্বদেশী ডাকাতদের পাণ্ডা বললেই হয়। ধরা যাতে সহজে না পড়ে সেই জন্যেই শুধু সে পুলিশের সঙ্গে এ সম্বন্ধটি পাতিয়ে রাখবার চেষ্টায় আছে। এই মেসে গোপাল এক বছর কাটিয়ে গেছে, প্রমাণ দিলে, তার শ্বশুর যে এসব কথায় কিছুতেই আর সন্দেহ করবে না, একথাও শোভান লিখে দিল। সত্যিকারের ভয় কিছু থাক আর না থাক এ চিঠি পাবার তিনদিনের ভেতরেই দেখি গোপালের মণিঅর্ডার এসেছে তিনশ' টাকার।"

সকলেই হাসিয়া উঠিলাম। শুধু শোভান ও শরৎ ইতিমধ্যে সরিয়া পড়িয়াছিল। তাহাদের খোঁজ পাওয়া গেল না।

পরের দিন শচীন আর ছাড়িল না।

তাহার সহিত সকালে বাহির হইতেই হইল। খবরের কাগজ বিক্রী করিতে হইবে। সেই খবরের কাগজ বিক্রী করিয়া একদিন কেমন করিয়া বড়লোক হওয়া যাইবে তাহাই শচীন সারাপথ আমাকে বোঝাইতে বোঝাইতে চলিল।

শচীনের কথায় বুঝিলাম কলিকাতার শেয়ার মার্কেটে দালালী করার চেয়ে যদি কোন ভাল কাজ থাকে তাহা হইলে এই খবরের কাগজ বিক্রীই সেই ব্যবসা।

শচীন বলিতে বলিতে চলিল—"কলকেতার রাস্তার একটা মোড় থেকে আরম্ভ করে সমস্ত দেশই একদিন দখল করব না তা কে বলতে পারে। খবরের আমরা হব পাইকিরি আড়ৎদার—একদিন হয়ত দেখবি আমাদের কারখানায় বাঙ্গলা দেশের সব খবর তৈরী হচ্ছে মিনিটে হাজার হাজার। রয়টারও একদিন লণ্ডনের রাস্তায় কাগজ ফিরি করত।"

হাসিয়া বলিলাম, "তাই নাকি?"

"ঠিক জানি না, তবে তা করলেই বা ক্ষতি ছিল কি।"

বলিলাম—"তোমার সাধ তাহলে কোন্‌টা? —বড়লোক হওয়া না খবর তৈরী করা?"

শচীন বলিল—"দুটোই। বড়লোক না হলে নিজের জীবন ব্যর্থ আর খবর তৈরী করতে না পারলে দেশের আশা ভরসা নেই।"

আমার দিকে ফিরিয়া হাসিয়া আবার বলিল —"এ যুগের রাজনীতি চলছে তৈরী খবরের ওপর। খবর তৈরী যাদের আয়ত্ত নেই দেশকে কোন দিক দিয়ে চালাতে তারা পারবে না। তৈরী না বলে খবর মেরামতও বলতে পারিস।"

"তাহলে কাগজ বিক্রী সুরু না করে কাগজ তৈরীর চেষ্টা করলেই ভাল হত না?"

"শনৈঃ শনৈঃ"—শচীন হাসিয়া পাশের

একটা গলি দেখাইয়া দিয়া বলিল---"বাঙ্গলা দেশের ভাবী সংবাদ-সম্রাটদের অভিযান ওই গলিটি থেকেই সুরু হবে---চল।"

গলির ভিতর প্রকাণ্ড একটি পুরাণ বাড়ী। তাহার ভাঙা গেটের মাথায় বাঙ্গলা ও ইংরাজীতে একটি সাইনবোর্ড লেখা 'নির্ভীক'। সাইন-বোর্ডটি নূতন। তাহার নূতন রঙের জৌলুষ বাড়ীর বার্দ্ধক্যকে ব্যঙ্গ করিতেছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সাইনবোর্ড না থাকিলেও বাড়ীটি যে খবরের কাগজের আফিস একথা বুঝিতে কোন কষ্ট হইবার কথা নয়।

সকালবেলা। তখনও সমস্ত কাগজ ফিরি-ওয়ালা বিদায় হয় নাই; সারে সারে সাইকেল সেই অনতিপ্রশস্ত গলিপথে ভীড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ভিতর হইতে কাগজের রাশ বাহিরে আসিতে না আসিতে কোথায় যে উধাও হইয়া যাইতেছে, বুঝিবার উপায় নাই।

ফিরিওয়ালাদেরই ভিতর একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম ফিরি করিবার কাগজ কেমন করিয়া পাওয়া যায়। সাইকেলের উপর কাগজের বোঝা চাপাইয়া সে আমাদের দিকে এমন বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাইয়া চলিয়া গেল যেন আমরা তাহাকে স্বর্গের সিঁড়ি দেখাইয়া দিতে বলিয়াছি।

দ্বিতীয় ব্যক্তি বিস্ময় প্রকাশ করিল না কিন্তু জাতিতত্ত্ব তুলিয়া বিশদভাবে বুঝাইয়া দিল যে, বাঙ্গালী ভদ্রলোকের এ কাজ নয়। তাহার চেয়ে বরং আমরা কোন আফিসে কেরাণীগিরির খোঁজ করিতে পারি। তাহার উপদেশ সত্ত্বেও পীড়াপীড়ি করায় সে বলিয়া দিল যে, কাগজ দেওয়া না দেওয়া অর্জুন সিংহের হাতে। তাহাকে আমরা একবার বলিয়া দেখিতে পারি। তবে কাগজ যে মিলিবে সে ভরসা কম। পুরাণ ফিরি-ওয়ালারাই চাহিদা মত কাগজ পায় না---নূতন লোক ত দূরের কথা।

তাহার মূল্যবান উপদেশ মনে রাখিয়া পদা-তিক ও সাইকেল-ফিরিওয়ালাদের ভীড় ঠেলিয়া অর্জুন সিংহের খোঁজে ভিতরে ঢুকিতে যাইতেছি এমন সময়ে কে হাঁকিল---"ঠাহ্‌রিয়ে বাবু, ভিতর যানে কা হুকুম নেহি।"

খবরের কাগজের আফিসেও পাহারা থাকিবে ভাবি নাই। দরওয়ানকে আমাদের সাধু উদ্দেশ্যের কথা জানাইতে যাইতেছিলাম। শচীন আমাকে চুপ করিতে ইসারা করিয়া বলিল---"ম্যানেজার বাবুকা সাথ মোলাকাৎ করনে মাঙতা---"

দরওয়ান তাহাতেও দমিল না, বলিল---"শ্লিপ ভেজিয়ে"---

গোড়াতেই যেখানে এত বাধা-বিপত্তি সেখানে শেষ পর্য্যন্ত কিছু হইবে এ আশা আমার ছিল না। শচীনকে আমি নিরস্ত করিতে যাইতেছিলাম কিন্তু শচীন তাহার আগেই একটা কাগজ লইয়া ইংরাজীতে লিখিয়া দিল। ---"বিজ্ঞাপন দিবার জন্য দেখা করিতে চাই---এজেণ্ট, পপুলার কেমিক্যাল ওয়ার্কস।"

দরওয়ান শ্লিপ লইয়া ভিতরে একজন বেহারাকে পাঠাইয়া দিল। আমি একটু সরিয়া আসিয়া বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম---"পপু-লার কেমিক্যাল ওয়ার্কস আবার কোথা থেকে এল? কাগজ ফিরি করতে এসেছ ত জানতুম, কেমিক্যাল ওয়ার্কসের এজেণ্ট কেমন করে হলে বুঝতে পারছি না ত।"

শচীন বলিল, "এমন নীরেট না হলে আর তুই দেশ সেবা করতে আসিস্! পপুলার কেমি-ক্যাল ওয়ার্কস সম্প্রতি গড়ে উঠেছে।"

একটু থামিয়া তাহার পর হাসিয়া বলিল---"আমার মগজে! আরে গাধা! খবরের কাগজের ম্যানেজার লাটসাহেবকে দরজা থেকে ফিরিয়ে দিতে পারে কিন্তু বিজ্ঞাপন যে দেবে তাকে ফেরাবে না জানিস?"

"কিন্তু তারপর!"

"একবার ঢোকা ত যাক তারপর দেখা যাবে।"

শচীনের অনুমান ভুল নয়। খানিকবাদেই বেহারা আসিয়া জানাইল, আমরা ম্যানেজারের কাছে দেখা করিতে যাইতে পারি।

বেহারা ভিতরে পথ দেখাইয়া লইয়া

যাইতেছিল। শচীন বলিল, "থাক, তুমি তোমার কাজে যাও, ম্যানেজারের ঘর আমরা চিনি। আমরা ছাপাখানায় একবার হয়ে যাচ্ছি।"

বেহারা কি বুঝিল বলা যায় না কিন্তু চলিয়া যাইতে আপত্তি করিল না।

শচীন বলিল--"যাক্ পপুলার কেমিক্যাল ওয়ার্কসের বিজ্ঞাপনটা এবার আর নির্ভীকে গেল না। বেহারার ভাগ্যেও একটু বকুনি আছে, তা থাক, এখন অর্জুন সিং-এর খোঁজ করা দরকার।"

এতক্ষণে চারিধারে ভালো করিয়া চাহিয়া দেখিলাম। বাড়ীটা পুরাণ হইলেও সুবৃহৎ, তাহার বিস্তৃত উঠানে করগেটের কয়েকটি শেড তুলিয়া ছাপাখানা করা হইয়াছে। যে শেডটির তলায় দাঁড়াইয়াছিলাম সেটি ছাদ পর্য্যন্ত রীল কাগজের বড় বড় পিপের মত বাণ্ডিলে বোঝাই। তাহার পাশের শেড হইতে সীসা গলানর একটা অস্বস্তিকর গন্ধ আসিতেছিল।

কাঠের একটা তক্তার উপর একরাশ সাজান টাইপ লইয়া একটা লোক পার হইয়া যাইতেছিল, শচীন তাহাকে অর্জুন সিং কোথায় থাকে জিজ্ঞাসা করিল।

লোকটা দাঁড়াইয়া পড়িয়া আমাদের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিল--"অর্জুন সিংকে কি হবে মশাই। প্রেসে কাজ চান ত আমাদের সুপারিটেন্ আশু বাবুকে ধরুন। কাজটাজ জানেন ভালো? খবরের কাগজে কখন কাজ করেছেন?"

কখনও যে করি নাই তাহা আমরা বলিবার পূর্ব্বেই অনুমান করিয়া লইয়া সে আবার বলিল ---"তাহলে হবে না মশাই। এ ফ্ল্যাটমেশিনের ঠুকঠাক কাজ নয়, একেবারে কলের মত হাত চলবে; তা না হলে এ মেড়ো সিংহকেই ধরুন আর যাকেই ধরুন কিছু হবে না।" আমাদের দিক হইতে কোন জবাবের আশা না রাখিয়াই লোকটা কলের মত হাত না হউক পা চালাইয়া হন হন করিয়া চলিয়া গেল। অর্জুন সিংহের কোন সন্ধান দিবার প্রয়োজনই সম্ভবতঃ সে বোধ করিল না।

শেষ পর্য্যন্ত অর্জুন সিংহের সাক্ষাৎ যখন পাইলাম তখন তিনি একটি শেডের পাশে চারপায়া বিছাইয়া তাহার উপর অর্দ্ধ উলঙ্গ অবস্থায় বসিয়া আছেন ও তাঁহার বিশাল মহিষাসুরের মত কলেবর দুইজন জোয়ান হিন্দুস্থানী তেল দিয়া ডলিতে ডলিতে গলদঘর্ম্ম হইয়া উঠিয়াছে।

শচীন কায়দাদুরস্তভাবে সেলাম করিয়া বলিল, "সেলাম সিংজি, তবিয়ৎ আচ্ছা?"

ভ্রূযুগল একটু কুঞ্চিত করিয়া অর্জুন সিং আমাদের দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন---"আপকোত পছানতা নেহি।"

"কেমন করে আর চিনবে সিংজি! তোমার সঙ্গে আগে কি আর দেখা করবার সৌভাগ্য ঘটেছে।"

সিংজি এবার বাংলা করিয়া বলিলেন---"তোবে কি দোরকার আছে হামার সঙ্গে।"

"দরকার আর কিছু নয় সিংজি; শুনলাম তোমার ফেরিওয়ালারা নাকি সব কুড়ের ধাড়ি; বাজারে কাগজ কাটাতে পারছে না; তুমি দুজন ভালো ফেরিওয়ালা নাকি খুঁজছ, তাই এসে হাজির হয়েছি।"

সব কথার অর্থ সিংজি বুঝিলেন কিনা বলা যায় না, তবু মুখ তাঁহার হঠাৎ অত্যন্ত অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। বলিলেন--"কে বোলে আমার কাগজ বাজারে কাটায় না? কে বোলে কে?" একটু থামিয়া তাহার পর এ কৌতূহল দমন করিয়া বলিলেন, "যাও হামার ফেরিওয়ালার কুছ দোরকার নেই।"

"উঁহু! অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন সিংজি। দরকার নেই, কিন্তু হতে কতক্ষণ! আজই তোমার ঈশ্বর না করুন দুজন ফেরিওয়ালা ধর গাড়ী চাপাও ত পড়তে পারে। ভালো লোক পাচ্ছ যখন হাতে রাখা ভাল। তাহলে কালই এসে কাগজ নিয়ে যাব! কি বল সেই বন্দোবস্তই ভাল!"

এইবার আর হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিলাম না। সিংজি কিন্তু চটিয়া উঠিয়া বলিলেন---"কেয়া ঘড়বড়াতা! হাম তুমকো কাগজ নেহি দেগা---যাও দিক্ মৎ করো!"

শচীন এতক্ষণ চারপায়ার একপাশে বেশ গুছাইয়া বসিয়াছিল, এইবার উঠিয়া পড়িয়া বলিল ----"তাহলে আর কি করব বল সিংজি; আজ আসি। তবে আমাদের কথাটা মনে রেখো। আবার না হয় আরেক দিন এসে তোমার ভবিষ্যতের খোঁজ নিয়ে যাব।"

প্রত্যুত্তরে সিংজি কি যে বলিলেন ঠিক বোঝা গেল না। আমরা উঠিয়া আসিলাম।

বাহির হইয়া যাইতেছিলাম, শচীন থামাইয়া বলিল, "এলামই যখন তখন বাড়ীটা একবার ঘুরেই না হয় দেখা যাক্।"

হাসিয়া বলিলাম---"কিসের জন্য যে এলে তাত বুঝলাম না। ওই রকম করে কথা বল্লে কখন কাজ আদায় হয়!"

শচীন বলিল---"বিবেকের দংশন কাকে বলে জানিস? আমি ক্ষতবিক্ষত হয়ে আছি। তাই এইবার তার বিষদাঁত ভাঙ্গবার ব্যবস্থা করলাম। গড়িয়ে গড়িয়ে জীবনের অলস বেলা যখন আর কাটতে চাইবে না, মনের মধ্যে বিবেক যখন দীর্ঘ উপদেশের বক্তৃতা দেবার জন্যে উসখুস করবে তখন তার সে আকুলতা শান্ত করবার মত জুৎসই কৈফিয়ৎ ত তৈরী হয়ে রইল। কাজ পাইনি, কিন্তু চেষ্টা করিনি একথা ত আর বলা চলবে না।"

কিন্তু শচীনের বিবেককে ফাঁকি দিবার প্রয়োজন হইল না। এদিক ওদিক কিছুক্ষণ ঘুরিয়া দোতালা হইতে নামিয়া আসিবার উদ্যোগ করিতেছি এমন সময় একটি ভদ্রলোক সম্পাদকের ঘরের কাটা দরজা ঠেলিয়া বাহিরে আসিয়া বলিলেন--"আপনারা কি 'মর্ম্মবাণী' থেকে এসেছেন?"

আমি জবাব দিবার পূর্ব্বেই শচীন বলিয়া বসিল---"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তাহলে ভেতরে আসুন। মিঃ সরকার আপনাদের খোঁজ করছিলেন।"

ভেতরে ঢুকিতে ঢুকিতে ভদ্রলোক প্রশ্ন করিলেন--"কিন্তু আপনাদের আরেকজনের আসবার কথা ছিল না?"

শচীন তৎক্ষণাৎ জবাব দিল---"আজ্ঞে হ্যাঁ ছিল, কিন্তু তিনি বোধ হয় এসে উঠতে পারলেন না।"

শচীনের খেয়ালে এতক্ষণ কোন বাধা দিই নাই কিন্তু এইবার বিরক্ত হইয়া তাহার কাণে কাণে বলিলাম--"এবার কিন্তু বাড়াবাড়ি হচেছ শচীন। এর ফল ভাল হবে না।"

শচীন সে কথার জবাব দিল না এবং আমার একটা হাত ধরিয়া টানিতে টানিতেই ভিতরে লইয়া গেল।

মিঃ সরকার এ অফিসের কে জানি না। মর্ম্মবাণী হইতে কাহাদের আসিবার কথা এবং তাহাদের মিঃ সরকারের কি প্রয়োজন কিছুই আমাদের জানা নয়। এই বিপজ্জনক ব্যাপারে জোর করিয়া নির্ব্বোধের মত আমাকে জড়াইয়া দেওয়ার জন্য সত্যই এবার শচীনের ওপর রাগ হইতেছিল। এ ব্যাপার কি রকম দাঁড়াইবে বুঝিতে না পারিয়া আশঙ্কাও বড় কম হইতেছিল না, কিন্তু শচীন দেখিলাম নির্ব্বিকার। আশঙ্কা উদ্বেগের লেশমাত্র চিহ্ন তাহার মুখে নাই।

মিঃ সরকার টেবিলে বসিয়া কি লিখিতেছিলেন। লেখা হইতে মুখ তুলিয়া আমাদের বসিতে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন---"আপনাদের জন্যে আমি অনেকক্ষণ থেকে অপেক্ষা করছি। আপনাদের আরো সকালে আসবার কথা ছিল না?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, একটু দেরী হয়ে গেছে।" ---শচীনই উত্তর দিল।

"আমাদের প্রুফ-রীডারের ভয়ানক অসুবিধা হয়েছে। আপনাদের কিন্তু কাল থেকেই কাজে লাগতে হবে। আজ লাগলেও ভাল হয়।"

"আজ্ঞে আজ আর হবে না। কাল থেকেই আসব।"

"আর আপনাদের আরেকজন কোথায়?"

শচীন অম্লান বদনে বলিল---"তিনি আসতে পারবেন না বলেছেন।"

মিঃ সরকার বলিলেন---"তাই নাকি। যাহোক এখন দুজন হলেই কাজ চলে যাবে। আপনাদের কিন্তু এখন রাত্রে কাজ করতে হবে।"

"তা আমরা করব। তবে---"

মিঃ সরকার বলিলেন---"হ্যাঁ সে আমি ঠিক করেছি আপনাদের মাইনে সেখানকার থেকে বেশীই পাবেন। আর আপনাদের Appointment letter আজ ম্যানেজার সই করে রাখবেন। কালই না হয় নেবেন।"

"আচ্ছা আচ্ছা, সেজন্যে ভাবনা নেই আমাদের। তাহলে আজ আসি।" বলিয়া শচীন উঠিয়া পড়িল।

"তাহলে কালই রাত্রে আসবেন রাত্তির দশটায়। শচীনবাবু এদের রীডারের ঘরটা দেখিয়ে দিন।"

মিঃ সরকার আবার তাঁর লেখায় মনোনিবেশ করিলেন। যে ভদ্রলোক আমাদের ডাকিয়েছিলেন, তিনিই আমাদের রীডারদের ঘর দেখাইয়া দিয়া গেলেন।

শচীন একটু যাইয়া বলিল---"যাক ভালই হল, কাগজ বিক্রীর ওপর কোনদিনই বিশেষ ভরসা ছিল না। ফেরিওয়ালা থেকে রাইটার হওয়ার সম্ভাবনা বড় কম কি বলিস?"

বিরক্ত হইয়া বলিলাম, "কিন্তু এটা কি হল শচীন---তোমার কি সত্যিই মাথা খারাপ হয়েছে?"

"এখনও হয়নি, কিন্তু কিছুদিন প্রুফ্-রীডারি করলে হবে বলে আশা রাখি। মাথাটা এত ভালো থাকা একটা ঝঞ্ঝাট, একটু খারাপ হলে মন্দ হয় না।"

সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে বলিলাম---"এ হাসি-ঠাট্টার কথা নয় শচীন। তুমি কি সত্যি কাল এখানে আরেকজনের ছদ্মনামে আসবে ভেবে রেখেছ!"

শচীন কি একটা জবাব দিতে গিয়া হঠাৎ আমাকে ছাড়িয়া দিয়া তরতর করিয়া নীচে নামিয়া গেল। তিনজন ভদ্রলোক সিঁড়ির কাছে দাঁড়াইয়া উঠিতে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। শচীন সটান তাঁহাদের কাছে গিয়া বলিল---"আপনারা কি মর্ম্মবাণী থেকে আসছেন?"

একজন বলিলেন---"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"এঃ---বড় দেরী করে ফেলেছেন! মিঃ সরকার এই এতক্ষণ পর্য্যন্ত আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করে করে চলে গেলেন।"

তিনজনের মুখে হতাশার ছায়া সঙ্গে সঙ্গে পড়িতে দেখিয়া সত্যই দুঃখ হইল।

শচীন বলিল--"কাল এমনি সময়ে আর একবার আসতে পারেন, কিন্তু আমাদের রীডারের যে রকম দরকার, এর মধ্যে লোক নিয়ে ফেলাও আশ্চর্য্য নয়। আপনারা যে বড় দেরী করে এলেন।"

একজন হতাশভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন---"তাহলে উপায় কি বলতে পারেন?" সকলে মিলিয়া তখন বাহিরের দিকে চলিতে সুরু করিয়াছি। শচীন জিজ্ঞাসা করিল--"আপনারা কি মর্ম্মবাণী ছেড়ে দিয়েছেন একেবারে?"

"না এখনও ছাড়িনি ঠিক, তবে এখানে কথাটা পাকা হলেই ছেড়ে দিতাম।"

শচীন হঠাৎ অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া বলিল---"তাহলে উপায় ভালই আছে মশাই।"

সমস্বরে তিনজনে বলিলেন--"কি?"

"মর্ম্মবাণী না ছাড়া।" শচীন হঠাৎ গলার স্বর গম্ভীর করিয়া বলিল---"কি লোভে আপনারা এখানে আসছিলেন বলতে পারেন? এই দশ বছর এখানে রীডারি করছি মশাই---আমরা এখান থেকে ছেড়ে যেতে পারলে বাঁচি, আর আপনারা সেধে এখানে আসতে চাচ্ছেন? অবশ্য এসব কথা আমার বলা উচিত নয়।"

কৌতূহলী শ্রোতাদের প্রশ্নে শচীন আবার বলিল, "আমার কথা যদি শোনেন মশাই, ও

মর্ম্মবাণী ছাড়বেন না মাসে মাসে মাহিনেটা ত ঠিক পান ওখানে?"

"কেন এখানে ত শুনেছি মাহিনে ঠিক দেয়?"

শচীন বিষণ্ণভাবে হাসিয়া বলিল---"শুনে থাকেন ভাল, তাহলে আর আমার বলবার কি আছে।"

"না না, আপনি এখানে কাজ করেন, আপনি বেশী জানেন বই কি?"

শচীন হঠাৎ গলার স্বর নামাইয়া চুপি চুপি বলিল, "তাহলে বলি মশাই শুনুন---অমন বোকামী করবেন না। শেষকালে পস্তাবেন। আপনাদের এ উপদেশ দেওয়ায় আমার স্বার্থ ত কিছু নেই। আপনারা আমার চাকরী ত আর কিছু কেড়ে নিচেছন না, শুধু ভুক্তভোগী বলেই আপনাদের সাবধান করে দিচিছ। তবে যদি মনে করেন, কাল এসে মিঃ সরকারের সঙ্গে কথা কয়ে দেখতে পারেন।"

কিন্তু যেভাবে তাঁহারা চলিয়া গেলেন তাহাতে পরের দিন আর আসিবার বাসনা তাঁহাদের আছে বলিয়া মনে হইল না। শচীন আমার দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল--"যাক্, মনে একটা খুঁত ছিল---গেল। কারুর অন্ন মারতে আর হল না।"

বলিলাম---"হলেও বিশেষ আপত্তি তোমার হত না।"

শচীন বিস্মিতভাবে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকাইয়া বলিল---"হওয়া উচিত নয়।"

খানিকদূর গিয়া শচীন বলিল---"এমন সুখবর মনুকে শুনিয়ে আসবি না? চল।"

কেন জানি না সেদিন আর আপত্তি করিতে পারিলাম না। খবরটা আদৌ সুখবর কিনা তাহা লইয়া শচীনের সহিত তর্ক করিবার অনেক কিছু ছিল। নিজের মনের সঙ্গে মনুকে শোনাই-বার ব্যাকুলতা লইয়া বোঝাপড়া করিবারও প্রয়ো-জন ছিল হয়ত। কিন্তু সেদিন যেন এ সমস্তই অনর্থক মনে হইল। হয় হোক এ আমার দুর্ব্বলতা----সারা জীবন ধরিয়া যে নীতির বর্ম্ম অনেক রকম ঢালাই পিটাই করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিলাম তাহাতে মস্ত বড় একটা ছিদ্র যদি দেখাই দিয়া থাকে দিক---তাহা লইয়া নিজেকে আর অনর্থক উৎপীড়িত করিবার উৎসাহ ছিল না। শচীনের মনের স্পর্শ লাগিয়াই হয়ত আমার ভিতরে এ গভীর পরিবর্ত্তন সুরু হইয়াছে ভাবিয়াও ভীত হইয়া উঠিতে পারিলাম না।

পথে যাইতে যাইতে শচীন হঠাৎ বলিল---"তোদের গাঁয়ে কমলা বলে একটি মেয়ে আছে নারে?"

অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলাম---"কই, জানি না ত।"

শচীন মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল---"আহা কমলা না হোক, তার নাম ধর বীণাই হল, না হয় রেবাসেবা---নাম কি আর আমার মনে আছে?"

হাসিয়া বলিলাম---"তা অমন কত আছে।"

"নারে অমন কত নয়, সেই একটি মেয়ের কথা বলছি, কাণে দুল, কপালে টিপ, পায়ে আলতা, উঁহু পায়ে আলতা নয়, কোমরে জড়ান নীলাম্বরি শাড়ী, ছেলেদের সঙ্গে ডাঙগুলি খেলে, গাছের আগডালে উঠে পাখীর ছানা পাড়ে, রাগ করে একদিন তোর হাত কামড়ে দিয়েছিল। চলে আসবার দিন কেঁদে বলেছিল---'রবি-দা আমিও জেলে যাব।'---কেমন? নেই এমনি একটি মেয়ে?"

"না মনে ত পড়ছে না।"

"ওহো ভুল হয়েছে তাহলে। পায়ে তার আলতাই হবে। লজ্জায় সামনে আসে না, এলে মাথা নীচু করে থাকে। পেছন ফিরলে মুখের দিকে চায়, চোখোচোখি হলে মুখ রাঙা করে চোখ নামায়, কথা কইতে গলা জড়িয়ে আসে---"

শচীন আরো অনেক কিছু বলিতেছিল।

বাধা দিয়া বলিলাম---"হল না শচীন।"

শচীন হাসিয়া বলিল--"না হোক্, আসল কথা তুই কাউকে ভালবেসেছিস?"

"হঠাৎ এ প্রশ্ন?"

"এমনি করলাম। বল না বেসেছিস কাউকে?"

বলিলাম---"এর উত্তর দেওয়া কি এতই সোজা শচীন ?"

শচীন আমার মুখের দিকে খানিক গম্ভীর-ভাবে তাকাইয়া রহিল। তারপর হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল---"হয়েছে, ঘুণ ধরেছে তাহলে।"

বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম---"তার মানে ?"

"তার মানে, চোখে ঘোর না লাগলে কি আর কথা ঘোরালো হয়ে আসে।"

আমার পিঠ চাপড়াইয়া শচীন আবার বলিল---"সস্তা অনুপ্রাস নয়রে, সত্যি কথা। আমাদের অসহযোগ আন্দোলনের রবীনকে চিনতিস্ ত ? সে হলে শুধু এককথায় বলত---'ধ্যেৎ।' কিন্তু আমাদের এখানকার রবীন এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া শক্ত মনে করে।"

খানিক বাদে হঠাৎ অন্য দিকে চাহিয়া নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিকভাবে শচীন বলিল---"মনু মেয়েটি সত্যিই অদ্ভুত---নারে ?"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "আমার চেয়ে তুমিই ত বেশী জান।"

শচীন গম্ভীর হইয়া বলিল---"তা হয়ত জানি।"

মনুদের বাড়ী যখন গিয়া পৌঁছিলাম তখন বেলা দুপুর। সারা বেলা ঘুরিয়া একটু ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। আর কিছু না হউক, এই দরিদ্র পরিবারটির আতিথেয়তার কথা স্মরণ করিয়া তখন লুব্ধ হইয়া উঠিবার কথা। বাড়ীর কাছে আসিয়া ঢুকিতে যেটুকু দ্বিধা হইতেছিল, মনুর সযত্ন সেবার কথা স্মরণ করিয়া তাহা অনায়াসে জয় করিয়া ফেলিলাম।

কড়া নাড়িতে খানিক বাদে যখন দরজা খুলিয়া গেল তখন কিন্তু সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলাম, দরজা যে খুলিয়াছে সে লোকটি আমাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত।

আমাদের দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে খানিক তাকাইয়া লোকটি অপ্রত্যাশিত রূঢ় কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল---"কাকে চান মশাই ?"

এরূপ সম্ভাষণের জন্য সত্যই প্রস্তুত ছিলাম না। কি উত্তর দিব ভাবিয়া পাইলাম না।

শচীন কিন্তু সহাস্য মুখে উত্তর দিল---"আপাততঃ কাউকে বিশেষ চাই না---একটু ভেতরে প্রবেশ করতে দিলে বাধিত হব।"

লোকটি বিরক্ত হইয়া বলিল---"কে মশাই আপনারা ?"

যেভাবে সে দরজা আগলাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল তাহাতে আমাদের ভিতরে যাইতে দিতে সহজে সে সম্মত হইবে বলিয়া মনে হইল না। খবরের কাগজের আফিসে একবার দরওয়ান পথ রোধ করিয়াছে, খানিকবাদে মনুদের বাড়ীতে ঢুকিতেও বাধা পাইব এতটা আশা করি নাই।

শচীন বলিল---"আমাদের সুদীর্ঘ পরিচয়টা এই দরজায় দাঁড়িয়ে দেওয়াটা কি সঙ্গত হবে ? চলুন না ভেতরে গিয়ে আপনার সাধু কৌতূহল নিবৃত্ত করবার একটু চেষ্টা করে দেখি।"

লোকটা এত কথা বুঝিল কিনা বলা যায় না ---উষ্ণ হইয়া বলিল--"কাকে চান, বলতে পারেন না, দরজায় এসে কড়া নাড়ছেন, কি রকম লোক আপনারা ?"

শচীন হাসিয়া বলিল--"পুলিশ কমিশনারের সার্টিফিকেটটা হারিয়ে এসেছি ; নাহলে আপনাকে এখনি প্রমাণ করে দিতে পারতাম, চুরি জুয়াচুরি বাটপাড়ি রাহাজানি সকল প্রকার অভিযোগ থেকে আমরা মুক্ত এবং অত্যন্ত সচ্চরিত্র লোক। তবে কাকে চাই এই দুরূহ প্রশ্নের উত্তরটা অত তাড়াতাড়ি দিতে পারব না মশাই। জীবনে এ প্রশ্নটা এখনও গভীরভাবে আলোচনা করে দেখিনি।"

শচীনের এই বাক্যবন্যা আরও কতক্ষণ চলিত এবং তাহার ফল কি দাঁড়াইত বলা যায় না। দরজায় দাঁড়াইয়া এই অনর্থক বচসায় অতিষ্ঠ হইয়া

উঠিতেছিলাম, এমন সময় মনু আসিয়া সকল গোল মিটাইয়া দিল। দরজায় আগাইয়া আসিয়া বলিল---"এস।"

লোকটা এবার সবিস্ময়ে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল--"এদের চেন নাকি?" তাহার পর দরজা ছাড়িয়া দিয়া বলিল---"তাই বুঝি আপনাদের কাকে চান বলতে বাধ্‌ছিল!" তাহার বিদ্রূপের হাসি যেমন স্পষ্ট তেমনি কুৎসিত। এক মুহূর্ত্তে সমস্ত বাড়ীটির বাতাস যেন সে হাসিতে কলুষিত হইয়া উঠিল। অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতেছিলাম।

শচীন ঘরে ঢুকিয়া বলিল---"মাফ্ করবেন মশাই, আমার এ তরুণ জীবনে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভের সৌভাগ্য কখনও হয়েছে বলে স্মরণ করতে পারছি না। আমাদের পরিচয়টা যখন অনুগ্রহ করে নিয়েছেন তখন আপনার পরিচয়টা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?"

লোকটা কাষ্ঠহাসি হাসিয়া বলিল, "বিলক্ষণ! আমার পরিচয় আর কি দেব বলুন! আপনাদের মত এঁর আপনার লোক ত আর নই, সম্পর্কে উনি আমার নিজের বৌদি হন।"

তাহার জঘন্য শ্লেষে সর্ব্বাঙ্গ রিরি করিয়া উঠিল। শচীন কিন্তু তেমনি হাসিয়া জবাব দিল, "ওঃ এত দূরের সম্পর্ক! তাইত ভাবি আপনার লোক হলে এই তিন বছরে আর দেখা পাওয়া যেত না। নিজের বৌদি যখন, তখন আর সেকথা বলা চলে না বটে।"

লোকটা এবার আর জবাব দিল না। অত্যন্ত অপ্রসন্নমুখে ভিতরে চলিয়া গেল। ফিরিয়া তাকাইয়া দেখিলাম, মনুও কখন নিঃশব্দে চলিয়া গিয়াছে।

কেন জানি না এ বাড়ীতে থাকিতে অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল। শচীনের ঘরে তাহার সহিত ঢুকিয়া বলিলাম---"আমি এখন যাই শচীন!"

শচীন বলিল---"যাবি বই কি। তোর এখানে মৌরসী পাট্টা হবার কোন আশা নেই, তবে এ বেলার আহারটা সমাধা করেই যা।"

তাহার পর মনুকে ডাক দিয়া বলিল, "মনোরমা দেবী একটু কৃপা করে দর্শন দেবেন কি?"

মনু দরজায় আসিয়া বলিল---"কি বলছ?"

এতক্ষণে মনুকে ভালো করিয়া দেখিতে পাইলাম, দেখিয়া সত্যই বিস্মিত হইলাম। আর যাহাই হউক মনুকে কোনদিন বিমর্ষ দূরের কথা গম্ভীর দেখিয়াছি বলিয়াও মনে পড়ে না। আজ কিন্তু অবাক হইয়া দেখিলাম তাহার মুখে অপরিসীম বেদনা ও ক্লান্তির এমন একটি গাঢ় ছায়া নামিয়াছে যে, তাহাকে চেনাই দুষ্কর। মনে মনে কেন জানি না তাহার একটি সাদর সম্ভাষণের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, কিন্তু এতদিন পরে আমি যে তাহার ডাকে আসিয়াছি এটুকু সে লক্ষ্য করিয়াছে, এমন ইঙ্গিতও তাহার সেই ক্লান্ত মুখে দেখিতে পাইলাম না।

এটুকু শচীনও নিশ্চয় দেখিতে পাইয়াছিল তবু বোধ হয় বাড়ীর আবহাওয়াটা হাল্কা করিয়া দিবার জন্যই বলিল--"দুর্ব্বাসার চেয়ে তেজ আমাদের কয়েক ফারেনহীট কম হতে পারে, কিন্তু অতিথি সৎকারের ত্রুটি হলে ক্ষমা করব না মনে থাকে যেন মনোরমা দেবী। যাও তিনজনের মত আতপ তণ্ডুল আর কদলী সিদ্ধের আয়োজন করগে। রবীনকে এবারের আদম সুমারীতে 'দুজন' বলেই ধরা হয়েছে এবং ভুল করা যে হয়নি তা তুমিও জান।"

মনোরমার মুখের ছায়া সরিল না। শান্তভাবে বলিল---"তোমাদের খাওয়া আজ যে আর হয় না শচীন-দা, আমায় এখনি যেতে হবে।"

"যেতে হচ্ছে? কোথায়?"---শচীনের পরিহাস-প্রীতি কোথায় তখন উবিয়া গিয়াছে।

এবার একটু ম্লান হাসিয়া মনু বলিল, "মেয়েরা যেখানে যায়---শ্বশুরবাড়ী।"

"কিন্তু---"

শচীনকে তাহার কথা শেষ করিবার অবসর না দিয়া মনু বলিল,"না, 'কিন্তু' আর নেই, শচীন-দা। আমার শাশুড়ীর মৃত্যুশয্যার খবর নিয়ে আমার দেওর এসেছে; আমায় যেতে হবে।"

"জীবনে যাকে চোখে দেখতে আপত্তি ছিল, মৃত্যুশয্যায় তাকেই এত প্রয়োজন হয়ে পড়ল কেন ঠিক বুঝতে পারছি না ত' মনু।"

"বোঝবার চেষ্টা আমিই যখন করিনি তখন তুমি কেন বৃথা করচ শচীন-দা। শুধু আমি এবার ঠিক করেছি---যাব।"

শচীন হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া বলিল, "না ---তোমার যাওয়া হতে পারে না মনু। তোমার ওপর কোন দাবী তাদের আর নেই, তাকি এরি মধ্যে ভুলে গেছ?"

"ভুলিনি বলেই ত যাব।"

শচীন অধৈর্য্য হইয়া বলিল---"এ কথার প্যাঁচের সময় নয় মনু। নিজেকে এমন করে হত্যা করতে তোমায় আমি দেব না।"

"তাহলে থাক বৌদি"---

চমকিত হইয়া চাহিয়া দেখিলাম মনুর দেওর আসিয়া দরজায় দাঁড়াইয়াছে। অত্যন্ত কুটিল-ভাবে হাসিয়া সে বলিল--"তোমার গিয়ে কাজ নেই; ওঁর মতের বিরুদ্ধে তোমার যাওয়াটা ত উচিত নয়। হ'লেই বা শাশুড়ীর অসুখ, যাওয়াটা ভালো'ও দেখাবে না।"

খানিক থামিয়া আমাদের সকলের দিকে একবার তাকাইয়া আবার বলিল--"তোমাদের গোপন আলাপে বাধা দিয়ে ভাল করলাম না বোধ হয়।"

শচীন বলিল---"না ভালো করেননি। আরো খানিকক্ষণ আড়ি পাতলে অনেক কিছু মুখরোচক ব্যাপার শুনতে পেতেন। তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলেন।"

"তাহলেও ক্ষতি নেই; না শুনেই যা বুঝেছি তাই যথেষ্ট। আমি চল্লাম বৌদি! মা একা সেখানে মরছেন সেই ভালো, তোমার হত্যাটা সেই সঙ্গে আর হবার দরকার নেই। মাকে ফিরে গিয়ে সজ্ঞানে দেখতে পেলে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করেই যেতে বলব।"

লোকটা চলিয়া যাইতেছিল। মনু হঠাৎ ডাকিয়া বলিল---"দাঁড়াও ঠাকুরপো, আমার সব কাপড়-চোপড় এখনও বাঁধা হয়নি।"

শচীন ও আমি স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলাম। লোকটা হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়া বলিল---"তার মানে?"

"তার মানে আর কিছুই নেই। আমায় নিয়ে যেতে এসেছিলে, নিয়েই যেতে হবে।"

মনুর দেওর কি বলিতে যাইতেছিল, মনু তাহাকে বাধা দিয়া বলিল---"তুমি যদি না নিয়ে যেতে পার আমি নিজেই যাব---"

মনু চলিয়া যাওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিশেষ কোন কথাই আর হইল না। গাড়ী আসিলে নীরবে মনুর দেওর তাহাতে জিনিষপত্র বোঝাই করিয়া গাড়ীর দরজা খুলিয়া দাঁড়াইল। মনুর মা কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া মেয়েকে গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন, শুধু শেষ পর্য্যন্ত থাকিতে না পারিয়া শচীন আর একবার বলিল---"তুমি ভুল করলে মনু!"

মনু একটু মাত্র হাসিয়া বলিল---"ভুল করা না করা আমার পক্ষে সমান কথা, এইটুকু আমি এতদিনে বুঝেছি শচীন-দা।"

তাহার পর গাড়ী ছাড়িয়া দিতে হঠাৎ এতক্ষণ বাদে আমার দিকে ফিরিয়া বলিল---"চল্লাম তাহলে, তোমার সঙ্গে হয়ত আর দেখাই হবে না।" এবং পরক্ষণেই তাহার সেই পুরাতন হাসিটি হাসিয়া বলিল---"তোমায় ভালো করে একদিন নাকাল করবার সাধ আর আমার মেটান হল না।"

হাসিতে গিয়া অকারণে চোখ জলে ভরিয়া গেল। কিছুই বলিতে পারিলাম না।

গাড়ী চলিয়া গেল।

স্তব্ধভাবে সেইখানে কতক্ষণ যে আমরা দাঁড়াইয়াছিলাম ঠিক বলিতে পারি না। মনুর চলিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ জীবনে যে এত বড় অবসাদ এক মুহূর্ত্তে আসিতে পারে, এ কথা কিন্তু সত্যই ভাবি নাই। কতটুকুই বা এই মেয়েটিকে জানিতে পারিয়াছি, কতদিনেরই বা তাহার সহিত পরিচয়? সামান্য যেটুকু সম্বন্ধের সূত্র একদিন

গড়িয়া উঠিতে চাহিতেছিল, তাহাকে প্রাণপণে সেদিন পর্য্যন্ত অস্বীকার করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবারই চেষ্টা করিয়াছি, তবে অকস্মাৎ সমস্ত হৃদয় এখন শূন্য হইয়া যায় কেন? জীবনের সমস্ত শিক্ষা দীক্ষা ও সাধনা আমার এ দুর্ব্বলতাকে ধিক্কার দিতে চায়, কিন্তু যুক্তি-তর্কের অতীতলোকে মনে হয় হৃদয় আমার এই অসীম বেদনার ভিতরেই নবজন্মের আভাষ পাইয়াছে।

হঠাৎ শচীনের দিকে ফিরিয়া দেখিলাম মাথা নীচু করিয়া সেও কি ভাবিতেছে। আমার এতক্ষণের তন্ময়তা দেখিয়া সে না জানি কি ভাবিয়াছে মনে করিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া উঠিলাম। তাহার গায়ে হাত রাখিয়া ডাকিলাম---"শচীন।"

প্রথমটা চমকাইয়া উঠিয়া পরক্ষণেই হাসিয়া উঠিয়া সে বলিল---"হ্যাঁ, ক্ষিদে আমারও পেয়েছে।"

বলিলাম---"ক্ষিদের কথা বলছি না।"

শচীন বলিল---"তেষ্টাও আছে বই কি! মনু গেছে যাক, আপদ গেছে, কিন্তু আমাদের উপবাসী রেখে যাওয়াটা তার ভাল হ'ল না। দেখে নিস্ রবীন্।"

শচীনের পরিহাসের সুর কিন্তু মনে হইল কোথায় যেন কাটিয়া যাইতেছে, তার হাসিতে সে উচ্ছলতা নাই।

বলিলাম---"এখন কি করবে?"

"পরিতৃপ্তি সহকারে আহার এবং তার সঙ্গে কিঞ্চিৎ দক্ষিণা কোথায় মেলে, তাই সন্ধান করব। তার পরে একটু বিশ্রাম করতেও আমার আপত্তি নেই।"

"তাহলে চল আমাদের মেসে যাই"---

শচীন বলিল, "সেই ভাল। আহার, দক্ষিণা, বিশ্রাম---তিনটে এক সঙ্গে না জুটলেও বিশ্রামটা সম্বন্ধে সেখানে নিশ্চিন্ত হওয়া যেতে পারে।"

মেসে গিয়া দেখিলাম ব্যাপার বিপরীত। সমস্ত মেসে আর তিল ধারণের স্থান নেই। চারিধারে লোক গিজ গিজ করিতেছে, তাহাদের বেশভূষা আচরণ কথাবার্ত্তা দেখিয়া শুনিয়া বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, কলিকাতায় ইহকালের কোন প্রয়োজন লইয়া তারা আসে নাই, পরকালের পাথেয়-স্বরূপ কিঞ্চিৎ পুণ্য সঞ্চয় করিতেই আসিয়াছে। খোঁজ লইয়া আমাদের অনুমান সত্য বলিয়াই জানিতে পারিলাম। বিনয় নাকি কি কাজে কালীঘাটে গিয়াছিল, সেখানে পাণ্ডাদের উৎপীড়ন হইতে রক্ষা করিয়া যূথভ্রষ্ট এই কয়েকটি পরিবারকে এখানে একদিনের মত আশ্রয় দিয়াছে।

বিনয়ের পরোপকার-প্রবৃত্তির উপর প্রসন্ন হইতে পারিতেছিলাম না। উপরে নীচে যেখানে চোখ পড়িল সব জায়গাতেই দেখিলাম একটা না একটা উনুন বসিয়াছে এবং তাহাতে কাঁচা কাঠের আগুন হইতে প্রচুর পরিমাণে ধূম উঠিয়া সমস্ত বাড়ী এমন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে যে, চোখে দেখা ও নাক দিয়া নিশ্বাস ফেলা খুবই কষ্টকর।

সবশুদ্ধ গুটি পাঁচেক পরিবার। তাহাতে শিশুসন্তান সমেত নানা বয়সের পুরুষ ও নারীর সংখ্যা মোট প্রায় ত্রিশ হইবে। দেখিলাম ইতি-মধ্যেই প্রথম পরিচয়ের সঙ্কোচ কাটাইয়া অত্যন্ত সহজে এই পুণ্যার্থী তীর্থযাত্রীর দল বাড়ীটিতে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইয়াছে।

শোভান উৎসুকভাবে চারিদিকে চাহিয়া কি খুঁজিয়া ফিরিতেছিল; জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি ব্যাপার শোভান, এ হাটে খুঁজছ কি?"

শোভান উৎকণ্ঠিতভাবে বলিল, "আমার একটা মুগুর কোথায় গেল বল ত? একটা মুগুর রয়েছে আর একটা কোথা?"

শচীন বলিল, "এ বিষয়ে আমি কিঞ্চিৎ জ্ঞানালোক তোমায় বিতরণ করতে পারি। তুমি আশ্বস্ত হও, মুগুর তোমার সৎকার্য্যেই প্রাণ দিয়েছে।"

শোভান বলিয়া উঠিল, "ঠাট্টা রাখ শচীন-দা। নতুন মুগুর এই কাল এনেছি।"

শচীন বলিল---"তাহলে তার তরুণ জীবন সার্থক। ওই উঠোনের কোণে ভদ্রলোকটিকে দেখছ, তৈলসিক্ত বিরাট বপুর ঘর্ম্ম গামছা দিয়ে মার্জনা করছেন। সম্প্রতি ইন্ধনাভাবে আমি তাঁকে একটি মুগুর কুড়ুল দিয়ে চেলা করে

উনুনের মধ্যে প্রেরণ করতে দেখেছি। সেটি তোমারই হওয়া সম্ভব।"

শোভানের মুখ দেখিয়া সে বিশেষ প্রসন্ন হইয়াছে, এমন মনে হইল না।

কাঁধে এক বোঝা বাজার লইয়া এমন সময় দেখা গেল বিনয় অত্যন্ত ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া এক ভদ্রলোকের পিছু পিছু প্রবেশ করিতেছে। শোভান তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া বলিল---"এ সব কি ব্যাপার বিনয়।"

"ছাড় ছাড়, আমার সময় নেই।"

কিন্তু শোভান তাহাকে ধরিয়া রাখিয়া বলিল ---"আমার একটা মুগুর তোমার এই অতিথি-আতুরদের সেবায় গেছে বুঝেছ। সেটি তোমায় গড়িয়ে দিতে হবে।"

বিনয় অবাক হইয়া বলিল---"মুগুর গেছে আতুর-সেবায়? মানে?"

মানেটা শচীনই পরিষ্কার করিয়া বলিয়া দিল। আমরাও শোভানের মুগুর-বিয়োগে যথোচিত সমবেদনা প্রকাশ করিলাম।

বিনয় কিন্তু নির্ব্বিকারভাবে বলিল---"আহা, আরেকটা ত আছে।"

শোভান চটিয়া বলিল---"হ্যাঁ সেটা তোমার জন্যেই আছে।"

শরৎ কোথায় ছিল এতক্ষণ দেখিতে পাই নাই, হঠাৎ আসিয়া বলিল---"আহা চট কেন শোভান, তুমি না হয় তোমার হজযাত্রীদের একদিন এখানে বসিয়ে খাইও---তা'হলেই ত শোধবোধ।"

শোভান বোধ হয় কড়া রকমের একটা পাল্টা জবাব দিতে যাইতেছিল, শচীন তাহাকে বাধা দিয়া বলিল---"আচ্ছা তোমাদের ধর্ম্মযুদ্ধ ও জেহাদ থামাও। আপাততঃ বিনয়ের গণতন্ত্রের একটু ঘনিষ্ঠ পরিচয় নেওয়া দরকার।"

বিনয় কিন্তু তখন শোভানের হাত হইতে ছাড়া পাইয়া তাহার বাজারের বোঝা সমেত অন্তর্দ্ধান হইয়াছে। পরিচয়টা নিজেদেরই উদ্যোগী হইয়া লওয়া ছাড়া উপায় নাই।

শচীন বলিল---"তোমার মুগুরের যিনি সদ্ব্যবহার করেছেন, তাঁকেই এ গণতন্ত্রের নায়ক বলে মনে হচ্ছে। পরের সম্পত্তি বিভাগ সম্বন্ধে তাঁর সুচিন্তিত কিছু মতামত আছে এবং সে মত তিনি কার্য্যে পরিণত করতেও পরাঙ্মুখ নন, সুতরাং আলাপটা তাঁর সঙ্গেই আরম্ভ করা যাক্।"

লোকটা ঘাম মোছা শেষ করিয়া তখন সেই গামছা দিয়াই প্রকাণ্ড একটি হাঁড়ি উনুনের উপর হইতে নামাইবার আয়োজন করিতেছিল।

শচীন আগাইয়া গিয়া বলিল---"গোঁসাইজি প্রণাম হই। রান্নাবান্নার কিছু অসুবিধা হল না ত?"

হাঁড়ি নামাইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া গোঁসাইজি প্রতিনমস্কার জানাইয়া বলিলেন---"আজ্ঞে কিছু না, কিছু না। আপনাদের, আর গুরুর কৃপায় কোন অসুবিধেই হয়নি।" তাহার পর সহসা যুক্তকর কপালে ঠেকাইয়া পরম ভক্তিভরে বলিলেন---"আর অসুবিধে হবার জো কি। তাঁর ভোগ তিনি আপনি আয়োজন করে নেন। দু'মুঠো পেসাদ বনে থাকি, অরণ্যে থাকি, কোন রকমে মিলে যায়ই---"

শরৎ একটু হাসিয়া বলিল---"তবে কি জানেন, বনে যেমন সহজে মেলে অরণ্যে কি আর তেমনটি হয়? জঙ্গলে হলে ত আবার আলাদা কথা।"

শরতের কথার তাৎপর্য্যটা চট্ করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া গোঁসাইজি খানিক সন্দিগ্ধভাবে তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া চুপ করিয়া রহিলেন, কিন্তু কিছুক্ষণ বাদেই বিশাল কলেবর কাঁপাইয়া হাস্যধ্বনিতে অঙ্গন মুখরিত করিয়া বলিলেন, "সে কি কথা মশাই। লীলাময়ের কাছে বনে অরণ্যে সব সমান। তাঁর কি আর স্থানকালের বন্ধন আছে?"

শচীনের গোঁসাইজি সম্বোধন দেখিলাম কোন দিক দিয়া অন্যায় হয় নাই। লোকটির গলায় তিনপুরু কণ্ঠী, কপালে তিলক। সকালে কালীঘাটে গঙ্গাস্নানটা সারিয়া আসিয়াছেন

বোধ হইল---সুপ্রচুর ঘর্ম্মের উপর বারবার গামছা প্রয়োগ সত্ত্বেও স্থানে স্থানে 'শ্রীহরিচরণ' চিহ্ন এখনও টিকিয়া আছে, আচরণে কথায়-বার্ত্তায় তাঁহার বিনয়ের সীমা নাই।

শচীন বলিল---"বলছিলাম কি, কোন কিছুর অভাব-টভাব হলে বলবেন। উনুনের কাঠটাঠ আরো লাগে ত বলুন, এখনো আর একটা মুগুর আছে।"

"মুগুর।" গোঁসাইজি একটু বিস্ময় প্রকাশ করিয়া পরক্ষণেই হাসিয়া বলিলেন---"হেঁ হেঁ মুগুর নিয়ে কি হবে বলুন, ভিখিরী বোষ্টম মানুষ।"

"বেশ বেশ না লাগে ত আর কথাই নেই। তাহলে রবীন এবেলায় আহারটা গোঁসাইজির পেসাদ দিয়েই সারা যাক কি বল।"

গোঁসাইজি হাত যোড় করিয়া বলিলেন, "এমন সৌভাগ্য আমার হবে।"

শরৎ বলিল, "হবে বই কি। হবে বই কি। আমাদের ঐ একটা দোষ গোঁসাইজি, কারও কথা ঠেলতে পারিনি। বস হে রবীন, বসে যাও শচীন-দা। শোভান আপত্তি না থাকলে তুইও বসে যেতে পারিস---ছোঁয়াছুঁয়ি না হলেই হল।"

গোঁসাইজির মুখের ভাব দেখিয়া দয়া হইল। বলিলাম, "আপনাদের অসুবিধে হবে না ত---কজনের মত মাপা রান্নাই ত হয়েছে।"

গোঁসাইজিকে কোন কিছু বলিবার অবসর না দিয়া শরৎ তাড়াতাড়ি বলিল---"কিছু অসুবিধে হবে না হে, কিছু হবে না। এমন পেসাদ বিতরণ করাতেই ওঁদের আনন্দ, কি বলেন গোঁসাইজি?"

গোঁসাইজি করুণভাবে হাসিয়া বলিলেন---"আজ্ঞে তা বই কি। তাহলে আর এক হাঁড়ি চড়াই?"

শচীন বলিল---"হ্যাঁ একটু চাপাচাপি করেই চড়াবেন, আমাদের আরো কজন এখনো এসে পৌঁছোয়নি।"

গোঁসাইজির মুখে যেটুকু হাসি ছিল এবার মিলাইয়া গেল। ভীত-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন ---"আর ক'জন হবে?"

"কত আর, জন বারো হবে।" বলিয়া শরৎ হাঁক দিল, "ওহে বিনয়, এদিকে একবার দর্শন দিও।"

আমাদের ভাবগতিক দেখিয়া বিনয়ের ব্যাপারটা বুঝিয়া লইতে বিলম্ব হইল না। বলিল, "এ তোমাদের ভারী অন্যায় শরৎ---অতিথির ওপর এ জুলুম---"

শরৎ তাড়াতাড়ি বলিল---"আহা জুলুম কিসের, এবারে শোভানের আর একটা মুগুর ত যাচেছ।"

শোভান উঠিয়া পড়িয়া বলিল---"কিন্তু তাতেও কুলোবে না, আমি তোর তক্তপোষটাও নিয়ে আসি।"

শরৎ অবিচলিতভাবে বলিল---"তা নিয়ে আসতে পারিস, তবে দাঁড়া ঠিকানাটা দিই। কাল পয়সার টানাটানিতে সেটা আবার এক দোকানে বেচে এসেছি।"

সারা দিনের পরিশ্রম ও উপবাসের পর আহারটা বেশ ভাল করিয়াই হইল। গোঁসাইজির আর কিছু না থাক, পাচক-বিদ্যাটা ভালো-রকমই আয়ত্ত আছে দেখিলাম। শরৎ বলিল ---"যাই বল ভাই লোকটা ভাল মানুষ, নিতান্ত নিরীহ গোবেচারা।"

শচীন বিনয়ের পিঠ চাপড়াইয়া বলিল---"তোমার গণতন্ত্রের জয় হোক্ বিনয়, আজ সকাল থেকে যে ভাবে ব্যাঘাত সুরু হয়েছিল, তাতে সারাদিনে কিছু জুটবে এমন আশা ছিল না।"

শোভান বলিল---"বিনয়ের গণতন্ত্রের পেছনে আমার একটি মুগুর আছে সে কথা ভুলো না শচীন-দা।"

"মুগুর না হলে কোন গণতন্ত্রই ভালো করে শেষ পর্য্যন্ত চলে না যে শোভান।"

বিনয় ক্ষুণ্ণ স্বরে বলিল---"তোমাদের এ সব ঠাট্টা আমার ভালো লাগে না শচীন-দা; আমার মনে হয়, সত্যি সত্যি তোমাদের মনে এই সাধারণ লোকদের প্রতি একটু অবজ্ঞা আছে। অথচ এরাই ত তোমার সত্যকার দেশ---"

বিনয়ের বক্তৃতা শেষ করা হইল না। নীচের উঠান হইতে সহসা যে কোলাহল কাণে আসিয়া

পৌঁছিল তাহা উপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকা অসম্ভব। সকলে মিলিয়া ব্যাপারটা কি দেখিতে যাইতে বাধ্য হইলাম।

বাহির হইতে প্রথমে কিছু বোঝা সেই শব্দ-সমুদ্রের ভিতর হইতে অসম্ভব। এক সঙ্গে তীর্থযাত্রীদলের সব কটি নারী ও পুরুষকণ্ঠ মুক্ত হইয়াছে---শিশুরাও কোথাও কোথাও যোগ দেয় নাই এমন নয়।

শরতের সেই নিরীহ গোবেচারী গোঁসাইজিকে কেন্দ্র করিয়াই আন্দোলনটা চলিয়াছে এটুকু বোঝা গেল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তাঁর সে শান্ত নিরীহ মূর্ত্তি কেমন করিয়া এমন রূপান্তরিত হইয়া গেল ভাবিয়া পাইলাম না। কাঁধের গামছা তিনি শক্ত করিয়া কোমরে বাঁধিয়া ফেলিয়াছেন, গলার এক ফেরতা কণ্ঠী যে কারণেই হোক্ ছিঁড়িয়া গিয়াছে; আরক্ত চোখ ও বিশাল মাংসল বাহু দিয়া তাঁহার তাল ঠুকিবার ভঙ্গি দেখিয়া মনে হইল, এ রকম সংগ্রামে তিনি অনভ্যস্ত নহেন এবং বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতি ভক্তি তাঁর অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমনই হোক না, এ সব ব্যাপারে তৃণের মত সুনীচ বা তরুর মত সহিষ্ণু হওয়া তাঁর স্বভাব নয়।

অপর পক্ষের পাণ্ডাস্বরূপ হইয়া যে ব্যক্তিটি তর্ক করিতেছিলেন বাহুবলের প্রতি তাঁহার তেমন ভক্তি নাই মনে হইল। শীর্ণ দীর্ঘ চেহারা; দেহের হাড়-পাঁজরাগুলি চামড়া ঠেলিয়া সকল জায়গাতেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু দেহের শক্তির অভাব তিনি গলার দ্বারা পূরণ করিয়া লইয়াছেন। তাঁহার বাক্যের স্রোত যেমন প্রবল, আওয়াজও তেমনি প্রচণ্ড।

খানিক এ রণ-তাণ্ডব নিরীক্ষণ করিয়া শচীন বলিল---"ওহে, এ মহাযুদ্ধে তৃতীয় শক্তির আর-বিট্রেশন প্রয়োজন।"

অনেক কষ্টে উত্তেজিত দুই পক্ষের অসংলগ্ন কথাবার্ত্তা হইতে এইটুকু সংগ্রহ করা গেল যে, আমাদের গোঁসাইজির নেতৃত্বে তাঁহার নিজের গ্রামের ও পাশাপাশি কয়েকটি গ্রামের গুটিদশেক পরিবার তীর্থযাত্রায় বাহির হইয়াছিল। কালীঘাটে কালী-মূর্ত্তি ও সেই সঙ্গে কলিকাতার যাদুঘর, চিড়িয়াখানা, পরেশনাথের বাগান ও লালদীঘি প্রভৃতি যাবতীয় দর্শনীয় স্থান দেখাইবার ভারও ছিল তাঁহার উপর। তীর্থযাত্রীরা বিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে সেজন্য কিছু টাকাকড়িও প্রত্যেকে দিয়াছিল। এখন সেই টাকা লইয়াই গোলযোগ বাধিয়াছে। মাত্র কালীঘাট দেখাইয়া অন্যান্য দর্শনীয় স্থান সম্বন্ধে কোনপ্রকার উচ্চবাচ্য না করিয়াই তিনি তাহাদিগকে দেশে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন অথচ টাকা ফেরৎ দিবার নাম নাই। শুধু তাই নয়, কালীঘাটে পাণ্ডাদের ঘরে থাকিবার ভাড়া বাবদ যে খরচটা হইত সে খরচটা যখন বাঁচিয়া গিয়াছে তখন তাহাই বা তিনি ফেরৎ দিবেন না কেন?

গোঁসাইজি শেষ পর্য্যন্ত এ সব কথায় অসহিষ্ণু হইয়া বলিলেন---"যা, দেব না আমি টাকা। করগে যা কি করতে পারিস। পাণ্ডার ঘরের ভাড়া লাগেনি---সে আমি ফন্দি করে এ বাবুদের কাছে বাড়ী আদায় করেছি বলেই না। সে টাকা দেব কেন শুনি?"

শরৎ হতভম্ব বিনয়ের দিকে চাহিয়া চোখ টিপিয়া বলিল---"বিনয়, শোন।"

শীর্ণকায় লোকটি উত্তেজিত হইয়া বলিল, "বেশ ভাড়ার টাকা অমনিই যেত, না হয় তুই নিলি কিন্তু যাদুঘর চিড়িয়াখানা দেখাবি বলে যে টাকা নিয়েছিলি সে টাকা কোথায়?"

গোঁসাইজি তাহাকে কথা শেষ করিতে না দিয়া বলিলেন---"ইস্ কত টাকা দিয়েছিলি, কত টাকা? চিড়িয়াখানা যাদুঘর সব মাগনা দেখা যায় না।"

তাহার পর এই টাকার কথা লইয়া যে কেলেঙ্কারী আরম্ভ হইল, স্ত্রীলোক শিশু সকলের সামনে যে ভাষা উভয় পক্ষ পরস্পরের প্রতি প্রয়োগ করিতে সুরু করিলেন, তাহাতে ধৈর্য্য ধরিয়া চুপ করিয়া থাকা অসম্ভব।

শচীনের সালিশীর চেষ্টা সেখানে থই পাইল না। বিনয় থামাইতে গিয়া এক রকম অপমানিত হইল। শরৎ এবার চটিয়া মারমূর্ত্তি হইয়া বলিল

---"না শচীনদা, আর পারা যায় না; ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বদমায়েসগুলোকে বার করে দিয়ে আসি দাঁড়াও।"

কিন্তু শুধু ঘাড়ধাক্কায় তাহারা হটিবার পাত্র নয়। গোঁসাইজি তখন অপর পক্ষের কুষ্টী আওড়াইয়া বলিতে সুরু করিয়াছেন---"হাঁরে বিশে কুকুর। তোকে আবার জানি না, নন্দ পালের ভাইঝি দুটোকে কি জন্যে এনেছিস্ বলব তাহলে ---বলব সকলের সামনে ? টাকা, আমার কাছে টাকা আদায় করবি তুই ? তার আগে তোকে জেলে দিতে পারি জানিস্ ?"

বিশে কুকুর তখন মরিয়া হইয়া বলিতে সুরু করিল---"আমাকে জেলে পাঠিয়ে তুই থাকবি কোথায়রে বদমাস, কোন্ লাট সাহেবের শ্বশুর-বাড়ী ? পঞ্চাশ টাকা আগাম নিস্‌নি তুই তার জন্যে ?"

শোভান ও শরৎ এবার সত্যই রাগিয়া আগুন হইয়া তাহাদের মারিতে যাইতেছিল।

শচীন তাহাদের থামাইয়া বলিল, "খালি মেরে তাড়ালে এ ব্যাপারের মীমাংসা হবে না শোভান। এতদূর পর্য্যন্ত শুনে আমাদের নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকা চলে না।"

আমিও শচীনের কথায় সায় না দিয়া পারিলাম না। এই দলের ভিতর নন্দ পালের ভ্রাতুষ্পুত্রী দুটি কাহারা, এখনও জানিবার সৌভাগ্য হয় নাই; কিন্তু তাহাদের লইয়া একটা পৈশাচিক ষড়যন্ত্র যে চলিয়াছে, সে কথা জানিয়া শুনিয়া আর চুপ করিয়া থাকা যায় না।

শরৎ গোঁসাইজির স্থূল গণ্ডে একটি প্রচণ্ড চপেটাঘাত করিয়া বলিল---"চুপ, বদমাস চুপ, কোথায়, নন্দ পালের ভাইঝি কোথায় এর মধ্যে ? দেখা শীগ্‌গির।"

এক মুহূর্ত্তে গোঁসাইজির চালচলন, মুখের ভাব, কথাবার্ত্তা সমস্ত বদলাইয়া গেল। একবার সামনে দৃষ্টিপাত করিয়া আমাদের শক্তির বহরটা একটু অনুমান করিয়া লইয়া সহসা একেবারে অত্যন্ত নরম হইয়া মৃদুকণ্ঠে বলিলেন---"মারলেন আমাকে। তা মারুন, আপনারা ভদ্রলোকের ছেলে, বেয়াদবী করলে দু'ঘা মারতে পারেন বই কি ?"

শোভান বলিল---"ও সব ন্যাকামি রাখ্, নন্দ পালের ভাইঝি দুজন কোথায় দেখা শীগ্‌গির, নইলে তোদের হাড়মাস আজ আলাদা করে দেব।"

সারা কলেবর কম্পিত করিয়া আর একবার উচচ অট্টহাস্য করিয়া গোঁসাইজি বলিলেন---"হ্যাঁ হ্যাঁ আপনারাও যেমন, ঝগড়ার মুখে কি বলেছি না বলেছি, তাই বিশ্বাস করে বসেছেন। আরে নন্দ পালের ভাইঝিরা কি এখানে ? তারা ত দেশে। না কি বল না হে বিশু।"

বিশু ইতিমধ্যেই বিপদ বুঝিয়া বেশ সামলাইয়া লইয়াছে। একগাল হাসিয়া বলিল---"ঝগড়ার মুখে ও আমাদের কত কি বেরোয় তাই কি পেত্যয় করতে আছে বাবু।"

শোভান তাহার গালে আরেক চপেটাঘাত করিয়া বলিল, "খবরদার, মিছে কথা বলেছিস কি পুলিশে দিয়েছি।"

গোঁসাইজি এবার আগের পথে সুবিধা হইল না দেখিয়া চাল বদলাইয়া বলিলেন, "কি, পুলিশে দেবে কি ? মগের মুলুক নাকি। চল না পুলিশে, দেখি কে কাকে দেয় ? যত ভাল মানুষি করতে চাই ততই জুলুম, না।"

শরৎ গম্ভীরভাবে বলিল, "পুলিশে তোমায় দেব না, জান গোঁসাইজি, এইখানে মেরে পুতে ফেলব, আমরা সব স্বদেশী ছেলে জান ত, কোন কিছু ভয় করি না।"

শরতের মুখের ভাব দেখিয়া হাসি পাইতেছিল কিন্তু গোঁসাইজির মুখ চোখ কেন জানি না শুকাইয়া উঠিল। স্বদেশী ছেলেদের সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা বুঝিলাম, আদৌ ভাল নয়। ধরা গলায় একবার শেষ চেষ্টা করিয়া বলিলেন---"আমি কিন্তু---ওহে বিশু, বল না ভাই, আমরা নন্দ পালের ভাইঝির কি জানি"---

কিন্তু তাঁহাকে আর জানাইতে হইল না। শুভ্র থান কাপড়ে অবগুণ্ঠিতা দুটি মেয়ে আসিয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে জানাইল---"দোহাই বাবা, আমাদের

ধরে পৌঁছে দাও, আমরা এ সবের কিছু জানি না।"

খানিকক্ষণ বিস্ময়ে কাহারও মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না; গোঁসাইজি ও তাঁহার সঙ্গীটিকে অত করিয়া ধমকাইবার সময়েও মনে মনে একটা আশা ছিল যে, ইহারা অত বড় পিশাচ নাও হইতে পারে, হয়ত সত্যিই হতভাগিনী মেয়ে দুটি তাহাদের দেশে এখনও আছে। সাহস করিয়া পাষণ্ডেরা এখানে তাহাদের আনে নাই। যাহাদের দেখিতে চাহিতেছিলাম, তাহাদের এখন সামনে আগাইয়া আসিতে দেখিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলাম।

কিন্তু গোঁসাইজি খানিক হতভম্ব হইয়া থাকিয়া হঠাৎ যেন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। মেয়ে দুটির সামনে আসিয়া হাত-পা আস্ফালন করিয়া প্রায় মারমুখি হইয়া বলিলেন---"তবেরে নচছার ছুঁড়িরা, ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খেতে শিখেছ?---না?"

অপরূপ ভঙ্গিতে মুখ ভেংচাইয়া তিনি আবার বলিলেন---"আমাদের বাড়ীতে পৌঁছে দাও বাবারা, আমরা এর কিছু জানি না। কেন? এরা কি তোদের বাবা খুড়ো? সোহাগ জানানো হচেছ।"

মেয়ে দু'টি সে আস্ফালন দেখিয়া সভয়ে পিছাইয়া গেল।

শোভান ও শরৎ গোঁসাইজিকে ধাক্কা দিয়া দূরে সরাইয়া দিয়া বলিল, "খবরদার, এখানে চোখ বাড়িয়েছ কি পিটিয়ে হাড় ভেঙ্গে দেব।"

তাহার পর মেয়ে দুটির দিকে ফিরিয়া বলিল, "আপনাদের কোথায় বাড়ী মা?"

মেয়ে দুটি কুণ্ঠিতভাবে যে গ্রামের নাম করিল তাহার নাম অবশ্য কখনও শুনি নাই। কোন্ জেলায় বাড়ী, কোথা দিয়া যাইতে হয় কিছুই তাহারা জানে না দেখিলাম। তাহারা অন্যান্য সহযাত্রীদের সহিত সরল বিশ্বাস ভরে তীর্থদর্শন করিতেই আসিয়াছে। তাহাদের বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র যে থাকিতে পারে, এ কথা তাহারা কল্পনাও করে নাই।

বুঝিলাম, গোঁসাইজিকে হাজার ধমকাইলেও সত্য কথা এখন তাঁহার নিকট হইতে বাহির হইবে না। মেয়ে দুটির ঠিকানা অন্য উপায়ে আমাদের সংগ্রহ করিতে হইবে।

শোভান বলিল---"পুলিস ডেকে এনে ধরিয়ে দিই।"

শচীন হাসিয়া বলিল---"হ্যাঁ মেয়ে দুটির লাঞ্ছনা এত অল্পে যাতে শেষ না হয়, তার ব্যবস্থা কর।"

"কিন্তু তা'হলে কি হবে?"

একটু চিন্তিত হইবারই কথা। দলে পুরুষ মাত্র দুচারজন এবং তারা সকলে অন্য সময়ে যাহাই হউক এখন দেখিলাম, একতাসূত্রে গভীরভাবে আবদ্ধ। তাহাদের গাঁয়ের লোককে কলিকাতার গোটা কয়েক 'ভলেণ্টিয়ার' ছোকরা জব্দ করিবে, এ তারা প্রাণ থাকিতে সহিবে না। তাহাদের কাছ হইতে কোন কথাই আদায় করা দুষ্কর। দলের স্ত্রীলোকেরা সকলেই অজ্ঞ। রেলে চড়িয়া কালীঘাটে আসিয়াছে এইটুকুই তাহারা জানে; গ্রামের নামও বলিতে পারে কিন্তু আর কিছু খবর দেওয়া তাহাদের পক্ষে অসম্ভব।

মেয়ে দুটিকে লইয়া সত্যই ভাবিত হইয়া পড়িলাম। এই পাষণ্ডদের হাতে তাহাদের কোন মতেই ছাড়িয়া দেওয়া যায় না। অথচ পুলিসে খবর দিলে ইহাদের সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে দুটিকে অশেষ প্রকারে হয়রাণ হইতে হইবে, এই আশঙ্কাই হইতে লাগিল।

সুযোগ বুঝিয়া গোঁসাইজি বলিলেন, "কেন আমাদের মিছিমিছি হয়রাণ করছেন মশাই? আপনারা ভদ্রলোকের ছেলে---এটা কি আপনাদের ভাল হচেছ?"

শোভান তাহাকে এক ধমকে থামাইয়া দিয়া বলিল, "শচীন-দা, সোজাসুজি না হয় মার দিয়ে এদের কাছ থেকে কথা আদায় করতে হবে দেখছি।"

শচীন কিন্তু ঘাড় নাড়িয়া তাহাতে আপত্তি জানাইয়া হঠাৎ কি ভাবিয়া গোঁসাইজির সঙ্গীটিকে ডাকিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

ব্যাপারটা কিছু বুঝিতে পারিলাম না। গোঁসাইজি প্রথমে একটু হতভম্ব হইলেও ক্রমশঃ দেখিলাম, উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেছেন। মার খাওয়ার সম্ভাবনা দূর হওয়ায় তিনি বোধ হয় নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন।

মেয়ে দুটিকে নানা প্রশ্ন করিয়া এবার আমরা তাহাদের বিরুদ্ধে কি ষড়যন্ত্র হইয়াছে, তাহার কিছু আঁচ পাইলাম। দুইজনেই তাহারা বিধবা। কাকার সংসারে বাস করিলেও নিজেদের কিছু কিছু সম্পত্তি আছে। সে সম্পত্তি তাহাদের কাকা হস্তগত করিবার চেষ্টা কয়েক বার ইতিমধ্যে করিয়াছেন। কাকার প্রতি অবিশ্বাসের কিছু কারণ না থাকিলেও ইহাতে তাহারা রাজী হয় নাই। এবারে তাহাদের কাকা যেন কিছু বেশী রকম উদ্যোগী হইয়াই তাহাদের তীর্থযাত্রায় পাঠাইতেছেন, এ সন্দেহ তাহাদেরও মনে হইয়াছিল। কিন্তু তীর্থযাত্রার আনন্দে সে কথা লইয়া বেশী কিছু ভাবিয়া তাহারা দেখে নাই।

এতদূর শুনিয়াও কিন্তু মেয়ে দুটিকে লইয়া যে যড়যন্ত্র হইয়াছে তাহার কোন স্বরূপ ঠিক বুঝিতে পারিলাম না।

মেয়ে দুটির কথার মাঝে মাঝে গোঁসাইজি এতক্ষণ অত্যন্ত করুণ স্বরে টীকা দিতেছিলেন।

"এতটুকু বেলা থেকে তোদের কোলে পিঠে করেছি, আমি হলাম দুষমণ, আর কোথাকার কে এই কটা ছোঁড়া তারাই হল তোদের আপন? হায় রে কলিকাল!

এই নাক-কাণ মলা বাবা, পরের ভালোতে আর কখন থাকব না। ভাবলাম আহা কখনও কোথাও যেতে পায় না, আমার দ্যাখতা যদি তীর্থ-ধর্ম্ম একটু করতে পায় ত ক্ষতি কি? এখন কিনা আমারই সর্ব্বনাশের চেষ্টা।"

শরৎ ও শোভান অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছিল। শরৎ বলিল—"শচীন-দা আবার কি করতে গেল বল দেখি। সব জায়গায় বুদ্ধি খাটান চলে না, বাহুবলেরও ক্ষেত্র আছে, শচীন-দা তা বোঝে না।"

কিন্তু শচীনের বেশী বিলম্ব হইল না। খানিক বাদেই সে হাসিমুখে ফিরিয়া আসিল। জিজ্ঞাসা করিলাম—"তোমার সঙ্গীটিকে কোথায় রেখে এলে?"

শচীন হাসিয়া বলিল—"তার সমস্ত পাপ গ্লানি মোচন করে নব ধর্ম্মে দীক্ষিত করে এলাম। এতক্ষণ বোধ হয় কাষায় বস্ত্র পরে আমার কল্যাণের বাণী প্রচার করতে বেরিয়ে পড়েছে।"

গোঁসাইজি এ সব কথা বুঝিতে না পারিয়া কিঞ্চিৎ ভীতভাবেই জিজ্ঞাসা করিলেন—"এঁ্যা সে খিশে ব্যাটা পালাল!"

"পালাবে কেন গোঁসাইজি! আপনাদের গোপন বন্দোবস্তের কথা বলে ফেলবার পর দেখলাম, আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে তার তেমন আগ্রহ নেই। তাই তাকে আমিই যাবার অনুমতি দিয়েছি।"

গোঁসাইজির মুখ এবার সত্যই শুকাইয়া গেল—অত্যন্ত করুণভাবে তথাপি সাহস সংগ্রহ করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা আমায় ফাঁসিয়ে বাছাধন কেমন করে নিষ্কৃতি পান্ আমিও দেখছি। ডুবি যদি আমি, সকলকে জড়িয়ে ডুবব! সে নন্দ পালকেও আমি ছাড়ছি না।"

শচীন গম্ভীর হইয়া বলিল—"ছাড়া উচিত নয় বলেই ত মনে হয়।"

"নয়ই ত! আমি না হয় টাকাই খেয়েছি, আর সে ব্যাটা খায়নি? আর নন্দ পাল সম্পত্তির লোভে আমাদের যে ঘুষ দিয়েছে সে যাবে কোথায়?"

শচীন তেমনি গম্ভীর হইয়া বলিল—"সব দিক ভেবে দেখলে আসল পাজী সেই নন্দ পাল। আপনার নিকলুষ জীবনে ক্ষণিক দুর্ব্বলতার মুহূর্ত্তে কাঞ্চনের মোহে আপনার না হয় সামান্য পদস্খলন হয়েছে কিন্তু—"

গোঁসাইজি বিমূঢ়ভাবে বলিলেন—"আজ্ঞে?"

"বলছি যে আপনি কিছু টাকাই না হয় নিয়েছেন, এখনও কিছু ত করেন নি। কিন্তু এ মেয়ে দুটির সর্ব্বনাশের ষড়যন্ত্র ত নন্দ পালের মাথা থেকেই বেরিয়েছে। সেই ত বদমায়েসের ধাড়ী।"

অন্ধকারের মধ্যে আবার আলোকের আভাষ দেখিতে পাইয়া গোঁসাইজি বলিলেন—"বলুন ত, আপনিই বলুন না! আমি যে টাকা নিয়েছি তারই বা প্রমাণ কি! আর এদের আমি সত্যিই ত কিছু করিনি এখনও।"

শচীন বলিল, "নিশ্চয়, আপনার ওপর কোন রকম অভিযোগই ত দাঁড়াতে পারে না, বিশেষতঃ আপনি যদি সাফ সব কথা বলে দেন। কিন্তু সে বেটা নন্দ পালকে ছাড়া উচিত নয়। কি বলেন?"

গোঁসাইজি আরো উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন, "নিশ্চয়!"

শচীন বলিল—"তার শাস্তি যদি না হয় তাহলে সংসারে ধর্ম্মের জয় আর কেউ গাইবে না।"

"আজ্ঞে না।"

শচীন গোঁসাইজির কাণের কাছে মুখ আগাইয়া লইয়া গিয়া গলার স্বর অত্যন্ত নামাইয়া বলিল—"বিপদ যদি হয় ত সেই নন্দ পালেরই হবে। আপনাদের সে বলেছিল কি?"

গোঁসাইজিও গলা নামাইয়া বলিলেন, "আমি সে-সব কিছুর মধ্যে ছিলাম না মশাই—ওই বিশে ব্যাটাই সব।"

"সেকি আর আমরা বুঝিনি। তবু শুনেছিলেন ত ব্যাপারটা।"

গোঁসাইজি অত্যন্ত বিমর্ষ মুখে বলিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, তা শুনেছিলাম বই কি; সে বড় নোংরা ব্যাপার মশাই, সে আর কি বলব?"

শচীন উৎসাহ দিয়া বলিল—"তবু—"

গোঁসাইজি বলিলেন, "ওই নন্দ পাল কি কম শয়তান! মেয়ে দুটোকে পারলে ও বিষ খাওয়াতো। কিন্তু তাতে হাঙ্গাম হতে পারে ভেবে নচ্ছারটা শেষে ঠিক করলে কি মেয়ে দুটোকে কলকাতার কালী দেখবার নাম করে পাঠিয়ে কোন রকমে হারিয়ে গেছে বলে ফেলে আসবার ব্যবস্থা করাবে।"

"তারপর?"

"তারপর আর কি? দেশে এসে রটিয়ে দেবে তারা বেরিয়ে গেছে। তখন কোন রকমে ফিরে এলেও তাদের চরিত্রে বিশ্বাস করছে কে? ঘরেই বা কে নিচেছ? সমস্ত সম্পত্তি একেবারে নন্দ পালের মুঠোয়।"

শচীন গম্ভীরভাবে বলিল—"হুঁ—আপনাদের গ্রামটা হল তাহলে—?"

গোঁসাইজি অসন্দিগ্ধভাবে গ্রামের নাম ঠিকানা সবই দিয়া ফেলিলেন।

শচীনকে এই সমস্ত করার ভিতরেও হঠাৎ অকারণ হাসিয়া উঠিতে দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম।

হাসিয়া সে বলিল, "ওহে শরৎ, তোমাদের বিশে ওরফে বিশ্বেশ্বর বাবুর এতক্ষণ নিঃসঙ্গ কারাবাস বোধ হয় অসহ্য হয়ে উঠেছে। তাঁকে তোমার ঘরের শিকলিটা খুলে বার করে নিয়ে এস।"

"বিশে তাহলে যায়নি!" গোঁসাইজি সবিস্ময়ে বলিলেন।

শচীন বলিল—"না, তবে তাঁর কোন দোষ নেই; আমার কাছে কোন কথা ভাঙ্গতে রাজী না হওয়ায় তাঁকে যেতে আমিই দিই নি।"

"বিশে কিছু বলে নি আপনাকে তাহলে।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, তাঁর সঙ্কল্প দেখলাম আপনার চেয়ে কিছু দৃঢ়। তাই আপনার কাছে কিঞ্চিৎ কৌশল প্রয়োগ করে আমাকে কথাগুলো আদায় করতে হল। আপনি হয়ত অসাধু ভাষায় একে অন্য আখ্যা দেবেন, তা দিন, কিন্তু দোহাই অপরাধ নেবেন না।"

গোঁসাইজির মুখ দেখিয়া তাঁহার মনে বিস্ময়, ক্রোধ বা ক্ষোভ—কোন্ ভাবের প্রাধান্য ঘটিয়াছে ঠিক বোঝা গেল না।

শচীন সকলের দিকে ফিরিয়া বলিল, "ওহে বিনয়, তোমাদের কাউকে ত এ মেয়ে দুটিকে

পৌঁছে দেবার ভার নিতে হয়। গোঁসাইজি ধর্ম্ম-ভীরু লোক, এ সমস্ত ব্যাপারের পরও নন্দ পালের ঘুষটা বেমালুম হজম করতে ওঁর হয়ত সঙ্কোচ হতে পারে। ওঁর সঙ্গে মেয়ে দুটিকে পাঠাতে ঠিক সাহস হচ্ছে না।"

শোভান বলিল, "আমি যাচ্ছি।"

শচীন ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "উঁহু, দিনকাল খারাপ, নারীরক্ষা করতে গিয়ে শেষে হরণের দায়ে পড়ে যাবে।"

শরৎ ততক্ষণ বন্দী বিশেকে মুক্ত করিয়া দিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। ঠিক হইল সে-ই মেয়ে দুটিকে তাহাদের গ্রামে পৌঁছাইয়া তাহাদের সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া আসিবে।

গোল বাধিল গোঁসাইজি ও তাঁহার সাঙ্গপাঙ্গকে লইয়া। বিনয় বলিল---"ওদের আর ধরে রেখে কি হবে শচীন-দা? ওদের ছেড়ে দেওয়া যাক।"

কিন্তু শোভান ও শরৎ তাহাতে রাজী নয়।

শরৎ বলিল---"ওদের কিছু দণ্ড না দিয়ে যেতে কিছুতেই দেওয়া যেতে পারে না।"

বিনয় একটু উষ্ণ হইয়া বলিল, "দণ্ড দেবার আমরাই মালিক নাকি?"

শোভান বিনয়ের পিঠ চাপড়াইয়া বলিল---"মালিক না হতে পারি কিন্তু তাঁর যোগ্য প্রতিনিধি। আর মালিকের বিচারের বহর ত' সারা জীবন ধরেই দেখলাম। ও দেওয়ানি আদালতের বাড়া। এ জন্মের মামলার রায় তিনি আর জন্মের আগে দেবার ফুরসৎ পান না। তার চেয়ে আমরা হাতে হাতে চুকিয়ে দিই সেই ভাল।"

বিনয় গম্ভীর হইয়া বলিল---"দণ্ডটা তাহলে কি হবে?"

শরৎ বলিল---"সেইটেই ভাববার বিষয়।"

তাহাদের ভাবিতে সময় দিয়া শচীনের সহিত উপরে চলিয়া গেলাম। সারাদিন শরীর ও মনের উপর দিয়া যে সকল গিয়াছে এতক্ষণে তাহার ফল টের পাইতেছিলাম। সমস্ত দেহ ও মন ক্লান্তিতে যেন একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িতে চাহিতেছিল। কিন্তু বিশ্রাম করিতেও কেন জানি না ভয় করিতে-ছিল। মনে হইতেছিল বিশ্রাম করিতে গিয়াও শান্তি আমার মিলিবে না। সারাদিন যে বেদনাটিকে বাহিরের হুজুগে মাতিয়া দূরে ঠেলিয়া রাখিয়াছি, তাহাই সামান্য একটু অবসর পাইবামাত্র সমস্ত মন অধিকার করিয়া বসিবে। সে বেদনার সহিত নিঃসঙ্গ আলাপ করিতে সত্যই সাহসে কুলাইতেছিল না। সেই বেদনার আলোয় হয়ত নিজের মনের এমন অভাবিত পরিচয় মিলিবে যাহা সহ্য করিবার শক্তি এখনও সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

শচীন অন্য ঘরে চলিয়া যাইতেছিল। তাহাকে ডাকিয়া বসাইলাম। ক্লান্ত সে আমার চেয়ে কম হয় নাই, কিন্তু তাহার মুখে যে ছায়াটি পড়িয়াছে শুধু ক্লান্তি তাহার জন্য দায়ী নয় মনে হইল।

শচীনকে ডাকিয়া বসাইলেও, কি যে বলিব ভাবিয়া পাইতেছিলাম না। যে কথাটি মনের সামনে সব কিছু আড়াল করিয়া আছে তাহাকে ভুলিয়া থাকিবার জন্য কি-ই বলা যায়।

শচীনই এ বিপদ হইতে আমাকে মুক্তি দিল, বলিল---"দেখ্ একা শরৎকে মেয়ে দুটির সঙ্গে পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে না। মেয়ে দুটিকে নিয়ে বেগ সেখানে অনেক পেতে হবে, শরৎ একলা সামলাতে পারবে না। আমিও যাব ভাবছি সঙ্গে।"

বলিবার কথা পাইয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম---"আমি গেলে হয় না?"

শচীন বলিল---"হবে না কেন, কিন্তু অনেক ঝঞ্ঝাট---।"

হাসিয়া বলিলাম---"ঝঞ্ঝাটই একটু চাই।"

শচীন কি জানি কেন পরিহাসের চেষ্টা পর্য্যন্ত করিল না। আমার দিকে অদ্ভুতভাবে খানিক তাকাইয়া বলিল---"তবে তুইও সঙ্গে যা।"

তাহার পর অনেকক্ষণ কোন কথাই হইল না। সন্ধ্যার অন্ধকারে ঘর আবছা হইয়া আসিতেছিল। দুইজনে চুপ করিয়া সেই অস্পষ্ট আলোয় দুই দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলাম। এমনভাবে চুপ করিয়া থাকা শচীনের অভ্যাস নয়। তাহার এ ভাব দেখিতে বিস্মিত হওয়া স্বাভাবিক।

নিজেই যাহোক একটা অবান্তর কথা বলিতে যাইতেছি এমন সময় শচীন হঠাৎ বলিল---

"বাসন্তীপুরে একবার না হয় নামিস্---ওই লাইনেই পড়বে।"

অবাক হইয়া বলিলাম---"বাসন্তীপুর?"

শচীন বলিল, "হ্যাঁ, মনুর শ্বশুরবাড়ী ওইখানে।" এবং পরক্ষণেই উঠিয়া চলিয়া গেল।

. . .

গোঁসাইজি ও তাহার সাঙ্গপাঙ্গের ব্যবস্থা শরৎ ও শোভান মিলিয়া কি করিল তাহারা জানে। পরদিন সকালে উঠিয়া তাহাদের আর দেখিতে পাইলাম না। শুনিলাম রাত্রিটা তাহারা এইখানেই কাটাইয়া ভোর না হইতে বিদায় লইয়াছে। শরৎ ও শোভান সারা সকালটা আমাদের এড়াইয়াই চলিল, গোঁসাইজি সম্বন্ধে কি রায় তাহারা দিয়াছে তাহাদের কাছে আদায় করা গেল না; সকল কথা ফাঁস করিয়া দিল বিনয়। বলিল, "দেখ ত শচীন-দা, শরৎ আর শোভানের অন্যায়। আচ্ছা গোঁসাইজি আর সেই বিশ্বেশ্বরেরই না হয় দোষ আছে, কিন্তু তার জন্যে দলের সকলকে সাজা দেওয়াটা কি উচিত?"

নেহাৎই ধরা পড়িয়া গিয়া শোভান প্রতিবাদ করিয়া বলিল---"সাজা কি রকম? এ রকম সৎকার্য্যে দান করার সুযোগ কার মেলে---"

শচীন ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল---"এবারের শুভকার্য্যটা কি?"

শরৎ উত্তর দিবার আগেই বিনয় বলিল, "আমাদের প্রতুলের একবার প্রত্নতত্ত্বে বাতিক হয় মনে আছে ত। রংপুরের কোথা থেকে একটা হাত-পা ভাঙ্গা মূর্ত্তিও সে-সময়ে সংগ্রহ করে এনেছিল। তারপর অনেক চেষ্টা-চরিত্র করেও সেটাকে নটরাজ বা অর্দ্ধনারীশ্বর বলে যখন প্রমাণ করা গেল না, আমাদের এখনকার পণ্ডিতেরা সেটাকে পুরোণ মাইলপোষ্ট বা ওই রকম কিছু ছাড়া আর কিছু বলতে রাজী হলেন না, তখন সেটা চোর কুঠুরিতে ফেলে রেখে দিয়েছিল।"

বিস্মিত হইয়া বলিলাম---"তার সঙ্গে এদের সাজার কি সম্বন্ধ?"

বিনয় বলিল, "শুনুন না, সম্বন্ধ আছে বই কি। রাত দুপুরে সেইটে কুঠুরি থেকে ঘাড়ে করে নামিয়ে এনে শরৎ বল্লে---এ হচ্ছে ভদ্রকালীর মূর্ত্তি। মা এখানে আবির্ভূত হয়েছেন, কিন্তু পয়সার অভাবে তাঁর প্রতিষ্ঠা করা যাচ্ছে না। গোঁসাইজি আর তার দলবল মিলে তাঁর প্রতিষ্ঠার খরচাটা দিয়ে দিলেই তাদের সাতখুন মাপ হয়ে যাবে।"

জিজ্ঞাসা করিলাম---"তারা তাই বিশ্বাস করে দিলে নাকি টাকা?"

শরৎ এবার বলিল---"দেবে না? অন্যভাবে চাইলে যদি বা না দিত, ভদ্রকালীর মূর্ত্তি শুনে বিশ্বাস করুক আর না করুক ভয়ে দিলে। যাদের সাজা হবার নয় তারাই বেশী দিলে এই যা দুঃখ।"

বলিলাম---"এ তোমার ভারী অন্যায় শরৎ, মানুষের ধর্ম্মবিশ্বাস নিয়ে এ রকম হাসি-তামাসা করাটা আমার ঠিক মনে হয় না।"

বিনয় সায় দিয়া বলিল---"আর তা ছাড়া এ ত' শুধু হাসি-তামাসা নয়, ডাহা জুয়াচুরি।"

শরৎ গম্ভীর হইয়া বলিল---"হুঁ, কিন্তু গোপালের সে দু'শ টাকা ফুরিয়ে এল তার খবর রাখ? কালীঘাটের পাণ্ডারা খেত, তার বদলে না হয় ভদ্রকালীর নাম করে আমরাই কিছু নিলাম। তাতে রাগ করবেন, মা কালী এমন অভদ্র নয়।"

বিনয় বলিল---"তাহলে কালীঘাটের পাণ্ডা হলেই ত চলে, স্বদেশ-সেবার ভান করবার দরকার কি?"

শরৎ জবাব দিল, "দ্বিতীয় ভাগ পড়ে ত আর স্বদেশ-সেবা করতে আসি নি। সদা সত্য কথা বলিব, কাহাকেও ফাঁকি দিব না, এমন কোন প্রতিজ্ঞাপত্রেও 'স্বাক্ষর' করি নি।"

বিনয় সত্যই রাগিয়াছিল, বলিল, "তোমাদের এই সামান্য হাসি ঠাট্টা মজা করার সখ ক্রমশঃ কোন্ দিকে বেড়ে চলেছে তা বুঝতে পারছ? যাঁরা স্বদেশসেবাকে ব্রত বলেছিলেন তাঁরা নেহাৎ না বুঝেই ও শব্দটা ব্যবহার করেন নি। নীতি-কথাগুলোকে দ্বিতীয় ভাগ বলে ঠাট্টা করতে পার, কিন্তু মনের ভিৎ এধারে ওধারে একটু আধটু আলগা করতে করতে সমস্তই একদিন ধূলিসাৎ হয়ে যেতে পারে।"

শরৎ বিনয়ের বক্তৃতা কি বলিয়া থামাইতে যাইতেছিল, কিন্তু বিনয় তাহার বাধা উপেক্ষা করিয়া বলিয়া চলিল, "নীতির বাঁধনে মনের পরিসর সঙ্কীর্ণ হয়ে আসে বলতে পার কিন্তু সঙ্কীর্ণ না হলে শক্তিও বাড়ে না একথাও স্বদেশ-সেবাকে যাঁরা ব্রত করতে চেয়েছেন তাঁরা জানেন। যাকে নির্দ্দোষ লঘুতা ভাবছ ধীরে ধীরে তা তোমাদের সমস্ত মনে কি ভাবে ছড়িয়ে যাচেছ্ তা তোমরা জান না।"

শরৎ হাতের আঙ্গুলে গুণিয়া গুণিয়া বলিল, "ব্রত, ধূলিসাৎ, পরিসর, নির্দ্দোষ লঘুতা—তোর মতামত যাই হোক, বিনয় ভাষা তোর প্রাঞ্জল হচেছ্ স্বীকার করতেই হবে।"

শচীন আগাইয়া আসিয়া তাহাদের ঝগড়া থামাইয়া দিয়া বলিল, "ওহে শরৎকে ট্রেণ ধরতে হবে, ওর হয়ে আমি না হয় তোমার সঙ্গে লড়ছি।"

বিনয় হাসিয়া বলিল, "না শচীন-দা, সত্যি আমার ভয় হয় শুধু শরৎ নয়, আমরা এ যুগে সবাই অতিরিক্ত চালাক হতে গিয়ে জীবনকে ব্যর্থ করছি।"

শচীন বলিল—"ব্যর্থ যখন হতেই হবে তখন বোকামী করে ব্যর্থ হওয়ার চেয়ে চালাকী করে ব্যর্থ হওয়ায় বাহাদুরী আছে বই কি।"

"আমার কথা তুমি বুঝলে না শচীন-দা, আমাদের এ চালাকীর পেছনে মনের গভীরতা নেই, অত্যন্ত ক্লান্ত অত্যন্ত উদাসীন মনের এটা একটা ভাসা-ভাসা চঞ্চলতা মাত্র। আমরা শুধু এর দ্বারা মুখ বেঁকাতেই শিখেছি, আর কিছু নয়। কিন্তু মুখ বেঁকিয়ে সব কিছুকে ছোট করতে গিয়ে আমরা নিজেরাই যেন অত্যন্ত ছোট হয়ে যাচিছ্। আগেকার লোকদের তুলনায় আমরা সব দিক দিয়ে মাথায় খাটো মনে হয় না কি?"

শরৎ হাসিয়া বলিল—"তোমাকে দেখে তা মনে হয় বই কি। কিন্তু তোমার ও স্পেশ্যাল কমপ্লেক্সের কথা আলোচনা নাই করলে এখানে।"

আমরা হাসিয়া উঠিলাম। শচীন বলিল, "শরৎ ফিরে আসুক বিনয়, আলোচনাটা গভীরভাবে করা যাবে।"

শরতের সঙ্গে মেয়ে দুটিকে পৌঁছাইয়া দিতে আমিও চলিলাম।

হাওড়া হইতে ঘণ্টা কয়েক রেলে গিয়া একটি জংশন ষ্টেশনে নামিতে হয়। সেখান হইতে সরু আর এক লাইনে ছোট আর এক গাড়ীতে চড়িয়া মেয়ে দুটির দেশের ষ্টেশনে পৌঁছাইতে বেশীক্ষণ লাগে না।

সন্ধ্যার কাছাকাছি মাঠের মাঝখানে টিনের ছাউনি-করা ছোট একটি নগণ্য ষ্টেশনে গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলাম। এই ষ্টেশন হইতে ক্রোশ দুই খোলা মাঠের উপর দিয়া হাঁটিয়া গেলেই মেয়ে দুটির গ্রাম মিলিবে, এইটুকু বিবরণ গোঁসাইজির নিকট সংগ্রহ করা গিয়াছিল। যানবাহনের কোন বালাই এখানে নাই। অনেক পয়সা কড়ি খরচ করিলে ও গ্রামে প্রভাব প্রতিপত্তি থাকিলে পাল্কি যোগাড় করা যায়, কিন্তু তাহার জন্যও দিন সাতেক আগে হইতে জানাইয়া রাখা প্রয়োজন। গরুর গাড়ী চলে বটে কিন্তু তাহারও বিশেষ কোন পথ নাই, কখনও মাঠের উপর দিয়া, কখনও অসমতল বন্ধুর ভূমির উপর দিয়া যাইতে হয়। সেই গরুর গাড়ীতে চড়িয়া কোনরকমে দেহের হাড় ক'খানাকে সংলগ্ন অবস্থায় গন্তব্যস্থানে লইয়া যাওয়াই নাকি কঠিন।

যাহাই হউক এমন গরুর গাড়ীতে চড়িবার ইচছা থাকিলেও তাহা পূর্ণ হইবার কোন আশঙ্কা দেখিতে পাইলাম না।

আমরা ছাড়া ষ্টেশনে কেহই আর নামে নাই, নীল একটি নিশান দুলাইয়া যে লোকটি অলস ট্রেণটিকে এক প্রকার যেন তাড়া দিয়াই সম্প্রতি ষ্টেশন হইতে বাহির করিয়া দিলেন, তিনি ব্যতীত ষ্টেশনেও অন্য কোন জনপ্রাণী দেখা গেল না।

লোকটির বেশভূষা একটু অদ্ভুত। পরণের কাপড়টি যেমন ছোট, তেমনি ময়লা, কোন রকমে হাঁটুর নীচে তাহাকে নামান যায় নাই। গায়ে তাঁহার কাপড়েরই অনুরূপ মলিন একটি গেঞ্জি। কিন্তু পোষাক যাহাই থাক, মাথা দেখিয়া তাঁহার পদমর্য্যাদা নির্ণয় করিতে দেরী হইল না। মাথায়

টুপি দেখিয়া বুঝিলাম, তিনিই ষ্টেশন মাষ্টার। এই ক্ষুদ্র ষ্টেশনটির টিকিট বেচা হইতে টিকিট আদায় ইত্যাদি সকল কাজই তাঁহাকে অবশ্য করিতে হয়, কিন্তু তাহাতে পরিশ্রম বা কষ্ট খুব বেশী আছে, তাঁহার চেহারা দেখিয়া মনে হইল না। হৃষ্টপুষ্ট গোলগাল দিব্য নধর চেহারা, চুল পাকিয়াছে কিন্তু মুখে দাগ পড়ে নাই। মুখে যে হাসিটি লাগিয়া আছে তাহাতে সরলতা অপেক্ষা নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয়ই হয়ত একটু বেশী হইবে, তবু তাহা ভাল লাগে। আমাদের টিকিট লইয়া তাঁহার চলিয়া যাইবার বিশেষ আগ্রহ নাই দেখিলাম।

খানিক এদিক ওদিক চাহিয়া বারকয়েক নির্ব্বোধের মত হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনারা যাবেন কোথায়?"

তাঁহার কথার ধরণ শুনিয়া মনে হইল এই নির্জ্জন ষ্টেশনে নিঃসঙ্গভাবে দিনের পর দিন বাস করিয়া মানুষের সহিত দুদণ্ড আলাপ করিতে পাওয়ার সৌভাগ্যটাই তাঁহার কাছে সবচেয়ে লোভনীয় হইয়া উঠিয়াছে।

আমাদের গন্তব্য স্থানের নাম শুনিয়া বলিলেন, "ও সে ত প্রায় দুক্রোশ রাস্তা, এই সন্ধ্যের সময় যাওয়া ভারী মুস্কিল হবে না? আপনাদের সঙ্গে আলো আছে?"

শরৎ বলিল, "না নেই, কিন্তু থাকলেও বিশেষ সুবিধা হত না। কারণ আলোয় পথ দেখতে পেলে আমরা চিনতে পারতাম বলে মনে হয় না। আমরা এই প্রথম সেখানে চলেছি।"

ষ্টেশন মাষ্টার মহাশয়ের সরল মুখে সত্যকার উৎকণ্ঠা দেখা গেল। বলিলেন, "তাহলে ত পথ চিনে যেতে পারবেন না মশাই, ভারী ঘোরাল পথ কিনা—"

এরূপ আশঙ্কা আমাদের আগেই হইয়াছিল, ষ্টেশন মাষ্টারের কথায় তাহার সমর্থন পাইয়া চিন্তিত হইয়া পড়িলাম। এই দুটি অসহায় নারীকে লইয়া এই রাত্রে পথ খুঁজিয়া যদি তাহাদের গ্রামে পৌছিতে না নারি, তাহা হইলে কি বিপদেই পড়িতে হইবে! তবু শেষ আশায় ভর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারে এমন কাউকে দিতে পারেন না? আমরা না হয় বক্‌শিস দিতাম।"

"বক্‌শিস ত দেবেন কিন্তু নেবে কে?" বলিয়া ষ্টেশন মাষ্টার মশাই নিজের রসিকতায় নিজেই হাসিয়া মাৎ করিয়া দিলেন।

হাসি থামিলে বলিলেন—"কেষ্টা বেটা থাকলে অনায়াসে সঙ্গে যেতে পারত; কিন্তু সন্ধ্যার পর সে বেটাকে ত এসে অবধি একদিন দেখলাম না। বেটার এখানে নাইট ডিউটি কিনা?"

ষ্টেশন মাষ্টার মহাশয়ের হাসি দেখিয়া বোঝা গেল, এটাও তাঁহার একটি অতি প্রিয় রসিকতা।

কেষ্টার পরিচয় গভীর রহস্যান্ধকারে আবৃত হইলেও তাহা অপসারণের চেষ্টা তখন আর করিলাম না। বলিলাম—"তা হলে আর লোক পাওয়া যাবে না, কি বলেন?"

ষ্টেশন মাষ্টার মহাশয় মুখ বিষণ্ণ করিয়া বলিলেন—"আমিই ত দিতে পারতাম আপনাদের এগিয়ে মশাই কিন্তু সাড়ে আটটায় তিন নম্বর আপ্‌টাকে যে পাশ করিয়ে দিতে হবে।"

তাঁহার বদান্যতার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া বলিলাম—"না না, তাকি হয়? ষ্টেশন ছেড়ে কি আপনাকে যেতে বলতে পারি।"

"খুব পারেন, বিলক্ষণ পারেন। যেতে কি আর অমন হয় না মনে করেন মশাই। এই ত পরশু সকালেই আমাদের সুরুটির মুখুয্যে মশাই মেয়ের বিয়ের একগাদা বাজার করে নিয়ে এসে নেমে বললেন—'মাষ্টার, বাড়ীর ছেলেপিলে ত কাউকে দেখছি না হে, দুপুরের ট্রেণেই আসার কথা ছিল বলেই বোধ হয়, আসে নি। এতগুলো জিনিষপত্র নিয়ে কি করি বল ত?' কি আর বলব। ভাবলাম এখন বেলা সাতটা, আর দুপুরের ট্রেণ বেলা বারোটায়। মাঝে এগারোটায় একটা মাল-গাড়ী পার করতে হবে, তা সুরুটি থেকে একটু টেনে হাঁটলে ফিরে আসাও যায়।"

শরৎ বলিল—"তাহলে গেলেন নাকি ভদ্রলোকের জিনিষ ব'য়ে তাঁর বাড়ী?"

হাত দুইটা নিরুপায় ভঙ্গিতে চিৎ করিয়া ষ্টেশন মাষ্টার মশাই বলিলেন, "না গিয়ে করি কি

বলুন। ভদ্রলোকের মাছটা বেলা বারোটা পর্য্যন্ত থাক্‌লে পচে যায়। তা এসে ধরেছিলাম ঠিক মালগাড়িটাকে, তবে একটু দৌড়োতে হয়েছিল বটে।"

শরৎ বলিল---"খাওয়া দাওয়ার পর এই বয়সে আপনি ছুটোছুটি করতে পারেন।"

"খাওয়া দাওয়ার পর?" ষ্টেশন মাষ্টার মশাই একটু অবাক্ হইয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন।

বলিলাম---"তারা ত খাইয়ে দায়েই ছাড়লে?"

মাষ্টার মশাই বলিলেন---"রামঃ, মুখুয্যে মশাই আবার খাওয়াবে --- যা কেপ্পন, বলে নাম করলে হাঁড়ি ফেটে যায়।"

শরৎ অবাক হইয়া বলিল---"এই এতখানি পথ তাদের মাছ ব'য়ে নিয়ে যাবার পর তারা আপনাকে না খাইয়ে ছেড়ে দিলে।"

অত্যন্ত সহজভাবে মাষ্টার মশাই বলিলেন, "তা নয় ত কি।"

ভাবিলাম সুদূর মফঃস্বলে মন্দ এক ষ্টেশন মাষ্টারের দেখা পাওয়া যায় নাই। লোকটি মনে রাখিবার মত।

এই অল্পক্ষণের মধ্যেই লোকটির সঙ্গে কেমন যেন হৃদ্যতা হইয়া গিয়াছিল---এমন লোকের সঙ্গে না হইয়া যায় না।

ভাবিতেছিলাম ষ্টেশন মাষ্টারের নিকট রাত্রের মত একটু আশ্রয় প্রার্থনা করিলে মন্দ হয় না। এমন সময় মাষ্টার মহাশয় নিজেই সে কথা পাড়িলেন।

বলিলেন, "কিছু যদি মনে না করেন একটা কথা বলি। আজকের রাতটার মত আমার ওখানে যদি কাটিয়ে দেন, কাল সকালে আমিই পথ দেখিয়ে দিয়ে আসতে পারি।"

সানন্দে তাঁহার প্রস্তাবে যে রাজি হইলাম এ কথা বলাই বাহুল্য।

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন, "আফিসের একটু ডিউটি আছে, সেরে নিতে হবে। একটু অপেক্ষা করুন।"

ডিউটি দেখিলাম মাষ্টার মহাশয়ের অনেক। আমাদের চারখানি টিকিট একটি টিনের বাক্সে রাখিয়া টুপিটি একটি টেবিলের উপর তুলিয়া রাখিলেন, তাহার পর ষ্টেশনের লাল নীল কাঁচ দেওয়া বাতিটি তুলিয়া লইয়া বলিলেন, "চলুন।"

শরৎ বলিল, "আপনার ডিউটি হয়ে গেল মাষ্টার মশাই?"

মাষ্টার মশাই বলিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, এখন আটটার ট্রেণটা পাশ করিয়ে দিলেই ছুটি।"

বলিলাম, "আফিসের ঘরে তালাটালা দেবেন না?"

মাষ্টার মহাশয় বিস্মিত হইয়া বলিলেন---"না, তালা দেব কেন?"

ষ্টেশনটির পদমর্য্যাদা সম্বন্ধে যেটুকু সন্দেহ ছিল তাঁহার বিস্ময় দেখিয়া তাহাও ঘুচিয়া গেল। বলিলাম---"না, এমনি বলছিলাম।"

মাষ্টার মহাশয় আগে আগে বাতি লইয়া যাইতেছিলেন। বলিলেন, "আর তালা থাকলে ত দেব মশাই। কেষ্টা ব্যাটা কবে সেটা সরিয়ে ফেলেছে জানিও না।"

ষ্টেশন হইতে কিছু দূরেই মাঠের মাঝখানে মাষ্টার মহাশয়ের কোয়ার্টার। ষ্টেশন যেমনই হউক কোয়ার্টার মন্দ নয়। ইটের দু কামরা বাড়ী। পাশে একটি রান্নাঘর। সামনে একটি ইঁদারা।

ষ্টেশনেও যেমন বাড়ীতেও তেমনি, মাষ্টার মহাশয়ের তালা কোথাও নাই। বাহির হইতে ঠেলিতেই দরজাটা খুলিয়া গেল, মাষ্টার মহাশয় ভিতরে ঢুকিয়া বলিলেন, "যা ভেবেছি তাই, কেষ্টা ব্যাটা উনুনে আগুন টাগুন না দিয়েই পালিয়েছে। এত করে বলি ব্যাটাকে যে, দেখ আর সব পারি ওই উনুনে আগুন টাগুনটা কেমন হয় না। ওইটুকু বাপু করে দিস। তা ফাঁকি দিতে পারলে ব্যাটা আর কিছু চায় না।"

অপরিচিত কেষ্টার নব নব পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইতেছিলাম। মনিবের দুর্ব্বলতাগুলি সে ভাল করিয়াই চিনিয়া ফেলিয়াছে বোঝা গেল।

মাষ্টার মহাশয় রকের উপর উঠিয়া একটা তোলা উনুন দেখাইয়া বলিলেন---"আপনাদের

ভারী কষ্ট পেতে হবে দেখছি। একলা থাকি, আমার যাহোক করে একরকম চলে যায়। কিন্তু আপনাদের নিয়ে এসে এখন কি খেতে দিই বলুন দেখি।"

তাঁহার কাতরতা দেখিয়া আশ্বস্ত করিবার জন্য বলিলাম—"আপনি অত ব্যস্ত হবেন না, আশ্রয় পেয়েছি এই যথেষ্ট। একটা রাত কিছু না খেলে কি আর চলে না।"

বলিলাম বটে, কিন্তু সারাদিনের ট্রেণের ধকলের পর রাত্রে উপবাসের সম্ভাবনায় মন বিশেষ পুলকিত হইয়া উঠিল না। তা ছাড়া আমরা উপবাস করিয়া না হয় থাকিতে পারি কিন্তু সঙ্গী মেয়ে দুটিকে কেমন করিয়া তা বলিয়া অনাহারে রাখা যায়!

মাষ্টার মহাশয় ব্যাকুলভাবে বলিলেন, "না না, না খেয়ে থাকবেন কি? তা কি হয়।"

শরৎ বলিল, "সত্য কথাই ত বাপু। না খেয়ে থাকতে টাকতে পারব না! দিন মাষ্টার মশাই, আপনার কয়লা টয়লা কোথায় আছে দেখিয়ে দিন। আমিই উনুন ধরাচ্ছি।"

মাষ্টার মশাই অসীম সাগরের মাঝে যেন কূল দেখিতে পাইয়া এক গাল হাসিয়া বলিলেন, "পারেন না কি আপনি, উনুন ধরাতে পারেন?"

তাঁহার প্রশংসমান দৃষ্টি দেখিয়া মনে হইল, এত বড় কীর্ত্তি সাধারণ মানুষের দ্বারা সম্ভব একথা তাঁহার কল্পনায় আসে নাই।

শরতের সম্মানে ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া বলিলাম, "শরৎ পারে বটে উনুন ধরাতে, কিন্তু যেদিন শরতের উনুন ধরে সেদিন আর রান্নার সময় থাকে না এই যা দোষ।"

আমার দিকে অবজ্ঞার দৃষ্টি হানিয়া শরৎ বাহির হইয়া গেল।

দুটি ঘরের একটিতে মেয়ে দুটিকে বসিতে দিয়া অন্যটিতে আমরা আশ্রয় লইয়াছিলাম।

এটি মাষ্টার মহাশয়ের ভাঁড়ার ঘর বলিয়াই মনে হইল। একটা ভাঙ্গা তক্তপোষের উপর কতকগুলি টিন সাজান। আরেক ধারে মেঝের উপর কিছু আলু ও অন্যান্য তরিতরকারী ছড়ান। ঘরের একদিকে কুটনার খোসা কতদিন ধরিয়া যে জড় হইয়া আছে বলা যায় না। মাষ্টার মহাশয় আর সেগুলি পরিষ্কার করিবার ফুরসৎ বোধ হয় পান নাই। তক্তপোষের তলায় খানিকটা তেল কবে বোধ হয় পড়িয়াছিল, আজও তাহা সাফ করা হয় নাই,—ধূলায় জঞ্জালে মেজেটা কালো হইয়া আছে। মাষ্টার মহাশয়ের গৃহস্থালীর শুধু নয়, তাঁহার চরিত্রেরও সম্পূর্ণ পরিচয় এই ঘরটি দেখিলেই পাওয়া যায়।

অনেকক্ষণ ঘরে বসিয়া থাকিবার পর শরৎ ও মাষ্টার মহাশয়ের আর কোন সাড়া শব্দ না পাইয়া তাঁহারা কতদূর কি করিলেন দেখিতে বাহির হইলাম। কিন্তু বাহির হইয়াই যে দৃশ্য চোখে পড়িল তাহাতে হাস্য সম্বরণ করা কঠিন।

মাষ্টার মহাশয় উবু হইয়া বসিয়া চোখ মুখ রাঙাইয়া উনানে ফুঁ দিতেছেন, শরৎ উপর হইতে সবেগে উনুনের উপর পাখা নাড়িতেছে। কিন্তু আগুন ধরা দূরে থাক একটু ধোঁয়া দিয়াও তাঁহাদের পরিশ্রম সার্থক করিবার ইচ্ছা উনুনটির আছে বলিয়া মনে হইল না।

শরৎ আমাকে দেখিতে পায় নাই। বলিল, "আরেকটু তেল ঢেলে দিই; কি বলেন মাষ্টার মশাই?"

মাষ্টার মশাই হতাশভাবে বলিলেন, "আর আছে কি তেল?"

বুঝিলাম, ইতিমধ্যে কেরোসিন তেল ঢালা সম্বন্ধে শরৎ কোনো প্রকার কৃপণতা করে নাই।

বলিল, "আছে সামান্য একটু।"

মাষ্টার মশাইএর শরতের ক্ষমতার সম্বন্ধে বিশ্বাস অনেকটা ক্ষয় পাইয়াছে মনে হইল। বলিলেন, "কিন্তু তাতেও যদি না ধরে?"

শরৎ হয়রান হইয়া গিয়াছিল। রাগের স্বরে বলিল, "তাহলে এ উনুন ভেঙে ফেলাই ভাল।"

তাহাদের কথায় হাসিয়া উঠিলাম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একটি সুমধুর হাসির শব্দে চমকিত হইয়া চুপ করিয়া দেখিলাম, মুখের ঘোমটা ঈষৎ সরাইয়া আমাদের আশ্রিতা মেয়ে দুটির একজন নিকটে

আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। মুখে কাপড় গুঁজিয়া কোনো রকমে হাসি থামাইয়া সে মৃদুকণ্ঠে বলিল---"আপনারা সরুন।"

শরৎ লজ্জিত হইয়া সরিয়া দাঁড়াইল। মাষ্টার মহাশয় শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়া পড়িলেন। মেয়েটি মৃদুস্বরে আবার বলিল, "কেরাসিন তেল আর একটু আছে না বলছিলেন। কই?"

তাহার সমস্ত কীর্ত্তিই মেয়ে দুটি দেখিয়াছে ও সব কথা শুনিয়া মনে মনে নিশ্চয়ই হাসিয়াছে বুঝিয়া শরতের যে অবস্থা হইল তাহা বর্ণনা করা শক্ত। লজ্জায় লাল হইয়া সে কেরোসিন তেলের বোতলটা আগাইয়া দিল।

তাহার পর কয়েক মিনিট নিঃশব্দেই কাটিল। যে দুরূহ কাজ সমাধা করিতে গিয়া তাঁহাদের অমন নাজেহাল হইতে হইয়াছে, ভোজবাজির মত মেয়েটি তাহাই কি করিয়া কয়েক মিনিটের মধ্যে সমাধা করে মাষ্টার মহাশয় বোধ হয় তাহাই দেখিতেছিলেন। আমি অবাক হইয়া ভাবিতেছিলাম, উনুন ধরাইবার সমস্যার এই সোজা মীমাংসাটা আমাদের কাহারও মাথায় এতক্ষণ আসে নাই কেন? মেয়ে দুটিকে রক্ষা করিতে আমরা এতই ব্যস্ত ছিলাম যে, বিপন্ন অবলা ছাড়া তাহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব যে থাকিতে পারে এ কথা মনেই হয় নাই।

কিন্তু দোষ আমাদের সম্পূর্ণ নয়। এই দুই দিন তাহাদের মুখের ঘোমটা ছাড়া আর কিছুই দেখিবার সুযোগ তাহারা দেয় নাই। তাহারা নন্দ পালের ভাইঝি এই সাধারণ পরিচয়টুকুই পাইয়াছিলাম---তাহাদের সম্বন্ধে আর কিছুই জানি নাই। জানিবার সুযোগও তাহারা দেয় নাই।

বিশেষ করিয়া সেই জন্যই চোখে পড়িল আমাদের সাহায্যে আসিয়া মুখে চোখে কৌতুকের আভাষ যে মেয়েটি এখনও সম্পূর্ণ দূর করিতে পারে নাই, বয়স তাহার নিতান্তই অল্প---শুধু তাই নয়, রূপও তাহার অসাধারণ।

ইহার পর উনুন ধরিতে বিলম্ব হইল না।

মাষ্টার মহাশয় উল্লসিত হইয়া বলিলেন, "মা লক্ষ্মীরা না হলে কি এসব হয়! আমরা না হয় পারি না কিন্তু কই কেষ্টা ব্যাটাও ত আধবোতল তেল না ঢেলে ধরাতে কোন দিন পারল না।"

শরৎ বলিল, "আপনার কেষ্টার নাম আর করবেন না মাষ্টার মশাই। এখনও তাকে চোখে দেখিনি কিন্তু আপনার মুখে তার বাঁশী শুনেই তাকে দেখবার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছি।"

মাষ্টার মশাই কি বুঝিলেন জানি না কিন্তু কেষ্টার প্রতি পাছে কোন অবিচার আমরা করিয়া ফেলি সেই ভয়েই বোধ হয় তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "না না; কেষ্টা লোক ভালো, বুঝেছেন কি না একটু শুধু খামখেয়ালী। স্থির হয়ে দুদণ্ড এক জায়গায় থাকতে পারে না।"

কেষ্টার প্রতি মাষ্টার মহাশয়ের যেরকম দুর্ব্বলতা আছে তাহাতে আরম্ভ হইলে তাহার কথা হয়ত আর ফুরাইতে চাহিবে না বুঝিয়া কথাটা পাল্টাইয়া দিলাম।

শরৎ জিনিষপত্র আগাইয়া দিয়া মেয়ে দুটিকে সাহায্য করিবার চেষ্টা করিতেছিল। বলিলাম, "শরৎকে সময় থাকতে বারণ করুন মাষ্টার মশাই, উনুন ধরাতে গিয়ে একবার কেরাসিন তেলের শ্রাদ্ধ করেছে, তারপর এখনও যদি ওর উৎসাহ না দমিয়ে দেওয়া যায় তাহলে খাওয়া দাওয়া আজ আর ভাগ্যে কারো নেই।"

মাষ্টার মহাশয় দেখিলাম শরতের উপর একেবারে আস্থা হারাইয়াছেন। তৎক্ষণাৎ আমার কথায় সায় দিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, "না না শরৎবাবু, দরকার নেই। ওঁদের একটু কষ্ট হবে বুঝছি, কিন্তু যা পারি না তা করতে গিয়ে ওঁদের কষ্ট বাড়িয়ে লাভ নেই।"

অগত্যা শরৎকে সাহায্য করার দুশ্চেষ্টা ছাড়িয়া চলিয়া আসিতেই হইল।

মেয়ে দুটি দেখিলাম হাসিতেছে।

সত্যই এই অসুবিধার ভিতর আহারটা যে এত ভাল করিয়া জুটিবে আশা করি নাই।

মেয়ে দুটি নিজেরাই সব ভার লইয়া রান্নার আয়োজন করিতেছিল। মুখে ঈষৎ ঘোমটা থাকিলেও সঙ্কোচ তাহাদের ইতিমধ্যে অনেকটা

কাটিয়া গিয়াছে। রান্নাঘরে ঢুকিলে মেয়েদের সব কুণ্ঠা বোধ হয় আপনা হইতেই দূর হয়।

মাষ্টার মহাশয়ের ভাঁড়ার হইতে চাল জুটিল, ডাল মিলিল, তরিতরকারীরও অভাব হইল না। তিনি তথাপি অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া বলিলেন---"আপনাদের ভারী কষ্ট হবে বোধ হয়। নূন তেল আছে কিন্তু আর কোন মশলা পাওয়া যাবে না।" কিন্তু তাঁহার আশঙ্কা বৃথা।

মাষ্টার মহাশয়ের আশঙ্কার উত্তরে ছোট মেয়েটি মৃদুস্বরে বলিল---"না, মশলা আছে ত।"

মাষ্টার মহাশয় অবাক হইয়া বলিলেন, "অ্যাঁ আছে নাকি? কে জানে বাপু, আমি ত কোন দিন পাই না।"

আমরা হাসিয়া উঠিলাম।

খাইবার সময় দেখা গেল শুধু মশলা নয়, মাষ্টার মশায়ের ভাঁড়ারের আরো অনেক জিনিষেরই খবর তিনি জানেন না। আমরা ত অবাক হইবই, মাষ্টার মহাশয় নিজেই তাঁহার ঐ সামান্য ভাঁড়ার হইতে এ রকম উপাদেয় ভোজের উপকরণ সংগ্রহ হইতে পারে কি করিয়া তাহা ভাবিয়া পাইলেন না।

মেয়ে দুইটির নাম ইতিমধ্যে জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি জানিয়া লইয়াছেন এবং তাঁহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া ও ব্যবহার দেখিয়া তিনি যে তাহাদের বহু দিনের পরিচিত অত্যন্ত নিকট আত্মীয় নন, একথা বলা কঠিন।

খাওয়া তখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। আমাদের পাতের কাছে অম্বলের বাটি নামাইয়া দিয়া ছোট মেয়েটি চলিয়া যাইতেছিল। মাষ্টার মশাই তাহাকে ফিরিয়া ডাকিয়া বলিলেন, "কিন্তু এবার ত আমায় ফাঁকি দিলে চলবে না মা কমলা। এ অম্বলের তেঁতুল নিশ্চয়ই তোমাদের সঙ্গে ছিল।"

কমলা আধ ঘোমটার ভিতর হইতে ঈষৎ হাসিয়া মৃদুস্বরে বলিল---"না, আমরা তেঁতুল কোথায় পাব?"

"তবে কি তোমরা বলতে চাও, তেঁতুলও আমার ভাঁড়ারে ছিল, আর কাল সারা সকাল অম্বল খাব বলে আমি কেষ্টাকে তেঁতুল পেড়ে আনবার জন্যে সেধে হয়রাণ হয়েছি।"

কমলা বলিল, "আপনি কোথায় খুঁজেছিলেন?"

"কেন ভাঁড়ার ঘরে।"

"তেঁতুল আপনার শোবার ঘরে ছিল যে" বলিয়া কমলা চলিয়া গেল। মাষ্টার মশাইএর মুখের ভাব দেখিয়া আমরা হাসিয়া উঠিলাম। তিনি এবার সত্যিই আকাশ হইতে পড়িয়াছেন।

খাওয়া দাওয়ার পর ঘরে বসিয়া খানিকটা গল্প হইতেছিল। আহারের আয়োজন ও পরিবেশনের ভিতর দিয়া মেয়ে দুইটির সঙ্কোচ অনেকটা দূর হইয়া গিয়াছে। মাষ্টার মহাশয়ের উপস্থিতিতেই তাহারা বোধ হয় বেশী করিয়া স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতেছিল। তাহারাও তখন নিকটে আসিয়া বসিয়াছে।

মাষ্টার মহাশয় হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজপুরে আপনারা যাচেছন কার বাড়ী?"

এতক্ষণের পর একথা জিজ্ঞাসা করা মাষ্টার মহাশয়েরই শোভা পায়। কাহাব বাড়ী যাইতেছি তাঁহাকে জানাইলাম।

নন্দ পালের নাম শুনিয়া মাষ্টার মহাশয় যেন একেবারে গলিয়া গেলেন। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিলেন---"বড় ভালো লোক মশাই। গ্রামের এমন হিতৈষী লোক এ অঞ্চলে আর নেই।"

মাষ্টার মহাশয়ের কথায় বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম---"কি রকম?"

"যাকে দশজনের একজন বলে, আবার কি রকম? গাঁয়ে দু দুটো পুকুর প্রতিষ্ঠা করেছে, ক্রিয়া-কর্ম্মে পাল-পার্ব্বণে গাঁয়ের অনাথ-আতুরদের দুহাতে সাহায্য করে।"

মাষ্টার মহাশয় নন্দ পালের যে পরিচয় দিলেন তাহাতে সত্যই ভীত হইয়া উঠিতেছিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম--"তা হলে ক্ষমতাবান লোক বলুন?"

"ক্ষমতাবান নয় আবার। তেজারতিতে অমন দশ হাজার টাকা খাটছে, জমি জমা পুকুর বাগিচা কত যে তার লেখাজোখা নাই।"

নন্দ পালের কাছে তাহার দুই বিধবা ভ্রাতুষ্পুত্রীর সামান্য সম্পত্তির মূল্য যে কেন বেশী এবার বুঝিতে পারিলাম। আরও বুঝিলাম, মেয়ে দুইটিকে তাহাদের স্নেহময় খুল্লতাতের গৃহে ফিরাইয়া দেওয়াটা তেমন সহজ হইবে না।

পরদিন সকালে মাষ্টার মহাশয় আমাদের পৌঁছাইয়া দিলেন। পথ সত্যই এমন কিছু জটিল নয়। দিনের বেলা লোকজনকে জিজ্ঞাসা করিয়া কোনরকমে হয়ত নিজেরাই যাইতে পারিতাম তবে রাত্রে হয়ত কিছু অসুবিধা হইতে পারিত।

নন্দ পাল যে গ্রামের ক্ষমতাবান লোক তাহা তাঁহার বাড়ীঘরের জাঁক-জমক দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম। অজ পাড়াগাঁয়ে এমন আশ্চর্য্য দেখিব আশা করি নাই। খড়ের ও টিনের ছাউনি দেওয়া গ্রামের মাঝে তাঁহার সুবৃহৎ অট্টালিকা ইষ্টক-গৌরবে সগর্ব্বে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে।

নন্দ পাল বৈষ্ণব ধর্ম্মকে অনুগৃহীত করিয়াছেন। প্রকাণ্ড দুমহলা বাড়ীর অন্দর মহলের তুলনায় বাহিরের মহল অনেক বড়। বাঁধান আঙিনা ঘিরিয়া প্রকাণ্ড নাটমন্দির, একধারে শ্রীকৃষ্ণজিউএর মন্দির।

আমরা যে আসিতেছি সে খবর কেমন করিয়া বলা যায় না, আমাদের আগেই নন্দ পালের নিকট পৌঁছাইয়া গিয়াছে দেখা গেল। বাড়ীর কাছ বরাবর না পৌঁছিতেই দুজন ফোঁটা চন্দন তিলকে সুশোভিত বৈষ্ণব আমাদের অভ্যর্থনা করিতে আসিলেন। বৈষ্ণব ধর্ম্মের আর গুণের চর্চ্চা না করিলেও বিনয়ে তাঁহারা তৃণাদপি সুনীচেন।

"আমাদের কি সৌভাগ্য। আপনারা কষ্ট করে আমাদের গ্রামে এসেছেন" বলিতে বলিতে তাঁহারা সোজা সরল পথ দেখাইয়া আমাদের লইয়া চলিলেন।

এতখানি খাতির প্রথমেই কেমন একটু আশ্চর্য্য বোধ হইতেছিল।

বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম আমাদের অভ্যর্থনার আয়োজন বড় কম হয় নাই। স্বয়ং নন্দ পাল—তাঁহার মাথার টাক, স্থূল তৈল-মসৃণ বপু ও হাতের স্বর্ণকবচ দেখিয়াই চিনিয়াছিলাম—আমাদের গলবস্ত্র হইয়া স্বাগত সম্ভাষণ করিতে আসিলেন।

সামনেই সুবৃহৎ ঘরে ফরাস পাতা হইয়াছে। রূপা বাঁধান আলবোলা ও জরীর কাজ করা ভেলভেটের তাকিয়া তাহার উপর সাজান। দেখিয়া শুনিয়া একটু বিস্মিতই হইতেছিলাম। আমাদের অভ্যর্থনার এমন আয়োজন ইহারা এত অল্প সময়ের মধ্যে করিল কি করিয়া। এই অজ পাড়াগাঁয়ে অতিথিদের আবার নিত্যই এমন ব্যবস্থা থাকে একথাও যুক্তিসঙ্গত নয়।

কিন্তু এ সমস্যার অচিরেই মীমাংসা হইয়া গেল। গলায় কণ্ঠি দেওয়া আমাদের গোঁসাইজিকে চকিতে একটি থামের আড়ালে দেখিয়া ফেলিলাম। বুঝিলাম, তিনিই আমাদের পূর্ব্বে দেশে আসিয়া আমাদের আগমনী সংবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন।

নন্দ পাল করযোড়ে তাঁহার চতুর্দ্দশ পুরুষকে বাধিত করিবার জন্য আমাদের ফরাসের উপর আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন।

শরৎ আমার কাণে কাণে বলিল—"ওরে এমন জানলে মেস্‌শুদ্ধ যে এগিয়ে দিতে আসতাম রে! বসবার ব্যবস্থাই যে রকম, আহারেরটা তদনুপাতে হলে নেহাৎ মন্দ হবে না।"

আমি ফরাসের উপর তাকিয়া ঠেসান দিয়া বসিয়া বলিলাম—"এতটা বাড়াবাড়ি কিন্তু তেমন ভাল ঠেকছে না।"

শরৎ চটিয়া গিয়া বলিল, "তোর সন্দিগ্ধ মন। তোর কিছুতেই উদ্ধার নেই--"

কিন্তু কথা তার শেষ করিতে হইল না। এত আপ্যায়নের ভিতরে কোথায় যে গলদ আছে তাহার আভাষ সেই মুহূর্ত্তেই পাওয়া গেল।

নন্দ পালের ভাইঝি দুজন আমাদের সহিত কতদূর আসিয়া এইবার অন্দর মহলের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। নন্দ পাল তাহাদের ডাকিয়া বলিতেছেন শুনিলাম—"পাগলী বেটিরা এর মধ্যেই ঘরে ঢুকছিস্ কিরে। বাবুরা কষ্ট করে সঙ্গে করে নিয়ে এল, তাদের পেন্নাম করে যা।"

নন্দ পালের গলার স্বরে স্নেহ ও প্রীতি উছলিয়া পড়িতেছে।

মেয়ে দুইটি লজ্জিত হইয়া ফিরিল এবং আমাদের কাছে আসিয়া মাষ্টার মশাই ও আমাদের দুইজনকে প্রণাম করিল।

কিন্তু এবারেও তাহাদের ভিতরে যাওয়া হইল না। প্রণাম করিয়া উঠিতেই নন্দ পাল হাসিয়া বলিল, "আরে অত ব্যস্ত কেন। বোস্ বোস্ এইখানে বোস্। বাবুদের কাছে সব কথা শুনি। ভেবে ভেবে ত কদিন ধরে সারা হচ্ছি।"

নন্দ পালের মুখ দেখিয়া কিছু বুঝিবার যো নেই, কিন্তু বুকটা আমার কেমন ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। মোয়ালেম কোন শয়তানীর চাল সে যে চালিতেছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ আর আমার মনে ছিল না।

মাষ্টার মশাই সরল হৃদয় লোক। নন্দ পালের কথায় এক গাল হাসিয়া বলিলেন---"তোমার ভাইঝি দুটি কিন্তু বেশ মেয়ে ভায়া। কাল আমায় যা রান্না করে খাইয়েছে কি আর বলব তোমায়।"

তাহার পর মেয়ে দুইটির দিকে ফিরিয়া বলিলেন---"কিন্তু কাকার বাড়ী এসে বুড়োকে ভুলে গেলে চলবে না। অরুচি হলেই এখানে এসে পাত পাতব আগে থাকতে বলে রাখছি।" মেয়ে দুইটি লজ্জিতভাবে মাথা নীচু করিল।

নন্দ পাল এইবার ফরাশের পাশে মেঝের উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল---"তারপর ব্যাপার কি বলত মাষ্টার? তোমায় এঁদের সঙ্গে দেখব তা ত আশা করিনি।"

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন---"ভয় নেই ভাই---ভয় নেই, আজই পাত পাতব না।" নিজের কথায় নিজেই হাসিয়া মাৎ করিয়া মাষ্টার মহাশয় আবার বলিলেন---"আমি সঙ্গে না থাকলে কি আর ভাইঝিদের আজ পেতে? ওঁরা ত আর পথ চেনেন না।"

নন্দ পাল একটু কাশিয়া মুখে গভীর বেদনার ছায়া আনিয়া বলিল---"কদিন ধরে কি ভাবনায় যে দিন কাটছে কি বলব মাষ্টার---আহার নিদ্রে একরকম ত ত্যাগই করেছি। ভাবি মেয়ে দুটো কখন কোথায় যায় না, যেতে দিইও না। শেষে কালীঘাটে গঙ্গা নাইতে গিয়ে কি ফ্যাসাদ হল রে বাপ্। কদিন ধরে পাত্তাই নেই। আবার গাঁয়ের লোক সব কি রকম জান ত মাষ্টার? একটু খুঁৎ পেলেই হল।"

এবার শরৎ আমার দিকে উদ্বিগ্নভাবে চাহিয়া ইসারা করিল। বুঝিলাম সন্দেহ আমার একার হয় নাই।

কিন্তু মাষ্টার মহাশয়ের জলের মত পরিষ্কার মনে দাগ পড়ে না। তিনি নন্দ পালের কথায় প্যাঁচের বিন্দুবিসর্গও না বুঝিয়া বলিলেন---"যাই হোক ভায়া পেয়েছে ত এইবার। এখন ত ভাবনা চুকেছে। বেটীদের ভেতরে যেতে বল। তোমারও কদিন ভাল করে খাওয়া শোওয়া হয়নি যখন এবার একটু সুস্থ হবার চেষ্টা কর।"

নন্দ পাল ম্লান হাসিয়া বলিল---"না দাদা, এখন সুস্থ হই কি করে! সুস্থ হতে কি দেয়? ওই বেটা নচ্ছার গোঁসাই এসে এমন খবর দিলে যে, মাথা একেবারে ঘুরে গেল। থানা পুলিশ করব না নিজে কলকেতা যাব ভেবে কূল পাইনে।"

এত ভনিতায় একটু বিস্মিত হইয়া মাষ্টার বলিলেন---"কি অত বকছ নন্দ? ভাইঝিদের ভাবনায় সত্যিই তোমার মাথা খারাপ হ'ল নাকি?"

"আর বাকী কি দাদা! আমার অবস্থায় পড়লে তোমরাও মাথা খারাপ হত। কি কাণ্ডটি গাঁয়ে বেধেছে তার খোঁজ রাখ?"

মেয়ে দুইটিও এতক্ষণ বাদে কোথা হইতে যেন বিপদের আভাষ পাইয়া চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু মাষ্টার মহাশয়ের তথাপি সাড়া নাই। তিনি সরল বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন---"কি হয়েছে কি!"

নন্দ পাল মাথায় হাত দিয়া বলিল, "হয়েছে আমার সর্ব্বনাশের যোগাড়। যাদের ভালর জন্যে দিনরাত ভেবে মরি তারাই সুবিধে পেলে গলায় পা তুলে দেয়, জানো মাষ্টার!"

গভীর দার্শনিকতার সহিত মাষ্টার মহাশয় একথায় সায় দিয়া বলিলেন---"তা মিথ্যে বল নি দাদা---সে জন্যেই কারুর ভালো করতে নেই।"

দুঃখের ভিতরেও মাষ্টারের কথায় হাসিয়া ফেলিলাম।

নন্দ পালের ভূমিকা এইবার বোধ হয় শেষ হইয়াছিল। সহসা আসল কথায় আসিয়া সে বলিল—"ঐ বেটা নচ্ছার গোঁসাই এসে কি গাঁয়ে রটিয়েছে জান মাষ্টার ?"

মাষ্টার মহাশয় জিজ্ঞাসু নেত্রে চাহিয়া রহিলেন বটে, কিন্তু গোঁসাই যাহাই রটাক না কেন তাহাতে বিশেষ কিছু আসে যায় বলিয়া তিনি মনে করেন ইহা তাঁহার মুখ দেখিয়া বোধ হইল না।

নন্দ পাল ব্যথিত কণ্ঠে বলিল, "আমি কারু মন্দ কখন করিনি, শ্যামসুন্দর জানেন—আর আমার ঘরেই আগুন দেবার চেষ্টা!"

মাষ্টার চমকাইয়া বলিলেন—"কবে আগুন দিলে ? কোন্ ঘরে ?"

নন্দ পাল মাষ্টারের মূঢ়তায় এবার একটু বিরক্তিই প্রকাশ করিয়া ফেলিয়া বলিল—"ঘরে আগুন দিলে যে এর চেয়ে ভাল ছিল মাষ্টার ! এরা যে তার চেয়ে সর্ব্বনাশ করতে চায়, এরা—আমার বংশে কলঙ্ক দিতে চায়। গোঁসাইকে সঙ্গে দিয়ে গঙ্গা নাইতে পাঠিয়ে দিলাম, গোঁসাই এসে খবর দিলে—'তারা আসে নি।'

'আসেনি কিরে ?'

বলে, 'আজ্ঞে তাদের খুঁজে পেলাম না।'

রেগে উঠে শুধোলাম—'তোদের সঙ্গে পাঠালাম, আর তোরা খুঁজে পেলি না কি রকম ?'

তাতে বলে কিনা—'চোখে চোখে ত সারাক্ষণ রেখেছিলাম, খেলনা কেনবার ছুতোয় কোথায় যে গেল আর পেলাম না!'—"

অনেকক্ষণ ধরিয়াই উদ্বেগ জমা হইতেছিল। মেয়ে দুইটি এবার সকলের সামনেই আকুলভাবে কাঁদিয়া ফেলিয়া কাকার পা ধরিয়া বলিল—"এসব কথা যে মিথ্যে কাকাবাবু, তোমার পা ছুঁয়ে বলছি কাকাবাবু—"

নন্দ পাল তাড়াতাড়ি পা সরাইয়া লইয়া বলিল—"আরে পাগলীরা, আমি কি তোদের অবিশ্বাস করছি নাকি। আচ্ছা বোকা মেয়ে ত সব।"

আমরা দু'জনে এই অবস্থায় কাঠ হইয়া বসিয়াছিলাম। সমস্ত ব্যাপার বুঝিলেও আমাদের করিবার কিছুই নাই। নন্দ পাল পাকা খেলোয়াড়ের মত সমস্ত আটঘাট বাঁধিয়া মাঙের চাল চালিয়াছে।

মাষ্টার মহাশয় কান্নাকাটি দেখিয়া প্রথমটা একটু স্তম্ভিত হইয়া গেলেও সামলাইয়া লইয়া নন্দ পালের কথায় সায় দিয়া বলিলেন—"বোকা না বোকা! তোদের নামে কে কোথায় কি লাগালে আর তাই সত্যি হয়ে গেল নাকি! যা বেটীরা ভেতরে যা।"

মাষ্টার মহাশয়ের উপর এবার বোধ হয় নন্দ পাল রীতিমত চটিয়া উঠিয়াছিল। আমাদের আশা হইতেছিল এই লোকটার অসামান্য সরলতাতেই যদি নন্দ পালের চাল বিফল হইয়া যায়।

কিন্তু পালের ঘুঁটি ঠিকই আছে।

হঠাৎ কোথা হইতে আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত গোঁসাই ও শীর্ণ বিশে রঙ্গমঞ্চে দেখা দিল।

মেয়ে দুইটিকে দেখিয়া তাহাদের বিস্ময়ের যেন আর অবধি নাই।

গোঁসাই দুই ভাঁটার মত চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল, "ওমা, এই যে এসে হাজির হয়েছে! আচ্ছা মেয়ে ত তোরা যা হোক। খেলনা কেনবার নাম করে কোথায় যে সরে পড়লি আর দেখা নেই।"

মেয়ে দুইটি অসহায়ভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে শুধু বলিল, "কি বলছ, গোঁসাই কাকা!"

বিশে গোঁসাইএর এক ধাপ উপরে যায়। খেঁকাইয়া উঠিয়া সে বলিল—"কি বলছি মানে ? নন্দ পালের ভাইঝি বলে কিছু রেখে ঢেকে কথা বলব তা ভেবো না, আমাদের স্পষ্ট কথা। চুপ করে কোথায় সরেছিলে বল ত ?"

হঠাৎ একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল। শরৎ অনেকক্ষণ হইতে রাগে ফুলিতেছিল দেখিতেছিলাম। হঠাৎ আর সহ্য করিতে না পারিয়া আসন হইতে উঠিয়া সজোরে বিশের গালে এক প্রচণ্ড চপেটাঘাত করিয়া সে বলিল—"মুখ সামলে কথা ক, শয়তান! বদমায়েসীর আর জায়গা পাস্‌নি।"

বিশে প্রথমটা হকচকাইয়া গিয়াছিল।

নন্দ পালও ব্যাপারটার এ পরিণতি বোধ হয় আশা করে নাই। কিন্তু তাহার ধৈর্য্য অসীম। একটু থামিয়া সে গম্ভীর স্বরে বলিল—"বেশ

করেছেন মশাই, বেশ করেছেন! আমার বাড়ীতে বসে আমায় অপমান!"

তাহার এ চাল প্রথমটা আমাকেও হতবুদ্ধি করিয়া দিয়াছিল। নিজে উঠিয়া বিশেকে সে যখন ঘাড় ধরিয়া বাহির করিয়া দিল তখন বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। এইবার সন্দেহ হইল এতক্ষণ ধরিয়া তাহাকে কি সত্যই ভুল বুঝিয়াছি। মাষ্টার মহাশয়এর কথাটাই কি তাহা হইলে ঠিক!

কিন্তু এ সন্দেহ দোলায় বেশীক্ষণ দুলিতে হইল না। ঘাড় ধরিয়া বাহির করিয়া দেওয়া সত্ত্বেও খানিক বাদে বিশু, গোঁসাই ও আরও কয়েকজনকে সঙ্গে লইয়া আবার হাজির হইল। এবার তাহারা রণবেশেই আসিয়াছে।

সামান্য দুইটি অসহায় মেয়ের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য যে গভীর চক্রান্ত ইহারা করিয়াছে তাহার সে অসাধারণ শয়তানী দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলাম।

বিশুকে ঘাড় ধাক্কা দিয়া বাহির করিয়া আসিবার পর নন্দ পাল অত্যন্ত ধৈর্য্য সহকারে এতক্ষণ আমাদের কাহিনী শুনিয়াছে।

মাষ্টার মহাশয় ব্যাপার দেখিয়া কেমন যেন বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি মাঝে মাঝে সবিস্ময়ে মন্তব্য করিয়াছেন---"ছি ছি, এমন মিথ্যে কথাও মানুষ রটায়! মায়েদের মুখের দিকে বেটারা চাইলে না!"

নন্দ পালের ভাব দেখিয়া মনে হইতেছিল, আমাদের কথা শুনিয়া তাহার সমস্ত সন্দেহ যেন দূর হইয়া গিয়াছে। কিন্তু একথা ভাবিয়া কি ভুলই যে করিয়াছি পরমুহূর্ত্তে বুঝিলাম।

বিশু ও গোঁসাইএর সহিত এবার একটি নূতন লোক আসিয়াছিল। লোকটি বয়সে বৃদ্ধ, মাথার চুল ও মুখের দাড়ির একটিও শাদা নাই। পক্ব কেশ ও শ্মশ্রুতে বৃদ্ধকে অত্যন্ত সৌম্য শান্ত প্রকৃতির বলিয়াই মনে হয় কিন্তু ইহা যে তাহার কত বড় ছদ্মবেশ তাহা প্রকাশ হইতে বিলম্ব হইল না।

বৃদ্ধকে নন্দ পাল যেরকম অভ্যর্থনা করিয়া সম্মানের সহিত আসন দিল তাহাতে বুঝিলাম গ্রামে তাহার প্রতিপত্তি আছে।

বৃদ্ধ আসন গ্রহণ করিয়া আমাদের দিকে চাহিয়া দন্তবিহীন মুখে জিজ্ঞাসা করিলেন---"আপনারা বুঝি বলকেতায়?"

আমি ঘাড় নাড়িলাম।

বৃদ্ধ বলিলেন---"কালেজে পড়েন বুঝি?"

হাসিয়া বলিলাম---"না!"

বৃদ্ধ অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন---"কি করেন তা হলে? চাকরী?"

তাহাও করি না শুনিয়া বৃদ্ধ খানিক বিস্মিত হইয়া চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর আমাদের কথা ছাড়িয়া নন্দ পালকে বলিলেন---"তুমি নাকি বিশুকে বাড়ী থেকে ঘাড় ধাক্কা দিয়েছ নন্দ?"

নন্দ পাল বেশ একটু উষ্মা প্রদর্শন করিয়া বলিল---"তা ত দিয়েইছি---দেব না! ও আমার কত বড় অপমান করেছে জান ঠাকুরদা!"

"কি করেছে ভায়া" এই বলিয়া বৃদ্ধ এইবার আলবোলার নলে মুখ দিলেন।

কিন্তু নন্দ পালকে কিছু বলিতে হইল না। বিশু নিজেই আগাইয়া আসিয়া বলিল---"ন্যায্য কথা বললে অপমান হয়! ওঁর ভাইঝিদের আমরা নিয়ে গেলাম কালীঘাট দেখাতে, আমাদের ফেরার পর আজ দুদিন বাদে ওঁরা কোথা থেকে এলেন জিজ্ঞেস করুন ত।"

শরৎ আবার উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছিল---আমি তাহাকে হাত ধরিয়া বসাইলাম। রাগ আমারও কিছু কম হয় নাই। কিন্তু বুঝিতেছিলাম ইহাদের কার্য্যের মাঝখানে গভীর চক্রান্তের বিরুদ্ধে রাগারাগি করিয়া কিছুই করিতে পারিব না।

নন্দ পাল বিশুর কথায় অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া জবাব দিল---"আর এ ভদ্রলোকেরা কি বলছেন জান?"

বৃদ্ধ হাত তুলিয়া তাহাকে থামাইয়া বলিলেন---"ভদ্রলোকেরা যাই বলুন তোমার ভাইঝিরা বিশুদের সঙ্গে ফিরে আসেনি এটা ত ঠিক?"

নন্দ পাল অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বে যেন একথা স্বীকার করিতে বাধ্য হইল।

বৃদ্ধ বলিলেন---"সমর্থ হিঁদুর ঘরের বিধবা, দুদিন বিদেশে বিভুঁয়ে কোথায় ছিল বাপু?"

নন্দ পাল যেন অত্যন্ত বিব্রত হইয়া বলিল ---"এঁরা ত বল্‌ছেন।"

"এঁরা যাই বলুন---তুমি এঁদের চেন, না বিশু-গোসাইকে চেন?"

নন্দ পাল জবাব দিবার কিছু না পাইয়াই বোধ হয় চুপ করিয়া রহিল।

বৃদ্ধ বলিলেন---"এতকাল গাঁয়ে বাস করছ, বিশু বা গোঁসাই কখন কোন ছোট কাজ করেছে শুনেছ?"

"তা শুনিনি।"

এই পর্য্যন্ত শুনিয়া শরীরের সমস্ত রক্ত রাগে টগবগ করিয়া ফুটিতেছিল। কত বড় একটা সুচিন্তিত ষড়যন্ত্রের ভিতর আমরা যে আসিয়া পড়িয়াছি---কি নিষ্ঠুরভাবে ইহারা ইহাদের পৈশাচিক অভিনয়ের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি যে রচনা করিয়াছে তাহা আর তখন বুঝিতে বাকী নাই। তবু নিরুপায় হইয়া বসিয়া থাকিতে হইল।

বৃদ্ধ নন্দ পালের কথায় নিজের যুক্তির অখণ্ডনীয়তার প্রমাণ পাইয়াই যেন সগর্ব্বে বলিলেন ---"তবে কি হিসেবে তুমি বিশু আর গোঁসাইএর কথা অবিশ্বাস করো। এঁরা কলকেতার ছেলে---হয়ত খুব লেখাপড়া জানা ভালো ছেলে, কিন্তু আমরা ত এঁদের চিনিনে বাপু। আমরা মুখ্যু পাড়াগেঁয়ে মানুষ, আমাদের তুমি কেমন করে বোঝাবে?"

নন্দ পাল গভীর দুঃখে অভিভূত হইয়াই বুঝি চুপ করিয়া রহিল।

বৃদ্ধ এবার হঠাৎ উঠিয়া পড়িয়া বলিলেন---"তুমি গাঁয়ের একজন মাথা---তোমার পয়সা আছে, লোকবল আছে---ইচেছ করলে তুমি যা খুশী করতে পার। ভাইঝিদের তুমি যদি আদর করে ঘরে তুলে নাও তাহলে তোমায় বাধা দেবার কেউ নেই। কিন্তু এই তোমায় বলে রাখছি নন্দ---আমাদের আর এর মধ্যে জড়িও না। এর মধ্যে কেন, আমাদের তাহলে আর কোন কাজেই জড়িও না। তোমার ভাই পয়সা আছে, পয়সার জোরে সব হয়। কিন্তু আমরা গরীব গুর্ব্বো লোক, আমাদের ত সমাজ মেনে চলতে হবে।"

বৃদ্ধ গভীর আত্মবিলোপের সুরে তাহার বক্তৃতা শেষ করিয়া আমাদের একেবারে মুহ্যমান করিয়া চলিয়া গেল।

নন্দ পাল তখনও দুশ্চিন্তা ও বেদনার ভারে মাথা নীচু করিয়া আছে।

মেয়ে দুইটি একবার আমাদের সকলের দিকে হতাশভাবে চাহিয়া কাকার পায়ের উপর পড়িয়া গুমরাইয়া গুমরাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল---"দোহাই ধর্ম্ম---আমরা যে কোন অপরাধ করিনি কাকা।"

আমাদের দুইজনের সমস্ত শরীর যেন অসাড় হইয়া পড়িয়াছে। মেয়ে দুইটির কাতর অসহায় মুখের পানে চাহিয়া এই অন্যায় পৈশাচিক ষড়যন্ত্রে মাথায় যেন আগুন ধরিয়া যাইতেছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও বুঝিতে পারিতেছিলাম, ইহাদের বিস্তৃত নির্ভুল চক্রান্তের বিরুদ্ধে আমাদের সমস্ত চেষ্টা এখন নিষ্ফল। কাপুরুষ অমানুষের দল স্বার্থের প্রয়োজনে সম্মিলিত হইয়াছে। নিজেদের খর্পরের ভিতর ফেলিয়া আমাদের সমস্ত শক্তি ইহারা কাড়িয়া লইয়াছে।

এ সব ক্ষেত্রে একটা মারামারি বাধাইতে পারিলেও শরতের গায়ের ঝাল হয়ত খানিকটা যাইত। আমারও যে সে ইচ্ছা হইতেছিল না এমন কথা বলিতে পারি না। কিন্তু তাহাতে মেয়ে দুটির আরো ক্ষতি ছাড়া লাভ যে কিছুই হইবে না ইহা সেও এখন বুঝিয়াছে মনে হইল।

স্থানুর মত আমরা বসিয়াছিলাম। ইহাদের কুমন্ত্রণার চক্রব্যূহ ভেদ করিবার কোন পথই আমাদের চোখে পড়িতেছিল না।

হঠাৎ চমকিয়া উঠিলাম।

মাষ্টার মহাশয়কে এতক্ষণ লক্ষ্য করি নাই। সত্য কথা বলিতে কি তাঁহার কথা ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। সহসা তাঁহার চেহারা দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। সেই নিরীহ সদাশিব ভালোমানুষটির ভিতর এমন রুদ্র মূর্ত্তি যে লুকাইয়া থাকিতে পারে কে জানিত?

মাষ্টার মহাশয় বজ্রনির্ঘোষে হাঁকিলেন---"নন্দ?"

সে স্বরে নন্দ পালের বেদনা অভিনয়ের নেশা এক মুহূর্ত্তে বুঝি ছুটিয়া গেল।

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন---"তুমি এই সব নচ্ছার ছোটলোকদের কথা বিশ্বাস কর নন্দ?"

নন্দ হাঁ, না কিছুই বলিল না।

কিন্তু মাষ্টার মহাশয় ছাড়িবার পাত্র নন, অসহায়ের উপর অত্যাচারে তাঁহার প্রকৃতি বদলাইয়া গিয়াছে। তিনি আবার একরকম ধমক দিয়াই বলিলেন---"বল বিশ্বাস কর কি না!"

নন্দ পাল একটু আমতা আমতা করিয়া বলিল---"বিশ্বাস না করে কি করি বলুন!"

"কি করি না করির কথা হচ্ছে না! তোমার মন কি বলে, তোমার ধর্ম্ম কি বলে?"

নন্দ পালকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া মাষ্টার মহাশয় আরো উত্তেজিত হইয়া বলিলেন---"তুমি ত তা হলে ভালো লোক নও বাপু! তুমি মুখ দেখে মানুষ চেন না! এই নির্দ্দোষ মেয়ে দুটোর নামে এত বড় কলঙ্ক তুমি অনায়াসে চাপাতে চাচ্ছ?"

নন্দ পাল হতাশভাবে হাত দুটো চিৎ করিয়া বলিল---"আমি কি করব বল! সমাজ মেনে ত আমায় চলতে হবে! মেয়ে দুটো দুদিন কলকেতায় কাটিয়ে না এলে ত এত হ্যাঙ্গাম হ'ত না।"

মাষ্টার মহাশয় রাগের চোটে উঠিয়া পড়িয়া বলিলেন---"তার মানে মেয়ে দুটোকে তুমি ঘরে নেবে না! তুমি অতি পাজী নচ্ছার---বদমাস লোক নন্দ! মেয়ে দুটোকে পথে ভাসাবার জন্য তুমিই ষড়যন্ত্র করেছ---এই আমি সকলের সামনে বলে যাচ্ছি! ছি ছি, নিজের অনাথা বিধবা ভাইঝি, তাদের এমন সর্ব্বনাশ করে!"

নন্দ পাল এবার বোধ হয় সময় বুঝিয়া একটু রুখিয়া বলিল---"যা তা পাগলের মত বোলো না মাষ্টার! আমি ঢের সহ্য করেছি।"

নন্দ পালের তাঁবেদার লোক সেখানে প্রচুর। তাহারাও তখন রুখিয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু মাষ্টার মহাশয়-এর ভ্রূক্ষেপ নাই। সজোরে মেঝের উপর পদাঘাত করিয়া তিনি বলিলেন---"যা তা বলবো না! বটে? এই আমি তোমার ঘরে দাঁড়িয়ে বলে যাচ্ছি, তুমি জোচ্চোর পাজী শয়তান! মেয়ে দুটোর বিষয়ের লোভে তুমি এই চালটি চেলেছ! কিন্তু তা বলে সহজে পার পাবে ভেবো না নন্দ! মেয়ে দুটোকে তুমি ঘরে ঠাঁই নাই দাও আমি নিয়ে যাচ্ছি। তারপর দেখা যাবে ধর্ম্মকে আর আইনকে কি করে তুমি ফাঁকি দাও।"

এই সরল সদাহাস্যময় লোকটির তেজোদৃপ্ত ভঙ্গির সামনে নন্দ পাল মনে যাহাই ভাবুক মুখে কিছুই বলিতে পারিল না।

মাষ্টার মহাশয় মেয়ে দুটিকে ডাকিয়া বলিলেন---"চল মা চল। ও বেটা তোদের কাকা নয়, চামার!"

মেয়ে দুটি কিন্তু তবু'ও একবার কাকার পায়ের কাছে পড়িয়া বলিল---"কাকা গো, আমাদের কি এমনি করে বিদায় করে দেবে?"

নন্দ পালের নিজ মূর্ত্তি প্রকাশে এইবার আর বাধা ছিল না। পাটা সরাইয়া লইয়া দাঁত খিঁচাইয়া উঠিয়া সে বলিল---"কেন! আর কাকাকে কেন? কলকেতায় গিয়ে নতুন সব ইয়ার বন্ধু জুটেছে, এখন তাদের কাছে যাও।"

শরৎ রুখিয়া উঠিতেছিল কিন্তু তাহার আগেই মাষ্টার মহাশয় বজ্রকণ্ঠে বলিলেন---"মুখ সামলে কথা বলো নন্দ, আমাকে আর ঘাঁটিও না!"

নন্দ এবার'ও সে মূর্ত্তির সামনে নীরব হইয়া গেল।

মাষ্টার মহাশয় নিজেই মেয়ে দুটির হাত ধরিয়া তুলিয়া এবার বলিলেন, "চল মা চল---ও বেটা কসাইএর কি মায়া দয়া আছে?"

আপাততঃ মাষ্টার মহাশয়ের সঙ্গে যাওয়া ছাড়া আমরা'ও কোন পথ দেখিতে পাইতেছিলাম না। মাষ্টার মহাশয়ের সঙ্গে আমরা'ও বাহির হইয়া আসিলাম।

মেয়ে দুইটির কিন্তু যাইবার ইচ্ছা দেখা গেল একান্তই নাই। তাহারা বারে বারে ফিরিয়া ফিরিয়া কাকার দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল। এখন'ও তাহাদের বোধ হয় আশা ছিল যে, কাকা তাহাদের ফিরিয়া ডাকিবে।

পথে বাহির হইয়াই মাষ্টার মহাশয়ের অন্য মূর্ত্তি।

হঠাৎ পকেট হইতে পুরাণ রঙচটা একটা ঘড়ি বাহির করিয়া তিনি দৌড়াইতে আরম্ভ করিলেন।

আমরা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম---"ওকি মাষ্টার মশাই?"

তিনি কিন্তু তখন অনেক দূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন।

দূর হইতে তাঁহার গলা শোনা গেল---"সাড়ে এগারটায় মালগাড়ী পাশ করতে হবে। আপনারা ওদের নিয়ে আসুন।"

*

* *

মাষ্টার মহাশয়ের আশ্রয়েই মেয়ে দুটিকে রাখিয়া কলিকাতায় ফিরিব ঠিক করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহা হইল না।

সেই রাত্রেই কেমন করিয়া তাঁহার কোয়ার্টারে যে আগুন লাগিল কে জানে।

টাইলে ছায়া পাকা দেওয়ালের বাড়ী, তবু পুড়িয়া ক্ষতি বড় কম হইল না। রাত্রে অন্ধকারের মধ্যে আগুনের প্রথম আভাষ পাইয়া কোন রকমে দরজা খুলিয়া আমরা বাহিরে বাহির হইয়া প্রাণে বাঁচিলাম বটে কিন্তু জিনিষপত্র অধিকাংশই নষ্ট হইল। ঘরগুলি বাসোপযোগী আর রহিল না।

সকাল বেলা সদানন্দ ষ্টেশন মাষ্টার মহাশয়ের চোখেও জল দেখিলাম। মেয়ে দুইটি তখন কাঁদিতে কাঁদিতে জানাইতেছে যে, তাহাদের পোড়া কপালের জন্য তাঁহার এত বড় ক্ষতি হইয়া গেল। কিন্তু তিনি সে কথা শুনিলেন না। তিনি অনবরত বলিতেছেন--"বুড়ো যে তোদের সামান্য একটু আশ্রয়ও দিতে পারল না মা।"

আমাদের বলিলেন---"এবারে কি করবে ভাই।"

রাত্রে নিরুপায় হইয়া সে কথা আমি ভাবিয়া রাখিয়াছিলাম। মাষ্টার মহাশয়কে সান্ত্বনা দিয়া বলিলাম---"আপনি ভাববেন না।"

তাহার পর নগণ্য এই গ্রামের স্বল্প পরিচিত সামান্য এক ষ্টেশন মাষ্টারের কাছ হইতে বিদায় লইবার সময় সত্যই চোখ জলে ভরিয়া আসিল।

গাড়ী ছাড়িবার সঙ্গে আমাদের জানালা ধরিয়া ছেলেমানুষের মত কাঁদিতে কাঁদিতে মাষ্টার মহাশয় প্লাটফর্ম্মের শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত দৌড়াইলেন।

মেয়ে দুইটি সাশ্রুনেত্রে জানালা হইতে মুখ বাহির করিয়া তাঁহার কাছে বিদায় লইল।

শরৎ এ সমস্ত দুর্ব্বলতার ধার ধারে না বলিয়া বড়াই করে। কিন্তু দেখিলাম, সে উল্টা দিকে কঠিন মুখ ফিরাইয়া বসিয়া আছে। ওদিকে চাহিবার তাহার সাহস নাই।

এই গ্রাম হইতে মানুষের অসাধারণ শয়তানীর পরিচয়ের সঙ্গে এমন একটি লোকের স্মৃতি বহন করিয়া লইয়া যাইব কে জানিত।

মাষ্টার মহাশয়ের সঙ্গে জীবনে দেখা হইবে না। আট হাতি ধুতি পরিয়া খালি গায়ে মাথায় টুপি চড়াইয়া এখনও হয়ত তিনি সেই ছোট ষ্টেশনটিতে ট্রেণ চলাচলের সহায়তা করিতেছেন। সে ষ্টেশন হইতে আর কোন ষ্টেশনে বা এ জীবন হইতে আর কোন জীবনে তিনি বদলি হইয়াছেন সে খোঁজও রাখি নাই। কিন্তু তবু মানুষ সম্বন্ধে অনেক দেখিয়া যখন হতাশা আসে তখন তাঁহার কথা স্মরণ করিয়া একটু সান্ত্বনা পাই।

সামান্য একজন ষ্টেশন মাষ্টারকে লইয়া এতটা বাড়াবাড়ি সকলের ভালো না লাগিতে পারে। কিন্তু তাহারা বোধ হয় ভাগ্যবান্। পৃথিবীতে খাঁটি মানুষের সংখ্যা যে কত কম এ তথ্য জানিবার দুর্ভাগ্য তাহাদের হয় নাই।

*

* *

মেয়ে দুইটিকে লইয়া যে কোথায় রাখিয়া আসিলাম সে কথা বলাই বাহুল্য। তাহাদের পিতৃধন উদ্ধার হয় নাই বটে আজো কিন্তু বিশেষ দু:খে তাহারা নাই।

কোন একটি গ্রামে আত্মীয়ের মাঝে থাকিয়াও নির্ব্বান্ধব অবস্থায় আশাহীন দৃষ্টি লইয়া একটি সুন্দরী মেয়ে স্বামিহীন শ্বশুরঘর করিতেছে। কি যে তাহার মনের কথা তাহা বিধাতাই জানেন, মুখ দেখিয়া তাহা বুঝিবার উপায় নাই।

একদিন শচীন তাহাদের সংসারে নিজেকে ভারস্বরূপ করিয়া রাখিয়াছিল বলিয়া রাগ করিয়াছিলাম, আজ অনায়াসে তাহারই স্কন্ধে অপ্রত্যাশিতভাবে দুইটি অপরিচিতা মেয়েকে চাপাইয়া দিলাম। তাহার তাহাতে এতটুকু বিরক্তি নাই।

তেমনি আগের মত হাসিয়া এক সময়ে জিজ্ঞাসা করিল---"এত শুকিয়ে গেছ কেন গো। আমার জন্যে ভেবে ভেবে নাকি?"

জবাব দিলাম, "সে অধিকার দিলে কই।"

হাসিয়া মনু বলিল---"এই যে বেশ কথা ফুটেছে দেখছি। কার আওতায় এমন হল গো। আমার যে ঈর্ষে হচ্ছে।"

তাহার পর একটু থামিয়া মনু আমায় বলিল, "আবার অ্যাথা অবলা মেয়ে কবে পথে কুড়িয়ে পাবে বল ত?"

অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম---"কেন বল ত?"

"তাহলে এই হতভাগীর ঘাড়ে তাদের চাপাতে ত আসতে হবে!---নইলে কি আর তোমাদের দেখা পাব।"

এবার গম্ভীর হইয়া গেলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম---"তুমি সত্যি আর এখান থেকে যাবে না মনু!"

সে মাথা নাড়িল মাত্র। চোখে তাহার যেন কিসের ছায়া।

বিদায়ের সময় কিন্তু আবার হাসি মুখ। বলিল, "শচীন-দা আমার জন্যে খুব ভাবে, না?"

ক্ষুব্ধস্বরে বলিলাম---"সেটা বোধ হয় তার অন্যায়?"

মনু হাসিয়া বলিল---"আমার জীবনটা ব্যর্থ হয়ে গেল বলে শচীন-দার বড় দুঃখ, কেমন?"

এ কথায় আর কি বলিব। চুপ করিয়া রহিলাম।

মনু বলিল---"শচীন-দাকে একটা কথা বোলো। বোলো যে, মানুষের সব গল্প গোল হয়ে সম্পূর্ণ হয়, কিন্তু বিধাতার গল্পে লাখো আরম্ভ কিন্তু বড় জোর একটি সম্পূর্ণতা। সব খেই সেখানে মেলে না। শচীন-দাকে একবার আসতে বোলো।"

কলিকাতায় ফিরিতে শচীন জিজ্ঞাসা করিল---"বাসন্তীপুরে গেছলি নাকি?"

সমস্ত কথা জানাইয়া বলিলাম---"মনু তোমায় একবার যেতে বলেছে।"

শচীন খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ উৎসাহভরে বলিল, "ওরে তোকে বলতে ভুলেছি। নির্ভীক অফিসের চাকরীটা হয়ে গেছে। আমি তোর হয়েও কদিন কাজ চালিয়ে দিয়েছি। আজ থেকে তোকে যেতে হবে।"

নির্ভীক অফিসের চাকরীই করিতেছি।

প্রতিশোধ

উপন্যাস

কোন এক মধুর সকাল বেলায়, বাংলার কোন একটি গ্রামের প্রান্তে গ্রামের জমিদার-পুত্র বিজয়-নারায়ণ চৌধুরীর বন্দুকের গুলীতে আহত একটি রক্তাক্ত পাখী পাশের গ্রামের একটি মেয়ের গায়ের উপর গিয়ে না পড়লে এ কাহিনীর সূত্রপাত হ'ত না। সব কিছু নিয়ে প্রশ্ন করা যাঁদের অভ্যাস, তাঁরা অবশ্য এ রকম ঘটনা-সমাবেশে আপত্তি তুলতে পারেন। তাঁরা বলতে পারেন যে, রক্তাক্ত পাখীটি ওই মেয়েটির গায়ে ছাড়া আর কি কোথাও পড়বার যায়গা পায়নি? আমরা উত্তরে শুধু বলতে পারি যে, পাখীটি যে কোন জায়গাতেই পড়তে পারতো কিন্তু তা হলে এ কাহিনী অলিখিতই থাক্‌ত। আমাদের নিত্যকার একঘেয়ে জীবনে সহসা একদিন অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটে বলেই অসাধারণ কাহিনীর সূত্রপাত হয়।

ছেলেটির পরিচয় আগেই একটু দেওয়া হয়েছে। সে গ্রামের প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর একমাত্র পুত্র। বহুদিন কলকাতায় থেকে পড়াশুনা করবার পর ছুটীতে এবার গ্রামে এসেছিল কিছুদিন বিশ্রাম করতে। কিন্তু গ্রামের নিস্তরঙ্গ একঘেয়ে জীবনে বিশ্রাম তার কাছে ক্রমশঃ বিস্বাদ হয়ে উঠেছে। সেই জন্যেই বুঝি সকাল বেলা উদ্দেশ্যবিহীনভাবে সে বন্দুক হাতে পাখী শিকারে বেরিয়ে পড়েছিল। কিন্তু পাখী মারতে গিয়ে নিয়তি তাকে দিয়ে অমন অসাধারণ লক্ষ্যভেদ করাবে তা বুঝি তার ছিল স্বপ্নেরও অগোচর। পাখীটি যে মেয়েটির গায়ের উপর গিয়ে পড়ল তাকেও একটু চেনা দরকার। নির্ম্মলা গ্রামের দরিদ্র পুরোহিত উমানাথ ভট্টাচার্য্যের একমাত্র মেয়ে। বয়স নিতান্ত অল্প নয়; অর্থাভাবেই এতদিন বিয়ে-থা বোধ হয় হয়নি। প্রকৃতিটি একদিকে যেমন মধুর, আর একদিকে তেমনি দৃপ্ত। সকাল বেলায় সবে পূজার জন্য উপকরণ সংগ্রহ করে সে বাড়ী ফিরছিল, হঠাৎ এই বিভ্রাট। পূজার উপচার এইভাবে নষ্ট হওয়ায় অত্যন্ত রেগে উঠে সে বাড়ীর ভেতর থেকে বেরিয়েই বন্দুক হাতে বিজয়ের দেখা পেলে। পরিচিত-অপরিচিত, শোভনতা-অশোভনতা বিচার করবার ধৈর্য্য তখন তার নেই। একেবারে আগুন হয়ে গিয়ে সে প্রথমেই ভর্ৎসনা ক'রে বললে,---কি রকম লোক আপনি? এটা বাঘ ভাল্লুকের জঙ্গল নয়---মানুষের গ্রাম তা জানেন? বন্দুক নিয়ে বাহাদুরিটা গ্রামের ভেতর না দেখালেই নয়?

বিজয় ফুঁ দিয়ে বন্দুকের নলটা পরিষ্কার ক'রে নিতে নিতে হঠাৎ এই অতর্কিত আক্রমণে একটু বিস্মিত হয়েই মুখ তুলে তাকালে। সঙ্কুচিতভাবে বলতে গেল,---দেখুন আমি ঠিক - - - -

কিন্তু নির্ম্মলা তাকে কথা আর শেষ করতে দিলে না, নিজের রক্তাক্ত শাড়ীর আঁচলটা দেখিয়ে ঝাঁঝের সঙ্গে বললে,---দেখেছেন কি হয়েছে? আমার সমস্ত পূজোর আয়োজন আপনি নষ্ট ক'রে দিয়েছেন, জানেন? কি অধিকারে আপনি গ্রামের মধ্যে পাখী শিকার করেন?

এই ভর্ৎসনার মাঝেও মেয়েটিকে বিশেষ মনোযোগ দিয়ে বিজয় এতক্ষণ লক্ষ্য করছিল। মেয়েটি চুপ করতেই সে বললে,---আমার সত্যি অপরাধ হয়েছে, আমায় ক্ষমা কর নির্ম্মলা।

এবার নির্ম্মলার বিস্মিত হবার পালা। নিজের নাম অপরিচিতের মুখে শুনে অবাক হয়ে তার দিকে তাকাতেই বিজয় হেসে বললে,---আমায় চিনতে পারছ না নির্ম্মলা? আমি বিজয়।

খানিক বিস্মিত হয়ে বিজয়ের দিকে তাকিয়ে থেকে নির্ম্মলা এবার মুখ না নামিয়ে পারলে না, বললে,---কিন্তু এখানে পাখী মারা খুব অন্যায় হয়েছে।

ঈষৎ ভর্ৎসনার ঝাঁঝ থাকলেও স্বর তার এখন অনেক নরম।

বিজয় হেসে বললে,---তা স্বীকার করছি, কিন্তু পাখীটা এমন বেয়াড়াভাবে তোমার গায়েই গিয়ে পড়বে তা ভাবতেই পারিনি। বিজয় একটু থেমে আবার জিজ্ঞাসা করলে, আমায় কি তুমি চিনতেই পারনি নির্ম্মলা?

নির্ম্মলা মাথা নীচু ক'রে বললে,---পেরেছি।

তা হ'লে এখনো ক্ষমা কর নি বুঝি---?

আমি কি তা বলেছি!---নির্ম্মলার গলার স্বরে এখনো যেন বিরোধের আভাষ!

ক্ষমা যে করেছ তাও ত' বল নি। কিন্তু আগেও তো আমি পাখী মেরেছি নির্ম্মলা। মনে পড়ে? তখন কিন্তু পাখী শিকারে তোমার বেশ উৎসাহই ছিল। এমন কি আমার হাত থেকে এয়ারগান কেড়ে নিয়ে ছুঁড়েছ!

নির্ম্মলা এবার হেসে ফেললে,---বিজয় আর একটু কাছে এগিয়ে এসে বললে,---তা' হ'লে মনে পড়েছে দেখছি। ওঃ কি দুষ্টই ছিলাম আমরা!

নির্ম্মলার মুখের সমস্ত মেঘ এবার কেটে গেছে দেখা গেল, নিজের অজ্ঞাতেই সে উৎসাহের সঙ্গে বলে ফেললে,---মনে হচ্ছে যেন এই সেদিন।

বিজয় একটু হেসে বললে,---ঠিক সেদিন নয়, অনেক দিন হ'ল। তোমায় তো আমি চিনতে পারিনি প্রথমে। কত বড় হয়ে গেছ!

তুমি নিজে বুঝি ছোটটি আছ, আমি তো ভেবেছি কে না জানি এক জাঁদরেল শিকারী।

কিন্তু জাঁদরেল শিকারীকেও যা ধমকটা দিলে--

নির্ম্মলা গম্ভীর হবার ভাণ ক'রে বললে,---অন্যায় করলে ধমক খাবে না? তুমি অমন ক'রে পাখী মারলে কেন?

আহা! আবার সে কথা কেন? পাখী না মারলে কি তোমার সঙ্গে দেখা হ'ত?

তুমি ভারি নিষ্ঠুর তো? পাখী না মারলে বুঝি দেখা আর হ'ত না?

কি করে হতো? পড়াশুনোর জন্যে ক'বছর আর গ্রামে আসিনি। তোমরা আমাদের গ্রাম ছেড়ে এগাঁয়ে উঠে এসেছ তা তো জানিই না।

পড়াশুনোর ছুতো করা কেন?---এবার নির্ম্মলার স্বর আবার বুঝি একটু ঝাঁঝাল,---বল সহর ছেড়ে এখানে আসতে ভাল লাগতো না!

তা একেবারে মিথ্যে বলনি, সময় যেন এখানে কাটতেই চায় না। আজকে নেহাৎ কিছু না পেয়েই তো বন্দুকটা নিয়ে বেরিয়েছিলাম।

এমন পোড়া গ্রামে না এলেই পার। এখানে কি মানুষ আসে!---ব'লে নির্ম্মলা মুখ ফেরালে।

অভিমানের সুরে বিপদের আভাষ পেয়েই বিজয় তাড়াতাড়ি বললে,---অমনি ক্ষেপে গেলে তো? আমি কি তাই বললাম। শুধু দেখতেই বড় হয়েছো, স্বভাবটি ঠিক তেমনই আছে দেখছি।

এত তোমার সহর নয়, এখানে রোজ রোজ কেউ বদলায় না---নির্ম্মলার স্বর এখনো গম্ভীর।

বিজয় গলা নামিয়ে বললে,---সহর তো তাই বার বার হার মেনে ফিরে আসে।

নির্ম্মলার চোখে একটু আবেশ যেন দেখা দিয়েছিল, তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে সে বললে,---বাবার পূজোর বেলা হয়ে গেল, আমি চলি---

নির্ম্মলা ক'য়েক পা এগিয়ে গেল। বিজয় একটুখানি কি যেন ভেবে নিয়ে তার সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে বললে,---দাঁড়াও, আমি যাব যে।

তুমি কোথায় যাবে?

কেন, তোমাদের বাড়ী।

আমাদের বাড়ী যাবে তুমি!---নির্ম্মলা সত্যি বিস্মিত।

কেন যাই নি কি কখনও? ছেলেবেলায় কত জ্বালাতন করেছি তোমার বাবা-মাকে।

এখন তো আর ছেলেবেলা নয়---

বিজয় হেসে বললে,---যেতে বারণ করছ তা হ'লে? কিন্তু---কিন্তু আমার যে ভয়ানক পিপাসা পেয়েছে। একটু জল খেতে দেবে না।

এই সকাল বেলায় পিপাসা!---নির্ম্মলা হেসে ফেললে।

বিজয় অম্লান বদনে বললে,---আমার ঐ রকম বেয়াড়া পিপাসা।

নির্ম্মলা হাসি চেপে গম্ভীর হয়ে বললে,---বুঝিছি, চল।

নির্ম্মলাদের বাড়ী বেশী দূর নয়। বাড়ীটি দেখলেই এই পরিবারটির সাংসারিক অবস্থাটি বুঝতে দেরী হয় না। চালে খড় নেই, চারিধারের দেওয়াল বহুদিনের সংস্কার অভাবে ধ্বসে পড়েছে; কিন্তু তবু উঠোন থেকে মাটীর দাওয়া পর্য্যন্ত সমস্ত পরিষ্কারভাবে নিকান পোঁছান দেখে বোঝা যায় যে, অস্বচ্ছলতা এ সংসারে কোন অভাবের গ্লানি আনেনি। বিজয়কে দাওয়ার কাছে দাঁড় করিয়ে নির্ম্মলা ঘরের ভেতর গেছল। হঠাৎ মস্ত বড় একটি জলভরা ঘড়া এনে তার সামনে বসিয়ে দিয়ে বললে,---নাও খাও।

বিজয় প্রথমে অবাক হয়ে তারপর হেসে ফেললে।

---এটা কি পান করবার, না স্নান করবার?

স্নান করবার কেন হবে? তোমার না ভয়ানক পিপাসা?---ব'লে নির্ম্মলাও হাসল। নির্ম্মলা হয় তো আর কিছু বলতো, কিন্তু ইতিমধ্যে মা এসে অপরিচিত একটি যুবককে বাড়ীর ভেতর দেখে একটু সঙ্কুচিত হয়ে মাথায় কাপড় টেনে সবিস্ময়ে নির্ম্মলার দিকে তাকালেন। মায়ের ভাব গতিক দেখে নির্ম্মলা হেসে ফেলে বললে.---চিন্‌তে পারলে না মা? ইনি মস্ত বড় শিকারী, তবে জঙ্গলের চেয়ে গ্রামের ভেতরেই রক্তারক্তি করতে ভালবাসেন।

মা এতক্ষণে চিনতে পেরেছেন। বললেন,---তুই থাম বাপু। আমাদের বিজয় না? কি আশ্চর্য্য আমি যে ভাবতেই পারি নি তুমি এই গরীবের কুঁড়েতে দেখা করতে আস্‌বে।

নির্ম্মলা বিজয়ের দিকে একবার দুষ্টুমির হাসি হেসে বললে,---উনি কি আর এমনি এসেছেন মনে কর। এসেছেন নেহাৎ পিপাসার জ্বালায়।

মা ব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন,---ওমা তা জল টল দিস্ নি?---

নির্ম্মলা হাসি চেপে বললে,---হ্যাঁ জল তো দিয়েছি মা।

শুধু জল দিয়েছিস নাকি, দেখ দিকি কি কাণ্ড!---মা ব্যাকুল হয়ে উঠলেন, কিন্তু পরের মুহূর্ত্তেই দুঃখের সঙ্গে বললেন,---কিন্তু গরীবের ঘরে কি বা তোমায় দেব বাবা। দু'টো মুড়কি-মোয়াও নেই---

নির্ম্মলা গম্ভীর হবার ভাণ ক'রে বললে,---তুমি থাম মা। জমিদারের ছেলে মুড়কি-মোয়া খায় না।

প্রসঙ্গটা তাড়াতাড়ি বদলাবার জন্য বিজয় বললে,---আর আমার কিছু দরকার নেই মাসীমা। আমি আপনাদের সঙ্গে দেখা করতেই এসেছিলাম।

মা খুসি হয়ে বললেন,---বেশ করেছ বাবা। সেই ছেলেবেলায় আসতে, তারপর কত দিন দেখি নি।

বিজয় একটু সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল,---আমি যে এখানে ছিলাম না মাসীমা। এই ক'বছর কলকাতাতেই পড়াশুনা করেছি, তাই আসতে পারি নি।

আর তারপর এই একমাস ছুটিতে এসে আমাদের বাড়ী আর খুঁজে পাচ্ছিলেন না---নইলে কবে আসতেন!---নির্ম্মলার চোখে মুখে দুষ্টুমির হাসি।

বিজয়ের পক্ষে অবস্থাটা একটু অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছিল। হঠাৎ বাইরে দুজনের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। একজন নির্ম্মলার বাবা গ্রামের পুরোহিত উমানাথ ভট্টাচার্য্য, আর একজন

গ্রামেরই একটি অত্যন্ত পরোপকারী ছেলে, নাম পরিতোষ। বিজয়ের সে বাল্যবন্ধু।

শোনা গেল, পরিতোষ পুরুত মশাইকে মৃদু ভর্ৎসনা কর্‌তে কর্‌তে আসছে,---আপনি তার চেয়ে বনে গিয়ে বাস করুন। সংসার কর্‌বার বিড়ম্বনা আপনার কেন!

বাড়ীর ভেতর ঢুকে একটি পুঁটলি নির্ম্মলার মায়ের হাতে তুলে দিয়ে সে বললে,---এই নাও মাসীমা! ভাগ্যিস্ আমি ছিলাম; নইলে আজও উমা খুড়ো তোমাদের উপোসের ব্যবস্থা ক'রে আস্‌ছিলেন। জমিদার বাড়ীর আদায়পত্র উনি রাস্তা থেকেই বিদায় করে দিচ্ছিলেন আর কি?

উমানাথ ভট্টাচার্য্য মৃদু প্রতিবাদ ক'রে বল্‌লেন--না---না, ঘোষাল বড় মুখ ক'রে চাইলে সকাল বেলা---

তাই দরাজ হাতে দক্ষিণার টাকাটা দিয়ে দিলেন, কিন্তু তার উপর এই চালডালগুলোও না দিলে চলছিল না---ব'লে পরিতোষ হাসলে।

উমানাথ সলজ্জভাবে কৈফিয়ৎ দেবার চেষ্টা করলেন,---জান না পরিতোষ, ওদের বড় অভাব। দু'বেলা খেতে পায় না।

পরিতোষ বাধা দিয়ে বললে,---আর আপনার বাড়ীতে বুঝি দু'বেলা যজ্ঞি লেগে আছে।

উমানাথ আরও যেন বিব্রত হয়ে বললেন,---না---না, তা নয়, তবে কি জান, আমাদের এমন এক আধ দিন উপোস করা অভ্যেস আছে।

এবার সবাই হেসে ফেল্‌লে।

পরিতোষ বল্‌লে,---সুতরাং আর ভাবনা কি? আচ্ছা নির্ম্মলা কত বড় হয়েছে সে খেয়াল আপনার আছে? ওর বিয়ে-থার ব্যবস্থা করতে হবে না? শুধু উপোস কর্‌তে জানলেই হবে?

উমানাথ এবার হেসে বললেন,---সে ভাবনা ভগবান ভাববেন।

তার বেলা ভগবান ভাববেন! পরিতোষ সকৌতুক স্বরেই বললে,---শুধু ঘোষালের ভাবনাটা বুঝি ভগবানের হয়ে আপনাকে ভাবতে হবে? বা: ভগবানের উপর কি দয়া! চলে এসো বিজয়, এদের সঙ্গে বেশীক্ষণ থাক্‌লে আর মাথার ঠিক থাকবে না।

নির্ম্মলার মা এতক্ষণ চুপ ক'রে ছিলেন, মেয়ের বিয়ের প্রসঙ্গে এইবার না ব'লে পারলেন না,---তুমি ঠিক বলেছ বাবা পরিতোষ। এত বড় সোমথ মেয়ে, ওকে আর ঘরে রাখা যায়?

পরিতোষ হেসে বললে,---বেশ ত তাহলে ঘর থেকে বার করে দিন? কি বলিস নির্ম্মলা?

মা গম্ভীর হয়ে বললেন,---না বাবা, হাসবার কথা নয়। তোমরা যদি একটু চেষ্টাচরিত্র না কর তাহলে আর কে করবে? ওঁকে ত জান, কোন কাজ যদি ওঁকে দিয়ে হয়। অথচ মেয়ে ত' দেখতে দেখতে তালগেছে হয়ে উঠেছে।

পরিতোষ নির্ম্মলার দিকে চেয়ে হেসে বললে,---ওই ত নির্ম্মলার দোষ। আচ্ছা মাসীমা এবার নির্ম্মলাকে বাড়ী থেকে বিদেয় না করে ছাড়ছি না। যেখান থেকে হোক একটা পাত্র ধরে আনবোই। আর আমিই বা কেন---এই বিজয় ত' আমার চেয়ে ভাল পারবে। কিহে বিজয়! তোমার জানাশুনো কলকাতাতে বন্ধুদের ভেতর একটা পাত্র মিলবে না?

বিজয় গম্ভীর হবার ভাণ ক'রে বললে,---পাত্র মিলবে কিন্তু পাত্রীর সঙ্গে মিলবে কিনা তাই ভাবছি।

এবার নির্ম্মলাই বিজয়ের দিকে ভ্রূভঙ্গী করে ফোঁস ক'রে উঠল,---মা সারা সকাল বসে বসে এই বাজে গল্প করবে? কাজকর্ম্ম আর নেই? আমি বাবার পূজোর যোগাড় দিতে চললাম।

নির্ম্মলা সত্যিই আর সেখানে দাঁড়ালো না। সেদিকে চেয়ে হেসে পরিতোষ বললে,---ওহে লক্ষণ ভালো নয়। নির্ম্মলা চটেছে। আমি চললাম। কিন্তু বিদেয় আমি নির্ম্মলাকে করবই।

বিজয়ও তার সঙ্গ নিয়ে বললে,---আচ্ছা মাসীমা, আবার একদিন আসব একেবারে ভাল পাত্রের খবর নিয়ে।

নির্ম্মলার মা খুসি হয়ে বললেন,---আমাদের ভাগ্য বাবা।

পরিতোষ আর বিজয় ছেলেবেলার বন্ধু। ছেলেবেলা এই গ্রামে একসঙ্গে পড়াশুনা করেছে। গ্রামের পথে এক সঙ্গে ফিরতে ফিরতে পরিতোষ হেসে বললে,---তারপর কুমার বাহাদুর! তোমায় এদের বাড়ী দেখব বলে ত' আশা করিনি!

বিজয় জবাব দিলে,---কেন এমন আশ্চর্য্যটা কিসের। ছেলেবেলার সাথী। তখন ত' এ বাড়ীতেই সারাদিন কাটাতাম!

কিন্তু ছেলেবেলা ত' আর নেই,---এখন ত' আর গ্রামে আসতেই চাও না। ক'বছর পরে গ্রামে এলে বল ত?

বিজয় একটু লজ্জিত হয়ে পড়ল,---সত্যি ভাই পড়াশুনার জন্যে - - - -

পরিতোষ আবার গম্ভীর হয়ে উঠল,---দেখ ভাই, ও দোহাই দিও না, ছুটিছাটায় এক আধবার গ্রামে এলে পড়াশুনোর ক্ষতি হয় না। এ দিকে গ্রাম গেল গ্রাম গেল ব'লে চীৎকার কর অথচ তোমাদের মত লোক যদি গ্রামে না আসে, গ্রামের দিকে না চায় - - - -

বিজয় হেসে বলে ফেললে,---ওই তোমার বক্তৃতা আরম্ভ হলো ত ভাই, আমাব দোষ আছে স্বীকার করি, কিন্তু তোমার মত গ্রামের জন্য প্রাণ দিতে ত' পারতাম না।

পরিতোষ একটু ম্লান হেসে বললে,---আমার কথা ছেড়ে দাও, মা-বাবা মরা অনাথ ছেলে মামাদের দয়ায় মানুষ। এই গ্রাম ছাড়া আর কি নিয়ে থাকবো বল। কিন্তু আমার মত লোকের দ্বারা কতটুকুই আর সম্ভব, কতটুকুই আর হ'তে পারে, তোমাদের মত লোক যদি গ্রামের দিকে না চায়---

পরিতোষের কথা আর শেষ হ'ল না। গ্রামের একটি ছেলে দূর থেকে ছুটতে ছুটতে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে,---পরিতোষদা, তোমাকেই খুঁজতে বেরিয়েছি - - - -

যে সব ছেলেদের দল নিয়ে পরিতোষ গ্রামের নানা কাজ ক'রে বেড়ায়, ছেলেটি তাদেরই একজন। সম্প্রতি গ্রামের বাউরী পাড়ায় একটি নোংরা নর্দ্দমা পরিতোষ নতুন ক'রে কাটিয়ে দেবার ব্যবস্থা করছিল। সেই নর্দ্দমা কাটা নিয়েই গোলযোগ বাধার সংবাদ ছেলেটি পরিতোষকে দিতে এসেছে।

সে বললে,---বাউরীরা ঠিক কাজ করছিল। আমাদের আচার্য্য ঠাকুর তাঁর দলদল নিয়ে এসে গোল বাধাচ্ছেন,---বলছেন সকলকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে, নইলে একঘরে করবেন। বামুন-কায়েতের ছেলে হয়ে বাউরীদের নর্দ্দমা ঘাঁটা! আপনাকে ত' যা নয় তাই শাপমন্যি দিচ্ছেন---

পরিতোষ হেসে বললে,---তা দিনগে যান; কিন্তু ছেলেরা একটু ঘাবড়ে গেছে নাকি?

তা দু' এক জন একটু ঘাবড়েছে বৈকি? তা ছাড়া বাউরীরা বলছে---কাজ নেই আমাদের নর্দ্দমায়। আচায্যি ঠাকুর তাদের পাপের ভয় দেখিয়েছেন, তার চাইতে বেশী দেখিয়েছেন জমিদারের ভয়। বামুন-কায়েতদের ছেলেদের নিয়ে নর্দ্দমা ঘাঁটানোর মজা তিনি দেখিয়ে দেবেন বলেছেন।

আচ্ছা চল দেখছি,---বলে পরিতোষ একটু অগ্রসর হ'তেই দেখা গেল, গ্রামের গোঁড়া দলের পাণ্ডা আচায্যি মশাই সেই দিকেই আসছেন।

আচায্যি মশাই একটি অপরূপ চরিত্র। ফোঁটা তিলক নামাবলীর ঘটা দেখে কে বলবে তাঁর পেটে পেটে অত কুটীল কুচক্রীর বুদ্ধি। একসঙ্গে জমিদার-পুত্র আর পরিতোষকে দেখে তিনি একেবারে গলায় মধু ঢেলে বল্লেন---এই যে বাবা বিজয়, ভাল আছ ত', কেমন বাবা পরিতোষ, সব কুশল ত'?

পরিতোষ একটু কৌতুকের হাসি হেসে বললে, ---ভাল আর থাকতে দিচ্ছেন কই আচায্যি মশাই?

সেকি কথা বাবা!---আচায্যি মশাই একেবারে আকাশ থেকে পড়লেন,---আমি ত' দিন রাত তোমাদের মঙ্গল কামনা করছি, তোমরা হ'লে গ্রামের সব,---কি বলে রত্ন!

তাই বুঝি সকাল বেলায় আমাদের একঘরে করবার ব্যবস্থা ক'রে এলেন?

পরিতোষের শ্লেষটা এবার বড় স্পষ্ট। আচার্য্য মশাইয়ের ধৈর্য্য রইল না, চেঁচিয়ে উঠলেন,---একঘরে। একঘরে আবার কাকে করবো---ওই সব হতভাগারা লাগিয়েছে বুঝি! তা বাউরী বাগ্দী

নর্দ্দমা ঘেঁটে প্রায়শ্চিত্ত না করলে একঘরে করব না ত' কি ধূপ ধুনো দিয়ে পূজো করবো। এ সব কুমতলব ভাল মানুষের ছেলেদের যারা দেয়---

পরিতোষ নিতান্ত শান্ত স্বরে বললে,---এ সব কুমতলব আমিই দিয়েছি আচায্যি মশাই।

আচায্যি মশাই জ্বলে উঠলেন, তুমি দিয়েছ---তুমি কেন দিয়েছ শুনি? সব ধিঙ্গি হয়ে পল্লীমঙ্গল ক'রে বেড়াচেছন। গাঁয়ের ছেলেগুলোর মাথা ত' এমনি খেয়েছ, তাদের জাত জন্মগুলো না খেলে আর চলছে না। বামুন-কায়েতের ছেলেদের দিয়ে নর্দ্দমা ঘাটানো।

পরিতোষ তবু শান্ত অবিচল। একটু হেসে বললে,---বামুন-কায়েতের ছেলেরা নর্দ্দমা ঘাটে নি, নর্দ্দমা বাউরীরা নিজেরাই কাটছে। কিন্তু বামুন-কায়েতদেরও এটা সমান প্রাণের দায় তা জানেন? জানেন গ্রামের যে ভাল পুকুরটার উপর সকলের ভরসা, বাউরীদের নোংরা জল সেখানে এসে পড়ে বলেই এই নর্দ্দমা কাটাবার ব্যবস্থা হচেছ। তার চেয়ে বাউরীদের নোংরা জলে গাঁয়ে রোগ লাগলেই বুঝি ভাল হ'ত?

রোগ---রোগ অমনি লাগলেই হ'ল।---আচায্যি মশাই খেঁকিয়ে উঠলেন,---বৃহৎ জলে দোষ নেই---এই হ'ল শাস্ত্রের কথা। আর লাগলই বা রোগ, তাই বলে জাত জন্ম খুইয়ে অস্পৃশ্যদের নর্দ্দমা ঘাঁটতে হবে? আমায় আর ন্যাকা বুঝিও না বাবু। তোমার কি বল না, তিন কুলে কেউ নেই, তোমার জাত গেলেই বা কি আর থাকলেই বা কি? কিন্তু এসব অনাচার আমরা গ্রামে থাক্‌তে হ'তে দেব না এই ব'লে রাখলাম। মনে রেখো এখনও ঠাকুর দেবতা জাগ্রত, আচায্যি ঠাকুর এখনও মরে নি।

আচার্য্য মশাই একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হয়ে চলে গেলেন। বিজয় পরিতোষের দিকে চেয়ে দুঃখের হাসি হেসে বললে,---গ্রামের জন্যে প্রাণ দেওয়ার এই ত' প্রতিদান। যাদের ভালর জন্য এত করছ তারাই তোমায় অভিসম্পাত দিয়ে যাচেছ।

পরিতোষ খানিক চুপ করে রইলো, তারপর বললে,---নিজের ভাল এরা বোঝে না বলেই ত' এদের ছেড়ে দেওয়া যায় না ভাই---যাকগে তুমি আর এ সব ভেবে দুঃখ পাও কেন? তোমার ছুটি ত ফুরিয়েছে, আজ কালের মধ্যেই বোধ হয় চলে যাবে?

বিজয় হঠাৎ কেমন যেন একটু লজ্জিত হ'য়ে পড়ে বললে,--না, ভাবছি দু' একদিন থেকেই যাব।

বিজয়ের একটু লজ্জিত বোধ করবার কারণ ছিল। ক'দিন ধ'রে গ্রামের একঘেয়ে জীবন অসহ্য লাগায় সে রোজই যাই-যাই করছে, নেহাৎ তার মায়ের অনুরোধেই তাকে কটা দিন থেকে যেতে হয়েছিল। এখন হঠাৎ যে কারণেই হোক, গ্রামে আরো কয়েক দিন থাকার ইচেছ তার হয়েছে। সে ইচেছর কথা জানাতে একটু সঙ্কোচ ত' হবারই কথা। তার অবস্থাটা বেশী অস্বস্তিকর হয়ে উঠল বাড়ীতে ফিরে। তার এই নতুন সঙ্কল্পের কথা মা জানেন না। বিজয় বাড়ীতে ফিরতে প্রতি-দিনের মত তিনি আর একবার অনুরোধ করলেন,---দু' একদিন আর থেকে গেলে হ'ত না বাবা?

বিজয়ের হ'ল মহাবিপদ, সোজাসুজি মার কথায় রাজী হ'তেও লজ্জা হয়, অথচ আপত্তি জানাবারও উপায় নেই।

বিজয়ের বোন মাধবীও মার সঙ্গে দাদার ঘরে এসেছিল জিনিষপত্র গুছিয়ে দিতে। একে হাসি-খুশি আমুদে মেয়ে তার উপর বিজয়ের সঙ্গে পিঠো-পিঠি ব'লে দাদা ব'লে সমীহ সম্মান সে বিশেষ করে না। সে তৎক্ষণাৎ ফোড়ন দিয়ে বললে,---কেন মুখ ব্যথা করছ মা, দাদা এখন শহুরে হয়ে গেছে, এই গাঁয়ে এখন আর ভাল লাগে। এখানে কোথায় ষ্ট্রাণ্ড, কোথায় চৌরঙ্গি---একটা লেকও ছাই নেই।

বড্ড ফাজলামী হচেছ মাধবী।---ছোট বোনকে শাসিয়ে মার কাছে বিজয় নালিশ জানালে,---জান মা, বিয়ে হবার পর থেকে মাধবীর আস্পদ্ধা বড় বেড়েছে। ও আমায় দাদা ব'লে মানতেই চায় না।

মাধবী অম্লান বদনে বললে,---তুমিও তা' হ'লে বিয়েটা তাড়াতাড়ি ক'রে ফেল না, তা হ'লেই আবার মানব।

বিজয় আবার তাচ্ছিল্যের ভাণ ক'রে বললে,---তোর মানবার জন্যে ত' আর আমার ঘুম হচেছ না যে বিয়ে করতে যাব।

ভাই-বোনের তর্ক থামিয়ে মা হেসে বললেন---আচছা তোকে বিয়ে করতে হবে না। কিন্তু কালই তোর না গেলে নয়, এখনও ছুটী ত' তোর আছে।

বিজয় যেন নিতান্ত অনিচছার সঙ্গে বললে,---তা ত' আছে।

মা আগ্রহ সহকারে বললেন,---তবে কেন এত তাড়াতাড়ি যাবার জন্য জেদ করছিস বাবা, এই ত' এতদিন বাদে এলি, থাক না আর দু'দিন।

নিতান্ত যেন দায়ে পড়ে বিজয় বললে,---আচছা বলছ যখন তখন ---

কিন্তু মাধবীকে অত সহজে ফাঁকি দেওয়া যায় না, সে সবিস্ময়ে বললে,---তুমি যে অবাক করলে দাদা, হঠাৎ এমন সুমতি ত' ভাল লক্ষণ নয়। এই না গাঁয়ে একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলে।

বিজয় গম্ভীর হবার চেষ্টা ক'রে বললে---মা যখন অত ক'রে বলছেন।

তা হ'লে মা আর যেটা বলছেন, সেটাও সুবোধ ছেলের মত ক'রে ফেল না। বিয়েটা যদি---

মাধবীর কথার মাঝেই বিজয় ফোঁস ক'রে উঠল,---দেখ মা, মাধবীকে মানা ক'রে দাও। ফের যদি বিয়ে বিয়ে ক'রে জ্বালাতন করে, তা হ'লে কিন্তু আমি থাকতে পারব না।

না---না, জ্বালাতন করবে না। তোর ইচেছ না থাকলে আমরা আর জোর ক'রে কি করব। ---বলে কোন রকমে বিজয়ের কলকাতা যাওয়াটা বন্ধ করার খুশিতেই মা ঘর থেকে চলে গেলেন।

বেশ, দেখব তোমার এ ভীষ্মের পণ কতদিন থাকে!---বলে মাধবীও ঘর থেকে চলে যাচ্ছিল। বিজয় একটু ইতস্ততঃ ক'রে তাকে ডেকে বললে,---শোন্ মাধবী।

মাধবী ফিরে এসে দাঁড়াল, কিন্তু বিজয় পড়ল দারুণ বিপদে। আসল কথাটা কি ভাবে এখন পাড়া যায়। মাধবী অবস্থাটা বোধ একটু অনুমান করে, বললে,---কি বলছ?

বিজয় আমতা আমতা ক'রে বললে,---হ্যাঁ কি যেন বলছিলাম, ওঃ---মনে পড়েছে। হ্যাঁ রে---সেই ছেলেবেলায় আমাদের বাড়ী আসত---তোর খেলার সাথী, কি যেন মেয়েটার নাম, মনে পড়ছে না।

খেলার সাথী তখন ত কত আসত, বেলা, সুরমা, ললিতা---

বিজয় অধৈর্য্য হ'য়ে বললে,---না---না, অন্য কি একটা নাম, আর তার সঙ্গে তোর খুব ভাব ছিল।

মাধবীর চোখে মুখে এবার কৌতুকের হাসি ফুটে উঠল,---ব্যাপারটা কি বল দেখি দাদা, তাদের কাউকেই মনে মনে ঠিক করেছ নাকি? তা এ কথাটা আগে বলতে হয়। মাকে বলি এখনি।

বিজয় চটে উঠল,---ওই জন্যেই ত' কোন কথা বলতে ইচেছ করে না। তুই এমন ফাজিল হয়েছিস।

আচছা---আচছা, আর ফাজলামী করব না। কিন্তু আমাদের সঙ্গে খুব ভাব ছিল ত' নির্ম্মলার। আমাদের পুরুত মশায়ের মেয়ে।

বিজয় যতদূর সম্ভব নির্ব্বিকার থাকার ভাণ ক'রে বললে,---হ্যাঁ---হ্যাঁ, নির্ম্মলা।

ও, নির্ম্মলা নামটাই ভুলে গেছলে!---মাধবীর চোখে দুষ্টুমির হাসি। আমার চেয়ে তোমার সঙ্গে বুঝি ভাব কম ছিল? ছেলেবেলা তাদের বাড়ীতেই ত কাটাতে।

আহা তাই ত বলছি। তার সঙ্গে তোর দেখা টেখা হয় না?

আমি শ্বশুরবাড়ী চলে যাওয়া অবধি আর তেমন হয় কই।

দেখা তুই না করলে আর হবে কোথেকে, নইলে এই ত পাশের গাঁয়ে---ব'লেই বিজয় বুঝল মস্ত একটা ভুল হয়ে গেছে।

মাধবী আঙুল নেড়ে শাসিয়ে বললে,---দাদা এবার ত ধরা পড়েছে।

ধরা---ধরা---বাঃ ধরা কিসের!---বিজয় যেন বিশেষ বিরক্ত।

কিন্তু মাধবীকে অত সহজে ঠকান যায় না, বললে,---নির্ম্মলারা পাশের গাঁয়ে উঠে গেছে কেমন ক'রে জানলে তুমি? তা'হলে নিশ্চয় তুমি খোঁজ নিয়েছ।

বিজয় অপ্রস্তুত হয়ে বললে,---না না, এই মানে সেদিন হঠাৎ দেখা হয়ে গেল কিনা।

আর শুনছি না কোন কথা। আমি ঠিক বুঝেছি তখনই, ভেতরে একটা কিছু আছে; নইলে হঠাৎ গাঁয়ের ওপর তোমার এত টান পড়ে!---আমি এখনি বলছি মাকে। বড্ড আমায় বিয়ের কথায় ধমক দেওয়া হয়।

বিজয় এবার কাতর হয়ে বললে,---এই মাধবী, দোহাই তোর! সত্যি বলছি তোকে এবার কলকাতা থেকে---একটা---তুই যা চাস এনে দেব।

মাধবী কিন্তু নির্ম্মম।---এর ওপর আমায় ঘুষ দিতে চাচ্ছ যখন তখন ব্যাপারটা বেশ গুরুতর---আমি এই চল্লাম।

মাধবী ঘরের বাইরে যেতে না যেতেই, সিঁড়িতে বিজয়ের বাবা জমিদার বীরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। বীরেন্দ্রনারায়ণ অত্যন্ত রাশভারী গম্ভীর চেহারার লোক। স্নেহের ফল্গুধারা যদি তাঁর অন্তরে কোথাও থাকে তাহ'লেও বাইরে কোন আভাষ তার নেই। গ্রামের লোক থেকে বাড়ীর সবাই তাঁকে যতটা শ্রদ্ধা করে---ভয় করে তার চেয়ে অনেক বেশী। তাঁর মুখের সামনে মুখ তুলে কথা বলবার সাহস তাঁর ছেলে-মেয়েরও নেই। বীরেন্দ্রনারায়ণ ঘরে ঢুকে এদিক ওদিক চেয়ে বললেন,---বিজয়! কই তোমার জিনিষপত্র গোছান হয়নি এখনও?

বিজয় মাথা নীচু ক'রে সঙ্কুচিতভাবে বললে---না, এখনও গোছান হয়নি।

একটু যেন বিরক্তির সঙ্গে বীরেন্দ্রনারায়ণ প্রশ্ন করলেন,---কেন?

বিজয় কোন রকমে সাহস সঞ্চয় ক'রে জানালে,---ভাবছিলাম এখনও ছুটি আছে। আরো দু'চার দিন যদি এখানে থাকি।

বীরেন্দ্রনারায়ণকে কিন্তু অসন্তুষ্ট হ'তে দেখা গেল না,---বললেন,---বেশ ভাল কথা, তোমার পড়াশুনার ক্ষতি না হ'লে হ'ল।

বিজয় এবার সাহস ক'রে বললে,---এখানে নির্জনতায় পড়াশুনায় সুবিধেই হচ্ছে।

খুব ভাল কথা।---ব'লে বীরেন্দ্রনারায়ণ চলে গেলেন।

মাধবী একেবারে চলে যায়নি। বাইরে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে দাদার করুণ অবস্থাটা উপভোগ করছিল। বাবা চলে যেতেই সে ঘরে ঢুকে দাদার গলা নকল ক'রে ব্যঙ্গের স্বরে বললে,---এখানে নির্জনতায় পড়াশুনোর সুবিধে হচ্ছে এবং তার চেয়ে সুবিধে হচ্ছে নির্ম্মলার সঙ্গে দেখার।

বিজয় ফিরে তাকিয়ে শাসন করবার আগেই দেখা গেল মাধবী এ তল্লাট ছেড়ে গেছে।

মাধবী কিছু মিথ্যে বলেনি। পরের দিন সকাল বেলা বিজয়কে নির্ম্মলাদের বাড়ীর কাছেই ঘোরা-ফেরা করতে দেখা গেল। নেহাৎ আকস্মিক-ভাবেই বোধ হয় নির্ম্মলার সঙ্গে তার দেখাও হয়ে গেল। নির্ম্মলা তখন পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে একটি বেলগাছ থেকে পূজোর জন্যে বিল্বপত্র সংগ্রহে ব্যস্ত, বিজয়কে সে দেখতে পায় নি। বিজয় নিঃশব্দে তার পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললে,---আমি তুলে দেব?

নির্ম্মলা চমকে ফিরে তাকিয়ে একেবারে অবাক!---তুমি!

দেখে আশ্চর্য্য হ'লে নাকি?---বিজয় হাসল।

নির্ম্মলা এতক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে, গম্ভীর হয়ে বললে,---তা একটু হলাম।

কেন বল ত? আমার এখানে বেড়াতে আসা এমন একটা নূতন কিছু?

নির্ম্মলা বিজয়ের দিকে না চেয়েই গম্ভীরস্বরে বললে,---এটা ত ঠিক বেড়াবার জায়গা নয়। গ্রামে এত ভাল জায়গা থাকতে এখানে কি কেউ বেড়াতে আসে?

বিজয় গাছ থেকে নিজেই পাতা তুলতে শুরু ক'রে অম্লান বদনে বললে,---ভালো মন্দ যার যার নিজের পছন্দ। আমার যদি এদিকটাই ভাল লাগে। অবশ্য তুমি যদি অসন্তুষ্ট হও তাহলে আর আমার এদিকে আসা হয় না।

নির্ম্মলা একবার বিজয়ের দিকে চেয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললে, আমার আবার সন্তোষ অসন্তোষ কিসের? আমার ত আর কেনা জায়গা নয় যে তোমাকে বারণ করব। তোমার যেখানে খুশি বেড়াতে আসতে পার।

কেনা জায়গা হ'লে বুঝি আমায় আসতে দিতে না।---ব'লে বিজয় হাসল।

তুমি বড় বাজে বক।---ব'লে নির্ম্মলা সেখান থেকে সরে যেতে গিয়ে অবাক হয়ে আবার জিজ্ঞাসা করলে,---আর ওকি, হচেছ কি?

বিজয় একটু ক্ষুণ্ণ হয়েই বললে, বাঃ তোমার জন্যে বেলপাতা তুলছি।

এবার নির্ম্মলা হেসে ফললে, বললে,---খুব। এই বেলপাতায় পূজো হবে। তোমার না পায়ে জুতো।

বিজয় এবার নিতান্ত অপ্রস্তত। নির্ম্মলাকে সাহায্য করার আগ্রহে জুতো পায়ে থাকার কথা তার খেয়ালই ছিল না। নিজের বোকামিতে তার হাসি আর থামতে চায় না। নির্ম্মলাও হেসে লুটোপুটি।

হঠাৎ এই দৃশ্যের মাঝে ধূমকেতুর মত আচার্য্যি মশাইএর উদয়। আচার্য্যি মশাই এই দিকেই যাচিছলেন বিশেষ জরুরী কোন কাজে, কিন্তু এরকম একটা মুখরোচক ব্যাপার একেবারে অবহেলা কি ক'রে করেন।

এই যে বাবা বিজয়! কল্যাণ হোক, কল্যাণ হোক, সব ভাল ত? এদিকে বেড়াতে এসেছিলে বুঝি। ভাল ভাল, সকালে বায়ু সেবন স্বাস্থ্যের পক্ষে অতি হিতকর আর গ্রামের এদিকটাই, কি বলে, বেশ ফাঁকা। আর দৃশ্যও অতি মনোহর। আমাদের মা নির্ম্মলার রোজ এদিকে পুষ্পচয়নে আসা চাই-ই।

আচার্য্যি মশাই হয়ত আরো অনেক কিছু বলতেন; কিন্তু ইতিমধ্যে আর একজন যে তাদের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে তা তিনি খেয়ালই করেন নি। হঠাৎ পেছন থেকে কে বলে উঠল, আপনিও কি এদিকে· প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছেন আচার্য্যি মশাই?

চমকে পেছনে ফিরে তাকিয়ে আচার্য্যি মশাই দেখলেন, পরিতোষ তাঁর দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসছে। আচার্য্যি মশাইএর প্রশান্ত মূর্ত্তি গেল লুপ্ত হয়ে, খেঁকিয়ে উঠে বললেন. প্রাতঃভ্রমণ। আমি বেরুব প্রাতঃভ্রমণে। কেন আমার কি খেয়েদেয়ে কাজ নেই? কাল রাত থেকে গরুটা ঘরে ফেরেনি, ভোর ইস্তক খুঁজে খুঁজে হয়রাণ হয়ে গেলাম। আমি .প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছি!

পরিতোষ কোন করমে হাসি চেপে বললে, আহা চটেন কেন? প্রাতঃভ্রমণে বেরুনটা আপনার পক্ষে এত লজ্জার কথা তা কি ক'রে জানব বলুন? কিন্তু আপনার গরু ত শুনলাম ওরা খোঁয়াড়ে দিয়েছে।

খোঁয়াড়ে দিয়েছে। আচার্য্যি মশাই একেবারে আগুন হয়ে উঠলেন,---আমার গরু খোঁয়াড়ে দিয়েছে! কোন হতভাগার এত বড় বুকের পাটা!

ওই যে হতভাগার সবজির বাগানের বেড়া ভেঙ্গে কাল আপনার গরু ঢুকেছিল---পরিতোষ একেবারে শান্ত নির্লিপ্ত।

আমার গরু বেড়া ভেঙ্গে বাগানে ঢুকেছিল। আচার্য্য মশাই রাগে একেবারে ফেটেই পড়েন বুঝি।

পরিতোষ তবু তেমনি শান্তস্বরে মৃদু হেসে বললে,---আমরাও ত তাই অবাক হচিছ আচার্য্যি মশাই। এতবড় একটা মহাপ্রাণ পণ্ডিতের গরু হয়ে কিনা এমন দুর্ম্মতি! পরের সবজির বাগানের দিকে কুদৃষ্টি! আপনার দৃষ্টান্তে ও বেটার কিছু ফল হ'ল না। গো-মূর্খ তাহলে আর বলেছে কেন?

আচার্য্যি মশাই আর দাঁড়াতে পারলেন না। দূর থেকে তাঁর শেষ কথা শোনা গেল, আচছা আমি দেখে নেব। আমার গরু খোঁয়াড়ে দেয় কোন্ বেটা, ---নির্ব্বংশ ক'রে ছাড়ব!

আচার্য্যি মশাই-এর আস্ফালনে বিজয় বুঝি একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেছল, নির্ম্মলা যে ইতিমধ্যেই

ফুলের সাজি নিয়ে চলে গেছে তা সে লক্ষ্যই করেনি। নির্ম্মলা তখনও বেশী দূর যায় নি। চেষ্টা করলে হয়ত আবার গিয়ে কথা বলা যায়। কিন্তু বিজয়ের কেমন সঙ্কোচ হ'ল, বিশেষ পরিতোষের সামনে ধরা পড়াটা সে চায় না।

কিন্তু নির্ম্মলার সঙ্গে দেখা করবার একটা সুযোগের ব্যবস্থা তার যে না করলেই নয়। রোজ রোজ অকারণে এদিকে প্রাতঃভ্রমণে আসা যায় না, ছেলেবেলার মত যখন তখন নির্ম্মলাদের বাড়ী গিয়ে হাজির হ'তেও বাধে, সুতরাং এদিকে আসা ও নির্ম্মলাদের বাড়ীতে যাওয়ার একটা চলনসই ছুতো তার চাই।

ছুতো তার হঠাৎ মিলেও গেলো। পরিতোষের সঙ্গে কথা কইতে কইতে তখন দুজনে কাছেই একটি অত্যন্ত নোংরা পানায় দামে মজা পুকুরের ধারে এসে পড়েছে। হঠাৎ পরিতোষকে থামিয়ে সে সাগ্রহে বললে---আচ্ছা আমার একটা কথা রাখবে?

হঠাৎ এ রকম উত্তেজনা ও আগ্রহের স্বর শুনে একটু অবাক হয়ে পরিতোষ বললে,---কি কথা শুনি আগে।

এই পুকুরটা পরিষ্কার করা যায় না। দামে পানায় মজে অবস্থা হয়েছে দেখছ---এই যে গ্রামে এত ম্যালেরিয়া তার মূল কোথায়? এই সব পুকুরেই ত--বিজয় রীতিমত বক্তৃতা শুরু ক'রে দিলে।

পরিতোষ এবার হেসে বললে,---তা ত সব বুঝলাম। কিন্তু এ রকম হাজা মজা পুকুর ত গ্রামে একটা নয়। এই পুকুরটার ওপরে হঠাৎ বিশেষ ক'রে ঝোঁক কেন?

এবার বিজয় একটু বিব্রত হয়ে পড়ল।---মানে ঠিক এটা নয়, তবে কি জান, একটা থেকে শুরু করতে হবে ত। তা ছাড়া---তা ছাড়া আমি কি ঠিক করেছি জান? আমি গ্রামে একটা সাঁতারের ক্লাব ক'রে দিতে চাই। তোমরা যদি এ পুকুরটা পরিষ্কার ক'রে ফেল, আমি নিজেই সাহায্য করব।

পরিতোষ তার পিঠ চাপড়ে বললে,---ভাল কথা, কিন্তু সাহায্য মানে শুধু টাকার সাহায্য নয়---আমাদের সঙ্গে জলে নামতে হবে, পারবে?

বিজয় সোৎসাহে জানালে,---বাঃ পারব না, আমি ত জলে নামতেই চাই।

বিজয়ের পুকুর পরিষ্কারের উদ্দেশ্য যাই থাক, সঙ্কল্পটা আন্তরিক।

পরের দিন সকাল বেলাই পরিতোষের দলবলের সঙ্গে তাকে সত্যই সেই পুকুরের ধারে হাজির হ'তে দেখা গেল। কিন্তু তখন সেখানে সেই পুকুর নিয়ে দুই সরিকের মধ্যে রীতিমত একটা খণ্ড-যুদ্ধ বেধেছে। দুই সরিকের সম্বন্ধটা অতি নিকট। খুড়ো আর ভাইপো। কিন্তু তাদের ঝগড়ার ধরণ দেখে কে তা অনুমান করবে।

খুড়ো বুঝি আগে এসে পুকুরে জেলে দিয়ে জাল ফেলেছিলেন। শোনা গেল তিনি বংশীকে নির্দ্দেশ দিচ্ছেন,---আর একটু ডান দিক ঘেঁষে জাল ফেল বংশী। নইলে কি মাছ সেধে ডাঙ্গায় উঠে আসবে।

কিন্তু বংশী জাল বাগিয়ে ধরবার আগেই দেখা গেল পুকুরের আরেক পাড়ে বংশদণ্ড হাতে ভাইপো গণেশলাল মারমুখো হয়ে দাঁড়িয়ে। বংশদণ্ড আস্ফালন ক'রে সেখান থেকেই সে শাসাচ্ছে---খবরদার বলছি বংশী। জাল এদিকে ফেলেছিস কি তোর জালের আমি দফা-রফা করেছি।

বেচারা বংশী সভয়ে জাল হাতে নিয়ে খুড়োর মুখের দিকে চাইল। তিনি ভাইপোকে উদ্দেশ ক'রে বললেন,---আমি ফেলেছি জাল আর তার দফা-রফা করবি তুই। তারপর বংশীকে হুকুম দিলেন, ---ফেল তুই বংশী, ফেল ডান দিক ঘেঁষে; দেখি হারু চক্কোত্তি থাকতে কে তোর জালের দফা-রফা করে। জ্যান্ত এই পুকুরে পুঁতে ফেলবো না।

বংশী দুজনের আস্ফালনের মাঝে পড়ে সভয়ে জানালে,---আজ্ঞে আমি গরীব মানুষ।

গণেশলাল বাঁশ হাতে ক'রে তখন একেবারে এ-পাড়েই এসে হাজির হয়েছে। খুড়োকে শাসিয়ে বললে,---এখনো ভাল কথায় বলছি কাকা,

বুঝে সুঝে জাল ফেল, নইলে খুড়ো ব'লে আর মানব না বলে রাখলাম।

খুড়োও ক্ষেপে উঠলেন,---মুখ সামলে কথা বলবি গণশা! বুঝে-সুঝে জাল ফেলব মানে?

আলবৎ বুঝে-সুঝে ফেলবে। জানো এই পুকুরের আমি দস্তুরমত সাড়ে তিন আনার সরিক। গণেশলাল পিছু হঠবার পাত্র নয়।

কাকে সাড়ে তিন আনার সরিক দেখাচ্ছিস। জানিস দস্তুর মত পৌণে পাঁচ আনা আমার।

গণেশলাল তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে,---জানি, জানি! তা পৌণে পাঁচ আনা হিসেব ক'রে জাল ফেল না। কেউ ত কিছু বলছে না।

হিসেব ক'রে ফেলব মানে?

আলবৎ হিসেব করবে। তোমার পৌণে পাঁচ আনার মাপ হ'ল বার হাত এক বিঘৎ তিন আঙ্গুল। তার এক চুল এগিয়েছ কি আমি দেখছি।

এবার হারু চক্কোত্তি আগুন হয়ে উঠলেন, ---জল মেপে আমার জাল ফেলতে হবে! এ তোর বাবাকেলে একলার পুকুর পেয়েচিস!

যেমন খুড়ো তেমনি ভাইপো! গণেশলাল তৎক্ষণাৎ জবাব দিলে,---বাপ তুলো না বলছি কাকা, তোমার বাপের নাম তাহলে ভুলিয়ে দেব ব'লে রাখছি।

পরিতোষ, বিজয় প্রভৃতি এতক্ষণ কাছে দাঁড়িয়ে মজা দেখছিল। এবার পরিতোষ বাধা না দিয়ে পারলে না, হেসে জিজ্ঞেস করলে, ব্যাপার কি হারু-খুড়ো! সকাল বেলায় খুড়ো-ভাইপোতে এত প্রেম কিসের?

হারু চক্কোত্তি একজনকে মধ্যস্থ পেয়ে যেন বেঁচে গেলেন। বলেন,---শোন, শোন তোমরা! ওই হতভাগা ষাঁড়ের গোবর আমায় বাপ তোলে,---আমি ওর আপন খুড়ো।

পরিতোষ হেসে বললে,---আহা আপনার বাপ ত ওরই ঠাকুরদা, নিজের ঠাকুরদাকে একটু তুলে ধরেছে এ আর এমন কি অন্যায়। কিন্তু ব্যাপারটা কি নিয়ে একটু শুনতে পাই কি?

হারু চক্কোত্তি বুঝিয়ে দিলেন,---এমন কথা কেউ কখনও শুনেছ? আমায় বলে কিনা জল মেপে জাল ফেলতে হবে।

গণেশ এতক্ষণ চুপ ক'রে ছিল, এইবার গর্জে উঠল,---মাপতে হবে না ত কি! পুকুর ত তোমার একলার নয়!

আবার খুড়ো-ভাইপোয় বুঝি সত্যি লাঠালাঠি বাধে। পরিতোষ দুজনকে সরিয়ে দিয়ে বললে, ---আহা থামুন থামুন, একটা কথা শুনবেন আমার? পুকুরের মাপ নিয়ে মারামারি করবার আগে পুকুরটা সাফ করবার একটা ব্যবস্থা করলে হয় না। কি অবস্থা হয়েছে পুকুরটার দেখেছেন?

হারু চক্কোত্তি বিরক্তির স্বরে বললেন--- দেখেছি! কিন্তু আমি করব কি! আমি পুকুর সাফ করি আর ওরা মজা মারুক কেমন? সেটি হচ্ছে না বাবা।

পরিতোষ এবার হেসে ফেললে,---তা ত বটেই, নিজের ক্ষতি হয় হোক, কারুর উপকার কিছুতে না হয়। কিন্তু পুকুর আপনাদের সাফ করতে হবে না, আমরাই সেটা ক'রে দিচ্ছি, তারপর আপনারা মাপ-জোক্ ভাগ-বাঁটোয়ারা করবেন।

হঠাৎ এই প্রস্তাবে প্রথমে দুজনেই হতভম্ব হয়ে খানিকক্ষণ একেবারে চুপ। তারপর খুড়ো-ভাইপোতে আর বিশেষ মতভেদ নেই দেখা গেল।

খুড়ো খেঁকিয়ে উঠলেন,---তার মানে? তোমরা পুকুর সাফ করবে কি রকম?

ভাইপো তাতে যোগ দিয়ে বললে,---আমাদের পুকুর তোমরা সাফ করবে মানে---

পরিতোষ যথাসম্ভব শান্ত স্বরে বোঝাতে চেষ্টা করলে,---পুকুরটা আপনাদের, কিন্তু গাঁয়ের স্বাস্থ্যের দায় আমাদের সকলের। আপনারা যখন হাত দেবেন না, তখন আমাদেরই সাফ করতে হবে।

খুড়ো-ভাইপো সব বিরোধ ভুলে এবার একেবারে এক দলের দলী হয়ে পড়লেন। গণেশ হেঁকে উঠল,---কিছুতেই না, কখ্খনো না, আমাদের পুকুর হেজে যাক্ মজে যাক্ তোমাদের কিহে বাপু--- কি বল কাকা?

হারু চক্কোত্তি তৎক্ষণাৎ সায় দিয়ে জানালেন,---নিশ্চয়ই। ভারী সব গ্রামের হিতৈষী এসেছেন, পুকুর সাফ ক'রে গাঁয়ের স্বাস্থ্য ভাল করবেন। আমাদের পুকুর আমরা যেমন খুশী নোংরা ক'রে রাখব। কি বলিস গণশা?

আলবৎ। আমাদের পুকুর আমরা পচিয়ে দেব।---গণেশ এখন খুড়োর সঙ্গে একেবারে একাত্মা।

যথাসময়ে যথাস্থানে হাজির হওয়া আচার্য্যি মশাইএর একটা বিশেষত্ব। তিনি কখন এসে দাঁড়িয়েছেন কেউ দেখেনি। এবার গোলযোগটা বেশ পাকিয়ে উঠেছে দেখে প্রসন্ন হাসি হেসে এগিয়ে এসে বললেন,---এই ত আমি উপস্থিত। বিষয়টা আমি অবিলম্বে মীমাংসা ক'রে দিচ্ছি।

কিন্তু পরিতোষের আর তখন ধৈর্য্য নেই। সে ধমক দিয়ে বললে,---থাক বিষয়টা কাউকে মীমাংসা করতে হবে না। আমরা পুকুর পরিষ্কার করবই। আপনারা যা পারেন করুনগে যান।

সেই সঙ্গে ছেলেদের সে হুকুম দিলে,---তোমরা লেগে যাও। ছেলেদের আর দুবার বলতে হয়। তারা তখন জলে নেমে গেছে। এই ছেলের দলের বিরুদ্ধে আপাততঃ কিছু করতে খুড়ো-ভাইপো কারুরই সাহসে কুলোল না। কিন্তু তবু পরিতোষকে একবার শাসিয়ে তারা বললে,---কাজটা কিন্তু ভাল হচ্ছে না বলে দিচ্ছি।

পরিতোষ তার জবাব পর্য্যন্ত না দিয়ে সরে গেল, আচার্য্যি মশাই একবার শেষ চেষ্টা ক'রে বিজয়ের কাছে নালিশ জানালেন,--এই যে বাবা বিজয়। তুমি এখানে উপস্থিত থাকতে এমন একটা অন্যায় অত্যাচার।

কিন্তু বিজয়ের কাছেও সুবিধা হ'ল না।---অন্যায় অত্যাচার ত কিছু হচ্ছে না আচার্য্যি মশাই। বরং নিখরচায় আপনাদের পুকুর পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে, তাতে আপনাদের আপত্তিটা কিসের?---ব'লে সেও পুকুরে নেমে গেল।

পাড়ে দাঁড়িয়ে রাগে ফুলতে ফুলতে গণেশ বললে---এর একটা হেস্তনেস্ত না করলে নয় আচার্য্যি মশাই।

হারু চক্কোত্তি হাত-পা নেড়ে বললেন,---আমি থানা পুলিশ না ক'রে ছাড়ব না।

কিন্তু আচার্য্যি মশাই অত সহজে বিচলিত হ'ন না। তাঁর বুদ্ধি আরো গভীর রাস্তায় চলে। তিনি একটু বাঁকা হাসি হেসে বললেন,---অত ব্যস্ত নয়, ব্যস্ত নয়, সময়ে সব হবে শুধু কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য প্রয়োজন। ভেতরে গভীর রহস্য আছে একটা। সেই মূল ধরে নাড়া দিতে হবে।

আচার্য্যি মশাই-এর মনটা কুটীল কিন্তু এ-ক্ষেত্রে তাঁর অনুমানটা একেবারে ভুল নয়। বিজয়ের পুকুর পরিষ্কারের আগ্রহটা নেহাৎ সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ যে নয় খানিক বাদেই সেটা যেন টের পাওয়া গেল। বিজয় আর সকলের সঙ্গেই জলে নেমেছিল পুকুর সাফের কাজে। হঠাৎ হাতের একটা আঙ্গুল অন্য হাতে চেপে ধরে দেখা গেল সে পাড়ে উঠে পড়েছে।

একটি ছেলে জিজ্ঞাসা করলে,---কি হ'ল কি বিজয়-দা?

আঙ্গুলটা কেটে গেল ভাই। আসছি এখুনি বেঁধে---ব'লে বিজয় আর কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই সেখান থেকে উধাও।

খানিক বাদেই তাকে দেখা গেল একেবারে নির্ম্মলাদের বাড়ীর উঠানে।

নির্ম্মলা। নির্ম্মলা। শীগ্‌গির।

নির্ম্মলা হঠাৎ বিজয়ের এ রকম ডাক শুনে উদ্বিগ্ন হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।---কি হয়েছে কি?

শীগগির একটা কিছু নিয়ে এস---ভয়ানক কেটে গেছে। বিজয় তখনও আঙ্গুলটা চেপে ধরে আছে।

নির্ম্মলা অস্থির হয়ে উঠল---কেটে গেছে। তাড়াতাড়ি কাছে এসে আঙ্গুলটা ধরে সে বললে, কই কোথায় কেটেছে দেখি?

আঙ্গুলটা দেখার পর মুখের ভাব কিন্তু তার বদলে গেল,---হুঁ খুব কেটেছে ত।

বিজয় রীতিমত গম্ভীর হবার চেষ্টা ক'রে বললে,---এখন রক্তটা বন্ধ হয়েছে তাই বুঝতে পারছ না।

নির্ম্মলার মুখও রীতিমত গম্ভীর---খুব বুঝতে পারছি কিন্তু এখানে ত তেমন কোন ওষুধ নেই।

বিজয় তাড়াতাড়ি বললে,---না না, ওষুধের দরকার হবে না, তুমি একটু বেঁধে দাও না, তাহলেই ঠিক হয়ে যাবে।

বেশ তাই দিচ্ছি।---নির্ম্মলা ঘরে গিয়ে একটা কাপড়ের ফালি এনে যেমন তেমন ক'রে একটু জড়িয়ে দিয়ে বললে,---নাও বাঁধা হয়েছে।

বিজয় হতাশ-স্বরে বললে,---এর মধ্যে বাঁধা হয়ে গেল? ভাল ক'রে বেঁধেছ ত।

এবার নির্ম্মলার মুখের না হোক চোখের হাসি চাপা রইল না, বললে,---মিছিমিছি আর ওর চেয়ে ভালো ক'রে বাঁধা যায় না।

মিছিমিছি! বিজয় একেবারে যেন আকাশ থেকে পড়ল।---তুমি বল কি নির্ম্মলা, তোমার একটু মায়াদয়া নেই! এই একটা আঁচড় থেকে কত কি হ'তে পারে জান? দস্তুর মত সেপটিক হয়ে উঠতে পারে।

কি ক'রে আর জানব বল।---নির্ম্মলা একটু হেসে বললে,---আমি ত আর ডাক্তারী পড়ি না। কিন্তু পুকুর সাফ করতে হাত কাটে কি ক'রে? জলে খুব ধার বুঝি!

তাহলে তুমি আমার আঙ্গুল কাটা বিশ্বাস কর না।---বিজয় এখনও গম্ভীর।

নির্ম্মলাও হাসি চেপে বললে,---বিশ্বাস করছি না আবার, খুব বিশ্বাস করছি---আমি শুধু ভাবছি---

ভাবছ আবার কি?

না এই ভাবছি, এর পর আর নূতন কি ছুতো খুঁজে বার করবে---পিপাসা হয়েছে, পান খাওয়া হয়েছে, আঙ্গুলও কেটেছে, তারপর?---ব'লে নির্ম্মলা আর হাসি চাপতে পারলে না।

বিজয়ও প্রথমটা হেসে ফেলেছিল, তারপর যেন অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হয়ে রাগের সঙ্গে বললে,---তুমি তাহলে মনে কর আমি ছুতো ক'রে তোমায় দেখতে আসি? তুমি মনে কর পুকুর পরিষ্কার করতে আসা আমার একটা ছল---তোমার ধারণা তোমায় না দেখে আমি থাকতে পারি না?

বিজয়ের গম্ভীর স্বরে সত্যি একটু অবাক হয়ে নির্ম্মলা তার দিকে তাকাতেই বিজয় কাছে এসে হঠাৎ সুর পালটে মৃদু হেসে বললে,---সত্যি তাই নির্ম্মলা, সত্যি আমি নিজেই বুঝতে পারছি না কি ক'রে এমন হ'ল।

নির্ম্মলা এবার মুখ ফিরিয়ে নিলে। বিজয় পাশে গিয়ে বসে বললে,---তুমি রাগ করলে নির্ম্মলা?

না, রাগ করব কেন, কিন্তু এ ভাল হচ্ছে না। আমাদের মধ্যে অনেক তফাৎ, আমাদের দূরে থাকাই উচিত।---নির্ম্মলার স্বর এবার সত্যি সত্যি গম্ভীর, যেন প্রচ্ছন্ন বেদনায় ভারী।

এ উচিত অনুচিত কার দিক থেকে বিচার করছ নির্ম্মলা?---বিজয়ের গলায় এবার সুস্পষ্ট ব্যাকুলতা।

সকলের দিক থেকে---সব দিক থেকে আমাদের মধ্যে বাধা!

বিজয় উত্তেজিত স্বরে বলে,---সব দিকের কথা পরে ভাব, তোমার নিজের দিকটা আগে শুনি। তোমার নিজের মনে যদি অবশ্য বাধা থাকে---

আমার কথা কি তুমি জান না---কিন্তু আমার কথায় কি আসে যায়। নির্ম্মলা এবার চোখ তুলে তাকাল বিজয়েব দিকে, সে চোখে আসন্ন অশ্রুর গাঢ় ছায়া।

বিজয় তেমনি উত্তেজিতভাবে বলে,---তাইতেই যা কিছু আসে যায় নির্ম্মলা। আর কোন দিক থেকে কোন বাধা আমি মানি না, মানব না।

একটু থেমে সে আবার বললে,---আজই তোমার কাছে কোন শেষ উত্তর আমি চাই না নির্ম্মলা। কিন্তু জেনো সে উত্তর একদিন আমি নেবই।

বিজয় নির্ম্মলার মুখের দিকে না তাকিয়েই বেরিয়ে যায়।

পুকুর পরিষ্কার তারপর নিয়মিতভাবে চলতে থাকে, সেই অজুহাতে বিজয়ের নির্ম্মলার সঙ্গে দেখাশুনারও বিশেষ অসুবিধা হয় না এবং

একদিন নির্ম্মলার হৃদয়ের উত্তর আর গোপন রাখা যায় না।

নির্ম্মলা দুর্ব্বলভাবে বিজয়কে এখনও বোঝাতে চেষ্টা করে,---কিন্তু তুমি বুঝতে পারছ না চারিদিকে কত আমাদের বাধা। তুমি যা ভাবছ, তা হবার নয়।

মুখে বললেও বোঝা যায় নির্ম্মলার মন তার নিজের অজ্ঞাতে কখন দুর্ব্বল হয়ে এসেছে।

বিজয় জোর করে বলে,---তুমি বাধাগুলো বড় বেশী ক'রে দেখছ নির্ম্মলা। আর বাধা যতই হোক, হার মানব কেন ? শুধু তুমি একবার সায় দাও।

নির্ম্মলা বিজয়ের দিকে একবার চোখ তুলে আবার নামিয়ে নেয়। বিজয় আবার বলে,---তুমি পাশে থাকলে আমি সমস্ত সংসারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারি নির্ম্মলা। কিন্তু তার দরকার হবে না। আমি বলছি সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি শুধু মত দাও, আমি মাকে জানাই।

নির্ম্মলা মাথা নীচু ক'রেই বলে,---বেশ। আমার আর কিছু বলার নেই।

আচার্য্যি মশাই ও তাঁর দলবল পুকুর পরিষ্কারের কাজে তারপর আর কোন বাধা দেননি। কিন্তু তাই ব'লে তাঁরা চুপ ক'রে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে নেই। বিজয় ও নির্ম্মলার মেলা-মেশার ব্যাপারটা আচার্য্যি মশাই ভালো ক'রেই লক্ষ্য করেছেন এবং একদিন তাঁকে দলবল সমেত একেবারে জমিদারের কাছারিতে উপস্থিত দেখা যায়। জমিদার মশাই তখনও আসেননি। জমিদারের দক্ষিণ-হস্তস্বরূপ সরকার মশাইএর কাছেই আচার্য্যি মশাই ভূমিকাটা সেরে রাখেন। শোনা যায় আচার্য্যি মশাই বলছেন,---সব বিপর্য্যয়ের মূল ঐ মেয়েটা। ওরই জন্যই ত এত গণ্ডগোল।

সরকার মশাই লোকটি একটু দুর্ব্বোধ্য। তাঁর কথাবার্ত্তার অর্থ সব সময়ে ঠিক পরিষ্কার বোঝা যায় না। মনে হয় লোকটির বাইরের পরিচয়ের পেছনে আর একটা মানুষ লুকিয়ে আছে। স্বয়ং জমিদার মশাইও যেন তাঁকে একটু সমীহ ক'রে চলেন।

সরকার মশাই বলেন,---বটে, তাই নাকি ? মেয়েটাই তাহলে আপনার মতে যত নষ্টের গোড়া।

আচার্য্যি মশাই উৎসাহিত হয়ে বলেন,---আমার মতে ত তাই। শুধু আমার মতেই বা কেন ? এই ত এঁরা এখানে উপস্থিত, এঁদেরই জিজ্ঞাসা ক'রে দেখুন না।

হারু চক্কোত্তি ও গণেশলাল দু'জনেই সেখানে উপস্থিত। দু'জনেই সায় দিয়ে বলে,---আজ্ঞে হ্যাঁ। কি মোহজালই না বিস্তার করেছে।

শশিভূষণ গম্ভীর স্বরে বলেন,---অর্থাৎ সহজ ভাষায় চলাচেছ। কিন্তু আমাদের এমন দেবতুল্য ভাল মানুষ পুরুত ঠাকুরের মেয়ে কিনা---

আচার্য্যি মশাই শশিভূষণকে কথাটা আর শেষ করতে দেন না, ব'লে ওঠেন,---শোন সরকার মশাইয়ের কথা, পুরুত ঠাকুর ভাল মানুষ ব'লে---

গণেশলাল তাঁর ওপর ফোড়ন দিয়ে বলে,---হ্যাঁ, গোবরে পদ্মফুল কি হয় না ?

সবাই এই অপূর্ব্ব উপমায় স্তম্ভিত।

আঃ, তুমি থাম দেখি গণেশ। উপমা অমনি প্রয়োগ করলেই হ'লো নাকি ?---আচার্য্যি মশাই গণেশলালের নির্ব্বুদ্ধিতায় না চটে পারেন না। গণেশলালের মূর্খতা মাঝে মাঝে সত্যিই মারাত্মক।

শশিভূষণ একটু হেসে বলেন,---কেন আচার্য্যি মশাই, উপমাটা মন্দ কি ? পদ্মফুলের লোভেই না সব অলি এসে জুটেছে।

গণেশলাল খুশী হয়ে মাথা নাড়ে। শশিভূষণ আবার বলেন,---কিন্তু এই অলিগুলি পদ্ম ছেড়ে হঠাৎ আপনাদের পুকুরের পানায় নজর দিচেছ কেন ? সেখানে ত কোন মধু নেই।

হারু চক্কোত্তি এবার তেতে ওঠেন,---সেখানে ওদের শ্রাদ্ধের পিণ্ডি আছে। সব গ্রামের স্বাস্থ্য রক্ষা করছেন। আমাদের চার পুরুষের পুকুর ওঁরা জোর ক'রে সাফ করবেন।

আচার্য্যি মশাই বাঁকা হাসি হেসে বলেন,---আহা, চটো কেন খুড়ো, ব্যাপারটা অত সরল নয়, গভীর রহস্য আছে ভেতরে। বুঝলেন সরকার

মশাই। ওদের পুকুর পরিষ্কারটা উপলক্ষ মাত্র।

লক্ষ্য বুঝি ঐ পদ্মটি?---শশিভূষণ হেসে বলেন,---কিন্তু নিশানাটা বড় দূরে হয়ে গেল না আচার্য্যি মশাই? সারাদিন পুকুরের পাঁক ঘাঁটলে পদ্মের খবর নেবার সময় কোথায়?

আচার্য্যি মশাই সকলের দিকে একবার অর্থপূর্ণভাবে চেয়ে বললেন,---যার খবর সে ঠিক নিচেছ। কি বল হে?

হারু খুড়ো সায় দেন,---তা ছাড়া আর কি?

যাকে বলে বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা,---গণেশলাল আবার উপমা প্রয়োগ করে।

আচার্য্যি মশাই চটে উঠে বলেন,---আঃ গণেশ।

শশিভূষণ হেসে বলেন,---আমাদের গণেশের উপমাগুলি একেবারে কালিদাসস্য। কিন্তু ঘোগটিকে চিনতে পারলুম না ত!

চিনবেন কেমন ক'রে সরকার মশাই। সে কি সহজে চেনা যায়! আমরাই ত তাজ্জব। আচার্য্যি মশাই এবার শশীর কানে কানে বলেন, ---স্বয়ং আমাদের জমিদারপুত্র।

শশিভূষণের মুখে কোন বিকার দেখা যায় না। একটু হেসে তিনি বলেন,---ওঃ তাই বুঝি জমিদার মশাইএর কাছে সুসংবাদটা দিতে এসেছেন।

আচার্য্যি মশাই যেন অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলেন,---আমাদের একটা দায়িত্ব বোধ ত আছে। অমন একটা হীরকখণ্ডের মত ছেলে একটা কুহকিনীর মায়ায় নষ্ট হয়ে যাবে- - -

সে আপনারা প্রাণ থাকতে দেখতে পারবেন না, বুঝেছি। কিন্তু জমিদারকে না জানিয়ে তাঁর হীরকখণ্ডের মত ছেলেটিকে কুহকিনীর মায়া থেকে উদ্ধার করা যেত না কি?---শশিভূষণের গলার স্বরে বোঝবার উপায় নেই তিনি বিদ্রূপ করছেন না সহজ কথা বলছেন।

আচার্য্যি মশাই কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করেন,---কি রকম?

শশিভূষণ বাখ্যা করেন,---কুহকিনীদের শুনি শিকার পেলেই হ'ল। তা একটা শিকার জুটিয়ে দিলেই ত হয়। এই আমাদের গণেশের মত নিরীহ নধর একটি। গণেশের বোধ হয় আপত্তি নেই।

গণেশলাল হঠাৎ খুশীতে লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে---আমায়? হেঃ আমায় সে আমলই দেয় না। সেদিন পুকুরের ধারে একটু ইসারায় ডেকেছি, যা ফোঁস ক'রে উঠল। আমার সঙ্গে তার যেন সোনায় সোহাগা!

উপমার অভিনবত্বে সবাই নির্ব্বাক।---শুধু আচার্য্যি মশাই হতাশভাবে ব'লে ওঠেন,---নাঃ বাতুল, বাতুল!

শশিভূষণ হাসি চেপে বলেন,---তাই ত বড় দুঃখের কথা। যাক্ তাহলে যা করবার হয় করুন। জমিদার মশাই ত এসে পড়েছেন।

জমিদার বীরেন্দ্রনারায়ণ ঘরে ঢুকে অতিথি-দের দিকে একটু বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে নিজের আসনে বসে বলেন,---তারপর আপনারা কি মনে ক'রে আচার্য্যি মশাই? আপনাদের দর্শন ত বিশেষ সৌভাগ্য ছাড়া পাওয়া যায় না।

আচার্য্যি মশাই বিনয়ে একেবারে গলে গিয়ে বলেন,---আজ্ঞে একটু নিবেদন ছিল।

জমিদার মশাই একটু তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই বলেন,---বেশ, নিবেদন ক'রে ফেলুন।

আচার্য্যি মশাই যেন অত্যন্ত কুণ্ঠার সঙ্গে জানান,---দেখুন গ্রামে ত আর বাস করা চলে না।

তাহলে বাস তুলে দিন।---বীরেন্দ্রনারায়ণের কণ্ঠস্বরে কোন সহানুভূতি দেখা যায় না।

আচার্য্যি মশাই একটু থমকে গেলেও হাল ছাড়েন না,---কিন্তু আপনি থাকতে গ্রামের এই দুর্গতি!- - -

বীরেন্দ্রনারায়ণের বিরক্ত দৃষ্টির সামনে আচার্য্যি মশাইএর আর বাক্স্ফূর্ত্তি হয় না। জমিদার মশাই শশিভূষণের দিকে ফিরে বিরক্তির সঙ্গে জিজ্ঞাসা করেন,---ব্যাপারটা কি?

শশিভূষণ নিতান্ত যেন সরলভাবে বলেন,---ব্যাপারটা গুরুতর। ওদের কোন পচা পুকুর গাঁয়ের ছেলেরা মিলে পরিষ্কার করতে লেগেছে।

বীরেন্দ্রনারায়ণের ঠোঁটের কোণে একটু হাসির আভাস দেখা যায়, সেটা চেপে তিনি বলেন, আপনাদের তাতে বড্ড অসুবিধে হয়েছে বুঝি?

আচার্য্যি মশাই তাড়াতাড়ি সুর বদলে জবাব দেন,---আজ্ঞে না। পুষ্করিণী উদ্ধার ত শুভ কাজ, ভাল কাজ, আমার ত তাতে কি বলে উৎসাহই ছিল। কিন্তু পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধারের নামে যদি এমন অনাচার শুরু হয়---

বীরেন্দ্রনারায়ণ ধমকে ওঠেন,---ভণিতা রেখে সোজা ক'রে ব্যাপারটা বলুন দেখি, আর যদি না পারেন ত যান, আমায় মিছিমিছি বিরক্ত করবেন না।

আচার্য্যি মশাই সকাতরে জানান,---বিরক্ত কি করতাম, নেহাৎ আমাদের বিজয় এর ভেতর না থাকলে- - -

বিজয়! আমার ছেলে? কি করেছে সে? জমিদার মশাই কঠিনভাবেই আচার্য্যি মশাইএর দিকে তাকান।

সে দৃষ্টির সামনে সঙ্কুচিত হয়ে প'ড়ে আচার্য্যি মশাই যথাসম্ভব মধুর কণ্ঠে বলেন,---না, না, না, সে কি করবে? নিষ্কলঙ্ক, দুগ্ধপোষ্য শিশু বললেই হয়, সে ত মহৎ উদ্দেশ্যেই পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করতে গেছল, সেখানে যে অমন ডাকিনী তার মস্তক চর্ব্বণ করবার জন্যে বসে আছে তা আর জানবে কি ক'রে!

এবার বীরেন্দ্রনারায়ণের কণ্ঠস্বর গম্ভীর হয়ে ওঠে,---আচার্য্যি মশাই, আমার ধৈর্য্য বেশী নয়। যা বলবার তাড়াতাড়ি বলুন।

আচার্য্যি মশাই সভয়ে কোন রকমে জানান, বলব আর কি? বলবার আর কি আছে? নেহাৎ নিজের চক্ষে দেখা তাই।

তারপর নিজে আর শেষ করতে না পেরে আর সকলকে সাহায্যে আহ্বান করেন,---কই হে বল না, তোমারাও ত দেখছে। পুরুৎ ঠাকুরের মেয়ে নির্ম্মলা না কি নাম ছুঁড়িটার, গাছতলায় বিজয়ের সঙ্গে কি ঢলাঢলি! অত বড় আইবুড়ো সোমত্থ মেয়ে। বিয়ে দিলে তিন ছেলের মা হ'ত- - -

জমিদার মশাইএর মুখ অনেকক্ষণ থেকেই কঠিন হয়ে আসছিল, এবার তাঁর বজ্রগম্ভীর স্বর শোনা যায়,---আচার্য্যি মশাই!

আচার্য্যি মশাই সভয়ে নীরব হয়ে যান। বীরেন্দ্রনারায়ণ বলেন,---আপনাদের বক্তব্য বোধ হয় শেষ হয়েছে। এখন আপনারা যেতে পারেন।

আচার্য্যি মশাই ও তাঁর দলবলকে তবু ইতস্ততঃ করতে দেখে শশিভূষণ হেসে বলেন,---মানটা বজায় থাকতে থাকতেই যাওয়া ভাল নয় কি আচার্য্যি মশাই?

হ্যাঁ, এই যে---আচার্য্যি মশাই নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গেই ক্ষুণ্ণ মনে দলবল সমেত বিদায় নেন। জমিদার মশাই তাঁদের শেষ কথা জানিয়ে দেন,---আর একটা কথা ভবিষ্যতে মনে রাখবেন। আমার ছেলের চরিত্র নিয়ে আপনাদের মাথা না ঘামালেও চলবে।

আচার্য্যি মশাই বা তাঁর দলবল আর উত্তর পর্য্যন্ত দিতে সাহস করে না।

তাঁদের দল চলে যাবার পর খানিকক্ষণ ঘর একেবারে নিস্তব্ধ। বীরেন্দ্রনারায়ণের গম্ভীর চিন্তানিমগ্ন মুখের দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে শশিভূষণ নীরবে নিজের কাজ ক'রে যান, হঠাৎ বীরেন্দ্রনারায়ণের ডাক শোনা যায়,--শশী---

শশিভূষণ মুখ ফেরান। বীরেন্দ্রনারায়ণ তাঁর দিকে না তাকিয়েই গম্ভীর স্বরে বলেন,---পুরুত মশাইকে খবর দেবে। কালই যেন এখানে আমার সঙ্গে দেখা করেন।

কথাগুলো ব'লেই বীরেন্দ্রনারায়ণ ঘর থেকে চলে যান। শশী সে দিকে না চেয়ে একটু হাসেন, তারপর খানিক চুপ ক'রে থেকে তাঁর হিসেবের খাতায় কি যেন কাটাকাটি করেন। দেখা যায় হিসেবের অঙ্কের বদলে সেখানে লেখা আছে, ---'মা আমায় ঘুরাবি কত---চোখ বাঁধা বলদের মত।'

পরের দিন সকাল বেলা। বিজয় তার পড়বার ঘরের টেবিলের ধারে বসে। কিন্তু সামনে বই খোলা থাকলেই কি পড়া হয়। দেখা যায় বিজয় অন্যমনস্কভাবে কলম দিয়ে একটা কাগজে হিজিবিজি কেটে চলেছে। হঠাৎ পেছনে মাধবীর গলার স্বর শুনে সে চমকে ওঠে।

দাদা কি পড়াশুনাই করছে রাতদিন, পড়ে পড়ে দাদার মাথাই না খারাপ হয়ে যায়।

মাধবী কখন চুপি চুপি পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে, বিজয় জানতেই পারেনি। তার দিকে ফিরে যথাসম্ভব গম্ভীর হবার চেষ্টা করে সে ব'লে ---করছিই ত পড়াশুনা! তোকে এখানে ফাজলামি করতে কে ডেকেচে।

ও আমি এসে পড়ায় বাধা দিলাম বুঝি? মাধবীর গলার স্বরও রীতিমত গম্ভীর। হঠাৎ খিল খিল ক'রে হেসে উঠে সে ছোঁ মেরে দাদার হাতের কাগজটা কেড়ে নিয়ে বলে,---বাঃ চমৎকার! তোমাদের পড়ায় এ সব বুঝি আঁকতে হয়, আর আর---

যেন অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে কাগজটা লক্ষ্য ক'রে মাধবী বলে,---আর এই নি---র--ম---লা এই নামটাও বুঝি লিখে জপ করতে হয়!

বিজয় এবার সত্যি ক্ষেপে উঠে কাগজটা কেড়ে নেবার চেষ্টা করে, তীব্র প্রতিবাদের স্বরে বলে,---কক্ষণ না! কক্ষণ ও নাম ওখানে লেখা নেই।

নেই বুঝি? তা'হলে আমারই ভুল, কিন্তু কাগজে না লিখে মনে মনে জপ করছিলে তো?

করছিলাম, বেশ করছিলাম, তুই এখান থেকে বেরো। রাত দিন এক বাজে কথা। বিজয়কে রীতিমত বিরক্তই মনে হয়।

বেশ যাচ্ছি।---ব'লে মাধবী যেন অত্যন্ত ক্ষুণ্ন হ'য়ে চলে যাবার উপক্রম করে। বিজয়কে সুতরাং নরম হ'তেই হয়। মাধবীই তার একমাত্র সহায়। তাকে চটানটা নিরাপদ নয়। বিজয় গলা নামিয়ে বলে,---চলে যাচ্ছিস নাকি?

বাঃ, তাড়িয়ে দিলে চলে যাব না!

না, শোন্ না, এদিকে আয়---বিজয়কে অনুরোধ করতে হয়।

কিন্তু মাধবী এখন সুবিধে পেয়েছে,---দরকার কি বাবা। তোমার পড়ার ক্ষতি হবে।

না---না, শোন্ না। বিজয়কে আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়েই মিনতি করতে হয়।

মাধবী কাছে এলে সে এবার আসল কথাটা কোন রকমে ব'লে ফেলে,---আচ্ছা মনে কর যদি ---এই যদি ধর---ধর---সত্যিই যদি নির্ম্মলাকে আমি বিয়ে করতে চাই!

মাধবীর মুখ চোখ উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে খুশীতে কিন্তু সুবিধে পেয়ে সে একটু জ্বালাতন না ক'রে ছাড়ে! সে যেন নিতান্ত অবিশ্বাসের সঙ্গে বলে, ---যা, বাজে কথা!

বিজয়কে এবার সাগ্রহে নিজের আন্তরিকতার প্রমাণ দিতে হয়, না---না, বাজে কথা নয়, সত্যি বলছি, বিয়ে আমি করতে পারি কিন্তু আর কাউকে নয়।

এইবার মাধবী হেসে ফেলে বলে,---ওই মা আসছে, মাকে বলব তা হ'লে?

এই না---না, এখন নয়। বিজয় সন্ত্রস্ত, ভীত হয়ে ওঠে।

মাধবী আরো তাকে জ্বালাতন করবার জন্যে বলে,---কেন এখনই তো ভাল, একেবারে তোমার সামনেই কথাটা পেড়ে ফেলি না?

না---না, দোহাই তোর, এখানে নয়।---বিজয় সকাতর মিনতি জানায় এবং হঠাৎ একটা বই টেনে নিয়ে অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে পড়তে বসে যায়।

মা এসে ভর্ৎসনা ক'রে বলেন,---খাওয়া দাওয়া কি সব ঘুচিয়ে দিলি বিজয়, কখন থেকে খাবার নিয়ে বসে আছি, খাবার হুঁসই নেই!

মাধবী দাদার দিকে একবার হেসে তাকিয়ে বলে,---হুঁস কি ক'রে থাকবে মা, দাদার এখন---বিজয় সভয়ে তার দিকে তাকাতেই মাধবী হেসে কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে বলে,---যা এক ভাবনা ঢুকেছে মাথায়!

মাধবী শেষ পর্য্যন্ত বোধ হয় অপ্রস্তুত ক'রে ছাড়বেই। বিজয় হতাশ হয়ে উঠে পড়ে বিরক্তির ভান ক'রে বলে,---নাও তোমরাই এ ঘরে বসে গজর গজর কর। আমার আর পড়েশুনে কাজ নেই!

সে রীতিমত রেগেই ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

শোন্ শোন্ বিজয়, যাসনি,---মা উদ্বিগ্নস্বরে ডাকেন। তারপর বলেন,---সত্যি আমাদের তো অন্যায় বাপু, পড়াশুনার সময় এসে বিরক্ত করলে তো রেগে যাবেই।

মাধবী এবার হেসে ফেলে,---পড়াশুনা নয় মা, পড়াশুনা নয়। দাদার এখন একটা বিয়ে দেওয়া দরকার শীগ্‌গির।

মা দুঃখের সঙ্গে বলেন,---তাতে কি আমার অসাধ কিন্তু ও তো বিয়ের নাম শুনলেই ক্ষেপে ওঠে।

ঠিক নাম শুনলে ক্ষেপে উঠবে না। দেখবে, সুড় সুড় ক'রে গিয়ে ছাদনা তলায় হাজির হয়েছে। তুমি এখন যার তার নাম করলে রাজী হবে কেন?

মা কিন্তু কিছু বুঝতে না পেরে বলেন,---মেয়ে দেখতেই রাজী না হ'লে ঠিক বেঠিক কি ক'রে বুঝব বাপু।

মাধবী মাকে একেবারে অবাক ক'রে দিয়ে বলে,---মেয়ে তো দেখে ঠিক হয়ে আছে---হ্যাঁ গো হ্যাঁ, নির্ম্মলাকে জান তো?

আমাদের পুরুত ঠাকুরের মেয়ে!---মা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেন।

হ্যাঁ, দাদার শুধু তাকেই পছন্দ। এখন তুমি বাবাকে ব'লে রাজী করালেই হ'লো। মাধবী এবার পরিহাস ছেড়ে দাদার হয়ে সত্যিই ওকালতি ক'রে বলে,---সত্যি মা, নির্ম্মলা ভারী ভাল মেয়ে, বাবাকে তোমায় বলতেই হবে।

বলব ত কিন্তু উনি কি রাজী হবেন? মার মুখ একটু যেন গম্ভীর হয়ে ওঠে।

মাধবী তবু জেদ করে,---কেন রাজী হবে না মা, নির্ম্মলার মত বৌ তোমরা কোথায় পাবে? তা ছাড়া দাদার যখন এ রকম পছন্দ।

মা হতাশভাবে বলেন,---সবই তো বুঝলাম, কিন্তু আমাদের চেয়ে নীচু ঘরের পুরুতের মেয়ে উনি কি আনতে চাইবেন? ওঁর মতামত তো জানিস।

মাধবী এবার রেগে ওঠে,---গরীব ব'লেই কি ঘর ছোট হয় মা, ঠাকুরের পূজো যার হাতে হয়, তার মেয়ে ঘরে আনবার যোগ্য নয়?

এ সব কথা আমায় ব'লে তো কোন লাভ নেই মা, আমি ঘরও বুঝি না, বংশও বুঝি না, আমি শুধু মানুষই বুঝি। কিন্তু ওঁর কাছে বংশের মান সবচেয়ে বড়, সেখানে আর কেউ নেই, আর কিছু নেই। তবু ব'লে দেখব একবার,---ব'লে মা গম্ভীর মুখে ঘর থেকে বেরিয়ে যান।

বিজয়ের ঘরে মাধবী যখন মার কাছে দাদার হয়ে ওকালতি করতে ব্যস্ত তখন জমিদারের কাছারী ঘরে, নির্ম্মলার বাবা, জমিদারের জরুরী তলবে এসে হাজির হয়ে বসে আছেন। জমিদার মশাই সাধারণতঃ তাঁকে পূজা আস্বার ব্যাপারেও ডেকে পাঠান না। আজকের এই বিশেষ আহ্বানে পুরুত মশাই তাই একটু বিস্মিতই হয়েছেন। অনেকক্ষণ সামনে বসে থাকলেও বীরেন্দ্রনারায়ণ এ পর্য্যন্ত তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করবার অবসর পান নি। পুরুত মশাই নিজের উপস্থিতিটা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেবেন কি না ভাবছেন, এমন সময় হঠাৎ জমিদার মশাই কাগজপত্র থেকে মুখ তুলে বলেন,---আপনি আর বসে কেন পুরুত মশাই, আপনি যেতে পারেন।

ডেকে এনে এতক্ষণ বসিয়ে রাখার পর এই কথার কোন অর্থ না পেয়ে পুরুত মশাই একটু বিস্মিতভাবে উঠে পড়ে বলেন,---আচ্ছা তাহলে আসি,---একটু ইতস্ততঃ ক'রে তিনি তারপর জিজ্ঞাসা করেন,---কিন্তু আমায় কি জন্যে যেন স্মরণ করেছিলেন!

ও হ্যাঁ তাও বটে, বসুন আর একটু তাহলে। ---জমিদার মশাই যেন হঠাৎ ব্যাপারটা স্মরণ ক'রে নিতান্ত সাধারণভাবে জিজ্ঞাসা করেন, আপনার একটি মেয়ে আছে না পুরুত মশাই?

আজ্ঞে হ্যাঁ, ওই একটি মেয়ে।

মেয়ে বেশ বড় হয়েছে, বিবাহযোগ্যা ?

আজ্ঞে হ্যাঁ, বয়স বরঞ্চ একটু বেশীই হয়েছে। ---পুরুত মশাই জানান।

তা বিয়ে দেননি কেন ?---চৌধুরী মশাইয়ের স্বর ক্রমশঃই যেন গম্ভীর হয়ে ওঠে।

পুরুত মশাই কিন্তু হেসে জবাব দেন,---জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ এ ত আমাদের হাতে নয়।

কিন্তু চেষ্টা তো আমাদের হাতে। চেষ্টা করেছেন ?

তেমন কিছু নয়, সংস্থানও তো কিছু নেই।

জমিদারের মুখ আরো কঠিন হয়ে ওঠে,---হুঁ, কিন্তু বিয়ে তা ব'লে ত আর ফেলে রাখা যাবে না।

পুরুত মশাই চুপ ক'রে থাকেন।

জমিদার মশাই আবার বলেন,---বয়স্কা মেয়ে অবিবাহিত থাকলে গ্রামে নানান কথা উঠতে পারে তা তো বোঝেন।

এবার সত্যি বিস্মিত হয়ে উমানাথ বলেন,---কথা উঠবে কেন ? মানুষের অদৃষ্ট আর অবস্থা নিয়ে ত আর কথা হ'তে পারে না ?

কিন্তু কথা তবু ওঠে পুরুত মশাই। আপনি আপনার মেয়ের জন্যে পাত্র দেখুন।---বীরেন্দ্র-নারায়ণের কথাগুলি আদেশের মতই শোনায়। একটু চুপ ক'রে থেকে তিনি আবার বলেন,---খরচের জন্যে ভাববেন না, তার একটা ব্যবস্থা করা যাবে।

উমানাথ এতক্ষণে যেন সমস্ত কথার একটা মানে খুঁজে পেয়ে সকৃতজ্ঞভাবে বলেন,---আপনার অনেক অনুগ্রহ।

পরমুহূর্ত্তে বীরেন্দ্রনারায়ণের কথায় তাঁকে চমকে উঠতে হয় একটু। বীরেন্দ্রনারায়ণ বলেন, ---একটা কথা মনে রাখবেন। এই মাসের মধ্যে আপনার মেয়ের বিয়ে হওয়া দরকার।

এই মাসের মধ্যেই।---উমানাথ সত্যিই বিস্মিত।--কিন্তু হঠাৎ এমন তাড়াহুড়ো ক'রে কি পারব ?

পারতে হবে পুরুত মশাই, মেয়ের বিয়ে এমন কিছু আশ্চর্য্য ব্যাপার নয়। চেষ্টা থাকলে এক-দিনেই দেওয়া যায়।

উমানাথ সত্যি মনে মনে আহত হয়ে ম্লান হেসে বলেন,---আচ্ছা দেখি।

উমানাথ তারপর বিদায় নমস্কার ক'রে চলে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ জমিদার মশাই তাঁকে ডেকে বললেন,---আর শুনুন, বড় আইবুড়ো মেয়ে বাড়ীতে থাকলে যার তার বাড়ীতে আসা উচিত নয়।

উমানাথ ভালো মানুষ হ'লেও নির্ব্বোধ নয়। কথাটার তাৎপর্য্য বুঝে খানিক স্তম্ভিত হয়ে থেকে ধীরে ধীরে বললেন,---বাড়ীতে তো যে সে কেউ আসে না, চৌধুরী মশাই! কখন কখন পরিতোষ, আর এই ক'দিন আমাদের বিজয়- - -

বীরেন্দ্রনারায়ণ উমানাথকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই অত্যন্ত কঠিন স্বরে বললেন,---বিজয় আমার ছেলে ব'লে তার কিছু সাত খুন মাপ নয় পুরুত মশাই!

উমানাথের মুখ দিয়ে আর কোন কথা বার হল না। খানিক চুপ ক'রে ম্লান মুখে দাঁড়িয়ে থেকে তিনি ধীরে ধীরে অবসন্ন পদে বেরিয়ে গেলেন।

মাধবীর কাছে সমস্ত কথা শোনার পর থেকেই বিজয়ের মা অন্নপূর্ণা দেবী স্বামীর কাছে প্রস্তাবটা একবার পাড়বার জন্যে উৎসুক হয়ে ছিলেন। খানিক আগে পুরুত মশাই কাছারী ঘরে স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন জেনে তাঁর একটু কেমন ভরসাও বেড়েছিল। বীরেন্দ্রনারায়ণ কাছারী ঘর থেকে বাড়ীতে ফিরে বিশ্রাম করতে বসা মাত্র তিনি আর অপেক্ষা করতে পারলেন না। ঘরে ঢুকে একটু উদগ্রীব হয়েই জিজ্ঞাসা করলেন,---পুরুত মশাই এসেছিলেন না ? কেন গো ?

বীরেন্দ্রনারায়ণ গম্ভীর মুখে শুধু বললেন,---ডেকে পাঠিয়েছিলাম।

ডেকে পাঠিয়েছিলে ? কেন বল ত ?

বীরেন্দ্রনারায়ণ এবার ঈষৎ হেসে বললেন, ---সে খবরেও তোমার দরকার ?

অনুপূর্ণা স্বামীর কাছে একটা আসনে বসে পড়ে খুশী মুখে বললেন---তা দরকার হ'তে পারে না। আমি পুরুত মশাইয়ের কথাই তোমায় বলতে এলাম যে।

বীরেন্দ্রনারায়ণ আলবোলায় দু'বার টান দিয়ে ঈষৎ কৌতুকের সঙ্গে বললেন,---তা ব'লে ফেল। পূজোর ঘটা একটু বাড়াবার দরকার বুঝি?

না গো না। পুরুত মশাইয়ের একটি মেয়ে আছে জান?—অনুপূর্ণা নিজেই কথাটা এবার পেড়ে ফেললেন।

বীরেন্দ্রনারায়ণের মুখ এক মুহূর্তে গম্ভীর হয়ে উঠল, বললেন,---জানি।

ভারী ভালো মেয়ে, রূপে গুণে একেবারে লক্ষ্মী।

বুঝলাম, তারপর?--বীরেন্দ্রনারায়ণের কণ্ঠস্বর অত্যন্ত কঠিন।

অনুপূর্ণা কিন্তু নিজের উৎসাহেই তখন অধীর, স্বামীর কোন পরিবর্তন লক্ষ্য না ক'রেই বললেন,---পয়সার অভাবে পুরুত মশাই মেয়েটির এখনও বিয়ে দিতে পারেন নি।

বীরেন্দ্রনারায়ণ কঠিন স্বরে বললেন,---এবার যাতে পারেন তার ব্যবস্থার জন্যেই পুরুত মশাইকে ডেকেছিলাম।

তার জন্যে ডেকেছিলে? কি আশ্চর্য্য আমি যে সেই কথাই তোমাকে বলতে এসেছি। সত্যি আমাদের বিজয়ের সঙ্গে এতো ভাল মানাবে---

অনুপূর্ণা উচ্ছ্বসিতভাবে আরো অনেক কিছুই বলতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ স্বামীর গম্ভীর রুক্ষস্বরে তাঁর চমক ভাঙ্গল। বীরেন্দ্রনারায়ণ তাঁকে থামিয়ে বলেন,---বিজয়ের সঙ্গে মানাবার কথা কোথা থেকে আসছে? পুরুত মশাইয়ের মেয়ের বিয়ের সঙ্গে বিজয়ের কোন সম্পর্ক নেই। উনি পাত্র খুঁজবেন, আমি খরচ দেব বলেছি---এই পর্য্যন্ত।

অনুপূর্ণার মুখ এক মুহূর্তে ম্লান হয়ে গেল। কোন আশা আর নেই বুঝেও তিনি শেষ চেষ্টা ক'রে বললেন,---কিন্তু অমন ভাল মেয়ে। আমি যে বড় আশা করেছিলাম।

কিন্তু বীরেন্দ্রনারায়ণ পাহাড়ের চেয়ে কঠিন। স্ত্রীর দিকে ফিরে বেশ একটু তিক্তভাবেই তিনি বললেন,---তোমার আশা একটু অদ্ভুত। একটা কথা ভুলে যেও না যে, শুধু সুন্দরী আর ভালো মেয়ে হ'লেই চৌধুরী বাড়ীর বৌ হবার যোগ্যা হয় না।

অনুপূর্ণা নীরবে ম্লানমুখে স্বামীর শেষ কথা শুনে উঠে যাচ্ছিলেন, বীরেন্দ্রনারায়ণ আবার তাঁকে ডেকে ব'লে দিলেন,---আর বিজয়কে বলে দিও, কালই যেন সে কলকাতায় রওনা হয়। তার এখানে থাকার আর প্রয়োজন নেই।

ভাগ্যের নিষ্ঠুরতম আঘাত মানুষের অতি বড় আনন্দের মুহূর্তেই বুঝি আসে। মাধবী ও মায়ের কাছে আশা ও আশ্বাস পেয়ে বিজয় অত্যন্ত উৎসাহ-ভরেই নির্ম্মলাদের বাড়ীতে গিয়েছিল। মা একবার প্রস্তাব করলে বাবার যে অমত হবে না এ বিষয়ে এখন তার আর কোন সন্দেহ নেই। সেই বিশ্বাসের জোরেই নির্ম্মলাকে সে গিয়ে জানালে--জানো আজ মার মত পেয়েছি, আর মা বললে বাবা যে মত দেবেন সে বিশ্বাস আমার আছে।

নির্ম্মলার মুখে একটু ম্লান হাসি দেখে সে আবার বললে,---এখনো তোমার ভয় ঘোচেনি, না নির্ম্মলা?

নির্ম্মলা শান্তস্বরে বললে,---ভয় নয়, তবে বেশী ভরসা ক'রে দুঃখ পেতেও আমি চাই না।

বিজয় জোর দিয়ে বললে,---দুঃখ পেতে হবে না নির্ম্মলা---

নির্ম্মলা একটু চুপ ক'রে থেকে বললে,---বাবা আজ তোমাদের ওখানেই গেছেন যে। জমিদার মশাই ডেকে পাঠিয়েছেন।

বাবা ডেকে পাঠিয়েছেন---বিজয় এতটা বুঝি নিজেও আশা করেনি। উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে বললে,---আমি জানতাম নির্ম্মলা, বাবা কিছুতেই আপত্তি করবেন না, তাঁর ওপরটাই পাথরের মত শক্ত কিন্তু ভেতরটা কত কোমল তা সকলে বুঝতে পারে না।

হঠাৎ উমানাথের ডাকে বিজয়ের সমস্ত স্বপ্ন পরমুহূর্ত্তেই চুরমার হয়ে গেল। উমানাথ সেই মাত্র কাছারী-বাড়ী থেকে ফিরছেন, তাঁর অবসন্ন বেদনাময় মুখে, বীরেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে সাক্ষাতের সমস্ত ইতিহাস যেন স্পষ্ট ক'রে লেখা। বিজয় পাংশু মুখে কাছে গিয়ে দাঁড়াল। উমানাথ একটু ইতস্তত: ক'রে বললেন,---তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে বাবা---

বিজয় তাঁর সঙ্গে একটু এগিয়ে যাবার পর, তিনি খানিক চুপ ক'রে থেকে অনেক কষ্টে যেন বললেন,---তোমার বাবা নির্ম্মলার বিয়ের জন্যে আমায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন,---নির্ম্মলার বিয়েতে তিনি সাহায্য করতে চান কিন্তু যেখানে হোক বিয়ে এ মাসেই দেওয়া চাই।

বিজয় স্থানুর মত চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। উমানাথ খানিক নীরব থেকে বিজয়ের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কোন মতে জমিদারের শেষ আদেশ জানালেন- -আর---আর, তোমার এ বাড়ীতে আসা-যাওয়া তিনি পছন্দ করেন না।

বিজয় ফোঁস ক'রে উঠল,---আর আমার দুঃখটা বুঝি কিছু নয়। আমি অন্যায় কিছু করতে চাইছি?

আমরা কি তা বলেছি। মাধবী কাতরভাবে বললে,---আমি ত মাকে বলতেই মা রাজি হয়েছেন। কিন্তু বাবার যে একেবারে মত নেই। মাকে তবু আবার একবার বলতে বলেছি।

না, আর কাউকে কিছু বলতে হবে না। আমার যা করবার ঠিক ক'রে ফেলেছি,---বেশ রুক্ষস্বরেই কথাগুলো ব'লে বিজয় ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মা কাছাকাছি থেকে সমস্ত কথাই শুনেছেন। ঘরে ঢুকে ব্যথিত স্বরে বললেন,---কি কবব আমি যে কিছুই ঠিক করতে পারছিনে। উনি যা একবার না ব'লে দিয়েছেন আর তাকে হ্যাঁ করান যে অসম্ভব।

মাধবী এবার উষ্ণস্বরেই বললে,---যাই বল না, বাবার এটা খুব অন্যায়। বংশমর্য্যাদাটা কি এত বড় জিনিষ, যার কাছে মানুষের সব কিছু আশা আনন্দ বলি দেওয়া যায়?

ন্যায় হোক, অন্যায় হোক, বাবার আদেশ চিরকাল নির্বিবচারে মেনে নিতেই বিজয় অভ্যস্ত. কিন্তু এবার যেন তার ভেতর কোথায় বিদ্রোহের আভাষ জেগেছে মনে হয়। মনে হ'ল কি যেন একটা সঙ্কল্প তার মনের ভেতর গড়ে উঠেছে। বাড়ীর আবহাওয়া অত্যন্ত থমথমে। মা সাহস ক'রে বিজয়কে কোন কথা বলতেই পারেন না। বিজয়ের অভিমানের আঘাতটা মাধবীকেই সইতে হয়। বিজয়ের কলকাতা যাবার দিন সকাল বেলা মাধবী কি যেন কথা বলতে দাদার ঘরে এসেছিল, বিজয় তাকে শুনিয়ে দিলে,--বাবা যেতে বলেছেন, বেশ আমি আজই চলে যাচ্ছি। কিন্তু আর যদি গ্রামে না আসি তা হ'লে কিন্তু আশ্চর্য্য হয়ো নি।

মাধবীর চোখ জলে ভরে এল, বললে,---অমন কথা কেন বলছ দাদা। মার মনে কত দুঃখ লাগবে বুঝতে পারছ না?

বিজয় অন্তত: অত সহজে সব কিছু বলি দিতে যে প্রস্তুত নয়, খানিক বাদে পরিতোষের সঙ্গে তার আলাপেই তা বোঝা গেল। বাবার আদেশের বিরুদ্ধে সামনাসামনি বিদ্রোহ করবার সাহস তার না থাকলেও একেবারে নিশ্চেষ্ট হয়ে হাল সে ছেড়ে দেয় নি। পরিতোষকে বাইরে এক জায়গায় ডেকে নিয়ে গিয়ে ব্যাকুলভাবে সে বলছে, শোনা গেল, ---তোমাকে এটা করতেই হবে ভাই। তুমি ছাড়া আর কেউ আমাদের বাঁচাতে পারে না।

পরিতোষ তখন গভীরভাবে এই সমস্যার কথাই ভাবছে, কোন উত্তর তার কাছে না পেয়ে বিজয় আবার সকাতরভাবে বললে,---দুটো জীবন একেবারে ছারখার হয়ে যায় এই কি তুমি চাও? নির্ম্মলার যদি অন্য জায়গায় বিয়ে হয়, আমাদের দুজনের কি যে হবে তা কি তুমি বুঝতে পারছ না। আমরা আর কেউ ছেলেমানুষ নই পরিতোষ। আমাদের মনের দাগ জলের দাগ নয়।

কিন্তু আমি ভাবছি এ রকম গোপন ব্যাপারের পরিণামটা কি ঠিক ভাল হবে?---পরিতোষের গলার স্বরে অনিশ্চয়তার গভীর উৎকণ্ঠা।

বিজয় ব্যাকুলভাবে বোঝাবার চেষ্টা করলে,---পরিণাম কিছু খারাপ হ'তে পারে না পারিতোষ। আমি জানি, বাবা আজ যাই বলুন, একদিন সবই ক্ষমা করবেন, মার ত মত এখনই আছে।

একটু চুপ ক'রে থেকে সে আবার বললে,---এখন শুধু কাজটা হয়ে যাওয়া দরকার। নির্ম্মলার বাবা দুর্ব্বল, নিরীহ লোক। আমি চলে গেলে যাতে কোন পীড়নেও নির্ম্মলার বিয়ে তিনি আর না দিতে পারেন, সেইটে আমি করে যেতে চাই।

বিজয়ের যুক্তি হয় ত নিতান্ত অবহেলার যোগ্য নয়, তবু পরিতোষ আর একবার বলে দেখলে,---তোমার বাবা যাতে মত দেন, তার আর একবার চেষ্টা করলে হয় না?

না ভাই, হয় না---বিজয় দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে জানালে,--বরং হিমালয়কে টলান যাবে তবু বাবাকে এখন টলান যাবে না। শুধু তাতে তাঁর জেদ বাড়বে এবং সমস্ত পণ্ড হয়ে যাবে। এখন আমি যা বলছি তাই একমাত্র পথ।

খানিক নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থেকে আর একবার বিষয়টা যেন নিজের মনে ভেবে নিয়ে পরিতোষ বললে,---বেশ চলো!

একবার কর্ত্তব্য স্থির ক'রে ফেললে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্বকে প্রশ্রয় দেবার মত লোক পরিতোষ নয়। নির্ম্মলার বাবা উমানাথের কাছে পরিতোষই ব্যাপারটা বুঝিয়ে বল্লে,---এ ছাড়া আর কোন উপায় ত দেখছি না উমাখুড়ো। আর সত্যি জমিদার মশাই একমাত্র ছেলের ওপর চিরকাল রাগ ক'রে থাকতে পারেন না। একদিন তিনি নিজের ভুল বুঝতে পেরে সব ক্ষমা করবেনই।

নিরীহ উমানাথ কেমন যেন একটু বিমূঢ় হয়ে গেছলেন। পরিতোষের ওপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস তবু তিনি একবার বললেন,---কিন্তু লুকিয়ে বিয়েটা বড় খারাপ কাজ হয় না?

লুকিয়ে শুধু ক'দিনের জন্য। যতদিন না বাবার এই জেদটা কেটে যায়,---এবার বিজয় বুঝিয়ে বল্লে।

উমানাথ তার দিকে ফিরে বললেন,---তার চেয়ে কিছুদিন অপেক্ষা করলে হ'ত না! ততদিনে তোমার বাবার মত---

বিজয় জোরের সঙ্গে বললে,---অপেক্ষা করবার কোন দরকার নেই, আমি বলছি এতে কোন অন্যায় হবে না। একথাও আমি বলছি যে, বাবা ভবিষ্যতে আমায় ক্ষমা করেন ভাল, না করলেও আমি দুঃখ করব না। যা উচিত মনে করি তার জন্য সব রকম ত্যাগ করতে আমি প্রস্তুত।

উমানাথ খানিক চুপ ক'রে থেকে পরিতোষকেই উদ্দেশ ক'রে বললেন,---আমি কিছু বুঝতে পারছি না পরিতোষ। ভাল-মন্দ আমি কিছুই ভাবতে পারছি না। শুধু তুমি যদি মত দাও---

আমিও যে না বলতে পারছি না উমাখুড়ো।---ব'লে পরিতোষ তার অমত না করার আসল কারণ জানালে,---তা ছাড়া আমার মতে, আসল মনের বন্ধন যেখানে হয়ে গেছে সেখানে বাইরের অনুষ্ঠান লুকিয়ে না প্রকাশ্যে হ'ল সেটা অবান্তর। জমিদার মশাইয়ের অমতটা তাই আমার কাছে খুব বড় কথা নয়।

তা হ'লে যা ব্যবস্থা হয় তুমিই কর।---বললেন উমানাথ।

---ব্যবস্থা আজ রাত্রেই করতে হবে উমাখুড়ো। এখানে গোপনে বিয়ে সেরেই বিজয় কলকাতায় রওনা হয়ে যাবে।

সেই রাত্রে অতি গোপনে উমানাথের ভাঙা কুঁড়েতে বিজয় ও নির্ম্মলার বিয়ে হয়ে গেল। সাক্ষী রইল একা পরিতোষ। সে বিয়েতে ঘটা নেই, উৎসব নেই, সমস্ত অনুষ্ঠানের ওপর কি যেন একটা আশঙ্কার ছায়া। গোপনে বিয়ে সেরেই বিজয়কে ট্রেণ ধরবার জন্যে বাড়ী গিয়ে ষ্টেশনের জন্যে রওনা হ'তে হ'ল। নির্ম্মলার কাছে ভাল ক'রে বিদায় নেবার সময়টুকুও তার মিলল না।

গ্রামের অন্ধকার পথে শশিভূষণের সঙ্গে ঘোড়ার গাড়ীতে যেতে যেতে বিজয় বুঝি চলে আসবার আগে ম্লান আলোয় দেখা নির্ম্মলার কাতর মুখখানির কথাই ভাবছিল। নব বর-বধূর এ এক অদ্ভুত বিদায় নেওয়া। কতদিনে আবার দু'জনের দেখা হবে কেউ জানে না। কি যে তাদের ভাগ্যে আছে, অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে কিছুই তারা অনুমান করতে পারে না।

বিজয় আচ্ছন্নের মত ষ্টেশনে পৌঁছল। তাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় তুলে দিয়ে শশিভূষণ যখন নিজের থার্ডক্লাস গাড়ীতে গিয়ে উঠলেন তখন বিজয়ের ভাবগতিক তাঁকেও চিন্তিত ক'রে তুলেছে।

নির্ম্মলার সে রাত্রে ঘুম আর আসে না, আসবার কথাও নয়। একা ঘরে বিছানার ওপর বসে সে বুঝি গত কয়দিনের অপ্রত্যাশিত ঘটনাগুলির ধারাই ভাল ক'রে বোঝবার চেষ্টা করছিল। হঠাৎ মনে হ'ল কে যেন বাইরের দরজায় ধীরে ধীরে আঘাত করছে। নির্ম্মলা উঠে দাঁড়াল।

দরজায় আবার টোকার শব্দ পেয়ে ঘরের লণ্ঠনটির আলো বাড়িয়ে বাহিরের উঠানে গিয়ে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলে, কে?

আমি নির্ম্মলা, দরজা খোল।

একি! এত বিজয়ের কণ্ঠস্বর! নির্ম্মলা কম্পিত বুকে দরজা খুলে বললে,---তুমি, তুমি চলে যাওনি!

না নির্ম্মলা, যেতে পারলাম না! ট্রেণ থেকে নেমে চলে এলাম।

ট্রেণ থেকে নেমে---নির্ম্মলা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে।

খুব কি অন্যায় করেছি নির্ম্মলা? তুমি কি খুব রাগ করলে?

নির্ম্মলা তার দিকে খানিক চেয়ে থেকে ধীরে ধীরে বললে,---না, রাগ করিনি। কিন্তু তুমি আসবে যে তা - - -

বিজয় ব্যাকুলভাবে তার কথাটা নিজেই পূরণ ক'রে বললে,---ভাবতে পারনি কেমন? আমি কাল সকালেই চলে যাব নির্ম্মলা, কেউ কিছু জানবার আগেই চলে যাব। শুধু তোমায় আর একবার না দেখে যেতে পারলাম না। মনে হ'ল কতকাল আর দেখা হবে না, কত কথার কিছুই বলা হয় নি - - -

কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গিয়ে বিজয় আবার একটু ক্ষুণ্নস্বরে বললে,---না, তুমি অসন্তুষ্ট হয়েছ বুঝতে পারছি, আমি তা হ'লে এখুনি যাচ্ছি।

নির্ম্মলা এবার কাতর হয়ে বললে,---না না, তোমায় যেতে ত আমি বলি নি। আমি বাবা-মাকে ডাকি?

তাদের ডাকবে? বিজয় যেন একটু সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল। কিন্তু এখন না ডাকলেও কোন ক্ষতি নেই নির্ম্মলা, কাল সকালে যাবার আগে ডাকলেই হবে।

একটু চুপ ক'রে থেকে সে আবার হেসে বললে,---হয় ত তুমি ভয় পাচ্ছ নির্ম্মলা। আমাদের বিয়ে যে হয়ে গেছে তাও তুমি ভুলে যাচ্ছ বোধ হয়।

তা ভুলবো কেন? নির্ম্মলা হেসে মাথা নীচু করলে।

তা হ'লে আমরা কি এখানেই দাঁড়িয়ে থাকব নির্ম্মলা!---বিজয় হেসে জিজ্ঞাসা করলে।

না, না, এস।---ব'লে নির্ম্মলা আলো দেখিয়ে বিজয়কে ঘরে নিয়ে গেল। বিজয় ঘরে গিয়ে বিছানার ওপর বসে নির্ম্মলাকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হেসে বললে,---ওইখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে? কাছে এসে বসতে নেই বুঝি?

নির্ম্মলা হেসে কাছে এসে দাঁড়াতে বিজয় আবার বললে,---সত্যি এখনো তোমার দূরে থাকতে ইচ্ছে করে!

সলজ্জ হেসে নির্ম্মলা বললে,---ইচ্ছা করলেই কি আসা যায়?

বিজয় আদর ক'রে কাছে টেনে নিয়ে বললে,---কেন যায় না নির্ম্মলা! কোন বাধা ত আজ সত্যি নেই। আর কেউ না জানুক, আমরা ত জানি আমাদের বিয়ে হয়েছে। সে বিয়েতে কি তোমার বিশ্বাস নেই?

বিশ্বাস না থাকলে এমন ক'রে এখানে থাকতে পারতাম? আমি সে কথা ভাবছি না ---

কি ভাবছ তুমি---জিজ্ঞাসা করলে বিজয়।

ভাবছি তোমার বাড়ীতে যদি জানতে পারেন।

বিজয় হেসে বললে---কেউ জানতে পারবে না। কাল ভোরে ট্রেণে আমি চলে যাব। সেখানে গিয়ে বলব, মাঝখানে একটা ষ্টেশনে চা খেতে নেমে আর উঠতে পারি নি।

নির্ম্মলাকে হাসতে দেখে বিজয় আবার বললে,---হাসছ নির্ম্মলা। ভাবছ কত ফন্দি না ক'রে এসেছি। কিন্তু সত্যি কোন ফন্দি আগে থাকতে করি নি। হঠাৎ ট্রেণে উঠে আর বসতে পারলাম না। মনে হ'লো তোমায় একবার না দেখলে নয়, কোন কথাই তোমার কাছে আমার বলা হয় নি।

বিজয় তার জামাটা খুলে এবার টেবিলের ওপর রাখলে। সেটা গুছিয়ে রেখে নির্ম্মলা জিজ্ঞাসা করলে---তুমি বুঝি অনেক দিন কোলকাতায় থাকবে?

হ্যাঁ, এখনকার হিসেবে অনেকদিন, হয় ত দু'মাস সেখানে থাকতে হবে। এতদিন অন্ততঃ তোমার হাতের চিঠি না পেলে কিছুতেই থাকতে পারব না। চিঠি দেবে ত?

কিন্তু তোমার ঠিকানা ত জানি না।

বিজয় হেসে বললে,---সেই জন্যেই আবার এলাম নির্ম্মলা। মনে হ'লো ঠিকানাটাও তোমায় ব'লে আসা হয় নি।

পকেট থেকে একটা কাগজ বার ক'রে তার ওপর ঠিকানা লিখে বিজয় নিজের ফাউণ্টেন পেনটা শুদ্ধ টেবিলের ওপর রেখে বললে,---এই আমার ঠিকানা লেখা রইল, আমার কলমটাও সঙ্গে সঙ্গে রেখে দিলাম। এই কলমটা দেখলে অন্ততঃ আমায় চিঠি লেখার কথা তোমার মনে পড়বে নির্ম্মলা। আচ্ছা কালই আমায় একটা চিঠি লিখবে, বল, লিখবে? বল অন্ততঃ, একদিন অন্তর তোমার চিঠি আমি পাবই।---বিজয়ের স্বরে অসীম ব্যাকুলতা।

আর তুমি বুঝি লিখবে না?

নিশ্চয় লিখবো,---ব'লে হঠাৎ বিজয় আলোটা নিভিয়ে দিলে।

কেন, আলোটা কি দোষ করলে?--হেসে জিজ্ঞাসা করলে নির্ম্মলা।

বিজয়ের হাসি শোনা গেল অন্ধকারে,---দোষ করে নি। বাইরের চাঁদের আলো ওর ভয়ে ঢুকতে পারছে না ঘরে।

বিজয় কোলকাতা রওনা হয়ে যাবার দুদিন পরেই জমিদার বীরেন্দ্রনারায়ণ শশিভূষণের কাছ থেকে একটি চিঠি পেলেন। চিঠির শেষ দিকটা পড়ে তাঁকে বিশেষ চিন্তিত দেখা গেল। সরকার মশাই লিখেছেন---

কাল সত্যিই চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলাম। বিজয় বাবাজীবন অবশ্য নিরাপদেই আজ আসিয়া পৌঁছিয়াছে। শুনিলাম পথে ট্রেণ হইতে কোন কারণে নামিয়া আর সময় মত উঠিতে পারে নাই। সেই জন্যে পরের ট্রেণে তাহাকে আসিতে হইয়াছে। ব্যাপারটা কেমন অস্বাভাবিক বলিয়া আপনার গোচর না করিয়া পারিলাম না। আমার নমস্কার জানিবেন। নিবেদন, ইতি:

বশংবদ

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়

বিজয়ের মা কি কাজে সেই সময়ে ঘরে এসেছিলেন। স্বামীর হাতে চিঠি দেখে তিনি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন,---কার চিঠি গো? বিজয় এর মধ্যে চিঠি দিয়েছে?

না বিজয় নয়, সরকার মশাই।---বীরেন্দ্রনারায়ণ গম্ভীর মুখে জানালেন।

অনুপূর্ণা উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, সরকার মশাই। কেন? বিজয়ের শরীর-টরির - - -

শরীর তার ভালই আছে। কোন ভয় নেই। তবে আমায় আজই কোলকাতায় যেতে হবে।---অত্যন্ত অপ্রসন্ন মুখে কথাগুলো ব'লে জমিদার উঠে পড়লেন।

অনুপূর্ণার উদ্বেগ তাতেই বেড়ে গেল। বললেন,---তুমি আমায় কি যেন লুকোচ্ছ। সত্যি বল, বিজয়ের কিছু হয়েছে কি?

তোমায় বলবার মত কিছু হয় নি, জেনে রেখো সে ভালোই আছে।---ব'লে জমিদার ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

কোলকাতায় বিজয়ের পড়াশুনার জন্যে একটি আলাদা বাসা ঠিক করা আছে। দেখাশুনা করে শশিভূষণ।

বীরেন্দ্রনারায়ণ পরের দিনই সেখানে গিয়ে উঠলেন এবং সকালেই তাঁকে শশিভূষণের সঙ্গে গম্ভীর মুখে বিজয়ের প্রসঙ্গই আলোচনা করতে দেখা গেল।

বীরেন্দ্রনারায়ণ গম্ভীর মুখে শশিভূষণকে জিজ্ঞাসা করলেন,---কোথায় নেমেছিল তুমি কিছু টের পাও নি?

কি ক'রে পাব বলুন, আমি ত ভিন্ন কামরায়। পাহারা দিতে হবে জানলেও না হয় জেগে থাকতাম।---শশিভূষণের সেই নিজস্ব অদ্ভুত গলার স্বর ও ভঙ্গি। সসঙ্কোচে কৈফিয়ৎ দিচেছন, না মনে মনে হাসছেন, বোঝবার উপায় নেই।

খানিক চুপ ক'রে থেকে বীরেন্দ্রনারায়ণ বললেন, কোলকাতায় পেঁৗছেই আমায় তার কর নি কেন?

আপনাকে মিছামিছি ব্যতিব্যস্ত করবার ভয়ে। সেখান থেকে ত আপনি কিছুই করতে পারতেন না, শুধু বাড়ীর সবাই ব্যতিব্যস্ত হ'ত। একটু থেমে শশিভূষণ আবার বললে,---আমি গ্রামের ষ্টেশন মাষ্টারকে 'তার' করেছিলাম।

এবার জমিদার মশাই সত্যি অবাক্ হলেন,---গ্রামের ষ্টেশন মাষ্টারকে?

শশিভূষণ জমিদার মশাইয়ের বিস্ময়টা একটু উপভোগ ক'রে বললেন,---হ্যাঁ, তাঁর ফিরতি 'তারে'ই জানলাম, বিজয় পরের দিন ভোরের ট্রেণে সেখান থেকে রওনা হয়।

বিজয় রাত্রে গ্রামেই ছিল! কোথায়?---বীরেন্দ্রনারায়ণ চেষ্টা ক'রেও গলার স্বর সংযত রাখতে পারলেন না।

শশিভূষণ অসহায় ভাব ক'রে বললেন,---তা কি ক'রে জানবো বলুন?

জমিদার গম্ভীর হয়ে শুধু বললেন,--হুঁ। তারপর তিনি সে ঘর থেকে চলে যাবার উপক্রম করতেই শশিভূষণ হঠাৎ আবার বললেন,---বিজয়ের নামে গ্রাম থেকে একটা চিঠিও এসেছে। চিঠিটা আমাদের বাড়ীর নয়।

বীরেন্দ্রনারায়ণ থমকে দাঁড়ালেন। তারপর শশির দিকে অবাক হয়ে খানিক চেয়ে থেকে বললেন,---চিঠি তাকে দিয়েছ?

না, এখনও দিই নি।

চিঠিটা দাও,---ব'লে জমিদার হাত বাড়ালেন এবং শশীর কাছ থেকে চিঠিটা নিয়ে চলে যেতে যেতে বললেন,---চিঠিটা আমার কাছে থাক।

জমিদার মশাই ঘর থেকে চলে যাবার পর শশিভূষণ আপন মনে হেসে নিজের কাজে বসতে যাচেছন, এমন সময়ে বিজয় হাসিমুখে এসে বললে,---Good Morning শশীকাকা। ও তুমি আবার গুড মর্ণিং টর্ণিং বোঝ না কিন্তু সুপ্রভাত বোঝ ত? চমৎকার সকাল যাকে বলে। কি চমৎকার সকালটা আজ বল ত?

শশিভূষণ একটু হেসে বললেন,--আমাদের ত আর সকাল নেই বাবা, সন্ধ্যে ঘনিয়ে এসেছে।

বিজয় হেসে উঠল, তারপর জিজ্ঞাসা করলে, আচ্ছা কাকা, আমার চিঠি-পত্র কি এসেছে দাও দেখি।

ক্ষণেকের জন্যে শশিভূষণের মত লোককেও যেন একটু বিব্রত মনে হ'ল। তিনি একটু থতমত খেয়ে বললেন,---চিঠি! না, কই চিঠি ত আসে নি।

না, না, নিশ্চয় এসেছে, তুমি দেখ,---বিজয় নাছোড়বান্দা।

শশিভূষণ আরো যেন বিব্রত হয়ে বললেন,---দেখব কি বল, চিঠি ত আর অদৃশ্য জিনিষ নয়!

বিজয়ের মুখের হাসি এবার সত্যি মিলিয়ে গেল। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল নির্ম্মলার চিঠি আসবেই---চিঠি আসে নি, সত্যি চিঠি আসে নি? সে আরেকবার জিজ্ঞাসা করলে, তারপর শশিভূষণকে মাথা নাড়তে দেখে অত্যন্ত বিষণ্ণ মুখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

চৌধুরী মশাই নিজের ঘরে গিয়ে চিঠি খুলে পড়ে প্রথমে স্তম্ভিত তারপর একেবারে রেগে আগুন হয়ে উঠলেন। তৎক্ষণাৎ শশিভূষণকে নীচে থেকে ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন গম্ভীর স্বরে,----এ চিঠিতে কি আছে জান?

আজ্ঞে না, আমি তখুলে পড়ি নি। শশিভূষণের কণ্ঠস্বরে একটু যেন প্রচ্ছন্ন কৌতুক।

চৌধুরী মশাইয়ের সেইটুকু লক্ষ্য করবার মত অবস্থা তখন নয়। রাগে আগুন হয়ে তিনি বললেন, বিজয় লুকিয়ে পুরুত মশাইয়ের মেয়েকে বিয়ে করেছে।

শশিভূষণের মুখেও এবার বুঝি বিস্ময়ের চিহ্ন দেখা গেল। জমিদার মশাইয়ের রাগ চড়েই চলেছে, বললেন,---আমার মতের বিরুদ্ধে সে লুকিয়ে বিয়ে করতে সাহস করল! কিন্তু ও জানে না যে, বীরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী নিজের ছেলের অপরাধও ক্ষমা করে না।

শশিভূষণ বেশ শান্তকণ্ঠে মন্তব্য করলেন,---হয় ত জানে বোলেই লুকিয়ে বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছে।

জমিদার মশাই তাঁর দিকে বিরক্তভাবে একবার তাকালেন, তারপর গম্ভীর স্বরে বললেন,---এ বিয়ে আমি মানব না। আমি ওকে ত্যাজ্যপুত্র করব।

তাতে বিয়েটা ওর কাছে বাতিল হয়ে যাবে না,---আবার মন্তব্য করলেন শশিভূষণ।

জমিদার মশাই আবার আগুন হয়ে উঠলেন,---এই অন্যায় আমি তা ব'লে সহ্য করব?

ন্যায় অন্যায় আপনি জানেন; তবে সহ্য না করবার সোজা পথ ছেলেকে ত্যাগ করা নয়,---শশিভূষণের স্বর এবার বেশ গম্ভীর।

চৌধুরী মশাই খানিক চুপ ক'রে থেকে এই কথাটাই যেন ভালো ক'রে ভেবে নিয়ে বললেন,---আমি আবার ওর বিয়ে দেব।

শশিভূষণ হাসলেন,---ও আপনারই ছেলে। জোর ক'রে মোচর দিতে গেলে ভেঙ্গে যাবে। ওকে সইয়ে সইয়ে ছাড়া নোয়ান যাবে না।

এবারেও চৌধুরী মশাইকে বেশ খানিকক্ষণ ভাবতে হ'ল। তারপর তিনি বললেন,---বেশ আজ থেকে পুরুত মশাইয়ের বাড়ীর কোন চিঠি যেন ওর হাতে না যায়। সমস্ত চিঠি আসবামাত্র তুমি ছিঁড়ে ফেলবে।

আর বিজয় যে চিঠি দেবে?---জিজ্ঞাসা করলেন শশিভূষণ।

বিজয় ত নিজে চিঠি ফেলে না?

তা ফেলে না বটে, আমার হাত দিয়ে ডাকঘরে পাঠায়, বললেন শশিভূষণ।

চৌধুরী মশায় হুকুম দিলেন,--সে চিঠিও যেন ডাকঘরে না পৌঁছয়। বিজয়ের গ্রামে যাওয়াও আমি বন্ধ করলাম।

শশিভূষণ একটু হেসে বললেন,---শুধু তাতেই কিছু হবে ব'লে মনে হয় না। কুপথ্যি বন্ধ হ'লেই রোগ সারে না, ওষুধও চাই।

হুঁ, তার ব্যবস্থাও করব।

জমিদার মশাইয়ের কথা শেষ হবার আগেই যেন ভাগ্যের নির্দ্দেশের মত বাইরে একটা মোটরের হর্ণ বেজে উঠল।

দেখা গেল একটি বেশ সমৃদ্ধ চেহারার মোটর সেখানে এসে থেমেছে। ভেতরে তিনটি তরুণা ও একজন বর্ষিয়সী মহিলা। দুবার ড্রাইভার হর্ণ দেবার পরও কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে বর্ষিয়সী মহিলা বললেন,---কই কারুর ত সাড়া নেই। ঠিক এই বাড়ী ত?

সবচেয়ে ছোট মেয়েটি বুঝি একটু বেশী চঞ্চল। সে ব'লে উঠল,---হ্যাঁ, হ্যাঁ মা, নম্বর দেখতে পাচ্ছ না?

মা ড্রাইভারকে উদ্দেশ ক'রে বললেন,---যাও না ড্রাইভার, তুমি না হয় নিজে নেমেই চিঠিটা দিয়ে এস না। তাতে তোমার মান যাবে না।

ড্রাইভার নেমে গিয়ে দরজায় দু'বার ধাক্কা দিয়ে কোন সাড়া-শব্দ না পেয়ে ফিরে এসে বললে---কৈ কাউকে ত দেখতে পেলাম না।

কেউ কিছু বলবার আগেই ছোট মেয়েটি ড্রাইভারের হাত থেকে চিঠিটি নিয়ে দরজা খুলে নেমে পড়ল। তারপর----আচ্ছা আমিই যাচ্ছি।

একটা চিঠি দিয়ে আসতে মারামারি ব্যাপার !---ব'লে দে ছুট।

সমস্বরে মা ও বোনেরা এবার পিছন থেকে চীৎকার ক'রে উঠলেন।---এই বুলা, বুলা! দেখচ কাণ্ড! ছিঃ ছিঃ, কি হচেছ কি বুলা!

কিন্তু বুলা তখন একেবারে দরজায়. সেখান থেকে ফিরে একবার বললে,---আমি এখুনি দিয়ে আসছি মা।

তারপর ভেতরে সে অন্তর্দ্ধান।

গাড়ীতে মার অবস্থা দেখে বোঝা গেল বুলাই তার জীবনের একটি প্রধান উৎকণ্ঠা ও উপদ্রব। প্রায় মূর্চ্ছা যাবার উপক্রম হয়ে হাতপাখা চালাতে চালাতে বললেন,---না মান সম্ভ্রম আর রইল না। বুলা আমায় পাগল ক'রে দেবে। বড় মেয়েকে উদ্দেশ ক'রে বললেন,---অনু, আমার স্মেলিংসল্ট্।

মেয়েরা মায়ের পরিচর্য্যায় ব্যস্ত হয়ে উঠল।

বুলা তখন দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে সিঁড়ি দিয়ে তর্-তর্ ক'রে উঠে একেবারে জমিদার মশাইয়ের ঘরে গিয়ে হাজির হয়েছে। জমিদার মশাই ও শশিভূষণ দু'জনেই তাকে দেকে অবাক। সে কিন্তু বেশ সপ্রতিভভাবে জিজ্ঞাসা করলে,---এটা বীরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর বাড়ী ত?---তারপর উত্তরের অপেক্ষা না ক'রেই জমিদার মশাইয়ের কাছে এসে নমস্কার ক'রে বললে,---বাঃ আপনিই ত জ্যাঠামশাই!

বীরেন্দ্রনারায়ণ একেবারে হতভম্ব,---আমি?

হ্যাঁ, আমি দেখেই চিনেছি, বীরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর নাম কি যাকে তাকে মানায়! আমি কিন্তু ভেবেছিলাম আপনার---ব'লেই খিল্‌খিল্ ক'রে হেসে উঠে বুলা বললে,---না বলব না।

জমিদার মশাই এই অনর্গল হাসি ও কথার মধ্যে একটু ফাঁক পেয়ে সবিস্ময়ে বললেন,---কিন্তু আমি ত---

কথা আর তাঁকে শেষ করতে হ'ল না। বুলা আবার হেসে উঠে বললে,---আমায় চিনতে পারছেন না বুঝি? আমি বাবার কাছ থেকে আসছি। ওই যা! দেখেছেন কি ভুল! শুধু বাবা বললে আপনি চিনবেন কি ক'রে? আমার বাবা হ'লেন রাজীব মুখোপাধ্যায়---

এতক্ষণে জমিদার মশাই একটু আলো দেখতে পেয়ে বললেন,---ও তুমি রাজীবের মেয়ে?

হ্যাঁ, ছোট মেয়ে,---বুলার কথার উৎস আবার খুলে গেল।---আপনি আমায় চিনতে পারেননি ত? কি ক'রে চিনবেন! আমায় কত ছোট দেখেছেন, আর আমি এখন দিদির সমান লম্বা হয়ে উঠেছি। কিন্তু দিদির মত সুন্দর হইনি। মা ত রোজ বলে তাল গাছ! ওই যা আসল কথাই ভুলে যাচিছ। বাবা একটা চিঠি দিয়েছেন আপনাকে।

চিঠিটা বার ক'রে চৌধুরী মশাইয়ের হাতে দেবার পর, তিনি পড়বার উপক্রম করতেই বুলা হেসে বললে,---চিঠি আর পড়বেন কি? আপনাদের যেতে হবে আমাদের বাড়ী, আজকেই। আপনি আর আপনার যে ছেলে এখানে থাকেন। বাবার অসুখ কি না, পেন্সন নিয়ে কোলকাতায় আসা অবধি অসুখ। অসুখের চেয়ে অবশ্য অসুখের বাতিক বেশী। রাতদিন খালি ভাবেন, অসুখ হয়েছে। আমরা কত হাসি। ব'লেই বুলা আর এক দফা হেসে নিলে, তারপর বললে,---হ্যাঁ, যা বলছিলাম। বাবার অসুখ ব'লে আসতে পারলেন না, কিন্তু বাবা আমাদের পাঠিয়েছেন।

জমিদার মশাই সস্নেহে হেসে বললেন,---বোলো আমি নিশ্চয়ই যাব!

বুলা তৎক্ষণাৎ ব'লে উঠল,---সে আমি জানতাম! আপনারা খুব পুরনো বন্ধু না? বাবার কাছে আপনার কত গল্প শুনেছি।

হঠাৎ একটা কথা মনে হওয়ায় সে উঠে পড়ে বললে,---না, আমি যাই তাড়াতাড়ি। মা, দিদিরা এতক্ষণ বোধ হয় ভেবে সারা হচেছন। ওঁরা যা ভীতু।

জমিদার মশাই একটু ব্যস্ত হয়ে পড়ে বললেন,---তোমার মা, দিদিরা এসেছেন নাকি?

এসেছেন ত! ওই বাইরে মোটরে আছেন। কথাটা ব'লে ফেলেই জিভ্ কেটে সে বললে,---ওই যা আপনাকে ব'লে ফেললাম, মা শুনলেই রাগ করবেন। ওঁরা এখন unofficially এসেছেন কিনা!---

বুলার আবার হাসি উথলে উঠল। আমি যাই এখন,---ব'লে দরজা পর্য্যন্ত ছুটে গিয়ে সে আবার বললে,---তখন কি বলতে যাচ্ছিলাম জানেন? বলতে যাচ্ছিলাম যে, আমি ভেবেছিলাম, আপনার আরো মস্ত গোঁফ হবে।

তারপর আর বুলা সেখানে দাঁড়ায়। সিঁড়িতে দ্রুত পায়ের শব্দের সঙ্গে একটা মিষ্টি উচ্ছ্বসিত হাসি শোনা গেল।

জমিদার মশাই এমন মেয়ে তাঁর জীবনেও দেখেন নি। এ যেন প্রাণের উচ্ছ্বসিত ঝরণাধারা। তিনি স্নেহ-স্নিগ্ধ মনে মেয়েটির কথাই ভাবছিলেন। শশিভূষণের কথায় তাঁর যেন চমক ভাঙল।

রাজীববাবুর মেয়েগুলি সুন্দরী ব'লে মনে হয়। তবে বোধ হয় একটু হাল-ফ্যাসানের।

জমিদার মশাই একটু কি যেন ভেবে নিয়ে বললেন,---হ্যাঁ, আজ বিজয়কে নিয়ে ওদের বাড়ী যাব ঠিক করলাম। অনেক দিনের পুরনো বন্ধু!

আর কোন কথা তারপর হ'ল না। জমিদার মশাইয়ের ঘর থেকে নীচে নামতে নামতে শশিভূষণকে গুন গুন ক'রে গাইতে শোনা গেল---

আমার দোষ কিছু নাই শঙ্করী।
সাধুর সাথে সাধু সাজি চোরের সাথে সড় করি।

বিজয় ঘরে বসে নির্ম্মলাকে চিঠি লিখছিল। লিখছিল,---

এই সামান্য কথাটুকু তুমি রাখতে পারবে না আমি সত্যই ভাবি নি নির্ম্মলা। আমি সত্যই বিশ্বাস করেছিলাম তোমার চিঠি পাবো। একটুখানি চোখের আড়াল হ'তেই যদি এমন ভুল হয়, তা হ'লে আমায় ভুলতে তোমার ত বেশীদিন লাগবে না। তোমার চিঠি না পেয়েও এই চিঠি দিচ্ছি। এর উত্তর দিতে একটুও দেরী ক'রো না কিন্তু---

চিঠি লেখার মাঝেই চৌধুরী মশাইয়ের বাইরে থেকে ডাক শোনা গেল,---বিজয়।

তাড়াতাড়ি চিঠি শেষ ক'রে বিজয় সেটি পকেটে ফেলে উত্তর দিলে,---যাই বাবা।

বাইরে বেরিয়ে আসতেই জমিদার মশাই গম্ভীর স্বরে আদেশ দিলেন,---তুমি তৈরী হয়ে নাও তাড়াতাড়ি। আমার সঙ্গে বেরুতে হবে।

কোথায় বাবা?

আমার পুরনো বন্ধু রাজীববাবুর বাড়ী। কোলকাতায় কিছুদিন হলো এসেছেন, তোমার আলাপ করা বিশেষ দরকার।

বিজয় একটু ইতস্ততঃ ক'রে বললে,--কিন্তু আমি---

যাও, তৈরী হয়ে নাও শাগ্‌গির। অসহিষ্ণুভাবে আদেশ দিয়ে চৌধুরী মশাই চলে গেলেন।

বিজয় খানিক নিরুপায় হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে শশিভূষণের কাছে গিয়ে বললে,---এই চিঠিটা এখুনি ফেলবার ব্যবস্থা করবে শশীকাকা, ভয়ানক জরুরী, বুঝেছ!

শশিভূষণকে চিঠিটা দিয়ে ক্ষুণ্নস্বরে বললে,---বাবার আবার কি খেয়াল, রাজীববাবুর বাড়ী যেতে হবে।

শশিভূষণ উত্তরে একটু হাসলেন মাত্র। সে হাসির অর্থ বিজয় আর কেমন ক'রে বুঝবে!

চৌধুরী মশাইয়ের পুরাতন বন্ধু রাজীববাবু এককালে বড় সরকারী চাকুরে ছিলেন। এখন অবসর গ্রহণ ক'রে কলকাতায় বাড়ী ক'রে সেইখানেই বাস করছেন। অবস্থা বেশ ভালো, রুচি মার্জিত ও আধুনিক। তবে স্ত্রী হেমাঙ্গিনীর সামাজিক উচ্চাশায় মাঝে মাঝে তাঁকে একটু বিব্রত হ'তে হয়। রাজীববাবু থেকে আরম্ভ ক'রে মেয়েরা সবাই হেমাঙ্গিনীর শাসনে তটস্থ। এক ছোট মেয়ে বুলা যা একটু ব্যতিক্রম। হেমাঙ্গিনীর ভ্রূকুটিও তাকে সব সময়ে দাবিয়ে রাখতে পারে না।

সেদিন সকাল বেলা বীরেন্দ্রনারায়ণ ও তাঁর ছেলের অভ্যর্থনার জন্যই হেমাঙ্গিনী একটু বেশী ঘটা ক'রে আয়োজন করেছেন। আসবাবপত্র থেকে মেয়েদের সাজ-পোষাক সব দিকেই তাঁর প্রখর দৃষ্টি পড়ছে। বড় মেয়ে অনিমা ড্রইং-রুমে ফুলদানিতে ফুল সাজাচ্ছিল। ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে

হেমাঙ্গিনী সেখানে ঢুকে মেয়ের পোষাকের দিকে চেয়ে বিরক্ত হয়ে উঠলেন,---অনিমা, তবু তুমি 'হাইকলার'টা পরে আস নি? না, তোমাদের নিয়ে আর পারব না! আর ওই শাড়ীটা! না, কতবার বলব, ও ছাই রঙ তোমায় মানায় না, flame colourটা পর নি কেন?

অনিমা মার কথার ওপর কথা ক'ওয়া বৃথা বুঝেও মৃদু প্রতিবাদ করে,---কিন্তু মা---

হেমাঙ্গিনী একেবারে অধৈর্য্য হ'য়ে পড়েন,---না, তোমরা আমায় পাগল ক'রে দেবে। একটা সামান্য জামা পর্য্যন্ত নিজেরা বুঝে পরতে পার না।

এবার পেছন থেকে বুলার হাসি শোনা যায়। সে ব'লে ওঠে,---আমি বললাম দিদিকে, মা তোমায় একেবারে আগুন না লাগিয়ে ছাড়বেন না। একেবারে ছুঁলেই ভস্ম!

হেমাঙ্গিনী গম্ভীরভাবে ধমক দিয়ে বলেন,---বুলা!

বুলা অতিকষ্টে হাসি চেপে অন্য দিকে মুখ ফেরায়। হেমাঙ্গিনী অনিমাকে আবার আদেশ দেন,---যাও অনিমা, যাও, হাই-কলার ব্লাউস আর সেই শাড়ীটা পরে এসো। আমায় আর জ্বালাতন করো না।

রাজীববাবু তখন ঘরে ঢুকছেন, একটুখানি মেয়ের পক্ষে ওকালতি করবার চেষ্টা ক'রে বলেন,---কেন মিছামিছি এত ব্যস্ত হচ্চ বল ত। এ ত আর state reception নয়। আমার পুরনো বন্ধু আসছেন তাঁর ছেলেকে নিয়ে - - -

তুমি চুপ কর দেখি!---হেমাঙ্গিনী ধমকে ওঠেন।---তোমার বন্ধুর তোমার মত রুচি না'ও হ'তে পারে। যাও অনিমা, যাও। দাঁড়িয়ে থেক না।

বুলার হাসির সঙ্গে টিপ্পনি শোনা যায়,---যাও না দিদি, শেষে মার আবার এখুনি smelling salt-য়ের দরকার হবে।

সত্যি বুলাকে নিয়ে আর পারা যায় না। হেমাঙ্গিনী আবার শাসন করেন,---বুলা।

বুলা একেবারে নেহাৎ ভাল মানুষের মত মার কাছে এসে দাঁড়িয়ে বলে,---না মা, আমি শুধু বলছিলাম, তোমায় মিছামিছি জ্বালাতন করা কেন! আমি এ জামাটা বদলে আসব না?

না, তোমায় আর জামা বদলাতে হবে না।---হেমাঙ্গিনী অপ্রসন্ন মুখে অন্য দিকে চলে যান।

বুলা যেন নিতান্ত ক্ষুণ্ণ হ'য়ে বলে,---বেশ, বদলাব না! তারপর মেজদিদি লিলির কাছে দুঃখ জানিয়ে বলে,---জানিস মেজদি, মার শুধু দিদি আর দিদি। আমাদের পোষাকের একবার খুঁতও ধরে না!

লিলি নেহাৎ নিরীহ শান্ত মেয়ে। তার মুখে কদাচিৎ একটা কথা'ও শুনতে পা'ওয়া সৌভাগ্য। বুলা তাই বাবার কাছে গিয়ে নালিশ জানিয়ে বলে,---খুব অন্যায় নয় বাবা?

রাজীববাবু একটু হেসে আদর ক'রে বলেন---তোমাদের পালাও আসবে মা, কোন ভাবনা নেই। যতদিন নিরাপদে আছ, দুঃখ ক'রো না।

রাজীববাবু রসিকতাটা গোপনেই করবার চেষ্টা করেছিলেন, হেমাঙ্গিনীর কিন্তু কথাটা কানে যায়। তারপর আর রক্ষা আছে। হেমাঙ্গিনী রুদ্র-মূর্ত্তিতে স্বামীকে শাসন করেন,---ওই ক'রেই ত মেয়েগুলির মাথা খেয়েছে। আমি যা করব তাতেই শুধু ঠাট্টা।

হঠাৎ বাইরের দরজায় 'বেল' বেজে উঠতেই এ যাত্রা রাজীববাবু নিষ্কৃতি পান।

হেমাঙ্গিনী ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে বলেন,---ওই, ওই এসেছে বোধ হয়। যা'ও বুলা যা'ও, অনিমাকে ডাক শীগ্‌গির। দেখ দেখি কি কাণ্ড---হেমাঙ্গিনী সাদর অভ্যর্থনার উপযুক্ত হাসি মুখে টেনে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ান। কিন্তু তাঁকে এবার হতাশ হ'তে হয়। বীরেন্দ্রনারায়ণ ও তাঁর ছেলের বদলে একটি সুবেশ এবং একটু বোকা বোকা ধরণের ছেলে ঘরে ঢুকে বলে,---আমি---আমি, am I welcome? মানে আমি কি স্বাগত?

ও, তুমি!---হেমাঙ্গিনী মুখের বিরক্তি গোপনের কোন চেষ্টা করেন না।

আগন্তুক ছেলেটি একটু বিব্রতভাবে বলে---I didn't know I was expected, মানে জানতাম না আমি প্রত্যাশিত।

বুলা হেসে উঠে বলে,---না মিঃ হালদার, আপনি অপ্রত্যাশিত, দেখছেন না মা কি রকম - - -

বুলার কথা শেষ হবার আগেই হেমাঙ্গিনী হাঁক দেন,---বুলা---

না, মা, আমি শুধু বলছিলাম, মিঃ হালদার হঠাৎ আজ এসে পড়ায় মা কি রকম খুশী হয়েছেন।--- বুলা তৎক্ষণাৎ একেবারে নিরীহ ভাল মানুষটি।

মিঃ হালদার অবস্থাটা বুঝতে না পেরে নির্ব্বোধের মত একটু হাসেন।

রাজীববাবু তাঁর ওপর দয়াপরবশ হয়ে বলেন,---বসুন মিঃ হালদার। আজ আমার একজন বন্ধু আসছেন কিনা, সবাই তাই একটু ব্যস্ত।

মিঃ হালদার আশ্বস্ত হয়ে এক জায়গায় বসে বলেন,---I see, I hope I shall not be in the way---মানে, আশা করি, আমি পথের বাধা হব না।

হ'লে একটু সরে দাঁড়াবেন তৎক্ষণাৎ,---ফোড়ন দেয় বুলা।

সকলে হেসে ওঠে এবং সেই হাসাহাসির মধ্যেই চৌধুরী মশাই বিজয়কে নিয়ে প্রবেশ করেন। রাজীববাবু এগিয়ে যান তাঁদের দিকে।

হেমাঙ্গিনী অস্থির হয়ে উঠে বলেন,---দেখ দেখি, অনিমা এখনও নামল না।

বুলা ব'লে ফেলে,---দাঁড়াও মা, যা হাই-কলারের ফরমাস করেছ। তাড়াতাড়ি নামতে পারছে না।---তারপর চট ক'রে মার দৃষ্টির অন্তরালে সরে পড়ে।

নেহাৎ অতিথিদের সামনে ব'লে হেমাঙ্গিনীকে শাসনটা আপাততঃ স্থগিত রাখতে হয়।

রাজীববাবু বীরেন্দ্রনারায়ণ ও বিজয়কে সঙ্গে ক'রে ভেতরে এনে বলেন,---ওঃ কতদিন বাদে দেখা বল ত?

হ্যাঁ, আমি ত তোমার ছোট মেয়েকে দেখে চিনতে পারি নি,---ব'লে চৌধুরী মশাই চারিধারে একবার চোখ বুলিয়ে দেখেন,---তোমার কি এই দুটি মেয়ে নাকি?

হেমাঙ্গিনী তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে জানান,---না বড়টি, বড়টি এখনও আসে নি। নমস্কার। নমস্কার, ভাল আছেন ত?---বীরেন্দ্রনারায়ণ ও বিজয় দু'জনে হাত তুলে নমস্কার করেন।

ভাল আর কই? এইটি বুঝি আপনার ছেলে?--- সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করেন হেমাঙ্গিনী।

হ্যাঁ, এই আমার ছেলে বিজয়, এখানে কলেজে পড়ে।

রাজীববাবু সস্নেহে বললেন, আমি আগে ত জানতাম না, তা হ'লে আগেই কবে ডেকে আনতাম।

চৌধুরী মশাই বলেন,---এখন থেকেই আসবে। এখানে তুমিই ত ওর অভিভাবক।

খুব ভাল কথা। বিজয়, এটা তোমার নিজের বাড়ী মনে করবে এখন থেকে,---ব'লে বীরেন্দ্র-নারায়ণের দিকে ফিরে রাজীববাবু বলেন,---চল হে আমরা এদের ছেড়ে একটু নিরিবিলি বসে গল্প করিগে যাই।

চ'ল ব'লে বীরেন্দ্রনারায়ণও উঠে পড়েন।

বুলা হঠাৎ হেসে ব'লে ওঠে,---বাবা, প্রথম দিনেই যেন শুধু অসুখের গল্প ক'রো না। জ্যাঠা-মশাই আর তা হ'লে আসবেন না।

বুলা!---হেমাঙ্গিনীর চাপা গলার ভর্ৎসনা শোনা যায়।

রাজীববাবু ও বীরেন্দ্রনারায়ণ কিন্তু বুলার কথায় হেসে উঠে তাকে একটু আদর ক'রে ওপরে চলে যান।

হেমাঙ্গিনী এবার বিজয়ের প্রতি ভালো ক'রে মনোযোগ দেন,---এইখানে এতদিন আছ অথচ চেনা পরিচয় হয়নি, কি আশ্চর্য্য বল ত! এ সব তোমার আপনার জনের মত। এইটি আমার মেজ মেয়ে লিলি, এইটি আমার ছোট মেয়ে বুলা।

বুলা সঙ্গে সঙ্গে জুড়ে দেয়,-- ভাল নাম বিনীতা এবং মার চোখের শাসন যেন দেখতেই পায় নি এমনিভাবে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

ইতিমধ্যে মিঃ হালদারের কাশির শব্দ শোনা যায়।

বুলা সেদিকে ফিরে হেসে উঠে বলে,---মা, তুমি মিঃ হালদারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছ না। উনি neglected মানে, কি বলে অবহেলিত বোধ করতে পারেন।

বুলাকে শাসন করা সম্বন্ধে হতাশ হয়ে হেমাঙ্গিনী অপ্রসন্ন স্বরে বলেন,---হ্যাঁ, উনি আমাদের একজন পরিচিত,---মিঃ হালদার।

মিঃ হালদারের পক্ষে কিন্তু ওইটুকুই যথেষ্ট, উচ্ছ্বসিতভাবে বিজয়ের করমর্দ্দন ক'রে তিনি বলেন,---so glad to meet you, মানে আপনার সহিত সাক্ষাৎ হয়ে অত্যন্ত খুশী।

জানেন বিজয়বাবু, মিঃ হালদার ইংরাজী কথা কিছুতেই বলবেন না ঠিক করেছেন। বুলা মিঃ হালদারের পরিচয়টা স্পষ্ট ক'রে দেয়।

মিঃ হালদার একগাল হেসে বলেন,---হ্যাঁ, আমি কি বলে ওই একটু foreign travel, মানে বিদেশ ভ্রমণ ক'রেই বাংলা ভুলে যাওয়াটা একেবারে unpardonable crime, মানে ক্ষমাহীন অপরাধ মনে করি।

হাসাহাসির মধ্যে অনিমা এসে ঘরে ঢোকে। দেখা যায়, মার কথামত পোষাক সে এখনও বদলায় নি। হেমাঙ্গিনীর কঠোর ভর্ৎসনা নেহাৎ বিজয় উপস্থিত ব'লেই জিভের আগায় এসে আট্‌কে যায়। তিনি যথাসম্ভব নিজেকে সম্বরণ ক'রে অনিমার পরিচয় দেন। তারপর সকলকে বসতে ব'লে বলেন,---চা-টা আসছে, ততক্ষণ একটু গান-টান হ'তে পারে, কি বল বিজয়?

বিজয় গোড়া থেকেই এই অপরিচিত আবেষ্টনে একটু আড়ষ্ট; নেহাৎ অসহায়ভাবে জানায়,---আজ্ঞে তাই হোক না।

হেমাঙ্গিনী উচ্ছ্বসিত স্বরে বলেন,---তোমায় বিজয় বলছি ব'লে কিছু মনে করো না যেন। তুমি বলতে গেলে আমাদের ঘরের ছেলের মত।

বিজয় কিছু বলবার আগেই মিঃ হালদার অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ স্বরে ব'লে ওঠেন,---আমায় কিন্তু হালদার ব'লে ডাকা আপনার অন্যায়।

হেমাঙ্গিনী তাকে একেবারে অবজ্ঞা ক'রে বিজয়কে বলেন,---তুমি একটা গান গাও না বিজয়!

না, আমায় অনুরোধ করবেন না।---বিজয় সলজ্জভাবে জানায়।

আচ্ছা অনিমাই একটা ধর না।---বলেন হেমাঙ্গিনী।

আজকে নয় মা---অনিমা আপত্তি করে।

কিন্তু সে আপত্তি টেঁকে না। হেমাঙ্গিনী কঠিন স্বরে বলেন,---আজকে নয় মানে? কেন, আজকে কি দোষ হয়েছে?

অনিমা নেহাৎ অনিচ্ছার সঙ্গে উঠে যায়। মিঃ হালদার তার পিছু পিছু যাবার চেষ্টা করতেই হেমাঙ্গিনী ধমক দিয়ে ওঠেন,---আহা তুমি আবার কোথায় যাচ্ছ, হালদার?

মিঃ হালদার থতমত খেয়ে বললেন,---না, এই পিয়ানোটা বাজাতে।

ও নিজেই বাজিয়ে গাইতে পারবে, তুমি বোস। ---হেমাঙ্গিনী ধমক দেন। মিঃ হালদার শুকনো মুখে এসে বুলা ও লিলির মাঝে বসে পড়েন। চায়ের আয়োজন তখন এসে পড়েছে। মিঃ হালদারের প্লেটে বুলা স্তূপাকার ক'রে কেক্ টোষ্ট সাজাতে থাকে। মিঃ হালদার আপত্তি জানাবার চেষ্টা করলে হেসে উঠে বলে,---ওটা consolation, মানে সান্ত্বনা।

বিজয় কোলকাতায় গিয়েছে কবে! কিন্তু আজও নির্ম্মলা তার কাছ থেকে একটি চিঠিও পায় নি। প্রতিদিন আকুল আগ্রহে রতন পিওনের ডাক বিলির সময় সে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে। প্রতিদিন হতাশভাবে তাকে ফিরতে হয় ঘরে। বিজয়ের এ ঔদাসীন্যের কোন মানে সে খুঁজে পায় না! কোন অপরাধ ত সে করে নি! তবে বিজয় এরই মধ্যে কি তাকে ভুলে গেল? না, সে কথা নির্ম্মলা বিশ্বাস করতে পারে না। তাদের শেষ বিদায়ের আগেকার সেই রাতের কথা তার মনে এখনও যে উজ্জ্বল হয়ে আছে! বিজয়ের সেই আকুলতা, সেই আশ্বাস সে কি শুধু ভান? না, নির্ম্মলা তা বিশ্বাস করতে পারে না। কিন্তু তাহ'লে বিজয় এমনভাবে নীরব হয়ে আছে কি ক'রে? আশঙ্কায় দুর্ভাবনায় নির্ম্মলার দিনরাত্রি দুর্ব্বহ হয়ে ওঠে। ম্লান মুখে প্রতিদিন সে চিঠির আশায় দরজায় দাঁড়িয়ে থেকে যখন ফিরে আসে

তখন মনে হয়, পৃথিবী বুঝি অন্ধকার হয়ে গেছে।

মা কাতরভাবে জিজ্ঞাসা করেন,---রতন পিওন গেল না এ দিক দিয়ে?

নির্ম্মলা কোন জবাব দিতে পারে না।

আজও বিজয়ের কোন চিঠিপত্র এলো না?---মা উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞাসা করেন।

না,---ব'লে নির্ম্মলা নিজের ঘরে বিছানায় মুখ গুঁজে উদ্যত অশ্রু দমন করবার চেষ্টা করে।

এদিকে বিজয়ও নির্ম্মলার অদ্ভুত আচরণের কোন কারণ খুঁজে পায় না। দিনের পর দিন তার এতগুলি চিঠির একটিরও উত্তর সে কি দিতে পারত না! কি তার বাধা? কি তার অসুবিধা? এতগুলি চিঠির একটিও কি সে পায় নি? এমন কথা ত বিশ্বাস করা যায় না। মাসের পর মাস কেটে যায়। বিজয় কি যে করবে কিছুই ভেবে পায় না!

শশিভূষণ সবে বুঝি নির্ম্মলার কাছ থেকে আসা একটি চিঠি ছিঁড়ে ছেঁড়া কাগজের চুবড়িতে ফেলেছেন। বিজয় ক্লান্ত ম্লান মুখে ঘরে ঢুকে বলে,---আজও কোন চিঠিপত্র নেই বোধ হয় শশিকাকা।

না, চিঠি ত নেই কোন!---শশিভূষণের কণ্ঠেও যেন কথাটা বেধে যায়।

বিজয় চুপ ক'রে খানিক দাঁড়িয়ে থেকে বিষণ্ণ স্বরে বলে,---জানো কাকা, আমি ছুটিতে দেশে যেতে চেয়েছিলাম, বাবা বারণ ক'রে চিঠি লিখেছেন; আমার দেশে যাওয়া কেন বারণ, বলতে পার কাকা?

শশিভূষণ তার মুখের দিকে চাইতে পারেন না, বলেন,---বোধ হয় পড়াশুনার ক্ষতি হবে ভেবে---

কেন, দেশে কি পড়বার জায়গা নেই?

দেশে ত তুমি নিজেই আগে যেতে চাইতে না বিজয়?---বলেন শশিভূষণ।

বিজয়ের মনের ক্ষোভ আর চাপা থাকে না। বলে,---কিন্তু এখন যদি দেশে যেতে চাই তবে অন্যায়টা কি হয়? আমার কি নিজের দেশে যাবার অধিকারও নেই?

শশিভূষণ একটু চুপ ক'রে থেকে বলেন,---অধিকারের কথা ত হচ্ছে না বিজয়। তোমার বাবা নিশ্চয় তোমার ভালর জন্যেই---আপাতত---

বিজয় এবার আর নিজেকে সামলাতে পারে না। উগ্রস্বরে বলে,---হ্যাঁ, তোমরা সবাই মিলে আমার ভালোই কর শুধু। এত ভালো আর সইতে পারছি না।

শশিভূষণ কি যে জবাব দেবেন ভেবে পান না।

হঠাৎ দরজায় বুলার তরল মধুর হাসির শব্দ শোনা যায়। অনিমা ও লিলির সঙ্গে ঘরে ঢুকে সে হেসে বলে,---কেমন আমি বলেছিলাম না বিজয়দাকে বাড়ীতেই পাব! যা কুনো লোক, উনি আবার কোথায় বেরুবেন!

বিজয়ের কাছে এগিয়ে গিয়ে তার হাত ধ'রে সে বলে,---নিন্ তাড়াতাড়ি আসুন দেখি।

সে কি! কোথায় যাব?---অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে বিজয়।

বাঃ! আমরা যে Picnic-এ যাচ্ছি। আপনাকে অবশ্য আগে থাকতে জানান হয় নি, কিন্তু সেটা ইচ্ছে করে। জানলে আপনি আগে থাকতে পালাবার সুযোগ পেতেন ত?---বুলা হেসে ওঠে।

অনিমা মৃদু ভর্ৎসনা করে,---আঃ বুলা!

বুলা মুখখানা অত্যন্ত গম্ভীর ক'রে দিদির কাছে এসে শাসনের সুরে বলে,---দেখ দিদি, মার মত কথায় কথায় খিট্-খিট্ ক'রো না। তোমায় মানায় না।

কিন্তু ওর যদি যাবার ইচ্ছে না থাকে!---অনিমা মৃদুস্বরে জানায়।

ইচ্ছে আছে গো আছে। তোমারি মতন, প্রাণ চায় চক্ষু না চায় ভাব!---ব'লে বুলা হেসে ওঠে। অনিমা বুলার মুখের কাছে হার মেনে নিরুপায় হয়ে একটু সরে দাঁড়ায়।

বুলা গম্ভীরমুখে বিজয়ের দিকে ফিরে তাকে দোষ দেয়,---দিলেন ত দিদিকে চটিয়ে?

আমি? কেন, আমি কি করলাম? বিজয় সঙ্কুচিতভাবে বলে।

বাঃ আপনি ছাড়া কে? আমরা এতগুলো মেয়ে এসে অনুরোধ করছি তার কোন দাম নেই? জানেন, আর কেউ হ'লে ধন্য মনে করত। জানেন, মিঃ হালদার কখন থেকে সেজেগুজে এসে বসে আছেন। তবু তাঁকে বলতে গেলে নেমন্তনুই করা হয় নি।

এবার সবাই হেসে ওঠে। বুলা বিজয়কে জোর ক'রে টানতে টানতে বলে---নিন্ চলুন, আপনার কোন আপত্তি শুনছি না।

নির্ম্মলাদের বাড়ীর দরজায় হঠাৎ সেদিন সাড়া পড়ে গেল। জমিদার বাড়ীর জমকালো পাল্কী সেখানে এসে থেমেছে। পাল্কীর ভেতর থেকে নেমে আসে জমিদারের মেয়ে মাধবী। নির্ম্মলা বাড়ীর দাওয়াতেই প্রতিদিনের মত ম্লানমুখে বসে ছিল। হঠাৎ মাধবীকে দেখে অবাক হয়ে উঠে এসে বলে, এ কি মাধবী!

মাধবী তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলে,---তবু ভাল। তুই চিনতে পারলি!

তাকে সঙ্গে নিয়ে দাওয়ায় আসন পেতে বসিয়ে নির্ম্মলা বলে,---তুই আসবি ভাবতেই পারি নি---

তা ত পারবিই না, কিন্তু না এসে কি করি বল, তুই ত আর যাবি না।

আমি কি ক'রে যাই বল?---নির্ম্মলা ম্লানমুখে বলে।

কেন ঘোমটা দিয়ে চৌদোলায় চড়ে,---মাধবী পরিহাসের সুরে কথাটা ব'লেই নির্ম্মলার ম্লানমুখের দিকে চেয়ে থেমে যায়। তারপর গলার স্বর তার গাঢ় হয়ে আসে বেদনায়,---তেমনি ক'রে নিয়ে যাবার ব্যবস্থাই ত করেছিলাম, কিন্তু ভাগ্যে হ'ল কই!

নির্ম্মলা নীরবে মুখ ফিরিয়ে থাকে।

মাধবী আবার বলে,---কেন যে বাবার এত জেদ বুঝি না, দাদা ত সেই থেকে আর দেশে পর্য্যন্ত আসে না। মা রাতদিন কাঁদাকাটা করে। বাড়ীতে এমন একটা---

এ সব কথা থাক মাধবী,---শান্তস্বরে নির্ম্মলা বাধা দেয়।

নির্ম্মলার মুখের দিকে চেয়ে ব্যথিত স্বরে মাধবী বলে,---না, সত্যি আমারই অন্যায়। এ সব কথা বলতেও তোর কাছে আসেনি। শ্বশুরবাড়ী চলে যাচ্ছি কে জানে কতদিনের জন্যে। তার আগে তোর সঙ্গে একবার দেখা না ক'রে যেতে পারলাম না।

মাধবী নির্ম্মলার মুখটি ধরে নিজের দিকে সাদরে ফেরাতে ফেরাতে হঠাৎ চমকে উঠে সবিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। নির্ম্মলা শক্ত হয়ে বসে থাকে কাঠের মত।

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে মাধবী ধরা গলায় বলে,---আমি যে কিছু বুঝতে পারছি না নির্ম্মলা?

নির্ম্মলার চোখ দিয়ে এবার নিঃশব্দে জলের ধারা নেমে আসে, কিন্তু তবু কণ্ঠস্বর তার শান্ত। তুমি এসেছ ভালই হয়েছে! সব কথা শুনে যাও। তারপর যা বিবেচনা হয় কোরো।

ইতিমধ্যে মা সেখানে এসে পড়েন। মাধবী তাঁর পায়ের ধূলো নেবার পর তিনি হেসে বলেন,---তখন থেকে দুজনে চুপ ক'রে বসে আছিস? তোদের কি ঝগড়া-ঝাটি হ'ল নাকি?

মাধবী জোর ক'রে হাসবার চেষ্টা ক'রে বলে---হ্যাঁ মাসীমা, ভয়ানক ঝগড়াঝাটি। একেবারে মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে যাবে। আপনি এখান থেকে যান দেখি। আমরা চুপচাপ ঝগড়াটা শেষ ক'রে নি।

মা একটু স্নেহের হাসি হেসে সেখান থেকে সরে যান।

নির্ম্মলা একে একে সমস্ত ঘটনাই মাধবীর কাছে খুলে বলে। একটিমাত্র দরদীর কাছে এমন ক'রে প্রাণের কথা খুলে বলতে পাওয়া যেন তার কাছে একটা সৌভাগ্য। মাধবী সমস্ত শুনে অনেকক্ষণ গুম হয়ে চুপ করে থাকে। তারপর কাতর স্বরে বলে,---আমি ত সবই বুঝলাম। কাল শ্বশুরবাড়ী চলে যাচ্ছি, সেখানে বা এখানে ঘুণাক্ষরেও কেউ আমার কাছ থেকে এ কথা জানতে পারবে না। তবু গাঁয়ে বেশীদিন কি এ কথা

লুকিয়ে রাখা চলবে? কেউ কি এখনও কিছু সন্দেহ করে নি?

হয় ত করেছে!---উদাসভাবে বলে নির্ম্মলা।

সব বুঝেও কিছুই আমার ক্ষমতা নেই, এই আমার সবচেয়ে দুঃখ। না আমি যাই,---ব'লে চোখের জল মুছে হঠাৎ মাধবী উঠে চলে যায়।

নির্ম্মলা তাকে পাল্‌কী পর্য্যন্ত এগিয়ে দিতে যেতেও যেন পায়ের জোর পায় না। স্থানুর মত সেইখানেই উদাসভাবে বসে থাকে।

গ্রামের লোকের সন্দেহ করার কথাটা নেহাৎ অমূলক কল্পনা নয়। পুকুরঘাটে পাড়ার মেয়েদের ঘোঁট ইতিমধ্যে পাকাতে শুরু করেছে দেখা যায়। স্নান করতে করতে একটি মেয়েকে সঙ্গীর সঙ্গে আলাপ করতে শোনা যায়।

হ্যাঁ লো হ্যাঁ, আমরা ত আর ঘাসে মুখ দিয়ে চরি না। তুই-ই বল না, এই ক'মাস তাকে পুকুরঘাটে দেখেছিস কোন দিন?

যাকে প্রশ্নটা করা হয়, সে বিস্ময়ের ভান ক'রে বলে,---তা দেখিনি বটে, কিন্তু তলে তলে এত কাণ্ড তা কি ক'রে জানব বল?

এক গাদা বাসন নিয়ে এসে ঘাটের উপর সশব্দে নামিয়ে নতুন আগন্তুক একটি বর্ষিয়সী মহিলা বলেন,---তলে তলে কি কাণ্ড লা মালতী?

না, না, ও কিছু না লক্ষ্মীদি!---বলে মালতী।

মালতীর সখি প্রতিবাদ ক'রে বলে,---আহা বলই না, লক্ষ্মীদিকে বলতে ভয়টা কিসের? আমরা ত কারুর চালায় ঘর বেঁধে থাকি না।

তারপর সে বেশ রসাল স্বরে বলে,---ব্যাপারটা আর কি বলব লক্ষ্মীদি। খবর ত আর কিছুই রাখ না? তোমাদের পাড়ায় অমন একটা বিয়ে হয়ে গেল।

কার আবার বিয়ে হলো পাড়ায়?---চতুর্থ মহিলার এবার আবির্ভাব হয়।

মালতী এবার নিজেই সোৎসাহে জানায়,---হয়েছে গো রামের মা, হয়েছে, অত ধূমধাম যজ্ঞি, কিছু টের পেলে না। তোমরা তা হ'লে কানে তুলো দিয়ে ছিলে বোধ হয়।

বর্ষিয়সী মহিলা এবার সবিস্ময়ে বলেন,---লক্ষ্মীর যেমন কথা! আমরা কানে তুলো দিয়ে থাকি! বলে পাড়ার কেউ কুটোটি নাড়লে আমরা টের পাই। একটা বিয়ে এমনি হয়ে গেলেই হ'ল?

মালতী বলে,---বিয়ে না হ'লে কেউ কখন মাথায় সিঁদূর দেয় শুনেছ!

এবার পর পর মন্তব্য হয়---

ওমা সে আবার কি কথা!

সেই ত কথা!

বলিস কি লা, কি ঘেন্না, কি ঘেন্না!

ছিঃ ছিঃ, গলায় দড়ি জোটে না মা!

বর্ষিয়সী মহিলা এবার আসল কথা পাড়েন,---তা কাক-পক্ষী টের পেল না? বিয়েটা হলো কার সঙ্গে? বর কি হাওয়ায় এল হাওয়ায় গেল নাকি?

একজন প্রস্তাব করে, চল না সেটা জিজ্ঞেস ক'রেই আসি। খুব রগড় হবে কিন্তু।

এ প্রস্তাবে সকলেরই সায় আছে দেখা যায়।

মানুষের মধ্যে কোথায় বুঝি নিষ্ঠুরতার চিরন্তন বীজ আছে। দুর্ব্বল অসহায়কে উৎপীড়ন করায় তার অহেতুক আনন্দ! পাড়ার মেয়েরা পুকুরঘাট থেকে সদল বলে সত্যিই নির্ম্মলাদের বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হয়। একজন ডাক দেন,---কোথায় গো নির্ম্মলার মা! নির্ম্মলার মা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে এতগুলি প্রতিবেশিনীকে একত্র দেখে কি যেন অজানা আশঙ্কায় শিউরে ওঠেন। মেয়েদের একজন ব্যঙ্গ ক'রে বলে,--অনেকদিন দেখাশোনা নেই, তাই একবার দেখতে এলাম গো, সব ভাল ত?

নির্ম্মলার মা সঙ্কুচিতভাবে বলেন, হ্যাঁ, সব ভাল।

কই নির্ম্মলা গেল কোথায়? কতদিন তাকে দেখিনি।

মা আরো সঙ্কুচিত হয়ে উঠে কাতরভাবে বলেন,---তার শরীরটা খুব খারাপ কিনা।

ও শরীর খারাপ বুঝি! তাই বলি নির্ম্মলাকে পাড়ায় দেখতে পাই না কেন?---নিষ্ঠুরভাবে একজন পরিহাস করে।

আর একজন তারি সঙ্গে ফোড়ন দিয়ে বলে,---কত দিন শরীর খারাপ গা ? সবাই হেসে 'ওঠে।

মালতী বুঝি সবার অগ্রণী। সে বলে,---শরীর খারাপ ব'লেই ত দেখ্‌তে আসা। কি বল গো ?

তা ছাড়া আর কি ? আর শরীর খারাপের ওষুধ-পত্তরও ত আছে।

মার চোখ এবার বেদনায় অপমানে অশ্রু-সজল হয়ে আসে---কাতরভাবে মিনতি ক'রে বলেন,---আমরা তোমাদের কাছে কোন অপরাধ ত করিনি, কেন তোমরা আমাদের নিয়ে তামাসা করতে এসেছ ?

সকলে যেন আকাশ থেকে পড়ে বলে,---তামাসা, 'ওমা ! আমরা তামাসা আবার কোথায় করলাম ! নির্ম্মলাকে অনেক দিন দেখিনি তাই ---

নির্ম্মলা অনেকক্ষণ ঘরের ভেতর থেকে এদের ব্যঙ্গ বিদ্রূপ নীরবে শুনেছে, এবার আর সে বসে থাকতে পারে না। ধীর অবিচলিতভাবে বাইরে এসে দাঁড়িয়ে কঠিন স্বরে বলে,---এই আমি এসেছি।

প্রথমটা সবাই তার মুখের দিকে চেয়ে তার দৃপ্ত কঠিন ভঙ্গিতে একটু বুঝি বিব্রতবোধ করে। তারপর সে অস্বস্তি সামলে উঠতে দেরী হয় না। একজন বলে,---না'ও দেখা হ'ল ত? তোমরা নিশ্চয়ই ভেবে সারা হচ্ছিলে।

মালতী তার কাছে এগিয়ে গিয়ে বলে,---সত্যি ভাই নির্ম্মলা, অনেকদিন তোকে না দেখে এমন ভাবনা হয়েছিল।

তারপর হঠাৎ নির্ম্মলার মাথাটা ধরে সকলের দিকে ঘুরিয়ে সে পরম উল্লাসে বলে,---দেখ গো যা বলেছিলাম ঠিক কিনা ?

ওমা, তাই ত সত্যিই !

সিঁথিতে সিঁদূর যে !

কবে বিয়ে হ'লো গো নির্ম্মলার মা ?

পাড়া-পড়শী আমরা, আমাদের একটা খবর দিলে না ?

নির্ম্মলা ঠিক প্রস্তর মূর্ত্তির মতই দাঁড়িয়ে থাকে। মার চোখে জল ভরে 'ওঠে, কিন্তু তার চোখে শুধু যেন আগুন।

আগন্তুকেরা এবার আর দাঁড়াতে যেন ভয় পায়। চলে যেতে যেতে একজন শুধু টিপ্পনি ক'রে বল্লে,---চলো গো চলো, বিয়েতে না করুক, নির্ম্মলার মা নাতির ভাতে নেমতন্ন করবে'খন।

সবাই চলে যাবার পর মা-ই প্রথম একেবারে ভেঙ্গে পড়েন। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন,---এ যে আর সহ্য হয় না মা, কি জন্যে এত লাঞ্ছনা তোকে সইতে হবে ?

নির্ম্মলা মার দিকে ফিরে তাকায়, জীবনের অসীম অতল হতাশা এর চেয়ে গভীরভাবে মানুষের দৃষ্টিতে বুঝি ফুটে উঠতে পারে না। অত্যন্ত অস্ফুট গলায় সে বলে,---এর চেয়ে আরো লাঞ্ছনা যে বাকি আছে মা,---তারপর আর দাঁড়াতে না পেরে দা'ওয়ার ধারে বসে পড়ে।

মা নির্ম্মলার গলার স্বরে হঠাৎ অত্যন্ত শঙ্কিত হয়ে 'ওঠেন। ব্যাকুলভাবে তার কাছে গিয়ে ব'সে তাকে দু'হাতে জড়িয়ে সভয়ে প্রশ্ন করেন,---আরো ?

এতক্ষণ বাদে নির্ম্মলার সমস্ত আত্মসম্বরণের চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। মায়ের কোলের উপর মুখ গুঁজে পড়ে সে কেঁদে ফেলে,---হ্যাঁ মা, আরো। এখনও কেউ কিছুই জানে না মা, তোমাকেও সাহস ক'রে বলিনি ---

অশ্রুর উচ্ছ্বাসে কথা আর সে শেষ করতে পারে না। মার মুখ দিয়ে অস্ফুট আর্ত্তনাদের মত শুধু বার হয়,---নির্ম্মলা।

যে সম্ভাবনার কথা তাঁর কল্পনাতেও স্থান পায় নি তারই আকস্মিক নিদারুণ উপলব্ধিতে তিনি একেবারে বিমূঢ় হয়ে যান।

মার কোল থেকে অশ্রুপ্লাবিত মুখ তুলে নির্ম্মলা শুধু একবার আহত পাখীর মত কাতরভাবে মার দিকে তাকিয়ে আবার মার কোলে লুটিয়ে পড়ে। স্তব্ধ স্তম্ভিত পাথরের মূর্ত্তির মত মা ও মেয়ে অনেকক্ষণ সেইখানেই নিঃশব্দে বসে থাকে। পরস্পরকে কোন কিছু বলবার ভাষা আর তাঁদের নেই।

কিন্তু এমন সর্ব্বনাশের মুখে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকাও সম্ভব নয়। নির্ম্মলার মা পরের দিন সকালেই

উমানাথকে সমস্ত ব্যাপার বুঝিয়ে বলেন,---না, তোমাকে যেতেই হবে। বুঝতে পারছ না কি সর্ব্বনাশ তা হ'লে হবে। আর কি আমাদের লজ্জা সঙ্কোচের সময় আছে। আমাদের মান-সম্ভ্রম, মেয়েটার জীবন পর্য্যন্ত যে যেতে বসেছে।

নিরীহ ভালমানুষ উমানাথ এই বিপদে আরো যেন বিমূঢ় হয়ে পড়েন। আচ্ছন্নের মত তিনি বলেন,---আমি যাচ্ছি। কিন্তু জমিদারকে ত তুমি চেন না। একবার তাঁর কথা রাখি নি। তিনি যে আর কোন অনুনয় বিনয়ে গলবেন, তা'ত মনে হয় না।

নির্ম্মলার মা কাতরভাবে বলেন,---কেন তিনি কি মানুষ নন, তাঁর কি হৃদয় পাষাণ? তাঁর নিজের রক্ত যেখানে বইছে সেখানে'ও কি তাঁর একটু মমতা হবে না! একটা নিরীহ নিরপরাধ মেয়েকে এত বড় কলঙ্কের মধ্যে তিনি ঠেলে দেবেন! এমন ক'রে আমাদের সর্ব্বনাশ ক'রে তাঁর কি লাভ হবে!

উমানাথের আশঙ্কাই কিন্তু সত্য, চৌধুরী মশাই তাঁকে রীতিমত অপমান ক'রেই বলেন,---আজ আমার কাছে কি জন্যে এসেছেন পুরুত মশাই? আপনার মেয়েকে কলঙ্কের হাত থেকে বাঁচাতে? তার জন্য আমার কি দায় বলতে পারেন? একদিন আপনার মেয়ের বিয়েতে আমি সাহায্য করতে চেয়েছিলাম। সে সাহায্য আপনি নেন নি। ব্যস্, আমাদের সকল সম্পর্ক চুকে গেছে।

উমানাথ কাতরভাবে বলতে যান,---কিন্তু সে ত আপনারই পুত্রবধূ।

জমিদার মশাই তাঁকে সরোষে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ ক'রে বলেন,---আমার পুত্রবধূ! বিয়ের সময় আমাকে সাক্ষী রেখে বিয়ে দিয়েছিলেন বোধ হয়।

উমানাথ তবু মিনতি করেন,---আপনাকে সবই ত বল্লাম। তখন নিরুপায় হয়ে যে কাজ করেছি তার জন্য আমায় যে শাস্তি দিতে হয় দিন কিন্তু এই একটা নির্দ্দোষ মেয়ের এমন সর্ব্বনাশ হ'তে দেবেন না।

নির্দ্দোষ হ'লে তার সর্ব্বনাশ হবে কেন?---জমিদারের কণ্ঠে কঠিন ঔদাসীন্য।

কেন হবে, তা আপনাকে আর কি বোঝাব? আপনি যদি তাকে পুত্রবধূ ব'লে স্বীকার না করেন, তা হ'লে কি কলঙ্ক তার নামে গ্রামে রটবে তা কি আপনি বোঝেন না?

উমানাথের কাতর আবেদনে কিন্তু কোন ফলই হয় না। চৌধুরী মশাই নিষ্ঠুরভাবে বলেন,---বুঝি আমি সব পুরুত মশাই। কিন্তু আপনার মেয়ে কার সঙ্গে ভ্রষ্টা হয়ে নিজের সর্ব্বনাশ বাধিয়েছে ব'লে আমি তাকে পুত্রবধূ বলে স্বীকার ক'রে নেব এ-কথা ভাববার স্পর্দ্ধা আপনার কি ক'রে হ'ল?

বজ্রাহতের মত নিস্তব্ধ উমানাথের মুখ দিয়ে খানিকক্ষণ কোন কথাই বার হয় না, তারপর তিনি অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলেন,---আপনি কি বলছেন? আপনি তা হ'লে কোন কথাই বিশ্বাস করেন না? বিজয়ের সঙ্গে নির্ম্মলার যে সত্যি বিয়ে হয়েছে তা'ও কি আপনি অবিশ্বাস করেন?

নিশ্চয়ই অবিশ্বাস করি।---চৌধুরী মশাই বজ্র-গম্ভীর স্বরে জানান,---আমার অজান্তে এই গ্রামের মধ্যে আমার ছেলের সঙ্গে আপনার মেয়ের বিয়ে হয়েছে এই কথা আপনি আমায় বিশ্বাস করতে বলেন? আপনাকে সাবধান ক'রে দিচ্ছি পুরুত মশাই। আপনার মেয়ের কলঙ্কের সঙ্গে আমার ছেলের নাম আপনি জড়াতে চেষ্টা করবেন না। তা হ'লে গ্রামে বাস করা আপনার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠবে।

উমানাথ কি যেন বলবার চেষ্টা করেন। দু'বার তাঁর মুখ দিয়ে অস্ফুট একটা শব্দ ছাড়া আর কোন কথা কিন্তু বার হয় না। হতাশ-ভাবে চৌধুরী মশাই-এর মুখের দিকে খানিক তাকিয়ে আচ্ছন্নের মত তিনি ধীরে ধীরে বেরিয়ে যান।

মেয়েদের মুখ থেকে পুরুষদের ভেতর কথাটা রটতে তখন আর বাকি নেই। উমানাথের বাড়ীতে ঢোকবার পথে তখন গ্রামের মাতব্বরদের জটলা শুরু হ'য়ে গেছে। বেণীখুড়ো, গণেশ ইত্যাদি

মিলে একপালা আলোচনা শেষ করবার পর আচার্য্যি মশাই এসে যোগ দিয়েছেন।

বেণীখুড়ো আচার্য্যি মশাইকে সোল্লাসে জিজ্ঞাসা করেন,---শুনেছেন ত আচার্য্যি মশাই, শুনেছেন ত সব ?

আচার্য্যি মশাই পরম বিজ্ঞের মত সর্ব্বজ্ঞতার বাহাদুরী দেখিয়ে বলেন,---শুনব আবার কি হে ? আমায় শুনতে হয় না, রাম না হ'তে রামায়ণ আমি আগেই অনুমান করতে পারি।

ভেবেছিল সিঁথিতে সিঁদূর দিলেই আমাদের চোখে ধূলো দেবে।---বেণীখুড়ো হেসে ওঠেন।

গণেশ উপমা প্রয়োগ করে,---হ্যাঁ তেল দাও, সিঁদূর দাও ভবি ভোলবার নয়।

কিন্তু আমরা থাকতে গ্রামে এমন অনাচার আমরা কিছুতেই হ'তে দেব না, এর একটা বিহিত করা চাই---আচার্য্যি মশাইয়ের কথা শেষ হবার আগেই দেখা যায় উমানাথ সেই দিকে আসছেন। চুপ চুপ, পুরুত মশাই আসছেন,---ব'লে সবাই আসন্ন উপাদেয় ঘটনাটির জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ায়।

উমানাথ আচ্ছন্নের মতই পথ দিয়ে হাঁটছিলেন। হঠাৎ আচার্য্যি মশাইয়ের ডাকে তিনি চমকে ফিরে তাকান। আচার্য্যি মশাই হেসে বলেন,---বলি ব্যস্ততা কিসের ? আমাদের প্রতি যে দৃষ্টিপাতই করছেন না।

উমানাথ বিমূঢ়ভাবে জিজ্ঞাসা করেন,---আমায় কিছু বলছেন ?

সকলে এবার তাঁকে ঘিরে ধরে। আচার্য্যি মশাই বলেন,---হ্যাঁ বলছি, এত ব্যস্ত কেন ? বাড়ীতে জামাই আসবে নাকি ?

জামাই ?---উমানাথ বিমূঢ়ভাবে তাদের দিকে তাকান।

বেণীখুড়ো নির্ম্মম বিদ্রূপের সুরে বলেন,---হ্যাঁ জামাই। মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন, জামাই বোঝেন না ?

আচার্য্যি মশাই ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলেন,---কন্যার বিবাহে আজকাল আর জামাইয়ের দরকার হয় না হে, কি বলেন পুরুত মশাই, সিঁথিতে সিঁদূর দিলেই সব শুদ্ধ।

এ সব কথার উত্তর দেবার মত মনের অবস্থা তখন উমানাথের নয়। করুণ অসহায়ভাবে তাদের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে তিনি নীরবে চলে যাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তারা তাঁকে সেটুকু অনুগ্রহ করতে প্রস্তুত নয়।

আচার্য্যি মশাই তাঁর পথ আটকে সরোষে বলেন,---কিন্তু যা ভেবেছেন পুরুত মশাই, তা হবে না। গ্রামের বুকের ওপর যা খুশী অনাচার আপনি করবেন, আর আমরা তাই চোখ বুজে সহ্য করব ? তা ভাববেন না। কার সঙ্গে কোথায় আপনার কন্যার বিবাহ হয়েছে আমরা সমস্ত জানতে চাই।

গণেশ উপমা প্রয়োগের এ সুযোগ অবহেলা করে না, বলে---নিশ্চয়ই চাই, বিয়ে বল্লেই বিয়ে হ'ল কিনা ? বেল পাকলে কাকের কি ?

আঃ, তুমি কি যে বক গণেশ।---আচার্য্যি মশাইকে ধমক দিতে হয়। তারপর উমানাথকে তিনি বলেন,---শুনুন পুরুত মশাই, এই গ্রামের পাঁচজন মাতব্বর এখানে উপস্থিত, আপনার কন্যার বিবাহের রহস্য এইখানেই আমরা শুনতে চাই। কি বলেন আপনারা ?

নিশ্চয়ই---নিশ্চয়ই। সকলেরই এ বিষয়ে সায় আছে দেখা যায়।

উমানাথ কাতরভাবে মিনতি করেন,---আপনারা মাপ করুন আমাকে, কোন কথা বলবার মত মনের অবস্থা আমার নয়। দোহাই আমায় ছেড়ে দিন।

এ কাতর মিনতিতে বুঝি পাষাণও গলে যায়। কিন্তু সমাজের যাঁরা রক্ষক তাঁদের অত কোমল হ'লে কি চলে। গণেশলাল তাঁদের সকলের হয়ে রুখে উঠে বলে,---ছেড়ে দেব মানে, আপনার মেয়ে গ্রামের সকলের মুখ পুড়িয়ে দিয়ে যাবে, আর আমরা চুপ ক'রে থাকব ভেবেছেন।

একটি লোক কিছুক্ষণ আগে থেকে এই ভীড়ের বাইরে দাঁড়িয়ে সমস্ত ব্যাপারটা শুনছিল। চেহারা দেখলে তাকে ভবঘুরে ব'লে মনে হয়। মুখে একমুখ দাড়ি। পরণে নোংরা ছেঁড়া পোষাক। লোকটি এইবার ভীড় ঠেলে এগিয়ে

এসে বলে,---চুপ ক'রেত থাকবে না, কিন্তু কি করবে বলতে পার?

খানিকক্ষণ সবাই তার দিকে চেয়ে হতভম্ব হয়ে থাকে। তারপর আচার্য্যি মশাই প্রথম বিস্ময়ের ধাক্কা সামলে বলেন,---আরে আমাদের পরিতোষ যে, কত কাল তোমায় দেখিনি, কোথায় গিয়েছিলে বল ত?

পরিতোষ কঠিন স্বরে বলে,---গিয়েছিলুম জেলে এবং আপনাদের সকলের মাথাগুলো ফাটিয়ে এখন একবার ফাঁসি যাবার ইচ্ছে আছে।

নিজের অজান্তেই সকলে কেমন সঙ্কুচিত হয়ে সরে দাঁড়ায়।

পরিতোষ উমানাথের হাত ধরে বলে,----চলো উমাখুড়ো। এই ছুঁচোগুলোর গন্ধে এখানে আর টেঁকা যাচ্ছে না।

শিকার একেবারে হাতছাড়া হয় দেখে, আচার্য্যি মশাই শেষ চেষ্টা ক'রে বলেন---তুমি সব কথা এখনও জানো না পরিতোষ!

পরিতোষ ফিরে দাঁড়িয়ে বজ্র কঠিন স্বরে বলে,---সব কথা জানলে হয়ত নিজেকে সামলাতে পারবো না আচার্য্যি মশাই। তার চেয়ে ভালয় ভালয় সব সরে পড়ুন।

সবাই সভয়ে পিছিয়ে যায় এবং পরিতোষ উমানাথকে নিয়ে বাড়ীর ভেতর চলে যাবার পর আচার্য্যি মশাই ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলেন,---ওই আকাঠ গোঁয়ারটাই সব নষ্টের মূল।

গণেশের এবার আস্ফালন সুরু হয়,---আপনারা সবাই আমায় ধরে ফেল্লেন, নইলে দিচ্ছিলাম আমি একটি রদ্দায় ঠাণ্ডা ক'রে। একেবারে সাপের পাঁচ পা দেখিয়ে ছেড়ে দিতাম।

আচার্য্যি মশাই এবার কিন্তু চটে যান,---তুমি থামো গণেশ! কে আবার তোমায় ধরলে?

গণেশলাল কিছুমাত্র অপ্রস্তুত না হয়ে বলে,---ওই মানে---ধরতে যাচ্ছিলেন ত!

নির্ম্মলাদের বাড়ীতে বসে পরিতোষ একে একে সব কথাই শোনে। বহুদিন দেশের কাজেই সে গ্রাম ছাড়া। এত ব্যাপার যে সেখানে হয়ে গেছে তার কোন খোঁজই সে রাখে না। সমস্ত ব্যাপার শুনে সত্যি অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে সে বলে,---এ যে আমি বিশ্বাস করতে পারছি না মাসীমা। জমিদার মশাইয়ের এ ব্যবহারের মানে আমি বুঝি, কিন্তু---কিন্তু বিজয় ত সে রকম ছেলে নয়। ---নির্ম্মলার দিকে ফিরে সে জিজ্ঞাসা করে,---একটা চিঠির উত্তরও সে দেয় নি?

নির্ম্মলার কাছ থেকে কোন জবাবই আসে না। বহুক্ষণ আগে থেকে কঠিন মুখে নিস্তব্ধ হয়ে সে দূরের একটি চালার খুঁটিতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গ্রামের মাতব্বরদের কাছে তার কলঙ্কের কথা নিয়ে বাবার লাঞ্ছনা সবই বোধ হয় সে শুনেছে। কিন্তু তার মুখে বেদনার কোন ছাপ যেন আর নেই। কোন ভয়ঙ্কর সঙ্কল্পের দৃঢ়তায় সে মুখ প্রচণ্ড ঝড়ের আগের আকাশের মত গম্ভীর ও ভয়ঙ্কর।

নির্ম্মলার হয়ে তার মা-ই জবাব দেন,---না বাবা, গিয়ে অবধি কোন চিঠিই সে দেয় নি। ছুটিতে দেশেও আসে নি।

আশ্চর্য্য! আমি ত এর মানেও বুঝতে পারছি না। মনে হচ্ছে সব বোধ হয় আমার দোষ,---পরিতোষ অত্যন্ত অনুতপ্তভাবে বলে।

উমানাথ ব্যথিত স্বরে বলেন,---তোমার কি দোষ বাবা, আমরা সবাই সরল বিশ্বাসেই এ কাজ করেছিলাম।

কিন্তু আমি এতদিন বাইরে না থাকলে এত সব কিছুই ঘটতে পারত না। পরিতোষের স্বরে গভীর অনুশোচনা ফুটে ওঠে। তোমাদের এমন সর্ব্বনাশ হচ্ছে জানলে দেশোদ্ধারের জন্যেও আমি জেলে যেতে পারতাম না।

উমানাথ অসহায়ভাবে বলেন,---সবই অদৃষ্ট।

পরিতোষ কিন্তু এবার উষ্ণ হয়ে উঠে,---অদৃষ্ট বলে হাল ছাড়তে আমি রাজি নই উমাখুড়ো। আমি আজ রাত্রেই কোলকাতায় যাচ্ছি। সেখানে বিজয়কে আমি সামনা-সামনি সব জিজ্ঞাসা করতে চাই।

পরিতোষ সেখান থেকে উঠে এসে চলে যেতে যেতে একবার নির্ম্মলার কাছে দাঁড়ায়,

কিন্তু বলবার কোন কথা খুঁজে না পেয়েই বোধ হয় নীরবে আবার চলে যায়।

বাড়ীর বাইরে চলে আসবার পর হঠাৎ পিছন থেকে সে নির্ম্মলার ডাক শুনতে পায়,---পরিতোষদা।

পরিতোষ দাঁড়িয়ে পড়ে। নির্ম্মলা কাছে এসে দৃঢ়স্বরে বলে,---তোমার কোলকাতায় যেতে হবে না।

কেন রে? হ'ল কি?---পরিতোষ সস্নেহে জিজ্ঞাসা করে।

না পরিতোষদা, আমার জন্যে আর তোমাদের কোন দুঃখ পেতে হবে না।---নির্ম্মলার স্বর কঠিন।

আচ্ছা, আচ্ছা, সে সব আমি বুঝব'খন।---পরিতোষ সুরটা হাল্কা করবার চেষ্টা করে।

নির্ম্মলা কিন্তু তীব্রস্বরে বলে,---আমি বলছি, তোমার কোথাও যাবার দরকার হবে না---সব সমস্যার মীমাংসা আমি নিজেই করব।

শেষ কথাগুলো বলবার সময় কিন্তু কোথা থেকে অশ্রুর বন্যা এসে তার সমস্ত অটলতা ভাসিয়ে নিয়ে যায়। তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে অশ্রু গোপন করবার চেষ্টায় সে সেখান থেকে চলে যায়। পরিতোষ বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

অন্ধকার রাত। ষ্টেশনে যাবার পথে নির্ম্মলাদের বাড়ী একবার হয়ে যাবার জন্যে পরিতোষ সেই দিকেই যাচ্ছিল। হঠাৎ পাশের পুকুরের জলে কি একটা শব্দ পেয়ে সে থমকে দাঁড়াল।

ব্যাপারটা একটু অস্বাভাবিক, তবু প্রথমটা তেমন কিছু সন্দেহ তার হয় নি। কিন্তু হঠাৎ সকাল বেলার সমস্ত কথা মনে পড়তেই সে শিউরে উঠে পুকুরের ধারে ছুটে গেল। অন্ধকারে বিশেষ কিছুই দেখা যায় না। তবু অস্পষ্ট একটি নারীমূর্ত্তি মনে হ'ল যেন গভীর জলের দিকে নেমে যাচ্ছে। পরিতোষ সশঙ্ক ব্যাকুল স্বরে ডাকলে;---নির্ম্মলা।

নারীমূর্ত্তি যেন চমকে ফিরে তাকাল। এবার একেবারে নিঃসন্দেহে হয়ে পরিতোষ ব্যাকুলভাবে আবার ডাকলে,---কি হচ্ছে নির্ম্মলা, এত রাত্রে তুমি এখানে কেন?

নারীমূর্ত্তি তবু নড়ে না দেখে সে নিজেই জলে খানিকটা নেমে গিয়ে বললে---উঠে এস নির্ম্মলা! শোন, শোন, কি করছ তুমি পাগলের মত?

ধীরে ধীরে নির্ম্মলা এবার তার দিকে এগিয়ে এল। তারপর হাতের ঘড়াটা পাড়ের ধারে রেখে প্রায় হিংস্রভাবে বললে---পাগলের মতই যদি করি!---মানুষের কি কখনও পাগল হবার অধিকারও নেই? কেন তুমি বাধা দিলে? আমায় মরেও কি তোমরা শান্তি পেতে দেবে না?

পরিতোষ নির্ম্মলার মনের অবস্থা বুঝতে পেরে স্নিগ্ধ সহানুভূতির স্বরে বললে,---আমি বাধা দিই নি নির্ম্মলা; তোমার নিয়তিই বাধা দিয়েছে। নইলে ঠিক এমনি সময় ষ্টেশনে যাবার পথে তোমাদের বাড়ী আসার কথা আমার মনে হ'ত না---তোমায় আমি দেখতেও পেতাম না। কিন্তু ছিঃ ছিঃ, তুমি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিলে কেন নির্ম্মলা?

কেন যাচ্ছিলাম? নির্ম্মলার স্বরে এখনও তিক্ততা।---আমি মরলেই সব সমস্যার মীমাংসা হয়ে যাবে ব'লে। বাবা-মার লাঞ্ছনা, তোমাদের দুর্ভাবনা সব শেষ হয়ে যাবে!

পরিতোষ শান্তস্বরে বললে,---কিন্তু এখনও এত হতাশ হবার ত কিছু হয় নি নির্ম্মলা। আমি ত কোলকাতায় বিজয়ের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। আমি আগে ফিরে আসি---

নির্ম্মলা পরিতোষকে বাধা দিয়ে বললে,---কিন্তু আর যে আমার একদিনও এ গ্লানি সহ্য করবার ক্ষমতা নেই পরিতোষদা। আমার জন্যেই বাবা-মার এই লাঞ্ছনা। কাল সকালেও যে তাঁদের কাছে মুখ দেখাতে আমি পারব না, কিছুতেই পারব না। আমার আত্মহত্যা ছাড়া আর কোন পথ নেই।

নির্ম্মলার গলার স্বরে এবার অসহায় হতাশা। পরিতোষও সে স্বরে কাতর হয়ে বললে,---না, না নির্ম্মলা, এমন অবুঝ হয়ো না, অকারণ নিন্দা গ্লানি মানুষের জীবনে আসে---

না পরিতোষদা,---নির্ম্মলা ব্যাকুল স্বরে ব'লে উঠল,---ও সব কথা আমি জানি, কিন্তু তবু আমি আর সইতে পারছি না। তার চেয়ে তুমি আমায় তোমার সঙ্গে কোলকাতায় নিয়ে যাও। আমি তাঁর সামনে গিয়েই একবার দাঁড়াতে চাই।

তা কি ক'রে হয় নির্ম্মলা? পরিতোষ ব্যথিত স্বরে বললে।

কেন হয় না পরিতোষদা? এখানে আমায় মরতে দিতে যদি না চাও---তা হ'লে একবার শেষ সুযোগ দাও তাঁর সঙ্গে গিয়ে দেখা করবার। ---নির্ম্মলা ব্যাকুলভাবে মিনতি জানালে,---আমার যা জিজ্ঞাসা করবার আমি নিজেই তাঁকে জিজ্ঞাসা করব।

পরিতোষ তবু ইতস্ততঃ ক'রে কি বলতে যাচ্ছিল,---কিন্তু নির্ম্মলা----

নির্ম্মলা দৃঢ়স্বরে বললে,---কোন কিন্তু আর এতে নেই। নিন্দে গ্লানির কথা ভাবছ? যা হয়েছে তার চেয়ে আর কি বেশী হবে বলতে পারো? না পরিতোষদা, আমায় সঙ্গে যদি না নিয়ে যাও তা হ'লে এখানে এসে আর আমায় দেখতে পাবে না। এখানে মুখ দেখাতে আর আমি পারব না।

পরিতোষ অনেকক্ষণ চুপ ক'রে রইল। এত বড় সমস্যার এক মুহূর্ত্তে কি মীমাংসা করা যায়। তারপর নিরুপায় হয়ে অন্য কোন পথ না দেখতে পেয়েই বললে,----বেশ চল্ তা হ'লে। তোদের একসঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে আমার দায়িত্ব অন্ততঃ শেষ হোক্।

পরিতোষ অতি বড় দুঃসাহসে সমস্ত দায়িত্ব নিজের স্কন্ধে নিয়ে শুধু এই আশাতেই নির্ম্মলাকে কোলকাতায় সঙ্গে নিয়ে যেতে রাজী হয়েছিল যে, বিজয়ের সঙ্গে একবার নির্ম্মলার দেখা করিয়ে দিতে পারলে সমস্ত সমস্যার সহজ মীমাংসা হ'য়ে যাবে। নির্ম্মলার যে রকম মনের অবস্থা তাতে গ্রামে তাকে রেখে আসা সত্যি সে নিরাপদও বোধ করে নি।

কিন্তু ভাগ্য যখন বিরোধী হয় তখন সামান্য একটু অপ্রত্যাশিত ঘটনার চড়ায় মানুষের সমস্ত আশা চুরমার হয়ে যায়।

একটি ছ্যাকড়া গাড়ীতে নির্ম্মলাকে সঙ্গে ক'রে সে বিজয়ের কোলকাতার বাসায় এসেছিল। নির্ম্মলাকে গাড়ীতে বসিয়ে সে বিজয়ের খোঁজ করতে গেল ভেতরে। যাবার সময় ব'লে গেল, ---তুমি একটু অপেক্ষা কর নির্ম্মলা। বিজয়ের সঙ্গে আমি আগে দেখা ক'রে আসি। এতদিন এমন উদাসীন হয়ে থাকার কি কৈফিয়ৎ সে দেয় তা'ত শোনা দরকার।

বিজয়ের বাসার বাইরের বাগানে একজন মালী ফুলের গাছে জল দিচ্ছিল। তাকে ডেকে পরিতোষ বল্লে,---ওহে ভেতরে গিয়ে বিজয়-বাবুকে একবার খবর দাও ত', বল দেশ থেকে---

তার কথা শেষ হবার আগেই মালী জানালে, ---আজ্ঞে বাবু ত এখানে নেই। বাইরে হাওয়া খেতে গেছেন।

পরিতোষের মনে এ সম্ভাবনার কথা একবারও উদয় হয় নি। স্তম্ভিত হয়ে সে বললে,---হাওয়া খেতে গেছেন।

পরিতোষের অবস্থা দেখে মালীরও বুঝি একটু সহানুভূতি হ'ল। সে বিস্তারিতভাবে জানালে, ---আজ্ঞে হ্যাঁ, বাবুর বন্ধুদের বাড়ীর সবাই গেলেন কিনা। তাঁরও ছুটি ছিল ব'লে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন।

একটু চুপ ক'রে থেকে পরিতোষ জিজ্ঞেস করলে,---কোথায় গেছেন তা জান না বোধ হয়।

আজ্ঞে না,---সরকার মশাই থাকলে বলতে পারতেন, তিনিও এখানে নেই।

পরিতোষ হতাশ মুখে গাড়ীর কাছে ফিরে এল। তাকে আসতে দেখে নির্ম্মলা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলে,---আমি এবার নামব পরিতোষদা?

পরিতোষ যথাসম্ভব হাল্কা ক'রে বলবার চেষ্টা করলে,---না রে, এখন নামা হবে না।

নির্ম্মলার মুখ কিন্তু শুকিয়ে গেল। পরিতোষের মুখের দিকে চেয়ে গাঢ় বেদনার স্বরে সে বললে,----তিনি বুঝি আমাদের সঙ্গে দেখা করতে চান না পরিতোষদা।

পরিতোষ জোর ক'রে হেসে উঠে বললে,---তুই পাগল হয়েছিস্। সে এখানে থেকেও আমাদের সঙ্গে দেখা করবে না তা কি হ'তে পারে? ছুটিতে দুদিন কোথায় বেড়াতে গেছে। ফিরে এলেই দেখা হবে।

নির্ম্মলা ক্লান্ত বিষণ্ণ সুরে বললেন,---কিন্তু আমরা এতদিন কি করব পরিতোষদা? গ্রামে ত আর ফিরে যেতে পারব না।

না রে না, গ্রামে ফিরতে হবে না। কটা দিন বইত নয়। এইখানেই কোথাও কাটিয়ে দেব'খন। ---পরিতোষ এমন ভাব দেখালে যেন ব্যাপারটা মোটেই গুরুতর নয়।

কিন্তু নির্ম্মলা অত সহজে প্রবোধ মানতে আর পারলে না। হতাশ স্বরে বললে,---তোমায় আর কত কষ্ট দেব পরিতোষদা! আমার জন্য আর কত দুঃখ-লাঞ্ছনা তুমি সইবে! তার চেয়ে তুমি কোন আশ্রমে টাশ্রমে আমায় রেখে চলে যাও---

পরিতোষ হেসে উঠল,---থাক ঢের হয়েছে। আমার জন্যে আর অত ভাবতে হবে না। এখন চ দেখি, একটা আস্তানা খুঁজে বার করি।

নির্ম্মলাকে আর কোন কথা বলবার সুযোগ না দিয়ে গাড়ীতে উঠে গাড়োয়ানকে সে আদেশ দিলে,---এগিয়ে চল গাড়োয়ান।

সম্বল আর তাদের কতটুকু। আস্তানা খুঁজতে শেষ পর্য্যন্ত তাই এক বস্তিতে গিয়েই হাজির হ'তে হ'ল। সেইখানেই বাড়ীওয়ালা রাখালরাজ চক্কোত্তির সঙ্গে পরিচয়।

লোকটি কথা বলে একটু বেশী। ঘর দেখাতে নিয়ে গিয়ে টিনের চালাটার বাইরে থেকেই সে বক্তৃতা সুরু করে,----হ্যাঁ টিনের বাড়ী মশাই, এক্কশবার বলুন টিনের বাড়ী।

পরিতোষ ও নির্ম্মলার কাছে কোন প্রতিবাদ না পেয়ে খুশী হয়ে সে আবার বলে,---তা যেমন গুড় তেমনি ত মিষ্টি! ঘর পিছু পাঁচ টাকায় ত আর দালান কোঠা হয় না।

পরিতোষ ও নির্ম্মলা কোন কথা অবশ্য বলে না।

রাখালরাজ সোৎসাহে ব'লে চলে,---তবে একটি কথা ব'লে রাখছি। রাখালরাজ চক্কোত্তির কাছে কোন হাঙ্গামাটি পাবেন না। দরকার হ'লে রাখালরাজ কানা, কালা, বোবা সব হ'তে জানে। এই যে আপনারা! ভদ্রলোকের মস্ত চেহারা অথচ উঠেছেন এসে বস্তিতে---সঙ্গে মোটঘাটও নেই। তা আমি কিছু জিজ্ঞেস করেছি একবার! কেন করব, কেন?

পরিতোষ ও নির্ম্মলার দিকে একটু ইঙ্গিত-পূর্ণ দৃষ্টি হেনে সে আবার বলে,---যার ব্যয়রাম সে বুঝবে। আমার কি বলুন না। মাস মাস ভাড়াটি ঠিক গুণে পেলে রাখালরাজ কারোর হাঁড়িতে কাঠি দিতে যায় না!

পরিতোষ ও নির্ম্মলাকে একটু আহত ও সঙ্কুচিতভাবে পরস্পরের দিকে তাকাতে দেখে রাখালরাজ একেবারে অন্য দিকে ঘুরে যায়।---কিন্তু খাঁটি খেরস্ত ছাড়া রাখালরাজ কাউকে ভাড়া দেয় না, বুঝলেন।---ও আধা সিকের কারবার এখানে নেই।

ততক্ষণে বাইরের চটের পর্দ্দটা সরিয়ে রাখালরাজ বাড়ীর উঠানে তাদের নিয়ে এসেছে। সেখান থেকে টিনের পার্টিসান দেওয়া অনেকগুলি কামরার একটিতে তাদের নিয়ে যেতে যেতে রাখালরাজ বলে,---এই বাড়ী মশাই! আহামরিও নয়, দূর ছাইও কেউ বলতে পারবে না। এখন আপনাদের পছন্দ হয় নেবেন, না হয়---

রাখালরাজ শেষ কথাটা উহ্য রেখেই পরিতোষের মুখের দিকে সাগ্রহে তাকায়।

পাশাপাশি দুটি ঘর। এদিক ওদিক একটু ঘুরে দেখে পরিতোষ বলে,---না, আমরা এই ঘরই নেব ঠিক করলাম!

বেশ! বেশ!---রাখালরাজ এক গাল হেসে বলে,---জানেন মশাই! এই আপনাদের মত

ভদ্দর লোক ভাড়াটে পেলে আর আমি কিছু চাই না। কি বলে---

পরিতোষ রাখালরাজের উচ্ছ্বাস থামিয়ে জিজ্ঞাসা করে,---ভাড়াটা কি আগাম দিতে হবে?

রাখালরাজ অত্যন্ত উদার হয়ে বলে,---না, না, না, না! বলেন কি! আগাম ভাড়া দেবেন কি! রাখালরাজ লোক চেনে মশাই! যখন খুশী আপনি ভাড়া দেবেন।

ঘরের দরজায় ঘোমটা ঢাকা একটি মূর্ত্তিকে কিছুক্ষণ থেকে দেখা যাচ্ছিল। হঠাৎ সেই ঘোমটার ভেতর থেকে অত্যন্ত তীব্র শাসনের তীক্ষ্ণ ডাক শোনা যায়---এদিকে একবার এস ত।

রাখালরাজের চেহারা এক মুহূর্ত্তে বদলে যায়। থতমত খেয়ে ঢোক গিলে হাত কচ্‌লে সে আমতা আমতা ক'রে বলে,---ওইটি, ওইটি---কি বলে, আমার পরিবার। আর দেখুন---মানে কিছু যদি মনে না করেন,----এই বলছিলাম কি,---অসুবিধে না হ'লে ভাড়ার টাকাটা যদি---

পরিতোষ ব্যাপারটা বুঝে হেসে বলে,----না, না। ভাড়া আমি আগামই দিচ্ছি।

ভাড়ার টাকাটা গুণে নিয়ে পরিবারের হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে রাখালরাজ বলে,---তা হ'লে আর কি, ঘর ত হয়ে গেল, এবার জিনিষ-পত্তর সব আনিয়ে ফেলুন। কি বলে,---ঘর সংসার ত আর হাওয়ায় পাতা যায় না। বলেন ত আমিই সব ব্যবস্থা---

নির্ম্মলা দূরের একটি জানালার দিকে গিয়ে ম্লান মুখে দাঁড়িয়েছিল। সে দিকে চেয়ে পরিতোষ গম্ভীর মুখে বলে,---না থাক, আপনাকে কষ্ট করতে হবে না।

রাখালরাজের আরো একটু ঘনিষ্ঠতা করবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু এদের ভাবগতিক দেখে হতভম্ব হয়ে সে বেরিয়ে যায়।

নির্ম্মলা ও পরিতোষের গ্রাম থেকে চলে যাওয়ার খবরটা রটে যেতে বেশী বিলম্ব হয় নি। নানা জনের কল্পনায় ব্যাপারটা ইতিমধ্যে যথাসম্ভব বিকৃত ও রসাল আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। গ্রামের মাতব্বররাও নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকেন নি। আচার্য্যি মশাই সদলবলে একেবারে জমিদারের কাছারীতে গিয়েই কথাটা তোলেন,---আজ্ঞে বড় কুৎসিত, বড় নোংরা ব্যাপার, কিন্তু তা ব'লে অবহেলা ত করা যায় না। এ রকম ব্যভিচার, কি বলে সমস্ত গ্রামের কলঙ্ক। সমাজ-পতি হিসাবে আমাদের একটা কর্ত্তব্য ত আছে।

বেণীখুড়ো সায় দিয়ে বলেন,---আলবৎ, এর উচিত সাজা দরকার, একেবারে টিট ক'রে দিতে হবে।

জমিদার মশাই এতক্ষণেও কোন কথা বলেন নি। তাঁর বদলে শশিভূষণই জবাব দেন, ---কিন্তু যাদের টিট করবেন, তারা ত পগার পার! পরিতোষ আর নির্ম্মলাকে পাচ্ছেন কোথায়?

গণেশলাল সোৎসাহে সে সমস্যার সমাধান ক'রে দেয়,---কেন? নির্ম্মলা না থাক তার বাপ ত আছে, যাকে বলে মধ্বাভাবে গুড়ম্ দদ্যাৎ।

আচার্য্যি মশাই বিরক্ত হয়ে ওঠেন---আঃ গণেশ!

কিন্তু গণেশের উপমা এখন থামায় কে? সে অদম্য উৎসাহে বলে,---মানে উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে,---মানে---মানে কেঁচো খুঁড়তে সাপ আর কি?

উপস্থিত সকলের মুখে অত্যন্ত বিরক্তির ভাব দেখে গণেশলাল শেষ পর্য্যন্ত অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হয়ে চুপ করে।

জমিদার মশাই গম্ভীরভাবে বলেন,----তা'-হলে নির্ম্মলার বদলে তার বাপকে শাস্তি দিতে পারলেই আপনারা খুশী?

বেণীখুড়ো সানন্দে জানান,---নিশ্চয়ই! রীতিমত একেবারে ধোপা-নাপিত বন্ধ।

জমিদার মশাই খানিক চুপ ক'রে থেকে বেশ কঠিন স্বরে বলেন,---বেশ তা'হলে আমার কাছে সময় নষ্ট না ক'রে ধোপা-নাপিতের কাছেই যান।

সকলে একেবারে হতভম্ব। আচার্য্যি মশাই অত্যন্ত বিমূঢ়ভাবে বলেন,---আজ্ঞে ধোপা-নাপিতের কাছে!

জমিদার মশাই কোন উত্তরই দেন না। শশিভূষণই কথাটা ব্যাখ্যা ক'রে বুঝিয়ে দেন---সোজা কথাটা বুঝতে পারলেন না আচার্য্যি মশাই, ধোপা-নাপিত বন্ধ করতে হ'লে তাদের মতামতটা আগে নেওয়া দরকার নয় কি?---যান যান দেরী করবেন না, ধোপা-নাপিত আবার খুঁজে বার করতে হবে ত?

খানিক নির্ব্বোধের মত দাঁড়িয়ে থেকে আচার্য্যি মশাইকে সদলবলে এবার বিদায় নিতে হয়। যাবার সময় নমস্কারটা ক'রে যাবার কথাও তাঁদের মনে থাকে না।

সবাই চলে যাবার পর জমিদার আসন থেকে উঠে পড়ে বলেন,---এরা আর যেন আমায় বিরক্ত করতে না আসে শশী।

শশিভূষণ ঘাড় নেড়ে বলে,---আজ্ঞে হ্যাঁ, তারপর একটু মাথা চুলকে বলে,---কিন্তু আমি ভাবছিলাম---

কি ভাবছিলে?---গম্ভীরমুখে জিজ্ঞাসা করেন চৌধুরী মশাই।

না, ভাবছিলাম, শরীরটা কেমন ক'দিন জুৎ নেই, দুদিন একটু বাইরে ঘুরে এলে হ'ত। এই বিজয় এখন যেখানে হাওয়া খেতে গেছে। গাঁয়ের খবরাখবরটাও ত তার পাওয়া দরকার।

জমিদার খানিক শশিভূষণের দিকে নীরবে চেয়ে থাকেন। তারপর মুখে কোন ভাবান্তর প্রকাশ না ক'রেই বলেন,---বেশ যেতে পার।

চৌধুরী মশাই আর সে ঘরে দাঁড়ান না।

শশিভূষণ আপন মনে একটু হেসে সেই পুরাণ গানটাই গুন গুন ক'রে গান।

গ্রামে যাওয়া তার নিষেধ। নির্ম্মলার কোন খোঁজও সে পায় নি। অত্যন্ত মনমরা অবস্থায় রাজীববাবুদের সঙ্গে তাঁদের দার্জিলিঙের বাড়ীতে ছুটিটা কাটাবার নিমন্ত্রণ বিজয় তাই আর প্রত্যাখ্যান করতে পারে নি।

রাজীববাবুদের এই দার্জিলিঙের বাড়ীতেই একদিন শশী হঠাৎ এসে উপস্থিত হয়।

বিজয় অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে,---কি ব্যাপার শশীকাকা! তুমি হঠাৎ এসে হাজির যে, সব খবর ভালো ত?

শশিভূষণ হেসে বলেন,---ভাল বাবা, সব ভাল। আমি এই এমনিই এসে পড়লাম। কাজকর্ম্ম এখন মন্দা। তাই ভাবলাম দু দিন তোমাদের এখান থেকেই ঘুরে যাই। ওই তোমাদের কি বলে, হাওয়া বদল ক'রে ভাঙ্গা শরীরটা যদি একটু মেরামত হয়।

একটু চুপ ক'রে থেকে বিজয়ের মুখের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে তিনি বলেন,---তা ছাড়া গাঁয়ে ক'দিন যা হৈ হুজুগ গেল, বেরুবার জন্য প্রাণটা হাঁপিয়ে উঠছিল।

গাঁয়ে আবার কি হ'ল?---সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করে বিজয়।

সে সব নোংরা কথা শুনে তোমার আর কাজ নেই। ছুটিতে গাঁয়ে যাওনি ভালই করেছ। গেলে মিছামিছি মেজাজটা বিগড়ে যেত। আমরাই ত থ বনে গেছি।

একটু হেসে যেন অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে শশিভূষণ আবার বলেন,---এমন নিষ্কলঙ্ক সৎ ছেলে ব'লে যাকে জানতাম---

বিজয় বাধা দিয়ে গম্ভীর হয়ে বলে,---বলতে হয় একটু স্পষ্ট ক'রে বল কাকা, কার কথা বলছ?

ওই তোমাদের পরিতোষ গো, তার পেটে পেটে এত ছিল, কে জানত?---শশিভূষণের মুখ দিয়ে যেন হঠাৎ কথাটা বেরিয়ে যায়।

কি করেছে সে?---রূঢ়স্বরে জিজ্ঞাসা করে বিজয়।

শশিভূষণ যেন নিতান্ত অনিচ্ছাসহকারে বলেন,---আমার এ সব কথা না তোলাই ভাল ছিল দেখছি, তোমার ছেলেবেলার বন্ধু।

বিজয় আবার বাধা দিয়ে উচ্চস্বরে বলে,--হ্যাঁ, সেই জন্যই সব কথা শোনা দরকার। গাঁয়ের সবাই তার বিরুদ্ধে আমি জানি। সবাই মিলে পিছু লেগে তাকে গাঁ ছাড়া করেছে বোধ হয়।

শশিভূষণ এবার যেন ক্ষুণ্ণ হয়েই গলা একটু চড়িয়ে রাগের সঙ্গে বলেন,---গাঁ তাকে ছাড়তে

হয়নি, সে নিজেই গাঁ ছেড়েছে। আর একা নয়, একটি মেয়েকে নিয়ে, একজন দেবতুল্য ব্রাহ্মণের সর্ব্বনাশ ক'রে।

শশীকাকা!---বিজয় রুক্ষস্বরে প্রায় ধমক দিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

শশিভূষণ যেন অত্যন্ত আঘাত পেয়ে ক্ষুণ্নস্বরে বলেন,---ওই জন্যই ত আমি কিছু বলতে চাইনি আগে। তুমি নেহাত বলিয়ে ছাড়লে---আর লুকিয়ে বা রাখব কেন? কি ভয়ানক অন্যায় বল দেখি। পুরুত মশাই-এর মুখের দিকে ত তাকান যায় না।

বিজয়ের মুখ হঠাৎ যেন ফ্যাকাশে হয়ে যায়,---পুরুত মশাই! কি বলছ কাকা?

তবে আর কি শুনছ। পুরুত মশাইর একটি মেয়ে ছিল না? তাকে নিয়ে ত পরিতোষ আজ ক'দিন নিরুদ্দেশ!---শশিভূষণ কথাগুলি তাড়াতাড়ি ব'লে ফেলেন।

নির্ম্মলা!---বিজয় আর কিছু বলতে পারে না।

শশিভূষণ অন্য দিকে মুখ ফিরিয়েই বলেন,---হ্যাঁ, হ্যাঁ, নির্ম্মলাই তার নাম। এখন ত শোনা যাচ্ছে অনেক দিন আগে থেকেই ওদের ভেতরে ভেতরে এসব চলেছে। এখন শুধু কেলেঙ্কারীটা আর চাপবার উপায় নেই ব'লেই গা ঢাকা দিয়েছে বাধ্য হয়ে।---কেন বলা যায় না বিজয়ের চোখের দিকে শশিভূষণ আর চাইতে পারেন না। বিজয় পাথরের মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। শশিভূষণ একটু চুপ ক'রে থেকে বলেন,---যাকগে, তুমি আর মিছিমিছি এদের কথা ভেবে মন খারাপ করো না।

হঠাৎ বিজয় হেসে উঠে উচ্চৈঃস্বরে। শশিভূষণও সে হাসিতে চমকে ওঠেন।---তুমি পাগল হয়েছ কাকা, যার খুশী সে জাহান্নমে যাক্। আমার কি এসে যায়!---ব'লে বিজয় আবার হেসে উঠে। সেই হাসির সঙ্গেই আর একটি তরল মিষ্টি হাসি শোনা যায়। দমকা হাওয়ার মত উচ্ছ্বসিত হাসির সঙ্গে ঘরে ঢুকে বিজয়ের হাত ধরে বুলা বলে,---বিজয়দা, শীগ্‌গির দেখবে এস চুপি চুপি। যা একটা মজা হয়েছে---

কোথায় কি মজা?---বিজয়কে যেন অত্যন্ত উৎসাহী মনে হয়।

যা একটা বেদেনীকে ধরে দিদিকে---তুমি এসই না--বুলা আর কথাটা শেষ না ক'রেই বিজয়কে টানতে টানতে নিয়ে যায়। দূর থেকে তাদের হাসির শব্দ শোনা যায়। শশিভূষণকে কিন্তু কেন বলা যায় না, মোটেই খুশী মনে হয় না। কেমন আচ্ছন্নের মত আড়ষ্টভাবে তিনি বসে থাকেন।

বিজয়কে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে গিয়ে, চুপ ক'রে থাকবার ইসারা ক'রে বুলা এক জায়গায় দাঁড় করায়। সেখান থেকে দেখা যায় হেমাঙ্গিনী একজন বেদিনী ডাকিয়ে অনিমাকে একটি তাবিজ বাঁধাবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল।

অনিমাও তাবিজ কিছুতেই পরবে না, হেমাঙ্গিনীও ছাড়বেন না। বলেন,---কেন, একটা তাবিজ পরলে কি হয়? হাত ত তাতে ক্ষয়ে যাবে না?

অনিমা মায়ের সব অত্যাচার সহ্য করলেও এ ব্যাপারে বিদ্রোহী হয়ে ভ্রূকুটি ক'রে বলে,---না, তাবিজ পরতে যাব কেন?

বেদিনী উৎসাহ দিয়ে বলে,---পরলে ভালো হোবে। জলদি জলদি সাদি হোবে। রাঙা দুলহা আসবে। এ তাবিজের বহুত গুণ।

বেদিনী তাবিজটা বাঁধবার চেষ্টা করতেই ঝাঁকানি দিয়ে তার হাত সরিয়ে দিয়ে অনিমা বলে,---দরকার নেই অমন গুণের তাবিজ।

দরকার নেই কি রকম!---হেমাঙ্গিনী এবার রীতিমত রেগে ওঠেন। বেদিনীর হাত থেকে তাবিজটা নিয়ে নিজেই জোর ক'রে অনিমার হাতে বেঁধে দিয়ে বলেন,---আমি এত কষ্ট ক'রে বেদিনা ডাকিয়ে আনলাম কি অমনি।

অনিমার তখনকার মুখের অবস্থা সত্যি দেখবার। বিজয় আর বুলা আর হাসি চাপতে পারে না। সে হাসির শব্দে তাদের দেখতে পেয়েই অনিমা আর মার শাসনও মানে না, সেখান থেকে একেবারে নিজের ঘরের দিকে ছুট দেয়।

হেমাঙ্গিনীও হাসির শব্দে ফিরে তাকান। তারপর সরোষে সকল গোলমালের মূল বুলাকে দেখতে পেয়ে ডাক দেন---বুলা!

কিন্তু বুলার কি আর তখন পাত্তা আছে! বিজয়কে নিয়েই সে সেখান থেকে দৌড় দিয়েছে।

অনিমা লজ্জায় নিজের ঘরে গিয়ে একটু বুঝি নিরাপদ বোধ করছিল। এখানে কেউ তাকে অনুসরণ ক'রে আসবে সে ভাবে নি। হাতের দিকে চেয়ে তাবিজটা ছিঁড়ে ফেলবে কি না ভাবছে, হঠাৎ দরজার দিকে তাকিয়ে সে চমকে ওঠে। বিজয় আর বুলা সেখানে কখন নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছে।

বিজয় দুষ্টামির হাসি হেসে জিজ্ঞাসা করে---দেখি অনিমা, তোমার হাতে ওটা কি?

বুলা খিল খিল ক'রে হেসে ওঠে।

অনিমা অত্যন্ত বিব্রত হবে এক মুহূর্ত্ত তাদের দিকে তাকিয়েই পাশের দরজা দিয়ে ছুটে একেবারে বাইরে বেরিয়ে যায়। বিজয় কিন্তু ছাড়বার পাত্র নয়। কি যেন নতুন উত্তেজনা আজ তার মধ্যে এসেছে। এঘর ওঘর ঘুরে শেষ পর্য্যন্ত বাইরের বাগানে গিয়ে একটি নির্জন বেঞ্চিতে অনিমাকে ধরে ফেলে সে বলে,---এইবার!

বিজয় এমনভাবে কোন দিন তার সঙ্গে কথা বলেনি। অনিমা লজ্জায় মাথা নীচু ক'রে বলে,---না, আমি যাই। বিজয় কিন্তু জোর ক'রেই তাকে বসিয়ে রেখে হেসে বলে,---না, যেতে দেব না।

তারপর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে অনিমার হাতের তাবিজটা দেখিয়ে বলে,---এই বুঝি তোমার বর ধরবার ফাঁদ?

বিজয়ের গলার স্বরে অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে অনিমা তার দিকে তাকায়। বিজয় হঠাৎ হাত বাড়িয়ে তার তাবিজটা ধরে ফেলে কঠিন স্বরে বলে,---এ তাবিজ যদি আমি ছিঁড়ে ফেলে দিই। যদি বলি, আমায় ধরবার জন্যে কোন ফাঁদ তোমার লাগবে না, কোন কৌশলের দরকার নেই।

অনিমা চমকে উঠে সন্ত্রস্তভাবে তার দিকে তাকায়। বিজয় সত্যিই তাবিজটা ছিঁড়ে দূরে ফেলে দিয়ে বলে,---মা কি বলবেন ভাবছ। মা কোন কিছু বলবেন না, তিনি যদি জানেন তোমায় বিয়ে করবার জন্যে কোন তাবিজ, কোন তুক্-তাকের সাহায্য আমার লাগবে না।

অনিমা কম্পিত কাতর স্বরে বলে,---তুমি, তুমি কি বলছ!

বিজয় যেন হঠাৎ আরো উগ্র হয়ে ওঠে,---কি বলছি! কেন আমার কথা বিশ্বাস হচেছ না? আমি বিশ্বাস করবার মত লোক নই? হৃদয় নিয়ে খেলা করাই আমার ব্যবসা। ভালবাসার ভান ক'রে শেষ পর্য্যন্ত আমি নির্ম্মমভাবে প্রতারণা ক'রেই বেড়াই!

একটু থেমে সে যেন আরো হিংস্রভাবে বলে, বেশ! কঠিনভাবে সে কথা আমায় শুনিয়ে দাও। অপমান ক'রে আমায় তাড়িয়ে দাও।

অনিমার চোখ সজল হয়ে আসে। মুখ নামিয়ে অশ্রু গোপন করবার চেষ্টা ক'রে সে বলে,---আমি তা ত বলি নি। আমি শুধু ভেবেছিলাম---

কি তুমি ভেবেছিলে? বিজয় প্রায় চীৎকার ক'রে ওঠে।

তার দিকে কাতর চোখ তুলে অনিমা দ্বিধা-জড়িত স্বরে বলে,---আমি ভেবেছিলাম, তোমার মনে হয় ত আমার জায়গা হবে না।

বিজয় অনেকক্ষণ চুপ ক'রে অনিমার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। তার দৃষ্টিও ধীরে ধীরে যেন সজল হয়ে আসে। কোমল ধরা গলায় সে এবার বলে,---কেন জায়গা হবে না, অনিমা? আমি নিজে যে নিরাশ্রয়। জীবনে শুধু আঘাতই পেয়েছি। সে আঘাত, সে বঞ্চনার ব্যথা তুমিই শুধু জুড়িয়ে দিতে পাবো অনিমা। তোমায় কাছে পেয়ে আমি হয়ত সব ভুলতে পারব।

বিজয় অনিমার হাতটা নিজের কাছে টেনে নেয়। হঠাৎ পাশ থেকে বুলার হাসির শব্দ শোনা যায়। সে কখন লুকিয়ে এসে সেখানে বসেছে কেউ জানে না। অনিমা কিছু বলবার আগেই সে চারিদিক আনন্দের হাসিতে মুখর ক'রে ছুটে পালিয়ে যায়।

বিজয়ের কোলকাতা ফেরার অপেক্ষায় পরিতোষ আর নির্ম্মলা এখনও পর্য্যন্ত দরিদ্র বস্তির সেই বাটীতেই বাস করছে। নির্ম্মলার সন্তান সেইখানেই ভূমিষ্ঠ হয়েছে। পরিতোষের যৎসামান্য উপার্জনে কোন মতে তাদের দিন চলে। এই দারিদ্র্য, দুঃখ-কষ্ট, গ্লানির মধ্যে সন্তানের মুখের দিকে চেয়েই যা কিছু সান্ত্বনা নির্ম্মলা পায়। অভাব অনটন যখন দুঃসহ হয়, তাকে ও পরিতোষকে জড়িয়ে সাধারণের স্বাভাবিক সন্দেহ যখন অত্যন্ত পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে, তখন একটি মাত্র ক্ষীণ আশা সম্বল ক'রে ছেলেটিকে বুকে চেপে ধ'রে সে এই কঠিন পরীক্ষার দিন পার হবার শক্তি সংগ্রহ করে। পরিতোষের মনে কিন্তু যেন কোন হতাশা, দুঃখ বা সংশয় নেই। সারাক্ষণ হাসিমুখে কি অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে এই দুঃখের সংসার সে চালাবার চেষ্টা করে তা দেখে নির্ম্মলার মন শ্রদ্ধায় কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে। তার ও তার সন্তানের জন্যে পরিতোষের এই আত্মত্যাগে নির্ম্মলার এক দিক দিয়ে অবশ্য কুণ্ঠার সীমা নেই। এই মানুষটিকে এমনভাবে বিব্রত করার কোন অধিকার ত তার নেই। তার মহত্ত্বের ওপর এই বোঝা আর কত দিন সে চাপিয়ে রাখবে। কিন্তু উপায়ই বা কি? এখনও পর্য্যন্ত বিজয় কোলকাতায় ফেরেনি। কবে যে ফিরবে তাও নির্ম্মলা জানে না।

সে দিন সকালে বাসন-কোসনগুলো মেজে ঘরের তাকে তুলে রাখতে এসে নির্ম্মলা দেখে, দোলনায় শোয়ান তার ছেলেটির হাতে একটা নতুন খেলনা দিয়ে পরিতোষ তাকে আদর করছে। মৃদু ভর্ৎসনার সুরে নির্ম্মলা বল্লে,---পরিতোষদা, আবার বুঝি খোকার খেলনা কিনে এনেছ?

আহা কি সামান্য একটা খেলনা!---পরিতোষ যেন লজ্জিত।

এইবার খোকার মাথায় একটি নতুন রঙিন টুপির দিকে নির্ম্মলার দৃষ্টি গেল। বল্লে,---সামান্য একটা খেলনা! আর ওই টুপিটা কেন?

পরিতোষ যেন অত্যন্ত অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল,---ওই রাস্তায় বিক্রি করছিল, সস্তায় পেয়ে গেলাম তাই। তাতে হয়েছে কি?

নির্ম্মলা কিন্তু সত্যি এবার যেন অসন্তুষ্ট হ'ল। পরিতোষ অসামান্য পরিশ্রম ক'রে কি ভাবে যে তাদের সংসার চালাচেছ তা আর তার জানতে বাকী নেই। একটু রাগ ক'রেই সে বল্লে,--হয়েছে কি! এসব বাজে খরচ করবার কি দরকার ছিল বল ত?

একটা টুপি কিনলেই বাজে খরচ হ'ল?---পরিতোষ কথাটা এড়িয়ে যেতেই চায়।

কিন্তু নির্ম্মলা তাকে সে সুযোগ দিলে না,---কই? তোমার যে জুতো কেনবার কথা, তা কিনেছ?

জুতো?---পরিতোষ যেন অবাক হয়ে বললে,---জুতো এখুনি কেনবার কি দরকার! দেখলাম এ জুতোটায় তালি দিলে এখনও মাসখানেক বেশ চলে যাবে।

অত্যন্ত ক্ষুণ্নস্বরে নির্ম্মলা বললে,---না, এ তোমার অত্যন্ত অন্যায় পরিতোষদা। ওই ছেঁড়া পেরেক-ওঠা জুতো নিয়ে সারাদিন তোমায় কাজের ধান্দায় ঘুরে বেড়াতে হয়। তবু তুমি একটা টুপি কিনে পয়সা নষ্ট ক'রে এলে। কি হবে ওই বাহারের টুপিতে?

একটু চুপ ক'রে থেকে সে আবার ধরা গলায় বললে,---গরীবের ছেলের ওসব লাগে না।

এবার পরিতোষই যেন রাগ ক'রে উঠল,---গরীবের ছেলে, গরীবের ছেলে করিসনি নির্ম্মলা। তোর বাপ গরীব হ'তে পারে, কিন্তু ওর বাপ-ঠাকুরদা ওকে অমন একটা ন্যাকড়ার টুপির বদলে সোনার টুপি পরাতে পারে।

কথাটা তারপর ঘুরিয়ে নেবার চেষ্টাতেই পরিতোষ বললে,---আর দেখ নির্ম্মলা, আমি চেয়ে চেয়ে দেখছিলাম, এ বেটা ঠিক একটি ক্ষুদে জমিদার মশাই হবে। একেবারে ঠাকুরদার নূতন সংস্করণ।

খোকার নাকটা ধরে আদর ক'রে পরিতোষ আবার সস্নেহে বললে,---কেমন ঠিক কিনা? তুই দেখ নাকটা।

আহা কি নাক!---নির্ম্মলা কথাটাকে যেন আমল দিতেই চাইলে না, ফিরে প্রশ্ন করলে,---কিন্তু তোমার এত খুশী কেন আজ বল ত।

পরিতোষ এবার বেশ একটু রহস্যময় হয়ে উঠে বললে,---ও সেই কথাই তোকে বলিনি বুঝি! জানিস,---না থাক্, এসেই বলব।---পরিতোষ যেন একটু ইতস্তত: ক'রে চুপ ক'রে গেল।

কি বলই না পরিতোষদা, শুনে যাও।---নির্ম্মলা কৌতূহলী হয়ে উঠল।

একটু বুঝি আর ধৈর্য্য ধরতে পারলি না?---পরিতোষ হেসে উঠল,---শোন তা'হলে, বিজয় কোলকাতায় এসেছে খবর পেয়েছি। আমি এখুনি যাচ্ছি দেখা করতে। একেবারে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসব। বাপ-বেটায় দেখা হবে, তাই ত বেটাকে সাজিয়ে গুছিয়ে গেলাম একটু! খোকাকে আর একবার আদর ক'রে হাসতে হাসতে পরিতোষ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

নির্ম্মলা বুঝি নিজের হৃদয়ের অকস্মাৎ উদ্দাম স্পন্দন দমন করতে না পেরেই স্তব্ধ হয়ে রইল দাঁড়িয়ে।

পরিতোষ অনেক আশা ক'রেই বিজয়ের কোলকাতায় আসার সংবাদ পেয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে গেছল। সেখানে অত বড় স্বপ্নভঙ্গের আঘাত যে তার জন্যে অপেক্ষা ক'রে আছে সে কি ক'রে জানবে।

পরিতোষ যখন বিজয়ের বাড়ীতে গিয়ে পৌছোল তখন সেখানে বাইরে একটি মোটর দাঁড়িয়ে আছে। পরিতোষ প্রবেশ করবার আগেই বাড়ীর ভেতর থেকে একজন সুন্দরী ভদ্রমহিলার সঙ্গে বিজয়কে সেজেগুজে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল। পরিতোষ সাগ্রহে এগিয়ে গিয়ে ডাকলে,---বিজয়!

বিজয় কিন্তু তাকে যেন দেখতে না পেয়ে ভদ্রমহিলাকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চলে গেল। পরিতোষ অত্যন্ত অবাক হয়ে পেছন থেকে আবার বল্লে,---বিজয়, আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি!

ভদ্রমহিলা আর কেউ নয়, অনিমা। সে-ই এবার বিজয়ের দৃষ্টি পরিতোষের দিকে আকর্ষণ ক'রে বললে,---তোমায় ভদ্রলোক যে কি বলছেন।

বিজয় এবার ভ্রূকুটি ক'রে পরিতোষের দিকে তাকিয়ে অনিমাকে বললে,---আচ্ছা তুমি মোটরে গিয়ে বসোগে, আমি আসছি।

অনিমা গাড়ীর দিকে চলে যাবার পর বিজয় অত্যন্ত কঠিন অপ্রসন্ন মুখে পরিতোষের সামনে এসে দাঁড়াল।

পরিতোষ নির্ব্বোধ নয়। বিজয়ের এই অপ্রত্যাশিত আচরণে অত্যন্ত বিস্মিত ও ক্ষুণ্ন হয়ে সে বললে,---আমায় দেখে তুমি খুশী হও নি মনে হচেছ বিজয়।

সেটা যখন বুঝতেই পেরেছ, তখন আর ব'লে লাভ কি!---বিজয়ের কণ্ঠস্বরে গভীর বিদ্বেষ ও ঘৃণা ছাড়া আর কিছুই নেই।

পরিতোষ সত্যি বিমূঢ় হয়ে গেল। বিজয়ের দিকে খানিক চেয়ে থেকে আহত স্বরে বললে,---কিন্তু তোমার এ ব্যবহারের কারণ ত কিছুই বুঝতে পারছি না।

সে বোঝবার ক্ষমতা তোমার থাকলে নির্লজ্জের মত তুমি এখানে আসতে সাহস করতে না---বিজয়ের কণ্ঠ যতদূর তিক্ত হ'তে পারে।

পরিতোষ অসহায়ভাবে বললে,--তুমি কি বলছ বিজয়! এ-সব কথার অর্থ কি?

তোমার কাছে অর্থ ব্যাখ্যা করবার সময় আমার নেই পরিতোষ। আমায় তাড়াতাড়ি বেরুতে হবে।

অত্যন্ত রুক্ষভাবে কথাগুলো ব'লে বিজয় চলে যাবার উপক্রম করতেই পরিতোষ কাতর-স্বরে বললে,---কিন্তু আমি যে তোমার জন্য আজ পাঁচ মাস অপেক্ষা ক'রে আছি বিজয়; আমার যে অনেক কথা আছে।

তোমার অনেক কথা থাকতে পারে, কিন্তু আমার সময় বা উৎসাহ কিছুই নেই, আমি চল্লুম।

বিজয়কে সত্যিই চলে যেতে উদ্যত দেখে পরিতোষ কাতরভাবে বললে,---তুমি কি হয়েছ

বিজয়! এ যে আমার ধারণার অতীত! শোন, আমি নির্ম্মলার কাছ থেকে আসছি।

বিজয় তাকে রূঢ়স্বরে বাধা দিয়ে তীক্ষ্ণ-কণ্ঠে বললে,--তুমি জাহান্নম থেকে এসে সেই-খানেই যেতে পার! আমার সে সব কথা শোনবার দরকার নেই।

পরিতোষ বিস্ময়ে বেদনায় অভিভূত স্বরে বললে,---তোমার স্ত্রী, তোমার ছেলের কথাও শোনবার তোমার দরকার নেই? তোমার জন্যে পরিচয়, আশ্রয় সব খুইয়ে যারা পথে এসে দাঁড়িয়েছে, তুমি তাদের স্বীকার করতে চাও না?

বিজয় পরিতোষের দিকে খানিক তাকিয়ে থেকে তিক্তস্বরে বললে,---তোমার অভিনয়ের ক্ষমতা আছে বটে পরিতোষ! একদিন তোমার মহত্ত্বে তাই সত্যি বিশ্বাস করেছিলাম, কিন্তু আজ তোমার ও বক্তৃতায় আমায় ভোলাতে পারবে না। শোন, আমার স্ত্রীকে আমি অবশ্যই স্বীকার করি এবং তিনি ওইখানে ওই গাড়ীতে বসে আছেন।

পরিতোষ স্তম্ভিত হ'য়ে অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞাসা করলে,---তোমার স্ত্রী? তুমি বিয়ে করেছ?

তা না হ'লে কি সেই কুলটার শোকে সন্ন্যাসী হ'য়ে থাকব মনে করেছিলে! যাও---এ খবরটা তোমার নির্ম্মলাকে দাওগে যাও।---সুতীব্র বিদ্রূপে পরিতোষকে আহত ক'রে বিজয় সেখান থেকে চলে গেল।

পরিতোষ সেখানে দাঁড়িয়ে রইল আচ্ছন্নের মত।

বিজয়কে সঙ্গে নিয়ে আসবার কথা ব'লে পরিতোষ সেই সকাল বেলা বেরিয়েছিল, ফিরে এল যখন তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। সারাদিন কোথায় কি ভাবে যে তার কেটেছে সে যেন নিজেই স্মরণ করতে পারে না।

দুর্ভাবনা আশঙ্কার মাঝে নির্ম্মলার সারাদিন কেটেছে নিদারুণ উৎকণ্ঠায়। পরিতোষের ফিরতে যত দেরী হয়েছে তত সে অস্থির হয়ে উঠেছে সংশয়ে, শঙ্কায়, দুর্ভাবনায়। এতক্ষণে পরিতোষকে ফিরতে দেখে অনেক কথাই একসঙ্গে বলবার জন্যে সে উন্মুখ হয়ে ওঠে। কিন্তু পরিতোষের মুখের দিকে চেয়ে সে স্তব্ধ হ'য়ে যায়। সে মুখ দেখে বিজয়ের সঙ্গে সাক্ষাতের কোন বিবরণই যেন তার জানতে বাকি থাকে না। প্রাণপণে নিজেকে সম্বরণ ক'রে সে সহজ গলায় হাল্কা ক'রে বলবার চেষ্টা করে,---বাঃ বেশ লোক ত? আমি সেই তখন থেকে বসে বসে খালি ঘড়ি দেখছি। সেই সকালে বেরিয়েছ আর এই বিকেলে তোমার ফিরে আসার সময় হোল?

পরিতোষ কোন উত্তর দেয় না। আচ্ছন্নের মত ঘরের এক কোণে ঘাড় গুঁজে বসে থাকে।

অনেকক্ষণ ঘরে আর কোন শব্দ শোনা যায় না। নির্ম্মলা তারপর বুঝি আর নিজেকে সামলাতে পারে না। অস্ফুট কাতর স্বরে ডাকে,---পরিতোষদা---

পরিতোষের তবু যেন কোন সাড়া নেই। ধরা গলায় ধীরে ধীরে নির্ম্মলা বলে,---তোমার সঙ্গে দেখা বুঝি করলে না?

পরিতোষ এবার তার দিকে ধীরে ধীরে মুখ ফেরায়, বলে,---দেখা না করলেই ভাল ছিল বোধ হয়,---তার গলার স্বরে বিষাদ ও তিক্ততার অদ্ভুত সংমিশ্রণ। হঠাৎ অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে সে আবার বলে,---সে তোমার নাম শুনতেও চায় না নির্ম্মলা, সে আবার বিয়ে করেছে।

নির্ম্মলা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে। চোখে তার অশ্রু নেই, মুখে কোন ভাবান্তর নেই, মনে হয় সে মুখ যেন পাথর দিয়ে তৈরী। অনেকক্ষণ পরে সে ধীরে ধীরে বলে,---আমি জানতাম!

অভিমানে বেদনায় পরিতোষের স্বর জ্বালাময় হয়ে ওঠে,---জানতে? তা হ'লে আমায় সেখানে যেতে বারণ করনি কেন নির্ম্মলা! যেচে তোমার এ অপমান তাহ'লে নিয়ে আসতে আমায় হ'ত না। তীব্রভাবে কথাগুলো ব'লে পরিতোষ আবার যেন ভেঙ্গে পড়ে। শুধু তার মুখ দিয়ে গভীর আক্ষেপের মত বার হয়,---ওঃ এত বড় পাষণ্ড সে হ'তে পারে আমি ভাবতে পারিনি। আমার সমস্ত শরীর যেন তার কাছে দাঁড়িয়ে অশুচি হয়ে গেছে মনে হচ্ছে।

নির্ম্মলা আর সেখানে দাঁড়াতে পারে না। ধীরে ধীরে বিছানায় গিয়ে মুখ গুঁজে লুটিয়ে পড়ে। রুদ্ধ কান্নার অবেগে তার সমস্ত দেহ শুধু দুলে উঠতে থাকে। পরিতোষ তার পাশে গিয়ে বসে তার গায়ে হাত রাখে। তার সহানুভূতিও কিন্তু বিজয়ের ওপর ঘৃণায় বিদ্বেষে অন্য এক রূপ নিয়ে প্রকাশ পায়,---কার জন্য তুমি কাঁদছ নির্ম্মলা? সত্যিই মনে কর তোমার বিয়ে হয়নি। ওকে তোমার স্বামী ব'লে ভাবতেও ঘৃণা হওয়া উচিত।

নির্ম্মলা হঠাৎ অশ্রুসিক্ত কাতর মুখ তুলে বলে,--না, না, ও কথা বোলো না।

বলব না! একশোবার বলব। পরিতোষ উগ্র হয়ে ওঠে,---নিজের শয়তানী মতলব হাসিল করতে ফাঁকি দিয়ে সে দুটো মন্ত্র পড়বার ভান করলে, সেই তোমার স্বামী---আর - - -আর--

কি যেন বলতে গিয়ে পরিতোষ হঠাৎ থেমে যায়। তারপর নিজেকে সম্বরণ করার জন্যই যেন সেখান থেকে সরে গিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। সমস্ত ঘর আবার নিস্তব্ধ।

সে নিস্তব্ধতা কিছুক্ষণ বাদে ভাঙে বাইরের একটি বালিকার কণ্ঠের ডাকে। গোয়ালাদের মেয়ে দুধ দিতে এসেছে। বাইরে থেকে সে ডাকে,---কই গো দুধ নিয়ে যাও না।

কারুর কোন সাড়া-শব্দ না পেয়ে সে ঘরে ঢুকে তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে,---বা রে! বর-বৌ মিলে এ ঘরে বসে গল্প হচেছ আর আমি চেঁচিয়ে মরছি!

পরিতোষ আর নির্ম্মলার সঙ্কুচিত দৃষ্টি একবার পরস্পরের সঙ্গে মিলে যায়। মেয়েটি আবার খেঁকিয়ে ওঠে,---কোথায় দুধ রাখব বল?

শান্তস্বরে নির্ম্মলা বলে,---ওঘরে বাটি আছে, তাইতে ঢেলে রেখে যা!

ইস্ নিজে বুঝি আর বরের কাছ থেকে উঠতে পারলে না,---মুখ-ভঙ্গি ক'রে মেয়েটি ঘর থেকে দুধের বালতি নিয়ে বেরিয়ে যায়।

নির্ম্মলা আর পরিতোষ অনেকক্ষণ কেউ কারুর দিকে তাকাতে পারে না। অনেকক্ষণ বাদে পরিতোষই প্রথম নির্ম্মলার দিকে এগিয়ে আসে। তার মুখে যেন একটা নূতন সঙ্কল্পের দৃঢ়তা। এমন দৃষ্টি তার চোখে কোনদিন দেখা যায় নি,---তোমার এখনো হয় ত এ-সব শুনলে লজ্জা করে নির্ম্মলা; কিন্তু আমার আর করে না। আমি জানি---এই গ্লানির মধ্যেই আমাদের বাস করতে হবে চিরদিন। আমাদের আর কোন সম্পর্ক কেউ কখন বিশ্বাস করবে না।

পরিতোষ একটু চুপ ক'রে থেকে যেন নতুন শক্তি সংগ্রহ ক'রে নিয়ে এক নিঃশ্বাসে ব'লে যায়,---তাই ভাবি, কেন এ সম্পর্ক আমরা সত্য ক'রে তুলব না? যা মিথ্যে গ্লানি হয়ে আছে তা কেন সত্যে মধুর হয়ে উঠবে না!

নির্ম্মলা সচকিতভাবে পরিতোষের দিকে মুখ তুলে তাকায়---সে দৃষ্টিতে বিস্ময় না আতঙ্ক, বেদনা না বিমূঢ়তা, কি যে সবচেয়ে প্রধান স্পষ্ট ক'রে বোঝা যায় না। পরিতোষ উত্তেজিতভাবে বলে,---ভাবছ, কি আমি বলছি। তার গলার স্বর কাতর হয়ে আসে। এ-সব কথা কোনদিন হয় ত বলতাম না, বলবার প্রয়োজনও হ'ত না। দুর্ব্বলতা বল, পাগলামি বল, দিনের পর দিন তোমার পাশে থেকে তোমায় দেখে আমার মনের মধ্যে যে আকুলতা জমে উঠেছে কোনদিন তোমার কাছে তা প্রকাশ করতাম না। কিন্তু আজ সমাজ সংসার সবাই আমাদের ত্যাগ করেছে; কোথাও আমাদের জায়গা নেই। এই নির্ম্মম উদাসীন পৃথিবীতে পরস্পরের হাত ছাড়া আর আমাদের ধরার কিছু নেই। আজ আর তাই নিজেকে সংবরণ করতে পারছি না।

পরিতোষ এক মুহূর্ত্ত চুপ করে। তারপর ব্যাকুলতায় তার গলার স্বর আবার তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে।---কেনই বা সম্বরণ করব নির্ম্মলা! সমস্ত পৃথিবী আমাদের অস্বীকার করেছে, আমরা কেন সমস্ত পৃথিবীকে অস্বীকার করব না! কেন আমরা তাদের দেওয়া অপমান গ্লানিকে উপেক্ষা ক'রে নতুন ক'রে নিজেদের জীবন গড়ে তুলব না!

পরিতোষ থেমে যায়। নির্ম্মলা ধীরে ধীরে অশ্রু-সজল চোখ অন্য দিকে ফিরিয়ে নেয়। সে

অশ্রু অপ্রত্যাশিত আঘাতের না মমবেদনার কে জানে!

পরিতোষ তার কাছে গিয়ে বসে ধীরে ধীরে বলে,---আমি জানি, তোমার মনে আমার সে রকম কোন স্থান নেই। হয়তো শুধু একটু শ্রদ্ধা ছাড়া আর কিছু দাবী করতেও আমি পারি না। তবু কোন দিন শ্রদ্ধার চেয়ে বেশী কিছু পাব এই আশাই আমার কাছে যথেষ্ট নির্ম্মলা।

কথাগুলি ব'লেই পরিতোষ উঠে পড়ে। তারপর নিজের ঘরের দিকে চলে যাবার পথে আবার ফিরে দাঁড়িয়ে বলে,---এ-সব কথায় তোমার যদি আঘাত লেগে থাকে, তাহ'লে শুধু এই ভেবেই ক্ষমা ক'রো যে, আমিও সামান্য দুর্ব্বল মানুষ ছাড়া আর কিছু নই। একটু স্নেহ, একটু ভালবাসার ক্ষুধা আমি জয় করতে পারিনি।

পরিতোষ আর সেখানে দাঁড়ায় না।---তোমার উত্তর এখুনি আমি চাই না নির্ম্মলা, তার জন্যে অপেক্ষা করবার ধৈর্য্য আমার আছে---কোনমতে এই কথাগুলি ব'লেই নিজের ঘরে চলে যায়। নির্ম্মলা যেমন মুখ ফিরিয়েছিল তেমনিভাবেই নিথর নিস্পন্দ হয়ে বসে থাকে।

রাত গভীর হয়। মনের মধ্যে সারাদিন যে ঝড় তার গেছে, তারই আঘাতে ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পরিতোষ কখন এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে, সে নিজেই জানতে পারে না। হঠাৎ কি একটা আওয়াজে ধড়মড় ক'রে সে উঠে বসে। তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় প্রথমটা সে বুঝতে পারে না, বাইরে না মনের ভিতরই একটা প্রচণ্ড ঝড় চলেছে। নির্ম্মলার ঘরে আবার একটা আওয়াজ শোনা যায়। পরিতোষ উদ্বিগ্নভাবে ডাকে,---নির্ম্মলা!

কোন সাড়া নেই নির্ম্মলার।

পরিতোষ উঠে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে আবার তাকে ডাকে। এবারও কোনও সাড়া পাওয়া যায় না। টিনের চাল কাঁপিয়ে দমকা একটা ঝোড়ো হাওয়া যেন আর্ত্তনাদ ক'রে যায়। নির্ম্মলার ঘরে আবার সেই শব্দ।

পরিতোষ আর দ্বিধা না ক'রে মাঝের দরজাটা খুলে নির্ম্মলার ঘরে গিয়ে ঢোকে। ঝড়ের বেগে ঘরের একটি জান্‌লার পাল্লাদুটি সশব্দে খুলে আবার বন্ধ হয়ে যায়। এই শব্দই সে পাশের ঘর থেকে শুনেছে নিশ্চয়।

কিন্তু নির্ম্মলা কোথায়? ঘরের বাইরে যাবার দরজা খোলা। দোলনায় তার সকাল বেলার কিনে দেওয়া পুতুলটি শুধু পড়ে আছে। দোলনার কাছে গিয়ে পরিতোষ বেদনা-বিমূঢ়ভাবে গিয়ে দাঁড়ায়। পুতুলটি অন্যমনস্কভাবে হাতে তুলে নিতে গিয়ে চিঠিটি এবার সে দেখতে পায়। যন্ত্রচালিতের মত চিঠিটা খুলে সে পড়ে। একবার নয়, বারকয়েক পড়ে তবে যেন চিঠির মর্ম্ম সে বুঝতে পারে। নির্ম্মলা লিখে গেছে,---

পূজনীয়েষু,

খোকাকে নিয়ে আমি চলে যাচ্ছি। বিশ্বাস কর যে, তোমার ওপর রাগ ক'রে বা তোমার কথায় আঘাত পেয়ে নয়। শুধু আমার আর এখানে থাকা উচিত নয় ব'লেই যাচ্ছি। আমি এবার বুঝেছি যে, আমি সংসারের অভিশাপ। যেখানে থাকব শুধু সর্ব্বনাশই ডেকে আনবো। বাপ-মার জীবন আমার জন্য বিষ হয়ে গেছে তারপর তোমার মত দেবতাকেও আমি কোথায় নামিয়ে এনেছি! এর চেয়ে বড় দুঃখ আর আমার কিছু নেই। আর কিছু লিখতে পারছি না। তুমি আমায় ক্ষমা করো, আমায় খোঁজবার চেষ্টা করো না। ইতি---

প্রণতা
"নির্ম্মলা"

চিঠিটার মর্ম্ম বুঝে আচ্ছন্নের মত অনেকক্ষণ পরিতোষ সেখানে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর হঠাৎ ঝড়ের মত ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

সারারাত পরিতোষ উদ্দেশ্যহীনভাবে নগরের পথে পথে নির্ম্মলাকে খুঁজে বেড়ায়। তারপর সকাল হ'তেই তাকে বিজয়ের বাড়ীতে দেখা যায়। তার ক্ষ্যাপার মত উস্কো খুস্কো চেহারা দেখেও অপ্রসন্নভাবে বিজয় বলে,---আবার তুমি এখানে?

পরিতোষ কাতরভাবে বলে,---তুমি তাড়িয়ে দিয়েছিলে, তবু না এসে পারলাম না বিজয়! আমাদের ভয়ানক বিপদ। নির্ম্মলা কাল রাত্রে বাড়ী থেকে চলে গেছে!

বিজয় বিদ্রূপের হাসি হেসে বলে,---শুনে বিশেষ আশ্চর্য্য হলাম না। তা ছাড়া এ সংবাদ আমার শোনবার কোন দরকার নেই।

এ অবজ্ঞা মাথা পেতে নিয়ে পরিতোষ ব্যাকুল-ভাবে বলে,---তুমি বুঝতে পারছ না বিজয়। তাকে এখুনি খুঁজে না পেলে কি সর্ব্বনাশ হবে, এই কোল-কাতা শহরে ওই ছেলেটি নিয়ে কি বিপদে সে পড়তে পারে! কিছু সে জানে না, কোন আশ্রয় তার নেই।

আশ্রয় না পেয়েই চলে যাবার মত নির্ব্বোধ সে নয়,---বিজয়ের গলায় নিষ্ঠুর বিদ্রূপ, সে নিষ্ঠুর ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলে,---আর চলে যে যাবে সে ত জানা কথা। একদিন আমাকে ছেড়ে তোমার ওপর ভর করেছিল, আজ আবার তোমায় ছেড়ে আর কারুর ওপর ভর করেছে দেখগে যাও।

তুমি কি বলছ তুমি নিজে জান না বিজয়! নির্ম্মলার ওপর চরম অবিচার তুমি করেছ। কিন্তু এখন এমন ক'রে নির্ম্মম হয়ো না। তোমার ছেলের খাতিরেও তাকে খুঁজে বার করতে আমায় সাহায্য কর!

না, কোন সাহায্য আমি করবো না,---তীব্র ঝাঁঝালো গলায় বিজয় চীৎকার ক'রে ওঠে।---এবং তোমাকেও বলছি, এর পর নির্ম্মলার কথা নিয়ে আমার কাছে এলে তুমি অপমানিত হবে।

বিজয় তার দিকে না তাকিয়েই ভেতরে চলে যায়। বিমূঢ় অসহায়ভাবে পরিতোষ অবশেষে বেরিয়ে আসে।

কিন্তু যত অপমানই ভাগ্যে থাক, পরিতোষ ত নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকতে পারে না। পরিতোষকে সমস্ত দ্বিধা সঙ্কোচ জয় ক'রে জমিদার বীরেন্দ্রনারায়ণের কাছে আবার যেতে হয়। কাতরভাবে সে তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করে,---আমার সম্বল কতটুকু? কতটুকুই বা আমার ক্ষমতা? কিন্তু আপনি চেষ্টা করলে এখনো তাকে খুঁজে বার করতে পারেন, এখনো,---এখনো তাদের বাঁচান যায়!

বীরেন্দ্রনারায়ণ কাছারী ঘরে বসেই পরিতোষের কথা শুনছিলেন। অদূরে শশিভূষণ তাঁর খাতা-পত্রের মধ্যে নিমগ্ন। বীরেন্দ্রনারায়ণকে খানিক চুপ ক'রে থাকতে দেখে যেটুকু আশা পরিতোষের হয়েছিল, পর মুহূর্ত্তে তাঁর রুক্ষস্বরে সে আশা তার চুরমার হয়ে যায়। চৌধুরী মশাই গম্ভীরভাবে বলেন,---কিন্তু আমার তাদের খোঁজবার কোন দায় ত নেই।

পরিতোষ তবু বলে,---আপনি অন্তরে অন্তরে জানেন সত্যি দায় আছে কি না! আর কেউ না বুঝুক, আপনি মনের ভেতর জানেন যে, সে নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক। যে সন্তান নিয়ে সে আজ নিরাশ্রয় হয়ে পথে বেরিয়েছে তার মধ্যে যে আপনাদের বংশের রক্তই বইছে এ-কথা জেনেও এমন নিষ্ঠুর হবেন না। আপনার অভিমানে যদি কোন দিন ঘা লেগে থাকে তার শোধ কি এতদিনেও হয় নি? আপনার বংশধর ওই দুধের শিশুকে না মারলে কি তার তৃপ্তি হবে না?

বীরেন্দ্রনারায়ণ মাথা নীচু ক'রে সমস্ত কথাই শোনেন।

পরিতোষের দীর্ঘ আবেদনের মাঝে কোন বাধা তিনি দেন না। কে জানে হয়ত হৃদয়ের কোন গভীর স্তরে গিয়ে পরিতোষের মিনতি তাঁকে আঘাত করেছে কি না।

শশিভূষণকে খাতাপত্র থেকে একবার মুখ তুলে তাঁর দিকে তাকাতে দেখা যায়।

কিন্তু হঠাৎ বীরেন্দ্রনারায়ণ কি যেন রুদ্ধ আবেগ চাপতে না পেরে একেবারে ফেটে পড়েন,---এসব উপদেশ তোমার কাছে শুনতে প্রস্তুত নই। তোমার ধৃষ্টতা অনেক সহ্য করেছি, কিন্তু আর নয়। তুমি যাও।

পরিতোষ বুঝতে পারে আর কোন আশা নেই। ম্লানমুখে সে বলে,---দোহাই আপনার, এখনও ভেবে দেখুন।

বীরেন্দ্রনারায়ণ বজ্রগম্ভীরস্বরে হাঁকেন,---যাও।

অপমানে, বেদনায়, হতাশায় পরিতোষের চোখে এবার সত্যি জল আসে। বিহ্বলভাবে খানিক সামনে তাকিয়ে থেকে সে ধীরে ধীরে বেরিয়ে যায়।

সমস্ত কাছারী ঘর কি একটা নিদারুণ অস্বস্তিতে যেন স্তব্ধ।

সে স্তব্ধতা প্রথম ভাঙে শশিভূষণের কথায়। হঠাৎ খাতাপত্র থেকে মুখ তুলে নেহাৎ যেন কথায় কথায় তিনি বলেন,---ছেলেটা শুনলাম দেখতে চমৎকার হয়েছিল।

তুমি চুপ করো শশিভূষণ!---চৌধুরী মশাই প্রায় গর্জন ক'রে ওঠেন।

আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি ত চুপ ক'রেই আছি,---ব'লে শশিভূষণ আবার খাতাপত্রে নিবিষ্ট হন। কিন্তু মুখ তাঁর বন্ধ হয় না। খানিক বাদেই বলেন,---কাঙ্গাল ভিখিরীদের অমন কত ছেলে পথে ঘাটে না খেতে পেয়ে মারা যাচেচ, তাতে কার কি?

চৌধুরী মশাই কঠিনভাবে তাঁর দিকে তাকিয়ে বলেন,---যার যেমন কাজ, তাকে তেমন শাস্তি পেতে হবে। আমাদের তা নিয়ে ভাবনা করবার কিছু নেই!

কিছু না, কিছু না, কোথাকার কে তার জন্য আবার ভাবনা! শশিভূষণের গলায় ঠিক ঔদাসীন্য কিন্তু ফুটে উঠে না---এতদিনে হয় ত সাবাড়ই হয়ে গেছে। আর জন্মে কর্ম্মদোষ ছিল নিশ্চয়, এজন্মে তাই শাস্তি।

বীরেন্দ্রনারায়ণ আর যেন সহ্য করতে পারেন না। ঘর থেকে সবেগে তাঁকে বেরিয়ে যেতে দেখা যায়। কিন্তু দরজার কাছে গিয়ে তিনি ফিরে দাঁড়ান। তারপর নেহাৎ যেন তাচ্ছিল্যভাবে বলবার চেষ্টা করেন,---তোমার যদি ইচ্ছে হয় তুমি কোলকাতায় গিয়ে খোঁজ করতে পার।

শশিভূষণ উত্তর দেয় না। খাতায় কি একটা লেখা তিনি সযত্নে কাটছেন দেখা যায়। সেখানে লেখা আছে।---

না আমায় ঘুরাবি কত
চোখ বাঁধা বলদের মত!

জমিদার মশাই ইতিমধ্যে আবার তাঁর কাছেই এসে দাঁড়িয়েছেন। শশিভূষণ যেন লজ্জিত হয়ে খাতাটা মুড়ে ফেলেন। চৌধুরী মশাই বলেন---তুমি আজই রওনা হ'তে পার।

আজ্ঞে হ্যাঁ তাই ভাবছি,---জমিদার ফিরে চলে যেতেই শশিভূষণের মুখে মৃদু একটু হাসি দেখা যায়।

শশিভূষণ কোলকাতায় এসে নির্ম্মলাকে খোঁজবার চেষ্টার কোন ক্রটি রাখেন না। থানায় থানায় খবর দিয়ে ও খোঁজ নিয়ে, নিজেদের লোক সর্ব্বত্র লাগিয়ে যেভাবে তিনি নির্ম্মলার জন্য ব্যাকুলভাবে শহর চষে বেড়ান তাতে সত্যি একটু অবাকই হ'তে হয়। জমিদারের চেয়ে তাঁর যেন বেশী দায় এখন নির্ম্মলাকে খোঁজবার।

কিন্তু এত ক'রেও নির্ম্মলার কোন খোঁজ মেলে না। শশিভূষণ ক্রমশঃ হতাশ হয়ে ওঠেন। নির্ম্মলা কি তা'হলে কোলকাতাতেই নেই? ওই একটি দুধের শিশুকে নিয়ে এই বিরাট মহানগরীতে সে কি সত্যিই চিরদিনের মত নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে?

নির্ম্মলা কিন্তু কোলকাতার বাইরে কোথাও যায়নি। অনেক দুঃখ, অনেক দুর্য্যোগের পর রাঁধুনীরূপে একটি গৃহস্থ বাড়ীতে সে আশ্রয় পেয়েছে। কিন্তু ভাগ্য তার প্রতি এতটা সুপ্রসন্ন বেশী দিন থাকে না। সেদিন সকালে সে রান্নাঘরে বসে রাঁধছিল। তার ছেলেটিকে একটি ভাঙ্গা খেলনা দিয়ে কাছেই রেখেছিল বসিয়ে। হঠাৎ ছেলেটি ডুকরে হাত-পা ছুঁড়ে কেঁদে ওঠে। নির্ম্মলা ফিরে দেখে, মনিবের দুরন্ত ছেলেটি কখন এসে তার খেলনাটি কেড়ে নিয়েছে।

নির্ম্মলা উঠে এসে মিষ্টি ক'রে বলে,---ওটা দিয়ে দাও মনু, দেখছ না কাঁদছে।

কাঁদছে ত বয়ে গেল!---মনিবের আদরের ছেলে মনু যেমন অসভ্য তেমনি স্বার্থপর।

ওটা ত তোমার নয়, কেন তুমি নিচ্ছ?---আবার শান্তস্বরে বলে নির্ম্মলা।

বেশ করেছি নিচ্ছি, এটা ত আমি কাল কিনেছি!---মনু অম্লান বদনে বলে।

ছিঃ মিথ্যে কথা বলতে নেই---নির্ম্মলা মৃদু একটু শাসন করে।

আদুরে গোপাল মনু চীৎকার ক'রে ওঠে,---আমি মিথ্যেবাদী? তুই, তুই মিথ্যেবাদী!

দূর থেকে মনুর চীৎকারে তার মা এবার এসে উপস্থিত হন,---কি হয়েছে কি, এত গণ্ডগোল কিসের?

মনু একেবারে মার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে কেঁদে উঠে বলে,---দেখ না মা, বামুন ঠাকরুণ আমায় যা-তা ব'লে গাল দিচেছ।

মনুর মা ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেন,---তুমি ত বেশ লোক বাছা, আমারি খেয়ে প'রে আমার ছেলেকে গালমন্দ! এত বড় তোমার স্পর্দ্ধা!

নির্ম্মলা সমস্ত ব্যাপার দেখে হতভম্ব। শান্তস্বরে তবু সে বলে,---গালমন্দ দিই নি, মিথ্যে কথা বলছিল তাই বলছি।

কি---ছোট মুখে বড় কথা!---মনুর মা গর্জ্জন ক'রে ওঠেন!---আমার ছেলে মিথ্যেবাদী? পথে পথে ভেসে বেড়াচ্ছিলে, দয়া ক'রে ঘরে এনে ঠাঁই দিয়েছি, আবার আমার মুখের ওপরই চোট! বেরিয়ে যাও! বেরিয়ে যাও!---আমার বাড়ী থেকে।

এত বড় অপমানেও নির্ম্মলা রেগে ওঠে না। রাগ করবার তার অধিকার কোথায়? খানিক বিষণ্ণভাবে তাকিয়ে থেকে শান্তভাবে বলে,--কেন মিছে রাগ করছেন, আমার আশ্রয় নেই ব'লেই ত বার বার আমায় তাড়িয়ে দেবার ভয় দেখান!

ইস! আশ্রয় ত নেই কিন্তু তেজ ত আছে ষোল আনা!---মনুর মা খেঁকিয়ে ওঠেন। না বাপু, তোমার মতন রাঁধুনী আমার দরকার নেই; কোন্‌দিন কি রান্নায় মিশিয়ে বাড়ীশুদ্ধ মার আর কি? তুমি এখুনি বেরোও, এখুনি এই কাপড়ে, বেরোও বলছি।

এরপর আর কোনমতেই বুঝি থাকা চলে না। ম্লান অশ্রুসজল মুখে রোরুদ্যমান ছেলেটিকে কোলে তুলে নিয়ে তালি দেওয়া কাঁথাটি জড়িয়ে নির্ম্মলা ধীরে ধীরে সে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যায়।

তারপর পথে পথে একটি অসহায় নিঃসম্বল সন্তানের জননীর দিন যে কি ভাবে কাটে তার বর্ণনাও বুঝি দুঃসহ। দুর্দ্দশার শেষ সীমায় উপস্থিত হয়ে সন্তানকে কোলে নিয়ে ভিক্ষা মাত্র যখন তার সম্বল হয়েছে, তখন পথের ধারের একটি গ্যাসের তলায় তার দেখা পাওয়া যায়। শিশুটিকে বুকে ক'রে পথচারীর দয়ার ওপর নির্ভর ক'রে সে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে।

আকাশে ঘন ঘটা। ঝিরঝির ক'রে বৃষ্টির আর বিরাম নেই। ঝিরঝিরে বৃষ্টি মাঝে মাঝে এক একবার প্রবল হয়ে উঠছে। ছেলেটিকে কোনমতে বৃষ্টি থেকে ছেঁড়া কাঁথা ঢাকা দিয়ে বাঁচিয়ে তবু নির্ম্মলাকে দাঁড়িয়েই থাকতে হয়। ভিক্ষাটা এখনও বুঝি স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়ায় নি! কেউ কিছু দিতে এলেও লজ্জা ও সঙ্কোচ এসে হাত বাড়াতে বাধা দেয়।

পাশেই একটি সাধারণ চায়ের দোকান। সেখান থেকে বেরিয়ে ছাতা মাথায় দিয়ে একটি লোক নির্ম্মলার কাছ দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়। নির্ম্মলা একবার তার মুখের দিকে চেয়েই সঙ্কুচিতভাবে আরো অন্ধকারের দিকে সরে যাবার চেষ্টা করে। কিন্তু লোকটি তবু ছাড়ে না। আরো কাছে মুখটা এগিয়ে নিয়ে গিয়ে বলে,---আরে কে, আমাদের নির্ম্মলা না? নির্ম্মলার কোন উত্তরের অপেক্ষা না রেখেই উল্লসিত কণ্ঠে বলে,---ঠিক চিনেছি বাবা! আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারে এমন মেয়েছেলে ত দেখলাম না; তা বাবা জড়োয়া বেনারসীই পরো আর ছেঁড়া কাঁথাতেই ঢাক---একবার দেখছি ত ব্যস, ছাপা হয়ে গেছে। নির্ম্মলা তবু নীরব। লোকটিকে সে অবশ্য চিনতে পেরেছে। যে বাড়ীতে পরিতোষ ও সে প্রথম কোলকাতায় আশ্রয় নিয়েছিল, লোকটি তার বাড়ী-ওয়ালা রাখালরাজ চক্রবর্ত্তী।

রাখালরাজ একটু চুপ ক'রে থেকে হেসে বলে,---তারপর পথে এসে দাঁড়িয়েছ তাহ'লে? পথে ভাসিয়ে দিয়ে সে বেটা সট্‌কান, কেমন? সে আগেই জানতাম---সব ব্যাটাই দেয়। সবাই ত আর রাখালরাজ চক্কোত্তি নয়! একবার পা ফস্কে-ছিল, ব্যস সেই থেকে রাজরাণী ক'রে রেখেছি দেখগে যাও। তা বলি, থাকা হয় কোথায়? ঘরটর নিয়েছ নাকি? নিতেই হবে বাপু। না নিয়ে থাক, চল বন্দোবস্ত ক'রে দিচ্ছি। খাসা বন্দোবস্ত! খাট পালঙ্, বার্ণিস করা সিসেবসান আলমারী, সব একেবারে মজুত। খালি মাসে মাসে কিস্তির

টাকাটা গুণে গেলেই হ'ল। তা তুমি পারবে---বেটা এখনও সব ফুতুর ক'রে যেতে পারে নি, রূপ-যৌবন কি বলে---

রাখালরাজ গোৎসাহে কতক্ষণ বকে যেত কে জানে? কিন্তু নির্ম্মলা এবার অস্ফুট কাতর কণ্ঠে বাধা দিয়ে বলে,--আমার ছেলের দুদিন ধরে জ্বর, দুদিন ধরে কিছু খায়নি।

রাখালরাজের চেহারা তৎক্ষণাৎ বদলে যায়,---অ্যাঁ, ছেলের জ্বর! রামঃ রামঃ! এই ত সব মাটি ক'রে দিলে দেখছি! ওই ছেলেপুলে শুনলেই যে মনটা অন্যরকম হয়ে যায়! দেখ দিকি কোথা থেকে এক ল্যাঠা বাধিয়ে বসলে? তা ছেলে জ্বর ত রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভিজছ কেন?

রাখালরাজ রীতিমত বিরক্ত হয়ে ওঠে। নির্ম্মলার কাছ থেকে কোন উত্তর না পেয়ে নিজের মনে আবার বলে,---বুঝেছি, দাঁড়াবার জায়গা আর নেই। ভালো ফ্যাসাদ বাধল ত এই সন্ধ্যা বেলায়! তোমায় দেখে এখন চলেই বা যাই কি ক'রে? ভদ্দর লোকের ছেলে হ'লে না হয় দুটো পয়সা দিয়েই সরে পড়তাম। আমাদের শালার যত মরণ, তোমায় ফেলেও যেতে পারি না।

রাখালরাজের অস্থিরতাটা সত্যি উপভোগ্য। একটু ইতস্ততঃ ক'রে সে আবার বলে,---চলো, নেহাৎ আমার গেরো, নিয়ে যেতেই হবে। সে খাণ্ডার মাগী আবার দুশো কথা শোনাবে'খন। তা শোনালে আর কি করছি বল। ছেলের জ্বর! দেখ দিকি---নাও এস!

ছাতাটি সযত্নে নির্ম্মলার মাথায় ধরে রাখালরাজ এবার অগ্রসর হয়। নির্ম্মলাকেও সঙ্গে যেতে হয়।

এটুকু অনুগ্রহে আপত্তি জানাবার মত অবস্থা তার এখন নয়। রাখালরাজ যেতে যেতে অভ্যাস মত বকতে সুরু করে,---ছেলের জ্বর তা আমাদের ওখানে দুদিন আগে যাও নি কেন? গেলে কি তোমায় কেউ ঝাঁটা মেরে বিদায় করতো! বলিহারী বুদ্ধি হটে! তা' না হ'লে আর বলে মেয়েমানুষ!

নির্ম্মলাকে সঙ্গে নিয়ে, বাড়ীর বাইরে পৌছে কিন্তু রাখালরাজ একবার থামে, তারপর একটু যেন ইতস্ততঃ ক'রে বলে,---এখানে একটু দাঁড়াও বাপু, আমি আগে একটু হাওয়া বুঝে আসি। বলা ত যায় না, এখন ডাকিনী না যোগিনী, না মোহিনী কোন্ মূর্ত্তিতে আছেন।

নির্ম্মলাকে সেখানে দাঁড় করিয়ে রেখে রাখাল-রাজ বেশ একটু সভয়েই নিজের ঘরে গিয়ে ঢোকে। তারপর একগাল হেসে দুবার মাথা চুলকে বলে,---কাপড় গুছোচিছ্স বুঝি?

যাঁকে উদ্দেশ ক'রে মোলায়েম কণ্ঠে এ প্রশ্ন করা হয় রাখালরাজের সেই পরিবার কাংশকণ্ঠে খেঁকিয়ে ওঠেন,---কেন, দেখতে পাচছ না? চোখের মাথা খেয়েছ?

ওই ত তোর দোষ। একটা ভাল ক'রে কথা বলতে গেলাম!---রাখালরাজ যেন অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ।

কিন্তু অপর পক্ষের তাতে কিছু মাত্র নরম হ'ওয়ার লক্ষণ দেখা যায় না।---আর ভাল কথায় কাজ নেই! আমার বলে মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল,---সংসার নিয়ে হিমসিম খেয়ে যাচিছ, উনি ভাল কথা শোনাতে এলেন!

রাখালরাজ হাওয়া বুঝে অত্যন্ত সহানুভতির সুরে বলে,---সত্যি তোর বড্ড খাটুনি।

আর সোহাগে কাজ নেই। কি রাজ-ঐশ্বর্য্যি দিয়ে রেখেছ? খাটুনি নিয়ে আবার আফশোষ!---মুখ নাড়া দিয়ে বাড়ীর গিন্নি বাইরে যাবার উপক্রম করেন।

আহা, রাগ করিস কেন? রাখালরাজ ব্যস্ত হয়ে ওঠে,---ভাবছিলাম তোর একটা সঙ্গের লোক-টোক থাকত, একটু কাজের সুসার হ'ত, দুদণ্ড গল্প-টল্প করতিস---

রাখালরাজের কথাটা আর শেষ করতে হয় না। আগুনে যেন ঘি পড়ে।---বলি মতলবটা কি বল ত? বুড়ো বয়সে পালক গজিয়েছে বুঝি?---গিন্নি মারমুখী হয়ে ওঠেন।

রাখালরাজ সভয়ে দু'পা পিছিয়ে বলে,---আরে রামঃ রামঃ! কি যে বলিস তুই, আমি মানে---

আমাদের সেই ভাড়াটে মেয়েটা ছিল না,---বড় দুঃখে পড়েছে। পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিল---

ও হতচ্ছাড়া, তুমি তাকে ফুসলে এনে এইখানেই রাখতে চাও? আমারি বুকের ওপর বসে দাড়ি ওপড়ান?---গিন্নি এবার সত্যি গলার চোটে পাড়া মাথায় ক'রে বলেন---আন না একবার দেখি, মুড়ো খ্যাংরা দিয়ে বিদেয় করব। আমার নাম বিদ্যেধরী---

রাখালরাজ শশব্যস্ত হয়ে বলে,---আহা করিস কি! শুনতে পাবে। এই বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।

কি? একেবারে বাড়ীতে এনে তুলেছ বুঝি! দাঁড়াও---ব'লে বিদ্যেধরী রণরঙ্গিনী মূর্ত্তিতে ঘর থেকে বার হয়। রাখালরাজ সভয়ে পিছু পিছু তাকে সামলাবার চেষ্টায় যেতে যেতে বলে,---আরে শোন্---

কিন্তু কে কার কথা শোনে। একেবারে বাঘিনীর মত বিদ্যেধরী গিয়ে নির্ম্মলার সামনে দাঁড়ায়। রাখালরাজ ব্যাকুলভাবে জানায়,---শোন শোন, ওর ছেলের জ্বর, কদিন ধরে খেতে পায় নি।

বিদ্যাধরী একবার রাখালরাজ, একবার নির্ম্মলার মুখের দিকে বারকয়েক অগ্নিদৃষ্টিতে তাকায়। তারপর তেমনি ঝাঁঝাল গলায় বলে,---হ্যাঁগা ভাল মানুষের মেয়ে! ছেলে নিয়ে ত পথে ভেসেছ, বুঝেছি, কিন্তু গলায় ফাঁস দেবার আর কি মানুষ ছিল না শহরে? আমার সর্ব্বনাশ করতে এই উজবুকটিকে ধরেছ কেন?

নির্ম্মলা সকাতর দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বলে,---না, না,---আমি চলে যাচ্ছি, আমি তোমাদের কোন ক্ষতি করতে চাইনি।

না, ক্ষতি করতে চাও না! রোগা ছেলে নিয়ে ঘরের দরজা থেকে শুকনো মুখে ফিরে যাও, আর আমাদের শাপ-মন্যি লাগুক আর কি!

নির্ম্মলা বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

বিদ্যাধরী আবার ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে,---ঢঙ ক'রে আর দাঁড়িয়ে কেন? দয়া ক'রে এসে বাড়ীতে ঢোক, কিতার্থ হই। ভাল আপদ হয়েছে।

মুখখানা বিরক্তিতে বিকৃত হ'লেও দেখা যায় ছেলেটিকে সে নিজেই কোলে তুলে নিয়েছে। তারপর আর একবার খেঁকিয়ে উঠে সে বলে,---একেবারে সাবাড় ক'রে এনেছ দেখছি! গা একেবারে পুড়ে যাচেছ যে!

নির্ম্মলাকে ছেড়ে এবার স্বামীর দিকে বিদ্যাধরী মনোযোগ দেয়,---হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে কেন? দুধ-টুধ আনতে হবে না, রোগা ছেলে খাবে কি?

হ্যাঁ, এই যে যাই,--ব'লে থতমত খেয়ে রাখাল-রাজ বেরিয়ে যায়।

হেঁচকা দিয়ে নির্ম্মলার হাতটা টেনে বিদ্যাধরী যেন জেলের কয়েদীর মত তাকে ধরে নিয়ে যায় ভেতরে।

নির্ম্মলা আবার আশ্রয় পায়।

কয়েক মাস কেটে গেছে। শশিভূষণ এখনও নির্ম্মলার বা তার ছেলের কোন সন্ধান পান নি। তবু তিনি হাল ছেড়ে দেন নি। তাঁর কেমন একটা অটল প্রতিজ্ঞা যে নির্ম্মলাকে খুঁজে বার করতেই হবে।

অনেকদিন পরে একদিন থানা থেকে প্রথম যেন আশা পাওয়া যায়।

থানার ইনস্পেক্টর বলেন,---দেখুন, এবারেও ঠিক ক'রে বলতে পারছি না, তবে আমার মনে হয়, এই ঠিকানাতে একবার খোঁজ ক'রে দেখতে পারেন।

আচছা তাই দেখি একবার!---ব'লে ঠিকানা নিয়ে শশিভূষণ বিদায় নেন।

ইনস্পেক্টার হেসে বলেন,---কি মশাই, একটা ধন্যবাদ দিয়েও গেলেন না?

ধন্যবাদটা খুঁজে পাবার পর দেব'খন!---ব'লে শশিভূষণ আর অপেক্ষা করেন না। সোজা গ্রামেই রওনা হন।

নির্ম্মলা এখনও সেই আশ্রয়ে আছে, কিন্তু তার ছেলেটির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। সে জ্বর আর তার সারে নি। ধীরে ধীরে শীর্ণ হয়ে সে এখন প্রায় বিছানায় মিশিয়ে গেছে বল্লেই হয়।

নির্ম্মলা সে দিন রুগ্ন ছেলের বিছানার পাশেই আচ্ছন্নের মত বসে ছিল। অভাব, দুঃখ, দুর্ভাবনা, হতাশা সমস্ত মিলে তার মুখে এমন একটা ছাপ ইতিমধ্যে দিয়েছে যে তাকে চেনাই যায় না। তার দৃষ্টি দেখে মনে হয় যেন পৃথিবীতে কোথাও আর আলো তার জন্যে নেই। বিদ্যাধরী পাশের ঘর থেকে এসে নির্ম্মলাকে তীক্ষ্ণকণ্ঠে শাসন ক'রে উঠল,---চুপ ক'রে বসে আছ যে বড়। কটা বাজে খেয়াল আছে! 'ওষুধ দেবার সময়টাও আমি ব'লে দেব? শুধু বসে ভাবলেই ত ছেলের রোগ সারবে না?

ক্লান্ত কণ্ঠে নির্ম্মলা বললে,---আর সারবে ব'লে ত আশা হচ্ছে না দিদি?

শোন কথা! অসুখ আর কারুর ছেলের হয় না যেন কোন দিন। বিদ্যাধরী যেন জ্বলে উঠল!---তুমি উঠে একটু অন্য কাজে যাও দেখি! আমি একটু বসি। সারাদিন গুমরে গুমরে নিজে'ও যে সাবাড় হবার যোগাড় করেছ।

নির্ম্মলা উঠে দাঁড়াতেই হঠাৎ বাইরে থেকে রাখালরাজের গলা শোনা গেল। রাখালরাজ কাকে যেন বলছে,---আসুন আসুন, এই বাড়ী বই কি। আলবৎ এই বাড়ী। রাখালরাজ চক্কোত্তি বল্লে এ তল্লাটে কোন্ বেটা না চিনবে!

নির্ম্মলা 'ও বিদ্যাধরী দুজনে একটু ত্রস্ত হয়ে উঠল। রাখালরাজ সর্ব্বপ্রথম ঘরে ঢুকে একগাল হেসে বাহাদুরীর স্বরে বললে,---হুঁ, হুঁ, আগেই জানতাম, এ যে সে ঘরের মেয়ে নয়। ও যতই ছাই চাপা দাও, আগুন কি আর চাপা থাকে? তা ছাড়া রাখালরাজের চোখকে ফাঁকি দেওয়া সহজ নয়।

বিদ্যাধরী খেঁকিয়ে উঠল,---কি বকছ কি?

কিন্তু রাখালরাজের আজ বুঝি একটা মস্ত কীর্ত্তির দিন। এই সর্ব্বপ্রথম বোধ হয় পরিবারের ভ্রূকুটীকে উপেক্ষা ক'রে সোৎসাহে সামনের দরজার দিকে ফিরে সে বল্লে,---এই যে, আসুন না, আসুন না এই ঘরে। এখানে লজ্জা করবার কেউ নেই।

বিদ্যাধরীকে একবার দেখিয়ে দিয়ে সে আবার বললে,---আমার ইস্তিরী। ও সকলের সামনে বেরোয়।

ঘরে অপরিচিত লোককে ঢুকতে দেখে বিদ্যাধরী রাখালকে একবার রক্তচক্ষু দেখিয়ে ঘোমটা দিয়ে সরে দাঁড়াল। নির্ম্মলা কিন্তু কঠিন হয়ে যেখানে ছিল সেইখানেই রইল দাঁড়িয়ে। ঘরে যাঁরা ঢুকেছেন তাঁদের সে চেনে। তাঁদের একজন জমিদার বীরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী স্বয়ং, আর একজন শশিভূষণ। সঙ্গে ক'রে গ্রামের ডাক্তারকেও তাঁরা নিয়ে এসেছেন। আর এনেছেন ফলের একটি ঝুড়ি। সেটি বিছানার কাছে এনে শশিভূষণ নামিয়ে রাখতেই রাখালরাজ একগাল হেসে বল্লে,---কেমন ঠিক মিলেছে ত! মিলতেই হবে, আমি সেই গোড়া থেকেই জানি, দুখিনী সীতার উদ্ধার কি না হয়ে পারে? কিন্তু রাখালরাজ অযত্ন করেছে সে কথাটি বলতে পারবে না---

বীরেন্দ্রনারায়ণ ঘরের সকলের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বিছানায় শোয়ান রুগ্ন শিশুটিকেই বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করছিলেন। এবার রাখালরাজকে বাধা দিয়ে গম্ভীরভাবে নির্ম্মলার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন---কতদিন অসুখ হয়েছে?

রাখালরাজই ব্যস্ত হয়ে জবাব দিলে,---আজ্ঞে তা কম দিন নয়, দেখতে দেখতে এই কমাস হয়ে গেল। তাও ভাগ্যে এই রাখালরাজ রাস্তা থেকে দেখে আদর ক'রে ঘরে এনে---

বিদ্যাধরীর চোখের শাসনেই রাখালরাজ কথাটা মাঝ পথে শেষ করলে। চৌধুরী মশাই নির্ম্মলার দিকে ফিরে তাকে উদ্দেশ ক'রেই আবার বল্লেন,---অনেক খোঁজ ক'রে আমায় এখানে আসতে হয়েছে। তোমায় গোটাকতক কথা বলতে চাই।

নির্ম্মলা পাথরের মূর্ত্তির মত নিথর নিস্তব্ধ। কোন কথাই তার মুখ দিয়ে বার হ'ল না।

বীরেন্দ্রনারায়ণ আবার বল্লেন,---এ ছেলের যা অবস্থা হয়েছে দেখছি, তাতে উপযুক্ত চিকিৎসা ক'রেও একে বাঁচান বোধ হয় কঠিন। কিন্তু তবু যদি বাঁচে তা'হলে একে এই দারিদ্র্যের মধ্যে মানুষ ক'রে তুলতে তুমি ত পারবে না।

বীরেন্দ্রনারায়ণ নির্ম্মলার কাছে একটা উত্তরের আশাতেই বোধ হয় চুপ করলেন। কিন্তু নির্ম্মলা তবু নীরব। তার চোখের দৃষ্টিতে শুধু কি যেন একটা দুর্জ্জেয় দীপ্তি।

আমি একে এখান থেকে নিয়ে যেতে চাই।---বীরেন্দ্রনারায়ণের কণ্ঠস্বরে এবার সত্যকার ব্যাকুলতা ফুটে উঠল,---ওর চিকিৎসার কোন ত্রুটি আমি রাখব না। যদি আমাদের ভাগ্যে ও বাঁচে তাহ'লে ওকে মানুষ করবার জন্য যা প্রয়োজন সবই আমি করব। কোন অভাব ও কোনদিন জানতে পারবে না।

রুগ্ন শিশুটি এতক্ষণ ধরে লোলুপভাবে ফলের ঝুড়িটির দিকে চেয়েছিল। বীরেন্দ্রনারায়ণের কথার মাঝখানেই সে ক্ষীণ কাতর কণ্ঠে বায়না ক'রে উঠল,---আমি ওই একটা নেব।

শশিভূষণ তাড়াতাড়ি দুটি ফল তুলে বীরেন্দ্রনারায়ণের হাতে দিলেন। বীরেন্দ্রনারায়ণ সস্নেহে সে দুটি ছেলেটির হাতে দিতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ হিংস্র বাঘিনীর মত সে ফল তাঁর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নির্ম্মলা মূর্ত্তিমতী প্রলয়ের মত তাঁদের দিকে ফিরে দাঁড়াল। তীব্র বিদ্বেষের স্বরে বল্লে,---আমার ছেলেকে আপনি নিয়ে যেতে এসেছেন? তাকে চিকিৎসা ক'রে বাঁচিয়ে তুলবেন? তাকে মানুষ করবেন? কেন আপনার এত অনুগ্রহ বলুন ত?

ছেলেটি তখন ফল না পেয়ে কাতরভাবে কেঁদে উঠেছে। সে দিকে একবার চেয়ে বীরেন্দ্রনারায়ণ বল্লেন,---আমায় ভুল বুঝ না---আমি তোমার ভালর জন্যই---

কিন্তু নির্ম্মলার স্বর আরো হিংস্র হয়ে উঠল,---হ্যাঁ, এই ছেলের ভালর জন্যই আপনার দুর্ভাবনার সীমা নেই। আপনি জানেন ওর দেহে আপনাদেরই বংশের রক্ত, ও আপনাদের নিজের। তাই ওকে বাঁচাতে হবে, মানুষ করতে হবে। আর আমি, আমি শুধু উনুনের পোড়া ছাই। পুড়ে খাক হয়ে যা কাজে লাগবার লেগেছি। এখন আঁস্তাকুড়েই তাই আমার জায়গা। কিন্তু যা আশা করেছেন তা হবে না।

কিন্তু তা না হ'লে ও ছেলে বাঁচবে না।---বীরেন্দ্রনারায়ণের এমন দুর্ব্বল কাতর কণ্ঠস্বর কেউ বুঝি কখনও শোনেনি।

বাঁচবার দরকার নেই! নির্ম্মলা যেন সত্যি উন্মাদ হয়ে গেছে,---ও মরবে আমি জানি, আর তাই আমি চাই। হ্যাঁ, তাই আমি চাই। ওকে আপনি নিয়ে যেতে পারবেন না, এ আপনার জমিদারী নয়। ও এইখানে তিলে তিলে মরবে। আর আপনি জানবেন, আপনার বংশধর না খেতে পেয়ে বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছে। যান্ যান্ এখান থেকে।

রুগ্ন শিশু তখনও কাঁদছে---আমায় ওই দিলে না কেন? আমায় ওই দাও।

না।---ব'লে চীৎকার ক'রে সমস্ত ফলের ঝুড়িটা দরজার বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নির্ম্মলা উন্মত্তভাবে বল্লে,---যান, নিয়ে যান আপনাদের জিনিষ। আমার ছেলের মুখে এর বদলে আমি বরং বিষ তুলে দেব, তবুও এ জিনিষ তাকে ছুঁতে দেব না।

নির্ম্মলার সে মূর্ত্তির সামনে বীরেন্দ্রনারায়ণও এক মুহূর্ত্তে যেন কেমন অসহায় অকিঞ্চিৎকর হয়ে গেলেন। শীর্ণ ছেলেটি দুর্ব্বলভাবে তখনও ডুকরে কাঁদছে। একবার সে দিকে, একবার নির্ম্মলার দিকে চেয়ে কম্পিত পদে তিনি যেন বজ্রাহতের মত অচেতনভাবে ঘর থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলেন। শশিভূষণ ও ডাক্তারকেও তাঁর পিছু পিছু ঘর থেকে যেতে হ'ল।

নির্ম্মলা আবার যেন পাথরের মূর্ত্তির মত স্তব্ধ হয়ে গেছে, তার কাছে এসে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বিদ্যাধরী বল্লে,---কি করলে নির্ম্মলা?

হঠাৎ যেন নির্ম্মলার চেতনা ফিরে এল, আর্ত্তনাদের মত তার কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এল,---কি করলাম আমি। আমি কি করলাম দিদি? মা হয়ে আমি ছেলের মরণ কামনা করলাম, তাকে অভিশাপ দিলাম।

বিছানায় লুটিয়ে পড়ে ছেলেটিকে বুকের ভেতর প্রাণপণে চেপে ধরে সে কেঁদে উঠল। এ যে আমার মনের কথা নয় ঠাকুর। এ যে আমার মনের কথা নয়।

বস্তি থেকে বার হয়ে তন্দ্রাচ্ছন্নের মত বীরেন্দ্রনারায়ণ বড় রাস্তায় তাঁর গাড়ীতে গিয়ে উঠলেন। শশিভূষণ তখনও রাস্তায় দাঁড়িয়ে দেখে বল্লেন,---তুমি এস শশিভূষণ।

শশিভূষণ তাঁর দিকে খানিক অদ্ভুতভাবে চেয়ে থেকে বল্লেন,---না, আমি আর যাব না।

তুমি কি তা'হলে পরে আসবে?----ক্লান্ত স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন চৌধুরী মশাই।

আমি একেবারে ছুটী নিচ্ছি চৌধুরী মশাই! ব'লে শশিভূষণ অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

বীরেন্দ্রনারায়ণ বিমূঢ়ভাবে শশিভূষণের দিকে চেয়ে রইলেন। শশিভূষণের কথার মর্ম্ম সত্যি বোঝা যায় না।

শশিভূষণ একটু চুপ ক'রে থেকে একটু যেন আবেগের সঙ্গেই এবার বললেন,---হ্যাঁ চৌধুরী মশাই, অনেক কাল আপনার নুন খেলাম, নেমক-হারামিও কখন করি নি। ভাল, মন্দ, ন্যায়, অন্যায় আপনার যাতে ভালো হবে মনে করেছি অম্লান বদনে তা করেছি। কিন্তু আর ভালো লাগছে না। কোথা থেকে অনেক যেন ময়লা জমে গেছে মনে। ভাবছি প্রয়াগে গিয়ে একটা ডুব দিয়ে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াব। একটা পেট ঠিক চলে যাবে।

বীরেন্দ্রনারায়ণ তবু বিমূঢ়ভাবে বললেন---তুমি যদি তীর্থভ্রমণ করতে চাও---

না, তীর্থে টীর্থে আমার বিশ্বাস নেই। আমি এমনি বাউণ্ডুলের মত ঘুরে বেড়াব।----ব'লে শশিভূষণ ম্লানভাবে একটু হাসলেন।

বীরেন্দ্রনারায়ণ খানিকক্ষণ কোন কথাই বলতে পারলেন না, তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে প্রায় অস্ফুট স্বরে বল্লেন,--তুমিও আমায় ছেড়ে যাচ্ছ শশি? আবার একটু চুপ ক'রে থেকে বল্লেন,---আমিও যদি সব ছেড়ে যেতে পারতাম!

শশিভূষণ একটু ব্যাকুল হয়ে উঠলেন এবার ---না না, আপনি কোথায় যাবেন? গ্রামে কাল আপনার নাতির অন্নপ্রাশন। আপনি সেখানে না থাকলে চলে?

বীরেন্দ্রনারায়ণ পৌত্রের অন্নপ্রাশনের উল্লেখে মনে হ'ল একবার যেন কেঁপে উঠলেন, তারপর ক্লান্ত কণ্ঠে বল্লেন,—হ্যাঁ, আমায় যেতেই হবে।

শশিভূষণ ড্রাইভারকে গাড়ী চালাতে আদেশ দিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে দিলেন।

বীরেন্দ্রনারায়ণকে নিয়ে গাড়ী দূরের রাস্তায় অদৃশ্য হয়ে যাবার পরও খানিকক্ষণ তাঁকে সেই-খানেই অন্যমনস্কভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। তারপর ধীরে ধীরে নগরের জনতার মাঝে কখন তিনি মিশে গেলেন কে জানে!

বিজয় ও অনিমার প্রথম সন্তান, জমিদারের প্রথম পৌত্রের অন্নপ্রাশন। জমিদার বাড়ীতে বিরাট উৎসব। উমানাথই পুরোহিতরূপে সমস্ত অনুষ্ঠান সমাধা করতে বসেছেন। গ্রামশুদ্ধ নিমন্ত্রিত হ'তে কারুর বাকী নেই। বহুদিন বাদে মাধবীও বাপের বাড়ী এসেছে। তাকে অনুষ্ঠানের আগেই এক কোণে সোৎসাহে শাঁখ বাজাতে দেখে অনিমা হেসে বল্লে,---তুমি যে আগে থাকতেই শাখ বাজাতে সুরু করলে ঠাকুরঝি, এখনও যে দেরী আছে।

মাধবী চিরদিনের মতই এখনও হাসিখুসি আমুদে। হেসে বল্লে,---যা পারি বাজিয়ে নিই বৌদি! ভাইপোর বিয়ে অবধি হয় ত বাঁচব না, তাতেই তাই সাধ মিটিয়ে নিচ্ছি।

বাবা, তোমার আশা ত কম নয়! অনিমা স্নিগ্ধ হেসে বল্লে,----এরই মধ্যে ভাইপোর বিয়ের কথা ভেবে ফেলেছ! তা আশা যখন করেছ তখন বিয়ে না দেখে যাচ্ছ কোথায়?

না বৌদি, আশা করলেই কি হয়! মাধবীর গলার স্বর একটু ভারী হয়ে এল।----মার কতই ত আশা ছিল কিন্তু তিনি আর দেখে যেতে পারলেন কই?

অন্নপূর্ণা কিছুদিন হ'ল অনিমার বিবাহের পরই এ-সংসার থেকে চিরকালের মত বিদায় নিয়েছেন।

তাঁর কথা মনে ক'রে দুজনে খানিক নিস্তব্ধ হয়ে রইল। অনিমাই প্রথম ব্যথিত স্বরে বললে, ---এই আনন্দের দিনে আর একজনের কথাও মনে হচেছ ঠাকুরঝি।

মাধবী তার দিকে খানিক অদ্ভুতভাবে চেয়ে থেকে হাসি দিয়ে সমস্ত ব্যাপার হাল্কা করার চেষ্টায় বললে,---আচছা খুব হয়েছে। সতীন না হ'লে আর সুখ হচেছ না বুঝি? দাদার কাছে কোনদিন ব'লে ফেলনি ত?

না, তুমি যখন বারণ করেছ!---মৃদুকণ্ঠে বললে অনিমা।

খুব লক্ষ্মী মেয়ে!----ব'লে হেসে তাকে আদর ক'রে মাধবী বললে,---এখন ওদিকে যাও দেখি, দাদা হাঁ ক'রে বৎসহারা গাভীর মত তোমায় খুঁজে বেড়াচেছ। তিলেক অদর্শনেই অন্ধকার।

মাধবী হেসে চলে যাবার পর অনিমা নিজের ঘরে যাবার পথেই স্বামীর দেখা পেয়ে পেছন থেকে হেসে বললে,---কিগো কাকে খুঁজছ এমন আকুল হয়ে?

এই যে তোমাকে খুঁজছি।---ব'লে বিজয় ফিরে তাকালে।

অনিমা স্নিগ্ধ হেসে বললে,--তাই ভাল, কিন্তু একটু সাবধান হ'তে হয়। ঠাকুরঝি ঠাট্টা করছিল যে।

কি ঠাট্টা করছিল?

বলছিল তোমার নাকি তিলেক অদর্শনেই অন্ধকার। ব'লে অনিমা হাসল।

বিজয়ও হেসে বললে,---নেহাৎ মিথ্যে বলে নি। অবস্থাটা প্রায় তদ্রূপ, কিন্তু শোন, বড় ভাবনায় পড়েছি। বাবা এখনও এলেন না কেন বুঝতে পারছি না, সকালের গাড়ীতে আসবার কথা।

তা'হলে এই গাড়ীতেই আসবেন!--- বিজয়কে আশ্বাস দিয়ে অনিমা বললে,----নিশ্চয় কোন দরকার পড়েছে সেখানে। নইলে তিনি কখন দেরী করতে পারেন আজকের দিনে?

হঠাৎ দুজনের কথার মাঝখানে শাখ হাতে ঘরে ঢুকল মাধবী। বকুনি দিয়ে বললে,---বাঃ তোমরা ত বেশ? গল্প করবার আর সময় পেলে না? পুরুত মশাই বসে আছেন। সময় হ'তে চললো। তোমরা যাও।

এই যে আমি যাচিছ।---বিজয় যেন, অপ্রস্তুত ---কিন্তু বাবা ত এলেন না।

বাবা এই এলেন। আমি তাঁকে খবর দিতে যাচিছ। তোমরা আগে ছেলে নিয়ে যাও দেখি ওখানে। খোকা কোথায়?

ঝি যে তাকে বাইরে নিয়ে গেল---বললে অনিমা।

দেখ দেখি ঝির আক্কেল। মাধবী বিরক্ত হয়ে উঠল---এখন কি বাইবে বেড়াতে যাবার সময়? যাও তাকে ডাকিয়ে নাও। আমি যাচিছ বাবার কাছে।

মাধবী বাবার ঘরে ঢুকেই একটু বিস্মিত হয়ে গেল। বীরেন্দ্রনারায়ণ ঘরের এক ধারে মাথা নীচু ক'রে বসে আছেন। তাঁর বসার ভঙ্গিটাই কেমন যেন অদ্ভুত। মনে হয় হঠাৎ কি যেন অপ্রত্যাশিত আঘাতে তিনি ভেঙ্গে পড়েছেন।

মাধবী উৎকণ্ঠিতভাবে ডাকলো,---বাবা!

মনে হ'ল বীরেন্দ্রনারায়ণ যেন শুনতে পান নি। কাছে এসে তাঁর মুখের চেহারা দেখে আরো উদ্বিগ্ন হয়ে মাধবী জিজ্ঞাসা করলে,--- কি হয়েছে বাবা? তোমার শরীর খারাপ?

বীরেন্দ্রনারায়ণ মুখ তুলে মাধবীর দিকে তাকালেন। ম্লান কণ্ঠে বললেন,---শরীর? না, শরীর ত ভালই আছে।

বাবার এমন কণ্ঠস্বর মাধবী আগে শোনেনি। অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে উঠলেও আসন্ন অনুষ্ঠানের খাতিরে সে বললে,---ওদিকে যে সময় হয়ে গেছে। তোমার জন্যই সবাই অপেক্ষা ক'রে আছে। তুমি চল।

আমি---আমি যাব? বীরেন্দ্রনারায়ণ বিমূঢ়ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন। একটু চুপ ক'রে

থেকে ধরা গলায় বললেন,---আমি না গেলে হয় না ?

কি বলছ বাবা ? মাধবী অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠল,----খোকার ভাত, তুমি থাকবে না, তা কি হয় ?

খোকার ভাত ! না, আমার নিশ্চয় যাওয়া দরকার। বীরেন্দ্রনারায়ণ জোর ক'রে উঠে দাঁড়াতে গিয়েও যেন পারলেন না। আবার বসে পড়ে হঠাৎ শঙ্কাতুর কণ্ঠে বললেন,----কিন্তু আমার যে কেমন ভয় হচ্ছে মাধবী !

সেকি কথা বাবা ? কি বলছ তুমি ? মাধবী এবার অত্যন্ত শঙ্কিত হয়ে উঠল।

বীরেন্দ্রনারায়ণ আবার তার দিকে খানিক উদ্‌ভ্রান্তের মত চেয়ে থেকে ধীরে ধীরে বললেন, ----তুই---তুই বুঝতে পারবি না মাধবী। কিন্তু আমার মনে হচেছ যেন কোন অমঙ্গল--- যেন----

তিনি কথাটা আর শেষ করতে পারলেন না। মাধবী কিছু ভালো ক'রে বুঝতে না পারলেও এ অবস্থায় শক্ত হওয়াই উচিত বুঝে বললে,--- ছিঃ বাবা। এ সব কথা বলতে আছে। তুমি ত এমন নও।

বীরেন্দ্রনারায়ণ ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন, তারপর জোর ক'রে যেন শক্তি সংগ্রহ ক'রে বললেন,---না, আমি এমন নই, আমি চিরকাল শক্ত, কঠিন। কিছুতেই আমি ভেঙ্গে পড়িনি। চ, চ, আমি যাচ্ছি।

বীরেন্দ্রনারায়ণ কম্পিত পদে নিজেই এগিয়ে গেলেন। ব্যাপার কিছুই বুঝতে না পেরে ভয়ে দুর্ভাবনায় মাধবীর চোখে তখন জল এসেছে। আঁচলে চোখের জল মুছে সে বাবাকে অনুসরণ করলে।

অনুষ্ঠানের জায়গায় ওদিকে তখন হৈ চৈ সুরু হয়ে গেছে। প্রাথমিক ক্রিয়াকর্ম্ম শেষ ক'রে পুরোহিত উমানাথ খোকাকে আনতে বললেন। কিন্তু যে ঝি তাকে নিয়ে গেছে তার দেখা নেই। এদিকে শুভলগ্ন নষ্ট হয়ে যায়।

বিজয় ব্যস্ত হয়ে উঠে বল্‌লে---কই এখনও খোকাকে নিয়ে এলো না। সে ঝি গেল কোথায় ?

চারিদিকে ছুটোছুটি পড়ে গেল। এদিক ওদিক খোঁজবার পর দেখা গেল ঝি খোকাকে নিয়ে নিশ্চিন্ত মনে বাড়ীর বাইরের বাগানে হাওয়া খাচেছ। সকলের ধমক খেয়ে সে খোকাকে কোলে নিয়ে সভামণ্ডপের দিকে ব্যস্তভাবে দৌড়ে গেল।

বীরেন্দ্রনারায়ণ তখন বাইরের সিঁড়ি দিয়ে মাধবীর সঙ্গে নামছেন। হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে তিনি ভীতস্বরে বল্‌লেন,---না, আমি যাব না মাধবী। আমি যেতে পারছি না---

বীরেন্দ্রনারায়ণ বুঝি টলেই পড়ে যাচ্ছিলেন, মাধবী তাকে ধরে ফেলে বল্‌লে,---একি বাবা। কেন তুমি অমন কর্‌ছো ?

উদ্‌ভ্রান্তভাবে বীরেন্দ্রনারায়ণ বললেন,--- কেন ? কেন ? তারপর সভামণ্ডপ প্রবেশপথের দিকে চেয়ে তিনি হঠাৎ আতঙ্কে শিউরে উঠলেন। সেই সঙ্গেই সভামণ্ডপ থেকে একটা ভীত আর্ত্তনাদ উঠল অসংখ্য লোকের কণ্ঠে।

খোকাকে নিয়ে তাড়াতাড়ি দৌড়ে আসতে গিয়ে বাইরের দরজার চৌকাঠে হোঁচট খেয়ে ঝি খোকাকে শুদ্ধ সজোরে নীচের উঠনে আছাড় খেয়ে পড়েছে।

এক মুহূর্ত্তের একটা রুদ্ধশ্বাস স্তব্ধতা।

তারপরই আবার চারিদিকে শঙ্কিত ব্যাকুল চীৎকারে মুখর হয়ে উঠল।

জল, জল, ডাক্তার।

একজন গিয়ে খোকাকে মাটি থেকে তুলে নিলে। তার শরীর রক্তাক্ত। কোন সাড়া নেই।

বীরেন্দ্রনারায়ণ ছাইয়ের মত পাংশুমুখে সেদিকে চেয়ে এতক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। হঠাৎ পাগলের মত ব'লে উঠলেন,--- আমি জানতাম, আমি জানতাম মাধবী।

কাঁপতে কাঁপতে তিনি সেইখানেই বসে পড়লেন। মাধবী কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

ওধারে দেখা গেল, অনিমার কোলে কে খোকাকে এনে তুলে দিয়েছে। খোকার সাড়া তখনও ফিরে আসেনি। যন্ত্রচালিতের মত অনিমা তাকে কোলের ওপর ধরে নিয়ে বসে আছে। তার চোখে জল পর্য্যন্ত নেই। একবার মুখ তুলে স্বামীর দিকে তাকিয়ে সে শূন্যদৃষ্টিতে সামনে চেয়ে বসে রইল।

কয়েকজন খোকার মুখে জলের ছিটে দিচ্ছিল। কে একজন যেন খবর দিলে ডাক্তার-বাবু আসছেন।

নগরের ওপর সন্ধ্যার অন্ধকার হতাশার মত গাঢ় হয়ে এসেছে, দরিদ্র পল্লীতে ধোঁয়ার ও ধূলিতে বিষাক্ত সে অন্ধকার নেমে এসেছে, রুদ্ধ-শ্বাস বেদনার মত, এমন একদিন পরিতোষ নির্ম্মলাকে আবার খুঁজে পেলে।

বাড়ীর বাইরে দাওয়ায় সিঁড়ির ধারে নির্ম্মলা শূন্যদৃষ্টিতে সামনে তাকিয়ে বসে আছে। অন্ধকারে তার মুখ ভালো ক'রে দেখা যায় না। পরিতোষ ধীরে ধীরে কাছে এসে দাঁড়াল।

নির্ম্মলা পদশব্দে মুখ তুলে তার দিকে খানিকক্ষণ অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে রইল। মনে হ'ল পরিতোষকে সে যেন চিনতে পারছে না। অনেকক্ষণ বাদে ক্লান্ত বিষণ্ণ কণ্ঠে সে বল্‌লে, ---এসেছ পরিতোষদা! এতদিন বাদে এলে?

এ-কণ্ঠস্বর পরিতোষের কাছেও অপ্রত্যাশিত। হৃদয়ের কোন গভীর ক্ষত থেকে এ-স্বর যেন রক্তাক্ত হয়ে বেরিয়ে আসছে। পরিতোষ কাতরভাবে বল্‌লে,---আমি যে তোমার খুঁজে পাইনি নির্ম্মলা। তোমায় খোঁজবার জন্য এতদিন কি না করেছি। এতদিন---

এখন খুঁজে পেয়েছ ত? কিন্তু পেয়ে কি লাভ হ'ল।----নির্ম্মলার দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত, কথা কেমন যেন অসংলগ্ন। ---কি দেখতে তুমি এলে, কাকে দেখতে? খোকাকে? খোকাকে দেখতে?

হঠাৎ নির্ম্মলার কণ্ঠস্বর যেন রুদ্ধ হয়ে গেল। পরিতোষ অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠে বল্‌লে,--হঁ্যা, খোকা! খোকা কোথায়? কেমন আছে?

নির্ম্মলার দৃষ্টি আবার কেমন যেন বদলে গেল। যেন অত্যন্ত সহজভাবে সে ধীরে ধীরে বল্‌লে,---খোকা খুব ভাল আছে। খুব ভালো। আর তার কোন অসুখ নেই, কোনদিন আর তার অসুখ হবে না।

পরিতোষ ঠিক কিছু বুঝতে না পেরে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ ক'রে বল্‌লে,--চল নির্ম্মলা, ভেতরে চল।

না, না, ভেতরে যাব না, ভেতরে যেতে পারব না!---নির্ম্মলা আবার যেন কোন দুর্ব্বোধ ভয়ে শিউরে উঠল, তারপর অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বল্‌লে,---ওরা খোকাকে এইখান দিয়ে নিয়ে গেছে, অনেক দূরে নিয়ে গেছে!

পরিতোষের বুঝতে আর কিছু বাকী রইল না। বেদনায় স্তব্ধ হয়ে অনেকক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকবার পর ব্যথিত কণ্ঠে সে বল্‌লে,---কেন তুমি এমন ক'রে চলে এলে নির্ম্মলা, কেন তুমি এমন ক'রে নিজের সর্ব্বনাশ করলে!

নির্ম্মলা নীরবে তার দিকে শুধু মুখ তুলে তাকালে, কিছু বল্‌লে না।

পরিতোষ আবার গভীর অনুশোচনার সঙ্গে বললে,---আমি অন্যায় করেছিলাম, মুহূর্ত্তের ভুলে তোমায় অপমান করেছিলাম। তুমি ত আমায় যা খুশী বলতে পারতে, আমাকে যে কোন শাস্তি দিতে পারতে। আমার মুহূর্ত্তের ভুল আমার চিরদিনের লজ্জা হয়ে থাকত। তার বদলে নিজেকে কেন তুমি এমন ক'রে শাস্তি দিলে!

পরিতোষের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে নির্ম্মলা বিষণ্ণ কণ্ঠে শুধু বললে,----এ-সব কথা থাক পরিতোষদা।

যা হয়ে গেছে তার কোন প্রতিকার নেই জানি, কিন্তু তবু এ আফশোষ যে মরে গেলেও যাবে না যে আমি তোমার সব দুঃখের মূল।----পরিতোষের কণ্ঠে কথাগুলো চাপা আর্ত্তনাদের মত শোনাল।

তা ত সত্যি নয়!----নির্ম্মলা যেন আবার সহজ স্বাভাবিক হয়ে গেল।

পরিতোষ কিন্তু প্রবোধ মানল না। ব্যাকুলভাবে বললে---তুমি না বল, তবু আমি জানি, আমার অপরাধের সীমা নেই। আমায় শুধু তার একটু প্রায়শ্চিত্ত করতে দাও নির্ম্মলা। তুমি আমার সঙ্গে চল।

নির্ম্মলা হঠাৎ উঠে দাঁড়াল, অদ্ভুত স্বরে বললে,---যাব তোমার সঙ্গে!

আমি তোমায় কোন অসম্মান করব না নির্ম্মলা। আমার সমস্ত দুর্ব্বলতা অনুশোচনায় পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

পরিতোষের কণ্ঠে অসীম কাতরতা। গভীর আগ্রহের সঙ্গে সে আবার বললে,---তোমার জীবনে আর কোন সান্ত্বনাই নেই জানি, তবু একটু শান্তি তোমায় দেবার অধিকার আমায় দাও, আমার নিজের অভাগী বোন মনে ক'রে তোমায় আমি সেবা করব সারা জীবন!

পরিতোষ চুপ করলে। নির্ম্মলা খানিক তার দিকে অদ্ভুতভাবে চেয়ে থেকে বললে,---আমায় তুমি শান্তি দিতে চাও?

নির্ম্মলার চোখের দৃষ্টি এবার পরিতোষকে শঙ্কিত ক'রে তুলল। স্নিগ্ধকণ্ঠে সে বোঝাবার চেষ্টা করলে,---আর ত কিছু দেবার ক্ষমতা আজ আর কারো নেই।

হঠাৎ নির্ম্মলার চোখ যেন জ্বলে উঠল। তীব্রকণ্ঠে সে বললে,---কিন্তু শান্তি আমি চাই না, বুঝেছ, শান্তি নয়। আমি শুধু প্রতিশোধ চাই।

প্রতিশোধ?

হ্যাঁ, যারা আমার সমস্ত জীবন ছারখার ক'রে দিয়েছে, বিনা দোষে যারা আমায় শাস্তি দিয়েছে, তাদের জীবনও আমি অভিশাপে বিষিয়ে দেব---নির্ম্মলা যেন হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে গেছে।

কি বলছ নির্ম্মলা?---সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলে পরিতোষ।

তিক্ত জ্বালাময় কণ্ঠে নির্ম্মলা জবাব দিলে,----ভাবছ আমি সামান্য পথের ভিখারী, আমি তাদের কি করতে পারি? সব পারি এখন। একদিন আমার ভয় ছিল, মানের ভয়, লোকলজ্জার ভয়, আজ আমার কিছু নেই। আমি গ্রামে ফিরে যাব।

গ্রামে যাবে!---পরিতোষের কণ্ঠস্বরে শঙ্কিত বিস্ময়।

হ্যাঁ, সেখানে সুখে স্বচ্ছন্দে, নিশ্চিন্ত আরামে যারা দিন কাটাচেছ তাদের সামনে আমার নিজের কলঙ্ক নিজে গিয়ে প্রকাশ করব।

নির্ম্মলা যেন আর এক মানুষ হয়ে গেছে। তার দৃষ্টিতে, তার কণ্ঠস্বরে কি এক উন্মত্ত উত্তেজনা। সত্যিই সে যেন মূর্ত্তিমতী প্রতিহিংসা। তীক্ষ্ণকণ্ঠে সে তখন ব'লে চলেছে,---জীবন তাদের তারপর বিষিয়ে উঠবে না! স্ত্রী চমকে উঠবে না স্বামীর মুখের দিকে চাইতে! ঘৃণায় ভয়ে তাদের বুক শিউরে উঠবে না, সন্দেহে অবিশ্বাসে তাদের জীবন অভিশপ্ত হয়ে উঠবে না দিনের পর দিন! আমি তাই যাচ্ছি ---এখুনি যাচ্ছি।

উন্মাদিনীর মত নির্ম্মলা হঠাৎ ছুটে সেখান থেকে রাস্তায় বেরিয়ে গেল।

পরিতোষ কেমন যেন বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল। নির্ম্মলার এই অপ্রত্যাশিত আত্মপ্রকাশে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার পর হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠে সে ব্যাকুলভাবে নির্ম্মলার জন্য চারিদিকে তাকাল।

কোথায় নির্ম্মলা!

রাস্তায় বেরিয়ে সে কোনদিকে তাকে দেখতে না পেয়ে আবার ব্যাকুলভাবে ডাকলে,----নির্ম্মলা! নির্ম্মলা!

নির্ম্মলার কোথাও তবু দেখা নেই। এরই মধ্যে সে গেল কোথায়! পরিতোষ সত্যি শঙ্কিত হয়ে উঠল। প্রায়ান্ধকার গলিতে গলিতে অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত সন্ধান ক'রেও নির্ম্মলাকে কিন্তু পাওয়া গেল না। নির্ম্মলা তার বাড়ীতেও ফেরেনি। কিন্তু এবার নির্ম্মলাকে খুঁজে যে.না

পেলেই নয়। গভীর নিস্তব্ধ রাত্রে নির্জন নগরের পথে পরিতোষের ব্যাকুল আহ্বান তাই ধ্বনিত হ'তে লাগল---নির্ম্মলা !

শহরে নির্ম্মলার কোন খোঁজ না পেয়ে পরিতোষকে শেষ পর্য্যন্ত গ্রামেই যেতে হ'ল নির্ম্মলার সন্ধানে। নির্ম্মলার মনের যা বর্ত্তমান অবস্থা, তাতে সত্যিই নিজের সঙ্কল্প কাজে পরিণত করতে তার পক্ষে গ্রামে ফিরে আসা কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু পরিতোষকে সে সর্ব্বনাশ নিবারণ করতেই হবে। নির্ম্মলাকে যেমন ক'রে হোক ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া তার চাই-ই। গ্রামে এসে পরিতোষ প্রথমে উমানাথের বাড়ীতেই গেল।

উমানাথ তখন বাড়ী থেকে বার হচ্ছিলেন, হঠাৎ পরিতোষকে সঙ্কুচিতভাবে ঢুকতে দেখে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলে,---তুমি !

পরিতোষ বিষণ্ন মুখে বললে,---হ্যাঁ, আবার এলাম। না এসে উপায় ছিল না ব'লেই এলাম। নির্ম্মলা, নির্ম্মলা কি গ্রামে এসেছে?

নির্ম্মলার মা অদূরে দাঁড়িয়েছিলেন, নির্ম্মলা নাম শুনে ব্যাকুলভাবে কাছে এসে বললেন, ----নির্ম্মলা ! তুমি কি বলছ পরিতোষ !

পরিতোষ ব্যথিত স্বরে বললে,---জানি তোমরা সবাই ভুল বুঝবে।

এখন সমস্ত কৈফিয়ৎ দেবার সময় আমার নেই। নির্ম্মলার খোঁজ আমার সবার আগে দরকার---বল সে এসেছে এখানে ?

উমানাথ এবার জবাব দিলেন,---সে এখানে আসবে কেন? আসবেই বা কোন্ সাহসে?---তাঁর কণ্ঠস্বর শান্ত, কিন্তু তার তলায় কত গভীর যে বেদনা আছে তা বেশীক্ষণ চাপা রইল না। একটু চুপ ক'রে থেকে ধরা গলায় তিনি আবার বললেন,---আর তুমিও না এলে পারতে পরিতোষ। আমি কাউকে দোষ দিই না, কিন্তু নির্ম্মলা ব'লে আমাদের যে কোন মেয়ে ছিল এটুকু আমরা ভুলে থাকতে চেয়েছিলুম, সেটুকু দয়াও তোমরা করলে না !

নির্ম্মলার মা আঁচলে চোখ মুছে ধীরে ধীরে সেখান থেকে সরে গেলেন। পরিতোষ খানিক চুপ ক'রে থেকে ব্যথিত স্বরে বল্লে,---আপনারাও শেষে এই বুঝলেন ! যাক্ এখন আর আমি কিছুই বলতে পারব না। যদি সময় হয় সবই বুঝতে পারবেন একদিন।

উমানাথ অতি দুঃখের হাসি হেসে বললেন,---আমি সমস্ত বোঝাবুঝির বাইরে চলে গেছি পরিতোষ, কিন্তু আর দাঁড়াতে পারছি না। বিজয়ের ছেলের কঠিন অসুখ, এই শান্তিজল নিয়ে এখুনি আমায় যেতে হবে।

অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে পরিতোষ এবার বল্লে,---বিজয়ের ছেলের অসুখ, আর আপনিই তার জন্য শান্তিজল নিয়ে যাচ্ছেন !

উমানাথ বিষণ্ণভাবে আবার হাসলেন, বল্লেন, ---হ্যাঁ, আমি যাচ্ছি। জমিদার আমার ওপর এইটুকু অনুগ্রহ এখনও রেখেছেন, এখনো আমি তাঁদেরই পুরোহিত।

সবিস্ময়ে তাঁর দিকে খানিক তাকিয়ে থেকে পরিতোষ বল্লে,---আশ্চর্য্য ! জমিদার মশাইকে আমি বুঝতে পারলুম না, আপনাকেও নয়।

কোন মানুষকেই তেমন ক'রে বোঝা যায় না পরিতোষ। মানুষ সোজা অঙ্কের হিসাব নয়। শান্ত ক'রে কথাগুলি ব'লে উমানাথ একটু চুপ ক'রে থেকে আবার বললেন,---তুমি ইচ্ছে করলে আমার এখানেই থাকতে পার এখন !

না, আমি এখানে থাকতে আসিনি, থাকবার উপায় নেই। আমার এই গাঁয়ের আশে-পাশেই থাকতে হবে, যেমন ক'রে হোক নির্ম্মলাকে আমার এখান থেকে নিয়ে যেতেই হবে।---ব'লে পরিতোষ বেরিয়ে গেল।

উমানাথ তখনও স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। নির্ম্মলার মা অনেক কষ্টে এতক্ষণ বুঝি নিজেকে সম্বরণ করেছিলেন। এবার কাছে এসে ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করলেন,---কি বল্লে পরিতোষ? নির্ম্মলা এখানে আসবে? নির্ম্মলা এখনও বেঁচে আছে ?

উমানাথের চোখও বুঝি সজল হয়ে এসেছিল, কিন্তু প্রাণপণে নিজেকে সম্বরণ ক'রে কঠোর স্বরে তিনি বললেন,---ছিঃ ছিঃ, এখনও তার জন্যে ভাবনা! এখনও জান না যে নির্ম্মলা ব'লে কেউ কখনও ছিল না আমাদের!

নির্ম্মলার মা অশ্রুপ্লাবিত মুখে মাথা নীচু ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন। উমানাথ ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলেন।

নির্ম্মলা মুহূর্ত্তের অপ্রকৃতিস্থতায় মিথ্যা কোন সঙ্কল্প করে নি। সত্যিই একদিন ছিন্ন মলিন বেশে উন্মাদিনীর মত গ্রামের পথে তাকে দেখা গেল। কত দীর্ঘ পথ পর্য্যটন ক'রে কি ভাবে সে সেখানে এসে পৌঁছেছে কে জানে! অনাহারে পথের ক্লান্তিতে শরীর তার শীর্ণ, কিন্তু চোখে তার যেন কি এক অস্বাভাবিক দীপ্তি। চোখের এই বহ্নির ইন্ধন জোগাতেই যেন তার দেহ ক্ষয় হয়ে গেছে।

গ্রামের পথ অতিক্রম ক'রে দেখা গেল জমিদার বাড়ীর দেউড়িতে সে এসে দাঁড়িয়েছে। দারোয়ানেরা তাকে বুঝি ঢুকতে দিতে চায় না।

নির্ম্মলা হিংস্রভাবে চীৎকার ক'রে উঠল,---ঢুকতে দেবে না, আমায় ঢুকতে দেবে না?

তারপর উন্মাদের মত হেসে উঠে তীক্ষ্ণস্বরে বল্‌লে,---তাত দেবেই না! আমি যে এই রাজপুরী ধ্বসিয়ে দিতে এসেছি, আমি যে তোমাদের সর্ব্বনাশ করতে এসেছি---আমি যে এ বাড়ীর অভিশাপ!

চুপ, চুপ মাগী, চেঁচাসনি, চেঁচালে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বার ক'রে দেব।---দারোয়ানেরা ধমক দিয়ে উঠল।

একজন তাকে শাসিয়ে জানালে,---জানিস বাবুর ছেলের অসুখ।

ছেলের অসুখ। নির্ম্মলার কণ্ঠে যেন অমানুষিক উল্লাস। ছেলের অসুখ ত সবে সুরু। এখনও ত কিছুই হয়নি, এখনও অভিশাপ লাগেনি এ বাড়ীর গায়ে। প্রত্যেক ইটখানা যেদিন এর ধ্বসে পড়ে যাবে, ভিৎ যেদিন নড়ে উঠবে---

দারোয়ানেরা রুখে উঠল মারমুখি হয়ে,---খবরদার মাগী, ফের যদি চেঁচাস---

হঠাৎ ভেতরের উঠানের কাছে কার সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর শোনা গেল,---কে ওখানে?

দারোয়ানেরা অনিমাকে দেখে ফিরে দাঁড়িয়ে সেলাম ক'রে বল্‌লে,---একটা পাজী ভিখিরী মাগী মা, তাড়ালেও যেতে চায় না।

অনিমা একটু এগিয়ে এসে স্নিগ্ধস্বরে আদেশ দিলে,---না, না, ওকে তাড়িও না। তারপর নির্ম্মলাকে উদ্দেশ ক'রে বল্‌লে,---তুমি এস, ভেতরে এস, কিছু মনে ক'রো না ওদের কথায়। ওরা জানে না, তুমি রাগ ক'রে ফিরে গেলে আমার ছেলের অকল্যাণ হবে।

নির্ম্মলা এতক্ষণ ধরে অনিমাকেই একদৃষ্টে লক্ষ্য করেছে। এবার ধীরে ধীরে তার কাছে এগিয়ে গিয়ে অদ্ভুতভাবে তার দিকে খানিক চেয়ে থেকে বল্‌লে,---তুমি বুঝি এ বাড়ীর বৌ? তুমি আমায় ডাকছ? আমায় ভেতরে যেতে বলছ?

নির্ম্মলার তীক্ষ্ণ অস্বাভাবিক দৃষ্টিতে কেমন একটু অস্বস্তি বোধ করলেও অনিমা স্নিগ্ধ হেসে শান্তস্বরে বল্‌লে,---হ্যাঁ, তুমি ভেতরে এসে বোস, তোমার যা চাই তাই দেব, তুমি রাগ ক'রো না।

নির্ম্মলা আর কোন প্রশ্ন করলে না। শুধু তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের দৃষ্টিতে চারিদিক লক্ষ্য করতে করতে ধীরে ধীরে অনিমার সঙ্গে ভেতরে চলে গেল।

ভেতরের একটি বারান্দার কাছে তাঁকে দাঁড় করিয়ে অনিমা স্নিগ্ধস্বরে বল্‌লে,--বোস, আমি এখুনি আসছি।

অনিমা চলে যাবার পর খানিকক্ষণ মনে হ'ল যেন নির্ম্মলা কেমন বিহ্বল হয়ে গেছে। ওপরে কোথা থেকে শিশুর কান্না মাঝে মাঝে ভেসে আসছে। হঠাৎ নির্ম্মলা সচকিত হয়ে উঠল, তারপর নীচে থেকে সামনের সিঁড়ি দিয়ে ধীরে ধীরে ওপরে উঠে গিয়ে সামনের ঘরের জানালায় গিয়ে দাঁড়াল।

জানালা থেকে ভেতরের সব কিছু দেখা যায়। বিছানার ওপর রুগ্ন শীর্ণ শিশু শায়িত। একজন ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করছে। উদ্বিগ্ন কাতর মুখে

বিজয়, জমিদার, উমানাথ সবাই সে দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

শিশুটি আবার যন্ত্রণায় কোৎরে কেঁদে উঠল। নির্ম্মলার মনে হ'ল তার চোখের সামনে সব যেন ঝাপসা হয়ে আসছে অশ্রুতে।

এই ঘর যেন তার চোখের ওপর আর এক জীর্ণ কুটীরে পরিবর্ত্তিত হয়ে যাচ্ছে, নোংরা মলিন শয্যায় যেন তারই শিশু শেষ নিশ্বাস টানছে। নিজের অজ্ঞাতেই বুঝি নির্ম্মলা অস্ফুট আর্ত্তনাদ ক'রে উঠল। সে শব্দে সেদিকে ফিরে চেয়ে বিজয়ই প্রথম সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলে,---কে ?---কে ওখানে ?

আর সকলেও এবার সচকিত হয়ে জানালার দিকে ফিরে তাকাল। বিজয় তখন ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। ক্ষণিক বিভ্রম কেটে গিয়ে আবার নির্ম্মলার মুখ হিংস্র কঠিন হয়ে উঠল। উদ্ধতভাবে এগিয়ে গিয়ে তীক্ষ্ণকণ্ঠে সে বল্লে,---কে আমি চিনতে পারছ না। ভাল ক'রে দেখ, চিনতে পার কি না ? কোনদিন কোনখানে আমায় দেখেছিলে কি না ?

বিজয় যেন হঠাৎ কোন প্রেতমূর্ত্তি দেখেছে। সমস্ত মুখ তার ফ্যাকাসে। অস্ফুট কম্পিত স্বরে সে শুধু বললে,---তুমি। নির্ম্মলা !

নামটা এখনো ভোলনি দেখছি। নির্ম্মলার কণ্ঠ আবার হিংস্র হয়ে উঠল,--আমিও ভুলিনি, কোন কিছুই ভুলিনি। তাই ত এসেছি এতদূর থেকে তোমাদের দেখতে, তোমাদের সর্ব্বনাশ দেখতে। ওই বুঝি তোমার ছেলে বিছানায় শুয়ে মরছে, যেমন ক'রে আমার ছেলে মরেছে, দিনের পর দিন, বিনা ওষুধে, না খেতে পেয়ে! তোমাদের অনেক টাকা আছে, অনেক ক্ষমতা,---তবু ও ছেলে বাঁচবে না---আমার অভিশাপ---আমার মরা ছেলের অভিশাপ---

নির্ম্মলার উন্মত্ত চীৎকার ছাপিয়ে আর একটি বজ্রগম্ভীর স্বর এবার শোনা গেল,---নির্ম্মলা !

নিরীহ ভালমানুষ উমানাথের চেহারা একেবারে যেন বদলে গেছে। বহ্নিদীপ্ত মূর্ত্তিতে তিনি সামনে এসে দাঁড়ালেন।

নির্ম্মলার হঠাৎ যেন চমক ভেঙ্গে গেল। প্রায় শশঙ্ক দৃষ্টিতে উমানাথের দিকে তাকিয়ে সে কম্পিত স্বরে ডাকলে,---"বাবা !"

কিন্তু উমানাথ গর্জন ক'রে উঠলেন,---না, আমি তোমার বাবা নই। তুমি আমার মেয়ে নও। আমার মেয়ে মরে গেছে---অনেক দিন মরে গেছে। আমার মেয়ে বেঁচে থাকলে, নিজে পুড়ে খাক্ হয়েও আর কারুর সংসারে হিংসার আগুন ধরাতে আসত না। তোমার ছেলে মরে গেছে বলছ ? তুমি মা নও, তাই সে তোমায় ছেড়ে গেছে। মা হ'লে এই রুগ্ন মরতে-বসা ছেলের ঘরে এসে তুমি অভিশাপ দিতে পারতে না।

একটু থেমে আবার বজ্রগম্ভীর স্বরে তিনি বল্লেন,---তুমি যাও ! এখনও যদি লজ্জা থাকে ত গিয়ে সত্যি ক'রে মর।

নির্ম্মলার যেন এক মুহূর্ত্তে আবার গভীর রূপান্তর ঘটে গেছে। কোন কথা আর তার মুখ দিয়ে বার হ'ল না। অসহায় কাতরভাবে একবার সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে সঙ্কোচে গ্লানিতে মাথা নীচু ক'রে অশ্রুসজল চোখে সে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল।

কিন্তু জমিদার বীরেন্দ্রনারায়ণ আর বুঝি সহ্য করতে পারলেন না। হঠাৎ তিনি যেন আর্ত্তনাদের মত ব'লে উঠলেন,---না, না, ওকে যেতে দিও না ! ও ফিরে গেলে এ সংসারে সত্যি অভিসম্পাত লাগবে !

অনিমা কিছুক্ষণ আগে থাকতেই এখানে এসে দাঁড়িয়েছে। ধীরে ধীরে তাকে এবার চলে যেতে দেখা গেল। বীরেন্দ্রনারায়ণ এগিয়ে যাচ্ছিলেন, বিজয় তাঁকে বাধা দিতে তিনি যেন পাগলের মত অস্থির হয়ে উঠলেন,---তোরা জানিস না, সমস্ত অপরাধ আমার ! মিথ্যে বংশের অভিমানে অন্ধ হয়ে আমি ওর সমস্ত জীবন ছারখার ক'রে দিয়েছি। সব জেনেও ওর মিথ্যে কলঙ্ক রটনায় সাহায্য ক'রে তোর মন ভেঙ্গে দিয়েছি, জোর ক'রে তোদের তফাৎ রেখে ওর সর্ব্বনাশ করেছি।

স্তম্ভিত বিস্ময়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে বিজয় কঠিন স্বরে ব'লে উঠল,---বাবা !

জমিদার পরম অপরাধীর মত কুণ্ঠিত কাতর স্বরে বললেন,---আমার বিচার পরে করিস বিজয়, আগে ওকে ফিরিয়ে আন। নইলে আমি জানি, এ বংশে বাতি দিতে কেউ থাকবে না, ওর দীর্ঘ-নিশ্বাসে সব ছাই হয়ে যাবে।

বিজয়ের হাত ছাড়িয়ে বীরেন্দ্রনারায়ণ নিজেই এবার ছুটে গেলেন বাইরে।

অনিমা আগেই গিয়ে সেখানে নির্ম্মলার কাছে দাঁড়িয়েছে।

বীরেন্দ্রনারায়ণ কাছে গিয়ে কাতর স্বরে বললেন,---তুমি ফিরে এস মা, আমাদের ক্ষমা ক'রে তুমি ও ছেলেকে বাঁচিয়ে তোল।

চল দিদি, আমি তোমায় মিনতি করছি।---অনিমা এবার নির্ম্মলার হাত ধরলে।

বিহ্বলভাবে অনেকক্ষণ তাদের দিকে তাকিয়ে থেকে তারপর সঙ্কুচিত অস্ফুট কণ্ঠে নির্ম্মলা বলে, ---আমি! আমি যাব?

স্নিগ্ধস্বরে অনিমা বলে,---হ্যাঁ দিদি, তুমি এসে কোলে তুলে নিলে ও যদি বাঁচে।

নির্ম্মলা তবু বিমূঢ় বিহ্বলভাবে দাঁড়িয়ে রইল।

অনিমা সকরুণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আবার বললে,--আমি সব জানি দিদি, ঠাকুরঝির কাছে সব শুনেছি। শুধু কাউকে কিছু বলবার উপায় নেই ব'লে মুখ বুজে থেকেছি। তোমাদের কাঁদিয়ে এ সুখ আমি চাই না দিদি। চল।

নির্ম্মলাকে নিজেই সে এবার ধীরে ধীরে ফিরিয়ে নিয়ে গেল ঘরের দিকে। স্বপ্নচালিতের মত মনে হ'ল নির্ম্মলার নিজের কোন শক্তি আর যেন নেই।

তখন ডাক্তারবাবু ছাড়া আর সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছেন। নির্ম্মলাকে নিয়ে অনিমা শিশুর শয্যার পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই ডাক্তারবাবু তাদের দিকে চেয়ে কি বুঝে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে অশ্রুসজল চোখে বীরেন্দ্রনারায়ণ ও উমানাথ এ-দৃশ্য দেখছিলেন।

ডাক্তারবাবু একটু হেসে বললেন,---আর আমার বিশেষ কোন দরকার হবে ব'লে মনে হয় না চৌধুরী মশাই।

বীরেন্দ্রনারায়ণের মুখ প্রসন্ন হাসিতে ভরে গেল, বললেন---না, ডাক্তার, আর ভয় নেই, আমি জানি। কি বল উমানাথ?

হঠাৎ আনন্দে সব কিছু ভুলে তিনি উমানাথের পিঠ চাপড়ে বললেন।

বিজয় ডাক্তারকে বাইরে এগিয়ে দিয়ে তখন ফিরছে, হঠাৎ পেছন দিকে পরিতোষ হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বললে,---নির্ম্মলা! নির্ম্মলা এখানে এসেছে শুনলাম!

বিজয় একটু হেসে বললে,---হ্যাঁ, এসেছে।

পরিতোষ অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতভাবে বললে,---আমি সারাক্ষণ পাহারায় ছিলাম বিজয়, সত্যি আমি ওকে আসতে দিতাম না কিছুতেই। তোমরা ওকে কিছু বোল না। আমি ওকে নিয়ে যাচ্ছি। ও তোমাদের কোন ক্ষতি করবে না।

বিজয় আবার অদ্ভুতভাবে হেসে বললে,---না, বোধ হয়।

কই, কোথায় সে?---ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করলে পরিতোষ।

চল দেখাচ্ছি।---ব'লে বিজয় তাকে ঘরের জানালার বাইরে নিয়ে গিয়ে দাঁড়াল।

সবিস্ময়ে পরিতোষ ভেতরে চেয়ে দেখলে। দেখা গেল, নির্ম্মলা শিশুকে বুকে তুলে নিয়ে তার দিকে স্নিগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে আছে, আর নির্ম্মলার কাঁধেই মাথা রেখে অনিমাও চেয়ে আছে সেই দিকে। পরিতোষের উৎকণ্ঠিত মুখ ধীরে ধীরে প্রসন্ন হাসিতে ভরে গেল।

আর এক জানালায় তখন দুর্দ্ধর্ষ জমিদার বীরেন্দ্রনারায়ণ ও নিরীহ পুরোহিত উমানাথ এক সঙ্গে চোখ মুছছেন।

মহানগর

আমার সঙ্গে চল মহানগরে,---যে মহানগর ছড়িয়ে আছে আকাশের তলায় পৃথিবীর ক্ষতের মত, আবার যে মহানগর উঠেছে মিনারে আর চূড়ায়, অভ্রভেদী প্রাসাদ-শিখরে তারাদের দিকে, প্রার্থনার মত মানবাত্মার।

আমার সঙ্গে এস মহানগরের পথে, যে পথ জটিল, দুর্ব্বল মানুষের জীবনধারার মত, যে পথ অন্ধকার, মানুষের মনের অরণ্যের মত, আর যে পথ প্রশস্ত, আলোকোজ্জ্বল, মানুষের বুদ্ধি, মানুষের অদম্য উৎসাহের মত।

এ মহানগরের সঙ্গীত রচনা করা উচিত, ভয়াবহ, বিস্ময়কর সঙ্গীত।

তার পটভূমিতে যন্ত্রের নির্ঘোষ, উর্দ্ধমুখ কলের শঙখনাদ, সমস্ত পথের সমস্ত চাকার ঘর্ঘর, শিকলের ঝনৎকার---ধাতুর সঙ্গে ধাতুর সঙঘর্ষের আর্ত্তনাদ। শব্দের এই পটভূমির ওপর দিয়ে চলেছে বিসর্পিল সুরের পথ ; প্রিয়ার মত যে নদী শুয়ে আছে মহানগরের কোলে, তার জলের ঢেউয়ের সুর, আর নগরের ছায়াবীথির ওপর দিয়ে যে হাওয়া বয় তার, নির্জন ঘরে প্রেমিকেরা অর্দ্ধস্ফুট যে কথা বলে তারো। সে সঙ্গীতের মাঝে থাকবে উত্তেজিত জনতার সম্মিলিত পদধ্বনি,---শব্দের বন্যার মত ; আর থাকবে ক্লান্ত পথিকের পথের ওপর দিয়ে পা টেনে নিয়ে যাওয়ার আওয়াজ, মধ্য রাত্রে যে পথিক চলেছে অনির্দ্দিষ্ট আশ্রয়ের খোঁজে।

কঠিন ধাতু ও ইটের ফ্রেমের লক্ষ জীবনের সূত্র নিয়ে মহানগর বুনছে যে বিশাল সূচিচিত্র, যেখানে খেই যাচেছ নিশ্চিহ্ন হয়ে হারিয়ে, উঠছে জড়িয়ে নতুন সূতোর সঙ্গে অকস্মাৎ,---সহসা যাচেছ ছিঁড়ে---সেই বিশাল দুর্ব্বোধ চিত্রের অনুবাদ থাকবে সে সঙ্গীতে।

এসঙ্গীত রচনা করার শক্তি আমার নেই। আমি শুধু মহানগরের একটুখানি গল্প বলতে পারি---মহানগরের মহাকাব্যের একটুখানি ভগ্নাংশ, তার কাহিনীসমুদ্রের দু' একটি ঢেউ। মহাসঙ্গীতের স্বাদ তাতে মিলবে না, তৃষ্ণা তাতে মেটাবার নয়,—জানি।

সঙ্কুচিত আড়ষ্টভাবে নদীর যে শাখাটি ঢুকেছে নগরের ভেতর, তারই অগভীর জলের মন্থর স্রোতে ভেসে আমরা গিয়ে উঠব নড়ালের পোলের তলায় ফুটন্ত কদম গাছের নিশান-দেওয়া সেই পুরান পোণা-ঘাটে। আমরা পেরিয়ে যাব পুরান সব ভাঙাঘাট, পেরিয়ে যাব ন্যাড়াশিবের মন্দির, পেরিয়ে যাব ইটখোলা আর চালের আড়ৎ, কেঠোকাটি আর পাঁজাকরা টালি ও ইট আর সুরকি বালির গোলা। আমরা চলেছি পোণার নৌকায়। আমাদের নৌকার খোলে টই-টম্বুর জল আর তাতে কিলবিল করছে মাছের ছানা। সেই পোণার চারা বিক্রী হবে কুণকে হিসাবে পোণাঘাটে।

আষাঢ় মাসের ভোর বেলা। বৃষ্টি নেই, কিন্তু আকাশ মেঘে ঢাকা। সূর্য্য হয়ত উঠেছে পূবের বাঁকা নগর-শিখর-রেখার পেছনে, আমরা পেয়েছি মাত্র মেঘ থেকে চোয়ান স্তিমিত একটু আলো। সে আলোয় এদিকের দরিদ্র সহরতলীকে

আরো যেন জীর্ণ দেখাচ্ছে। ভাঙাঘাটে এখনও স্নানে বড় কেউ আসে নি, গোলাগুলি ফাঁকা, ধানের আড়তের ধারে শূন্য সব শালতি বাঁধা। সব খাঁ খাঁ করছে।

জোয়ারের টানে ভেসে চলেছে নৌকা। মাঝিরা বড় নদীতে বরাবর এসেছিল দাঁড় টেনে। এখন তারা ছইএর ভেতর একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছে। শুধু হালে বসে আছে মুকুন্দ, আর তার কাছে কখন থেকে চুপটি ক'রে গিয়ে বসেছে যে রতন তা কেউ জানে না,---সেই বুঝি রাত না পোহাতেই। নৌকা তখন মাঝ নদীতে।

বাদলা রাতে আকাশে ছিল না তারা। রতনের মনে হয়েছে সব তারা যেন নেমেছে জলের ওপর। নদী তখন মহানগরের নাগাল পেয়েছে; দু'ধারে জাহাজ আর ষ্টীমার, গাধাবোট আর বড় বড় কারখানার সব জেটি। অন্ধকারে তাদের রূপ দেখা যায় না, দেখা যায় শুধু গায়ে আলোর ফোঁটা, অগুন্তি ফোঁটা, কালো জলের এপার থেকে ওপারে। মেঘলা আকাশ ছেড়ে তারাগুলিই ত' নেমেছে নদীর ওপর।

রতন ভয়ে ভয়ে এসে বসেছে নিঃসাড়ে হালের কাছে। কে জানে বাবা বকবে কি না? হয়ত ধমকে আবার দেবে পাঠিয়ে ছইএর ভেতর! কিন্তু সে কি থাকতে পারে এমন সময় ছইএর ভেতর,---নৌকা যখন পেয়েছে মহানগরের নাগাল, আকাশের তারা যখন জলের ওপর নেমেছে! তার যে কত দিনের সাধ, কত দিনের স্বপ্ন! রতন দুচোখ দিয়ে পান করেছে আলো-ছিটান এই নগরের অন্ধকার আর নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত ফেলেছে সাবধানে, পাছে বাবা টের পায়, পাছে দেয় তাকে ধমকে ভেতরে পাঠিয়ে। কিছুই ত বিশ্বাস নেই। বাবা ত তাকে আনতেই চায়নি বাড়ী থেকে। ছেলেমানুষ আবার সহরে যায় নাকি! আর নৌকায় এতখানি পথ যাওয়া কি সোজা কথা! কি করবে সে সেখানে গিয়ে? কত কাকুতি মিনতি ক'রে, কেঁদে কেটে না রতন শেষ পর্য্যন্ত বাবাকে নিমরাজী করিয়েছে। তবু নৌকায় তুলে বাবা তাকে শাসিয়ে দিয়েছে,---খবরদার, পথে দুষ্টুমি করলে আর রক্ষা থাকবে না। না, দুষ্টুমি সে করবে না, কাউকে বিরক্তও না। তাকে যা বলা হবে তাই করতে সে রাজী। সে শুধু একবার সহর দেখতে চায়---রূপকথার গল্পের চেয়ে অদ্ভুত সেই সহর। কিন্তু শুধু তারই জন্যে কি সহরে আসবার এই ব্যাকুলতা রতনের? আচ্ছা সে কথা এখন থাক।

কিন্তু রতনকে কেউ লক্ষ্য করে না, কিম্বা লক্ষ্য ক'রেও কেয়ার করে না। রতন বসে আছে নিঃসাড়ে, শুধু সমস্ত দেহের রেখায় ফুটে উঠেছে তার ব্যগ্রতার প্রখরতা।

ধীরে ধীরে অন্ধকার এল ফিকে হয়ে। এবার নদী রেখায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রথম ছিল চারিধারে আবছা কুয়াশা। প্রকৃতির পটের ওপর যেন রঙের এলোমেলো ছোপ, কোথাও একটু ঘন, কোথাও হাল্কা, সে রঙের ছোপ তখনও নির্দ্দিষ্ট রূপ দেয়নি। নীহারিকার মত আকারহীন সেই অস্পষ্ট ধোঁয়াটে তরলতা থেকে রতনের চোখের ওপরেই কে যেন এই মাত্র নতুন পৃথিবী সৃষ্টি ক'রে তুলছে। আকাশের গায়ে কালো খানিকটা তুলির পোঁচ দেখতে দেখতে হয়ে উঠল প্রকাণ্ড একটা জাহাজ, তার জটিল মাস্তলগুলি উঠেছে ছোটখাটো অরণ্যের মত মেঘলা আকাশে, তার নোঙরের শেকল নেমেছে অতিকায় অজগরের মত জলের ভেতর। রতনদের নৌকা যে দানবের ভ্রূকুটির তলা দিয়ে ভয়ে ভয়ে পার হয়ে যায় ছোট শোলার খেলনার মত। জলের আরেক ধারে বিছান ছিল খানিকটা তরল গাঢ় রঙের কুয়াশা। সে কুয়াশা জমাট বেঁধে বয়ে গেল অনেকগুলো গাধাবোটের জটলা---একটি জেটির চারিধারে তারা ভীড় ক'রে আছে। দূর থেকে মনে হয় ওরা যেন কোন বিশাল জলচরের শাবক---মায়ের কোল ঘেঁষে তাল পাকিয়ে আছে ঘুমিয়ে। নদীর ওপরকার পর্দ্দা আরো গেল সরে। কলকারখানার বিশাল সব দেহ উঠল জেগে নদীর দু'পারে। জলের ওপর তাদের লৌহ-বাহু তারা বাড়িয়ে দিয়েছে। বাঁধান পাড় থেকে বড় বড় ক্রেণ উঠেছে গলা বাড়িয়ে; দুই তীরে সদাগরী জাহাজের আশে পাশে জেলে ডিঙ্গি আর খেয়া নৌকা, ষ্টীমার আর

লক্ষ ভীড় ক'রে আছে। এই মহানগর। ভয়ে বিস্ময়ে ব্যাকুলতায় অভিভূত হয়ে রতন প্রথম তার রূপ দেখলে।

তারপর তাদের নৌকা বাঁক নিয়ে ঢুকেছে এই শাখার ভেতর, চলেছে পুরান সহরতলীর ভেতর দিয়ে। বড় নদীতে মহানগরের রূপ দেখে রতন সত্যি ভয় পেয়েছিল, হতাশ হয়েছিল আরো বেশী। কিন্তু এই পুরান জীর্ণ সহরতলী দেখে তার যেন একটু আশা হয়। কেন আশা হয়? আচ্ছা সে কথা এখন থাক।

নদীর আরেকটা বাঁক ঘুরেই দেখা যায় নড়ালের পোল; আগে থাকতে পোণার সব নৌকা এসে জুটেছে পোণাঘাটে। মুকুন্দ হাঁক দিয়ে এবার সবাইকে তোলে। লক্ষ্মণ উঠে তার কুণকে ঠিক করে। মাঝিরা গা মোড়া দিয়ে ওঠে। আর রতন বসে থাকে উত্তেজনায় উদ্‌গ্রীব হয়ে। তার চাপা দুটি পাতলা ছোট ঠোঁটের নীচে কি সঙ্কল্প আছে, জানে কি কেউ? বড় বড় দুটি চোখে তার কিসের ব্যগ্রতা? শুধু সহর দেখার কৌতূহল ত এ নয়! কিন্তু সে কথা এখনো থাক।

পোণাঘাটে এসে নৌকা লাগে। পোণাঘাটে আর জায়গা কই দাঁড়াবার! এরই মধ্যে মাটির হাঁড়ি দুধারে ঝুলিয়ে ভারীরা এসেছে দূর দূরান্তর থেকে পোণার চারা নিয়ে যেতে। তাদের ভীড়ের ভেতর পাড়ের কাদার ওপর কারা দোকান পেতে বসেছে পান বিড়ি আর তেলেভাজা খাবারের। সরকারী লোকেরা ঘুরে বেড়াচেছ পাওনা আদায় করতে। দালালেরা ঘুরছে হাঁক ডাক ক'রে।

পাড়ে আর জায়গা নেই, তবু মুকুন্দদাসের খাস নৌকার একটু নোঙর ফেলবার ঠাঁই মেলে। মুকুন্দ ত আর যে সে লোক নয়। বর্ষার কটা মাসে তার গোটা ছয়েক পোণার নৌকা আনাগোনা করে এই পথে।

মাঝিরা এর মধ্যেই নৌকার খোল থেকে জল ছেঁচে ফেলতে সুরু করছে একটু আধটু। লক্ষ্মণ কুণকে পরখ করছে---মাছ মেপে দেবার সময় খানিকটা জল রেখে হাত সাফাই করতে সে ওস্তাদ। মুকুন্দদাস নৌকো থেকে জলে নেমে ডাঙ্গায় ওঠে। পেছন দিকে হঠাৎ চোখ পড়ায় ধমক দিয়ে বলে,---"তুই নামলি যে বড়!"

রতন বাবার দিকে কাতরভাবে তাকায়। মুকুন্দ একটু নরম হয়ে বলে,---"আচ্ছা কোথাও যাসনি যেন, ওই কদম গাছের তলায় দাঁড়াগে যা।"

রতন তাই করে। কদম গাছ থেকে অসংখ্য ফোটা ফুল ঝরে পড়েছে মাটিতে। কাদায় মানুষের পায়ের চাপে রেণুগুলো থেঁৎলে নোংরা হয়ে গেছে। পোণা-চারার হাটে কদম ফুলের কদর নেই।

রতনের চারিধারে হট্টগোল।

"চাপড়াও না হে, নইলে বাড়ী গিয়ে মাছ-চচচড়ি খেতে হবে যে।"

"একটা নতুন হাঁড়িও জোটেনি! ভাতের তিজেলটাই এনেছ বুঝি টেনে। তারপর মাছ যখন ঘেমে উঠবে তখন হবে দালাল বেটার দোষ।"

ভারীরা কেউ এসেছে খালি হাঁড়ি নিয়ে, কারুর কেনা প্রায় সাঙ্গ হ'ল। বসে বসে তারা হাঁড়ির জল চাপড়ায়, মরা মাছ ছেঁকে ফেলে। নদীর ধারের কাদায় মরা মাছ আর কদম রেণু মিশে গেছে।

রতন কিন্তু কদমতলায় বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে না। এখানে থাকবার জন্যে কাকুতি-মিনতি ক'রে সে ত সহরে আসেনি। সারাপথ সে মনের কথা মনে চেপে এসেছে; মুখ ফুটে একবার বুঝি লক্ষ্মণকে গোপনে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করেছিল,---"হ্যাঁ কাকা, পোণাঘাটের কাছেই উল্টোডিঙি না?"

লক্ষ্মণ কাকা হেসে বলেছে---"দূর পাগলা, উল্টোডিঙি কি সেথা! সে হ'ল কতদূর!" তার পর অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছে---"কেনরে, উল্টো-ডিঙির খোঁজ কেন? উল্টোডিঙির নাম তুই শুনলি কোথা?"

কিন্তু রতন তারপর একেবারে চুপ। তার পেটের কথা বার করে কার সাধ্য।

কদমতলায় দাঁড়িয়ে উৎসুকভাবে রতন চারি-দিকে তাকায়। তার বাবা কাজে ব্যস্ত, রতন এক সময়ে বেরিয়ে পড়ে রাস্তায়। কাউকে

কিছু জিজ্ঞাসা করতে এখানে তার সাহস হয় না। একটা দিক খেয়ালমত ধরে সে এগিয়ে যায়।

মহানগরের বিশাল অরণ্যে কত মানুষ আসে কত কিছুর খোঁজে ;---কেউ অর্থ, কেউ যশ, কেউ উত্তেজনা, কেউ বা বিস্মৃতি। মৃত্তিকার স্নেহের মত শ্যামল একটি অসহায় ছেলে সেখানে এসেছে কিসের খোঁজে ? এই অরণ্যে নিজের আকাঙ্ক্ষিতকে সে খুঁজে পাবার আশা রাখে---তার দুঃসাহস ত কম নয়।

অনেক দূর গিয়ে রতন সাহস ক'রে একজনকে পথ জিজ্ঞাসা করে। লোকটি অবাক হয়ে তার দিকে তাকায়, বলে,---"এ ত অন্য দিকে এসেছো ভাই, উল্টোডিঙি ওইদিকে, আর সে ত' অনেক দূর!"

---অনেক দূর! তা' হোক, অনেক দূরকে রতন ভয় করে না। রতন অন্য দিকে ফেরে। লোকটি কি ভেবে তাকে জিজ্ঞাসা করে,---"তুমি একলা যাচ্ছ অতদূর! তোমার সঙ্গে কেউ নেই ?"

রতন সঙ্কুচিতভাবে বলে,---"না।"

লোকটির কি মনে হয়, একটু শক্ত হয়েই জিজ্ঞাসা করে---"বাড়ী থেকে পালিয়ে যাচ্ছ না ত ? উল্টোডিঙিতে কার কাছে যাচ্ছ ?"

রতন ভয়ে ভয়ে ব'লে ফেলে---"সেখানে আমার দিদি থাকে।" তারপর তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চলে যায়। লোকটা যদি আরো কিছু জিজ্ঞাসা করে, যদি ধরে নিয়ে যায় আবার তার বাবার কাছে।

তাহ'লে এবার বলি। রতন এসেছে দিদিকে খুঁজতে। যেখানে মানুষ নিজের আত্মাকে হারিয়ে খুঁজে পায় না, সেই মহানগর থেকে তার দিদিকে সে খুঁজে বার করবে। সহর মানে তার দিদি। বাড়ীতে থাকতে সে ভেবেছে সহরে গেলেই বুঝি দিদিকে পাওয়া যায়। মহানগরের বিরাট রূপ তার সে ধারণাকে উপহাস করেছে; কিন্তু তবু সে হতাশ হয় নি। দিদিকে খুঁজে সে পাবেই। শিশু-হৃদয়ের বিশ্বাসের কি সীমা আছে!

কিন্তু দিদিকে খোঁজার কথা ত কাউকে বলতে নেই। দিদির নাম করাও যে বাড়ীতে মানা, তা কি সে জানে না! অনুচ্চারিত কোন নিষেধ তার শিশুমনের ব্যাকুলতাকে মূক ক'রে রেখে দেয়।

তাই সে সারা পথ এসেছে মনের কথা মনে চেপে। তাই সে একা বেরিয়েছে দিদির সন্ধানে।

দিদিকে যে তার খুঁজে বার করতেই হবে। দিদি না হ'লে তার যে কিছু ভালো লাগে না। ছেলেবেলা থেকে সে ত' মাকে দেখে নি, জেনেছে শুধু দিদিকে। দিদি তার মা, দিদিই তার খেলার সাথী। বিয়ে হয়ে দিদি গেছ্‌ল শ্বশুরবাড়ী। তবু'ও তাদের ছাড়াছাড়ি হয় নি। কাছাকাছি দু'টি গাঁ, রতন নিজেই যখন তখন পালিয়ে গিয়ে হাজির হয়েছে দিদির কাছে। তারপর দিদির কাছ থেকে তাকে নিয়ে আসা সোজা ব্যাপার নয়। দিদি যেখানে থাকতে পারে দিনের পর দিন, সেখানে তার বেশী দিন থাকা কেন যে দোষের তা সে কেমন ক'রে বুঝবে!

তারপর কি হ'ল কে জানে। একদিন তাদের বাড়ীতে বিষম গণ্ডগোল। দিদির শ্বশুরবাড়ী থেকে লোক এসেছে ভীড় ক'রে, ভীড় ক'রে এসেছে গাঁয়ের লোক। থানা থেকে চৌকীদার পর্য্যন্ত এসেছে। ছেলেমানুষ ব'লে তাকে কেউ কাছে ঘেঁষতে দেয় না। তবু সে শুনেছে---দিদিকে কারা নাকি ধরে নিয়ে গেছে। তাকে আবার কেড়ে আনতেই ত হয়! কেন যে কেউ যাচ্ছে না তাই ভেবে তার রাগ হয়েছে। তার পর সে আরো কিছু শুনেছে; শিশুর মন অনেক বেশী সজাগ। দিদিকে কোথায় ধরে নিয়ে গেছে কেউ নাকি জানে না।

এইবার সে কেঁদেছে। কে জানে কারা নিয়ে গেছে দিদিকে ধরে। তারা হয়ত দিদিকে মারছে, হয়ত দিচ্ছে না খেতে। দিদি হয়ত রতনকে দেখবার জন্য কাঁদছে। একথা ভেবে তার যেন আরও কান্না পায়।

বাবা তাকে আদর করেছেন কান্না দেখে। মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছেন---"কান্না কেন বাবা ?"

চুপি চুপি রতন বলেছে, "দিদি যে আসছে না বাবা।"

মুকুন্দ শিশুর সজাগ মনের রহস্য না জেনে বলেছে,---"আসবে বৈকি বাবা, শ্বশুরবাড়ী থেকে কি রোজ রোজ আসতে আছে!"

রতন আর কিছু বলে নি। কিন্তু বাবা তার কাছে কেন লুকোতে চান বুঝতে না পেরে তার বড় ভয় হয়েছে।

তারপর একদিন সে শুনেছে যে, দিদিকে নাকি পাওয়া গেছে। দারোগা সাহেব পুলিশ নিয়ে গিয়ে তাকে নাকি কোন দূরদেশ থেকে খুঁজে বার করেছেন। দিদিকে খুঁজে পাওয়া গেছে! রতনের আনন্দ আর ধরে না। দিদি এতদিন বাদে তাহ'লে আসছে।

কিন্তু কোথায় দিদি! একদিন, দুদিন, ব্যাকুল-ভাবে রতন অপেক্ষা করে, কিন্তু দিদি আসে না। দিদিকে ফিরে পাওয়া গেছে, তবু দিদি কেন আসে না, রতন বুঝতে পারে না। দিদির ওপরই তার রাগ হয়। কতদিন রতন তাকে দেখেনি তা কি তার মনে নেই? দিদি নিজে চলে আসতে পারে না? আর বাবাই বা কেমন, দিদিকে নিয়ে আসছে না কেন? রতনের সকলের ওপর অভিমান হয়েছে।

হয়ত দিদি চুপি চুপি শ্বশুরবাড়ী গেছে ভেবে একদিন সকালে রতন সেখানে গিয়ে হাজির হয়। কিন্তু সেখানে ত দিদি নেই। সেখানে কেউ তার সঙ্গে ভাল ক'রে কথাবার্ত্তা পর্য্যন্ত কয় না; দাদাবাবু তাকে দেখতে পেয়েও দূর থেকে না ডেকে চলে যান। মুখখানি কাঁদ কাঁদ ক'রে রতন সেদিন বাড়ী ফিরে এসেছে।

ফিরে এসে বাবার কাছে কেঁদে সে আবদার করেছে---"দিদিকে আনছ না কেন বাবা?"

সেইদিন মুকুন্দ তাকে ধমকে দিয়েছে।

তারপর থেকে দিদি আর আসে নি। দিদি নাকি আর আসবে না।

কিন্তু রতন মনে মনে জানে, তাকে কেউ ডাকতে যায় নি ব'লেই অভিমান ক'রে দিদি আসে নি।

রতন যে জানে না দিদি কোথায় থাকে, না হ'লে সে নিজেই গিয়ে দিদিকে ডেকে আনত।

কিন্তু কেমন ক'রে সে জানবে দিদি কোথায় আছে। কেউ তাকে দিদির কথা বলে না। দিদির কথাই যে বলতে নেই। রাত্রে সে চুপি চুপি শুধু দিদির জন্যে কাঁদে; দিদি কেমন ক'রে তাকে ভুলে আছে ভেবে মনে মনে তার সঙ্গে ঝগড়া করে। দিদি কোথায় থাকে সে জানে না।

কিন্তু শিশুর মন আমরা যা মনে করি তার চেয়ে অনেক বেশী সজাগ।

শিশু অনেক কিছু শুনতে পায়; অনেক কিছু বোঝে। কোথা থেকে সে শুনেছে কে জানে যে, দিদি থাকে সহরে,---রূপকথার চেয়ে অদ্ভুত সেই সহর। কোথা থেকে কার মুখে শুনেছে---উল্টোডিঙির নাম। বাতাসে কথা ভেসে আসে, বিনিদ্র ভালবাসা কান পেতে থাকে, শুনতে পায়।

তাই সে কাকুতি-মিনতি ক'রে এসেছে মহা-নগরে, তাই সে চলেছে সন্ধানে।

দিদিকে সে খুঁজে বার করবে, সে জানে দিদির সামনে একবার গিয়ে দাঁড়ালে সে আর না এসে থাক্‌তে কিছুতেই পারবে না। এমনি গভীর তার বিশ্বাস।

রতনকে আমরা এখানে ছেড়ে দিতে পারি। মহানগরে অনেকেই আসে অনেক কিছুর খোঁজে, কেউ অর্থ, কেউ যশ, কেউ উত্তেজনা, কেউ বিস্মৃতি, কিউ আরো বড় কিছু। সবাই কি পায়? পথের অরণ্যে তারা হারিয়ে যায়। মহানগর তাদের চিহ্ন দেয় মুছে। রতনও তেম্নি যাবে হারিয়ে ভেবে আমরা তাকে ছেড়ে দিতে পারি।

কিন্তু তা যাবে না। পৃথিবীতে কি সম্ভব কি অসম্ভব কে বলতে পারে? রতন সত্যি দিদির খোঁজ পায়। দুপুর তখন গড়িয়ে গেছে বিকেলের দিকে। আষাঢ় মাসের আকাশ, মেঘে ঢাকা ব'লে বেলা বোঝা যায় না। ক্লান্তপদে শুকনো কাতর মুখে একটি ছেলে গিয়ে দাঁড়ায় খোলার ছাওয়া একটি মেটে ঘরের দরজায়। একটি মেয়ে তাকে রাস্তা থেকে এনেছে সঙ্গে ক'রে।

রতন অনেক পথ ঘুরেছে, অনেককে জিজ্ঞাসা করেছে পথ, শেষে সে সন্ধান পেয়েছে। ভালবাসা কি না পারে!

খানিক আগে হয়রাণ হয়ে খোঁজ করতে করতে রতন দূরে একটি মেয়েকে দেখতে পায়, উৎসাহভরে সে চীৎকার ক'রে ডাকে—"দিদি!" মেয়েটি ফিরে দাঁড়াতেই রতন হতাশ হয়ে যায়। তার দিদি ত অমন নয়। কুণ্ঠিতভাবে সে অন্য দিকে চলে যাবার চেষ্টা করে। মেয়েটি তাকে ডেকে বলে—"শোন!"

কাছে গেলে তার ক্লান্ত শুক্‌নো মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করে—"কাকে খুঁজছ ভাই?"

রতন লজ্‌জিতভাবে তার দিদির নাম বলে। মেয়েটি হেসে বলে—"তোমার দিদির বাড়ী বুঝি চেন না, চল আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।"

মেটে বাড়ীর দরজায় দাঁড়িয়ে এখন মেয়েটি ডাকে,—"ও চপলা, তোকে খুঁজতে কে এসেছে দেখে যা।"

ভেতর থেকে চপলাই বুঝি রুক্ষ স্বরে বলে,—"কে আবার এল এখন?"

"দেখেই যা না একবার।"

চপলা দরজার কাছে এসে দমকে দাঁড়ায়। রতনের মুখেও কথা ফোটে না। দিদিকে চিনতেই তার কষ্ট হয়। দিদি যেন কেমন হয়ে গেছে।

দু'জনেই খানিকক্ষণ থাকে নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে। যে মেয়েটি রতনকে সঙ্গে ক'রে এনেছে সে একটু সন্দিগ্ধ হয়ে বলে,—"তোর নাম ক'রে খুঁজছিল, তাই তোর ভাই ভেবে বাড়ী দেখাতে নিয়ে এলাম। তোর ভাই নয়?"

উত্তর না দিয়ে চপলা হঠাৎ ছুটে এসে রতনকে বুকে চেপে ধরে, তারপর এদিক ওদিক চেয়ে অবাক হয়ে ধরা গলায় বলে,—"তুই একা এসেছিস?"

রতন দিদির বুকে মুখ লুকিয়ে থাকে, কিছু বলে না।

মহানগরের পথে ধুলো, আকাশে ধোঁয়া, বাতাসে বুঝি বিষ। আমাদের আশা এখানে কখন কখন পূর্ণ হয়। যা খুঁজি তা মেলে ত বহুদিনের কামনার ফলও কেমন একটু বিস্বাদ লাগে। মহানগর সব কিছুকে দাগী ক'রে দেয়, সার্থকতাকেও দেয় একটু বিষিয়ে।

চপলা রতনকে ঘরে নিয়ে যায়। সে ঘর দেখে রতন অবাক। মাটির ঘর এমন ক'রে সাজান হ'তে পারে, এত সুন্দর জিনিষ সেখানে থাকতে পারে রতন তা কেমন ক'রে জানবে? এত জিনিষ দেখে সে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে প্রথম,—"এসব তোমার দিদি?"

চপলার অকারণ চোখের জল তখনও শুকোয়নি, একটু হেসে সে বলে,—"হ্যাঁ ভাই!"

কিন্তু দিদির ঘর যেমনই হোক তা নিয়ে মেতে থাকলে চলবে না ত। আসল কথা রতন ভোলেনি। সে হঠাৎ বলে,—"তোমায় কিন্তু বাড়ী যেতে হবে দিদি!"

চপলা বুঝি একটু চমকে ওঠে, তারপর ম্লানভাবে বলে,—"আচ্ছা যাব ভাই, এখন ত তুই একটু জিরিয়ে নে!"

"কিন্তু জিরিয়ে নিয়েই যেতে হবে। আমাদের নৌকা কাল সকালেই ছাড়বে কিনা! এসব জিনিষ কেমন ক'রে নেব দিদি?"

এবার চপলা চুপ ক'রে থাকে।

হঠাৎ কেন বলা যায় না একটু ভীত হয়ে রতন জিজ্ঞাসা করে,—"একটু জিরিয়ে নিয়েই যাবে ত দিদি?"

দিদির মুখে তবু কথা নেই। দিদি জিনিষপত্র নিয়ে যাবার ভাবনাতেই হয় ত রাজী হচ্ছে না ভেবে রতন তাড়াতাড়ি বলে,—"ওসব জিনিষ একটা গরুরগাড়ী ডেকে তুলে নেব, কেমন দিদি?"

চপলা কাতর মুখে ব'লে ফেলে—"আমার যে যাবার উপায় নেই ভাই।"

যাবার উপায় নেই! রতনের মুখের সব দীপ্তি হঠাৎ নিভে যায়। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়ে যায় বাবার রাগ, মনে পড়ে বাড়ীতে দিদির নাম পর্য্যন্ত উচ্চারণ নিষেধ। সত্যই বুঝি দিদির সেখানে যাবার উপায় নেই! বৃথাই এসেছে সে দিদিকে খুঁজতে, দিদিকে খুঁজে পেয়েও তার লাভ নেই।

তারপর হঠাৎ আবার তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বলে,—"আমিও তা হ'লে যাব না দিদি!"

"কোথায় থাকবি ?"

"বাঃ তোমার কাছে ত!" ব'লে রতন হাসে; কিন্তু চপলার মুখ যে আরো ম্লান হয়ে আসছে তা সে দেখতে পায় না।

তারপর খেয়ে দেয়ে সারা বিকেল দুই ভাই-বোনের গল্প হয়। কত কথাই তাদের আছে বলবার, জিজ্ঞাসা করবার। কিন্তু সন্ধ্যা যত এগিয়ে আসে তত চপলা কেমন অস্থির হয়ে ওঠে। একবার সে বলে,---"তুই যে চলে এলি একলা, বাবা হয় ত খুব ভাবছে!"

দিদির প্রতি অবিচারের জন্য বাবার ওপর রতনের একটু রাগই হয়েছে, সে তাচ্ছিল্য ক'রে বলে---"ভাবুকগে!"

খানিক বাদে চপলা আবার বলে,---"এখান থেকে নড়ালের পোল অনেকখানি পথ, না রতন?"

রতন এপথ পার হয়ে ত এসেছে। গর্ব্বভরে সে বলে---"ওরে বাবা, সে বলে কোথায়!"

"পয়সা নিয়ে তুই ট্রামে ক'রে, না হয় বাসে, যেতে পারিস না?"

"বাঃ আমি কি যাচ্ছি নাকি?"

দিদির মুখের দিকে চেয়ে সে কিন্তু থমকে যায়! দিদির চোখে জল।

মাথা নীচু ক'রে চপলা ধরা গলায় বলে---"এখানে যে তোমার থাকতে নেই ভাই!"

রতন কিছুই বুঝতে পারে না, কিন্তু এবার তার অত্যন্ত অভিমান হয়। দিদি সেখানেও যেতে পারবে না, আবার এখানেও বলবে তাকে থাকতে নেই! আচ্ছা সে চলেই যাবে। কখ্খনো, কখ্খনো আর দিদির নাম করবে না, বাবার মত। ধীরে ধীরে সে বলে---"আচ্ছা আমি যাব।"

মেঘলা আকাশে একটু আগে থাকতেই আলো এসেছে ম্লান হয়ে। চপলা উঠে তার আলমারী থেকে চারটে টাকা বার ক'রে রতনের হাতে গুঁজে দিয়ে বলে---"তুই খাবার খাস্।"

চার টাকায় অনেক পয়সা, তবু আপত্তি করবার কথাও আর রতনের মনে নেই। দিদি যে এক্ষুনি তাকে চলে যেতে বলেছে তা বুঝে সে যেন বিমূঢ় হয়ে গেছে। তার সমস্ত বুক গেছে ভেঙ্গে।

রতন আর ঘরে দাঁড়ায় না, আস্তে আস্তে বাইরে বেরিয়ে আসে।

দিদির মুখের দিকেও আর না চেয়ে গলি দিয়ে সে সোজা বড় রাস্তার দিকে এগিয়ে যায়। মুখের দিকে চাইলেও হয়ত দিদির অবিশ্রান্ত চোখের জলের মানে সে বুঝতে পারত না।

চপলা পেছন থেকে ধরা গলায় বলে---"বাসে ক'রে যাস রতন, হেঁটে যাসনি!"

রতন সে কথা শুনতে পায় কিনা কে জানে, কিন্তু বড় রাস্তার কাছ থেকে হঠাৎ আবার সে ফিরে আসে। তার মুখ আবার গেছে বদলে। এইটুকু পথ যেতে কি সে ভেবেছে কে জানে।

চপলা তখনও দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। রতন তার কাছে এসে হঠাৎ বললে,---"বড় হয়ে আমি তোমায় নিয়ে যাব দিদি! কারুর কথা শুনব না।"

ব'লেই সে এবার সোজা এগিয়ে যায়। তার মুখে আর নেই বেদনার ছায়া, তার চলার ভঙ্গি পর্য্যন্ত সবল; এতটুকু ক্লান্তি যেন তার আর নেই। দেখতে দেখতে গলির মোড়ে সে অদৃশ্য হয়ে যায়।

মহানগরের ওপর সন্ধ্যা নামে বিস্মৃতির মত গাঢ়।

অরণ্য-পথ

ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। গভীর রাত্রে ষ্টীমার কখন ছাড়িয়াছে টের পাই নাই। বিমল গায়ে ঠেলা দিয়া তুলিয়া দিতে ধড়মড় করিয়া জাগিয়া বসিলাম।

অন্ধকারে পায়ের তলায় গভীর জলের আলোড়ন-শব্দ---হঠাৎ শুনিলে ভয় হইবার কথা।

ষ্টীমারের দুই পাশে মাল-বোঝাই গাধাবোট বাঁধা। তাহারা দৃষ্টি একেবারে আড়াল করিয়া আছে। কোনও দিকে চাহিয়া ষ্টীমার টলিতেছে কিনা বুঝিবার উপায় নাই। শুধু ইঞ্জিনের গতির সঙ্গে বিশাল দারুদেহের কম্পনে ও জলের প্রবল আলোড়ন-শব্দে ষ্টীমারের বেগ অনুমান করা যায়।

ডেকের উপর আমাদের আসন। আইন-মতে ডেকের মাঝখানে একটি উজ্জ্বল হউক ম্লান হউক আলো জ্বলিবার কথা। কিন্তু এদিকের জলপথে শুধু মালপত্রই যাতায়াত করে---মানুষ যে করে না তাহা নয় কিন্তু তাহারা নগণ্য। তাহাদের জন্য সারা রাত বাতি খরচ করা কোম্পানী প্রয়োজন মনে করে না।

অন্ধকারে কিছুই দেখিতে না পাইয়া ভারী অস্বস্তি বোধ হইতেছিল। যখন উঠিয়াছিলাম তখন প্রথম রাত্রি। যাত্রীর ভিতর আমরা তখন দুই-জনই মাত্র ছিলাম। তাহার পর কতজন উঠিয়াছে কে জানে। অন্ধকারে দূরে অস্পষ্ট গুঞ্জনধ্বনি শোনা যাইতেছিল--মনে হইল হয়ত নূতন যাত্রী পরে উঠিয়া থাকিবে। তাহাদের দেখিতে পাইলেও সময়টা কোনরকমে চরিত্র-পর্য্যালোচনা করিয়া কাটিতে পারিত। কিন্তু ভিতরে বাইরে যখন দেখিবার কিছুই নাই তখন অকারণে জাগিয়া বসিয়া কি করিব।

ঘুম হইতে জাগাইয়া তোলার জন্য বিমলকে ধমক দিলাম।

'মিছিমিছি জাগালি কেন বলত?'

'বাঃ---ষ্টীমার ছাড়লে জাগিয়ে দিতে বলেছিলে না!'

বলিয়াছিলাম সত্যই। তখন আশা ছিল ষ্টীমার ছাড়াটা অত্যন্ত একটা রহস্যময় ব্যাপার হইবে। মনে হইয়াছিল, দীপালোক বিক্ষত দুই তীরের মধ্য দিয়া ভাসিয়া যাইতে যাইতে ভাগীরথীর অন্ধকার বক্ষ হইতে নিদ্রিত মহানগরীকে একটা জমকালো রকমের বিদায় নমস্কার দিয়া যাইব।---তোমার পাষাণ বন্দীশালায় অনেক ঘুরিয়াছি---প্রস্তর কঠিন পথে চরণ জর্জরিত হইয়াছে, দেওয়ালে দেওয়ালে মাথা ঠুকিয়াছে--তবু কিছু মিলে নাই। হে উদাসীন নগরী, তাই বিদায় লইলাম। এমনি সব বড় বড় কথা বুঝি মনের মধ্যে রচনা করিয়াছিলাম। কিন্তু কিছুই হইল না। মহানগরী অত্যন্ত অশ্রদ্ধা-ভরে আমাদের বিদায় দিয়াছে। জানোয়ারের মত পিঁজরাবন্দী হইয়া যাইতে যাইতে কাব্য করা শোভা পায় না।

বলিলাম---'বলেছিলাম ত; কিন্তু অন্ধকারের ভেতর ভূতের মত জেগে বসে থেকে কি হবে?'

বিমলের উৎসাহ কিছুতেই ম্লান হয় না। বলিল,--'চল না একটু ঘুরে আসি।'

আগেই বলিয়াছি, সমস্ত ষ্টীমার মালপত্রে বোঝাই। তাহার ভিতরে অন্ধকারে পদে পদে হোঁচট খাইতে খাইতে ঘুরিবার বাসনা তখন হইল না। বিমলকে তাহার অন্যায় চঞ্চলতার জন্য একটু ভর্ৎসনা করিতে যাইতেছি, হঠাৎ চমকিয়া উঠিলাম।

উচ্ছ্বসিত হাসির শব্দ ;---জলতরঙ্গের নীচের পর্দা হইতে সর্বোচ্চ পাত্র পর্য্যন্ত কে যেন দ্রুতবেগে যষ্টি টানিয়া দিয়াছে।

অবশ্য নারীকণ্ঠ---কিন্তু স্বর শুনিয়া মনে হয় বালিকার চাপল্য তাহাতে বেশী।

অন্ধকারে এই কণ্ঠস্বর একেবারে যেন অভিভূত করিয়া দিল। মুগ্ধ মন এই ধ্বনির সাহায্যে সেই মুহূর্ত্তে যে মুখখানি রচনা করিয়া ফেলিল, বাস্তবের সহিত হয়ত তাহা কিছুতেই মিলিবে না, তবু তখনকার মত তাহার স্নিগ্ধতায় একেবারে আবিষ্ট হইয়া গেলাম। দ্বিতীয়বার হাস্যধ্বনি উঠিতে না উঠিতেই মাঝখানে থামিয়া গেল। কে যেন সহসা জোর করিয়া তাহা চাপা দিয়াছে।

উৎসুকভাবে হাস্যধ্বনির পুনরাবৃত্তির জন্য অপেক্ষা করিলাম অনেকক্ষণ, কিন্তু বিশাল পাথর চাপা দিয়া কে বুঝি নির্ঝরিণীর মুখ বন্ধ করিয়া দিয়াছে। আর কিছুই শোনা গেল না। ব্যাপারটা একটু যেন রহস্যময়, অন্ততঃ ষ্টীমারের তলায় জলের কল্লোল-শব্দ, নদীবক্ষের অন্ধকার এবং হাস্যধ্বনির আকস্মিক পরিসমাপ্তি আমাদের কাছে তাহাকে রহস্যমণ্ডিত করিয়া দিয়াছিল।

শব্দটা কোন্ দিক হইতে আসিয়াছিল বুঝিতে পারিয়াছিলাম, কিন্তু কিছুই দেখিবার উপায় নাই।

ডেকে আলো না রাখিবার জন্য এইবার সত্যই ষ্টীমার কোম্পানীর উপর রাগ হইতেছিল।

বিমল আমার মতই কৌতূহলী হইয়াছে বুঝিলাম। আশ্চর্য্যের বিষয়, ষ্টীমারটা ঘুরিয়া আসিবার আর সে নাম করিল না। আমার পাশে নীরবে কম্বলের উপর শুইয়া পড়িল।

খানিক বাদে শুধু সে জিজ্ঞাসা করিল, 'রাত এখন কত?'

মনে মনে হাসিয়া বলিলাম,---'জানি না।'

ভোর হইতেই জাগিয়া উঠিলাম। ফাল্গুন মাস, তবু নদীর প্রবল জোলো হাওয়ায় যেন শীত শীত করিতেছিল। পাশে বিমলকে দেখিতে পাইলাম না, সে কতক্ষণ উঠিয়া গিয়াছে কে জানে।

ভোরের নীলাভ আলোয় ডেকের সমস্তই এবার দেখা যাইতেছিল। উঠিয়া এদিক ওদিক একবার পায়চারী করিয়া বেড়াইলাম। এ ষ্টীমারে অধিকাংশই ডেকের যাত্রী। ফার্ষ্ট ও সেকেণ্ড ক্লাস নামে একটা সুসজ্জিত অংশ আছে কিন্তু সেখানে একটা যাত্রীও হয় না। সে দিকের কাঠের দরজায় তালা বন্ধই থাকে।

বোঝা গেল আমাদের পরে বেশী যাত্রী ওঠে নাই। একটি কৃষক পরিবার একদিকে গোটাকতক কেরোসিন কাঠের বাক্সের পাশে তাহাদের জায়গা করিয়া লইয়াছে। দুটি পুরুষ, একটি পাঁচ বছরের রুগ্ন শিশু, একটি বৃদ্ধা। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, তাহারা কাকদ্বীপে নামিয়া যাইবে।

আর একদিকে দুই বৃদ্ধ সাধু সকাল বেলায় গঞ্জিকা সেবনের উদ্যোগ করিতেছিল। আমার বেশভূষা দেখিয়াই বোধ হয় সাহস করিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া বসিল। নিমন্ত্রণটা প্রত্যাখ্যান করিতেই হইল।

কি যে খুঁজিতেছিলাম সে কথা গোপন করিবার চেষ্টা করা আর নিষ্ফল। ডেকের নানা যায়গায় স্তূপাকার করিয়া কোথাও বা জিনিষ বোঝাই কেরোসিন কাঠের বাক্স, কোথাও বা ক্যানাস্তারা, কোথাও বা বস্তা রাখা হইয়াছে। সেই মালপত্রের স্তূপের দরুণ ডেকের উপর অনেকগুলি নিভৃত কোটর সৃষ্টি হইয়াছে। একদিক হইতে সবগুলি দেখা যায় না। হয়ত কোথাও আনাচে কানাচে আর কোন যাত্রী আছে মনে করিয়া আরো একটু বিশদভাবে অনুসন্ধান করিলাম। কোন ফল হইল না। অমন রহস্যময় হাস্যধ্বনি তুলিতে পারে এমন কোন নারী দূরে থাক, ষ্টীমারে আর যাত্রীই নাই। ব্যাপারটা সত্যই বড় বিস্ময়জনক ঠেকিতেছিল। তাহার উপর সকাল হইতে বিমলটাই বা গেল কোথায়? সমস্ত ডেকে এবং সারেঙের

সহিত ভাবসাব করিয়া ইঞ্জিনের দিকটা ঘুরিয়াও তাহার দেখা পাইলাম না।

বিমলের এই ধরণের অন্তর্দ্ধানে সত্যই একটু চিন্তিত হইলাম। এই কয়েকদিনের আলাপে তাহাকে যেটুকু চিনিয়াছি তাহাতে তাহার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। বন্ধু ও সঙ্গী বলিয়া তাহার স্নেহ ভালবাসা শ্রদ্ধা যতই আমার উপর থাক না কেন, মনের খেয়ালের মুহূর্ত্তে আমাকে চিরদিনের মত ছাড়িয়া যাইতে সে যে এতটুকু দ্বিধা করিবে না তাহা আমি ভাল রকমই জানি।

তাহার সহিত আলাপ হইয়াছে মাত্র এই কয় মাস। কেমন করিয়া আমার এই ছন্নছাড়া জীবনে সে যে আসিয়া জুটিল তাহা ভাবিলে এখনও বিস্ময় লাগে।

প্রয়াগে কুম্ভমেলা। সকালে স্নান করিবার জন্য মানুষের স্রোতে যখন হইতে মিশিয়াছি তখন হইতে পৃথক সত্তা আর নাই।, নিজের ইচ্ছাশক্তি আর প্রয়োগ করিতে হয় না, ভীড়ের ভিতর কোন প্রকার চেষ্টা না করিয়াই শুধু চারিদিকের ঠেলায় আমারই মত বহু স্নানার্থীর সহিত জমাট বাঁধিয়া আগাইয়া চলিয়াছি, স্নান শেষ করিয়া সেইভাবেই ফিরিতেছিলাম। দু চোখ যতদূর যায়, দেখা যায় শুধু নরমুণ্ড---যেন লক্ষশির একটা বিরাট প্রাণী নড়িতেছে। তাহার দেহ দেখা যায় না।

কপালের ঘাম চোখে আসিয়া পড়িয়া চোখ জ্বালা করিতেছে। হাত তুলিয়া যে ঘামটুকু মুছিব তাহারও উপায় নাই। চারিধারের চাপে দুইটা হাত জম্পেশ হইয়া নিজের গায়ে আঁটিয়া গিয়াছে। যে স্রোতের সঙ্গে আসিয়াছি সেই স্রোতের ভিতরই থাকিতে হইবে, এখনও মাইল খানেক পথ না পার হইলে মুক্তি নাই।

মানুষের ভীড় শাসনের অতীত হইয়া যাওয়ায় কিছুদূরে শৃঙ্খলা আনিবার জন্য কয়েকটা হাতী ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। সেই হাতীর একটা আমাদের দিকে আসিলে কি যে হইবে তাহা ভাবিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেও করিবার কিছু নাই। শামুকের মত গতিতে যেমন অগ্রসর হইতেছি, তেমনি হইতে হইবে।

সমুদ্রকল্লোলের মত, অযুত মানুষের সেই পদধ্বনি ও কণ্ঠস্বরের সম্মিলনের ভিতর হঠাৎ নিকটে অদ্ভুত আওয়াজ শুনিলাম। আর্ত্ত এক ছাগ-শিশুর চীৎকার।

কষ্টে ঘাড় বাঁকাইয়া দেখিলাম, আস্ত এক ছাগশিশুকে দুই হাতে ভীড়ের উর্দ্ধে তুলিয়া ধরিয়া একটি যুবক আমারি কিছু পিছনে আসিতেছে। ছাগশিশুটি পথভুল করিয়া পুণ্যলোভী এই জনতার মধ্যে কেমন করিয়া আসিয়া পড়িয়াছিল কে জানে। স্নানার্থীদের পদ-নিষ্পেষণে তাহার অক্ষয় স্বর্গলাভের পথ তৈয়ারী হইয়া গিয়াছে।

সে এক বীভৎস দৃশ্য। পায়ের চাপে তাহার মাথায় আর কিছুই অবশিষ্ট নাই। সামনের দুইটা পা একেবারে ভাঙ্গিয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে। একটা দিকের চোখ আর নাই। খুলির খানিকটা অংশের সহিত উপড়াইয়া গিয়াছে। যায় নাই শুধু প্রাণটুকু। যন্ত্রণায় তাই সে আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিতেছিল।

যে ছেলেটি ছাগশিশুকে বহন করিয়া আনিতেছিল তাহার চারিধারে ভীড়ের ভিতর ভয়ানক গণ্ডগোল সুরু হইয়াছে। ছাগশিশুর মাথার উপর হইতে টপ টপ করিয়া রক্ত সদ্যস্নাত জনতার মাথার উপর পড়িতেছে। তাহারা প্রতিবাদ ত করিবেই। সাধ্য থাকিলে তাহারা ছেলেটিকে সেখানেই বোধ হয় উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া দিত কিন্তু জিহ্বা সঞ্চালনের সুযোগ থাকিলেও হাত-পা নাড়া একপ্রকার অসম্ভব।

ভীড়ের ঠেলায় কখনও কখনও ছেলেটি আমার কাছাকাছি আসিয়া আবার সরিয়া যাইতেছিল। একবার সুযোগ পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এটিকে কোথায় পেলে হে?'

ছেলেটি সেই অবস্থাতেই হাসিয়া বলিল, 'এটি পুণ্যফল! কুড়িয়ে পেয়েছি!'

খানিকক্ষণ পাশের একটা ধাক্কা সামলাইতে কথা কহিবার আর অবসর পাইলাম না। আবার একটু সুবিধা হইতেই জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ওর ত স্বর্গলাভের আর বিলম্ব নেই! কেন আর বয়ে নিয়ে নিজেকে আর আশে পাশের লোককে কষ্ট দেওয়া!'

ছেলেটি কি বলিল শুনিতে পাইলাম না। যাহাদের গায়ে রক্তের ফোঁটা পড়িয়াছে তাহাদের তীব্র কণ্ঠ ও ছাগশিশুর আর্ত্তনাদে তাহা চাপা পড়িয়া গেল। কিছুক্ষণের জন্য আমি তাহার নিকট হইতে একটু আগাইয়া যাইতেও বাধ্য হইলাম।

আবার যখন দেখা হইল তখন ছাগশিশুর পরমায়ু বোধ হয় শেষ হইয়া আসিতেছে। মাথাটা নেতাইয়া পড়িয়াছে---শব্দ করিবার আর তাহার সামর্থ্য নাই।

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলাম,---'রক্তে যে একেবারে নেয়ে গেছ হে!'

ছেলেটির মুখে এবার হাসি নেই। গম্ভীর মুখে বলিল, 'হুঁ, যোগের স্নানটা ভাল ক'রেই হোল!' এবার আমরা ভীড়ের নূতন একটা আবর্ত্তনের মাঝে পড়িয়া প্রায় পাশাপাশি আসিয়া পড়িয়াছিলাম। দেখিলাম তাহার মাথায়, মুখে, কাঁধে ছাগশিশুর টাটকা রক্ত পড়িয়া ইতিমধ্যেই জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে। অনেকক্ষণ একভাবে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া পশুটিকে বহন করিবার জন্য হাত তাহার কাঁপিতেছিল।

বলিলাম,--'কষ্ট'ও ত খুব কম হচ্ছে না!'

ছেলেটি আমায় অবাক্ করিয়া দিয়া বলিল, 'এখন বোধ হয় অজ্ঞান হয়ে গেছে; যা যন্ত্রণা পেয়েছে আগে যদি দেখতেন। এতগুলো মানুষের চাপ, একটা হাতী পড়লে থেৎলে গুঁড়ো হয়ে যায় আর এ ত একটা বাচচা ছাগল। বেটাকে উদ্ধার করতে গিয়ে আর একটু হ'লে আমিই গেছ্‌লাম আর কি!'

ইহার পর কোন কথাই বলিতে পারিলাম না। ছেলেটি খানিক বাদে বলিল, 'আমার চোখের ওপর রক্ত পড়ে চোখটা কর্‌কর্‌ করছে; ভালো দেখতে পাচ্ছিনে---দেখুন তো একেবারে শেষ হয়ে গেছে কিনা!'

বলিলাম,---'প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, একটু মুখটা নড়ছে মাত্র।'

ছেলেটি শুধু বলিল, 'একটু যদি জল পেতাম।'

সব দুর্ভোগেরই একটা শেষ আছে। এক জায়গায় আসিয়া ক্রমশঃ ভীড় হাল্‌কা হইতে আরম্ভ করিল এবং পরে আরও কিছুদূরে গিয়া যখন দু'ধারে হাত-পা ছড়াইবার জায়গা পাইলাম তখন প্রথমটা মনে হইল, এত বড় সৌভাগ্য মানুষের জীবনে খুব কমই আসিয়াছে।

ছেলেটি ইতিমধ্যেই আবার পিছনে পড়িয়া গিয়াছিল। তাহার কথা ভুলিয়াও বুঝি গিয়াছিলাম। হঠাৎ পিছন হইতে কে ডাকিল,---'ও দাদা, চলে যাচেছন যে!'

ফিরিয়া দেখিলাম, সেই ছেলেটি। ছাগশিশুটিকে এবার সে বুকের উপর নামাইয়া আমার কাছে আসিয়া হঠাৎ প্রশ্ন করিল,---'কতদূরে থাকেন?'

জানাইলাম যে, নিকটেই একটি অস্থায়ী পান্থশালায় কয়েকদিনের মত থাকিবার স্থান যোগাড় করিয়াছি।

ছেলেটি বলিল, 'তাহ'লে চলুন তাড়াতাড়ি। বেটাকে একটু জলটল দিয়ে দেখি।'

আমার পান্থশালায় আসিয়া ছাগশিশুর জন্য অনেক কিছুই সে করিল, কিন্তু স্নানার্থীদের চরণস্পর্শের জোর অনেক বেশী। ছাগশিশুকে অক্ষয় স্বর্গ হইতে কোন মতেই বঞ্চিত করা গেল না। ছেলেটির হাতের একটু জল পান করিবার চেষ্টা করিয়া বার দুই পা গুলি একটু নাড়িয়া চাড়িয়া একেবারে স্থির।

বলিলাম, 'যোগের স্নানের পর আর স্নান করতে নেই যে! কিন্তু গা-ময় রক্ত নিয়েই বা থাকবে কি ক'রে?'

ছেলেটি বলিল, 'হুঁঃ, যোগে আর স্নান করা হোল কখন? অর্দ্ধেক পথ থেকেই ফিরতে হ'ল যে।'

কথাটা বিশ্বাস করা সহজ নয়। দূর দূরান্তর হইতে আসিয়া জন-সমুদ্রের মাঝে এই নিদারুণ নিগ্রহ সহ্য করিয়া কেহ যে মাঝ পথ হইতে শুধু একটা মুমূর্ষু ছাগশিশুর জন্য স্নান শেষ না করিয়া ফিরিতে পারে ইহা আমার পক্ষে কল্পনা করাও শক্ত। আমার বিস্মিত দৃষ্টি দেখিয়া ছেলেটি একটু হাসিয়া বলিল,---'তা মস্ত বড় একটা কাজ ক'রে ফেলেছি---কি বলেন দাদা? সেই কবে বুদ্ধদেব

একবার ছাগল-ছানার জন্যে সমস্ত জপতপ পুণ্যের সঙ্গে প্রাণটা ফাউ দিতে চেয়েছিলেন আর এতদিন বাদে আমি কুম্ভমেলার পুণ্যটা হেলায় ছেড়ে দিলাম। প্রাণটাও দিয়েছিলাম আর কি।'

তাহার কথায় হাসিয়া ফেলিয়া তাহার স্নানের বন্দোবস্ত করিবার চেষ্টায় গেলাম।

ছেলেটি সেদিন আমাদের পান্থশালাতেই থাকিয়া গেল। তাহার ভাবগতিক দেখিয়া মনে হইল, অবস্থানটিকে দীর্ঘ করিতে তাহার বিশেষ আপত্তি নেই। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, এ রকম আশ্রয়হীন হইয়াই সে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে---শুধু কুম্ভমেলার এই কয়দিন নয়, আজ ছয় বৎসর ধরিয়া।

তাই বলিয়া তাহার রুচির খুঁত ধরিবার কিছু নাই। পান্থশালার আহার্য্যের ও শয়নের ব্যবস্থার অত্যন্ত কঠোর সমালোচনা করিতে ছাড়িল না। রান্নার দোষ ধরিয়া বেশ দু'কথা পাচক ব্রাহ্মণ-কুমারকে শুনাইয়া দিল এবং আমাকে এক সময় সহজভাবে জানাইল, 'দেখ দাদা, মাংস নইলে আমার খাওয়ার জুৎ হয় না।'

বিমলের সহিত এমনি করিয়া পরিচয়। কুম্ভমেলা শেষ হইয়া গেল, কিন্তু বিমল আমার সঙ্গ পরিত্যাগ করিবার নাম করিল না। আকার-ইঙ্গিতে তাহাকে আমার অবস্থার কথা ইতিপূর্ব্বে জানাইয়াছি---শীঘ্রই যে আমার এস্থান পরিত্যাগ করিতে হইবে তাহাও বলিতে ভুলি নাই কিন্তু বিমল তাহাতে বিচলিত হয় নাই। এক দিন আমায় স্পষ্ট বলিয়া দিল, 'তোমার ওসব হেঁয়ালি কথা-টথা আমায় শুনিও না দাদা; তোমায় এখন আমি ছাড়ছিনে। আমার ভাল লেগে গেছে।'

ইহার পর আর কথা চলে না। বিমলকে লইয়াই কলিকাতায় ফিরিলাম। হ্যাঙ্গাম অবশ্য কম নয়। নিজের আশ্রয় জোটানই ভার। বিমলকে লইয়া আরো ফাঁপরে পড়িলাম। সে কিন্তু নিশ্চিন্ত নির্ব্বিকার। আশ্রয় ও আহার সংগ্রহের ভার আমার উপর অর্পণ করিয়া সে পরমানন্দে ঘুরিয়া বেড়ায়। ত্রুটি হইলে অনুযোগ করিতেও ছাড়ে না।

দূর সম্পর্কের এক জ্ঞাতির বাড়ীতে অনেক কষ্টে আশ্রয় পাইয়াছিলাম। কিন্তু সে আশ্রয় হইতে বঞ্চিত হইতে হইল। তাঁহার গৃহটিকে নগরের যাবতীয় খঞ্জ, আতুর পশুপক্ষী ও মানুষের পিঁজরা-পোল বানাইবার বিমলের যে সাধু ইচ্ছা ছিল তাহা আমার জ্ঞাতি অনুমোদন করিতে পারিলেন না। বিমলের সহিত তাঁহার তুমুল বচসা হইয়া গেল। মহানগরে অনুসংস্থানের জন্য উপায়ও এতদিনে খুঁজিয়া পাই নাই। একদিন তাই বিমলকে লইয়া বিদায় হইলাম। তারপর তাহারই অনুরোধ ও আগ্রহাতিশয্যেই এই জলপথে চলিয়াছি।

বিমল সত্যই কোথাও যায় নাই। দুপুরের আগেই তাহার দেখা মিলিল। তাহার অনুপস্থিতিতে রন্ধনের আয়োজন আর করি নাই। দেখিলাম, সে নিজেই আহার সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে। খালাসীদের সহিত ভাব করিয়া একছড়া কলা, একটা বড় তরমুজ ও কয়েকটা পেঁপে যোগাড় করিয়াছে। কোথায় ছিল জিজ্ঞাসা করিতে বলিল, ভোরের বেলা উঠিয়া সে একদিকের একটা গাধা-বোটের উপর গিয়া বসিয়াছিল। ষ্টীমারের তুলনায় সে স্থান যে অত্যন্ত মনোরম তাহাও সে সোৎসাহে জানাইল।

সকাল বেলায় নদীর হাওয়ায় কেমন একটু ঠাণ্ডা বোধ হইয়াছিল, এখন তেমনি গরম। নীচে বয়লারের ও উপরে সূর্য্যদেবের তাপে সমস্ত ষ্টীমার তাতিয়া আগুন হইয়াছে। শান্ত ঢেউ-বিহীন বিস্তীর্ণ গঙ্গার জল সূর্য্যের প্রখর আলোয় জ্বলন্ত ইস্পাতের সুপ্রশস্ত পাতের মত দেখাইতেছে। ডেকের যে কোণ হইতে গাধাবোটের ফাঁক দিয়া বাহিরের দৃশ্য একটু দেখা যায়, সেই কোণেই দাঁড়াইয়াছিলাম। দুই ধারে ঢালু বন্ধ্যা পাড় দূরের নারিকেল-বনের রেখায় গিয়া মিশিয়াছে, তাহারই ভিতর কোথাও কোথাও ধানের ক্ষেতের ফালি জলের কিনারা ছুঁইয়াছে. ও যেন জীবন-রস ভিক্ষা করিয়া জাহ্নবীর কোলে শ্যামল ধরণীর সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত।

খালাসীদের প্রাদেশিক ভাষাই এতক্ষণ শুনিয়া আসিতেছি, তাহার ভিতর আমাদের দেশের

কণ্ঠ কাছে শুনিতে পাইয়া ফিরিয়া তাকাইলাম। আধা-বয়সী স্থূলকায় এক ভদ্রলোক সেকেণ্ড মেটের সহিত আলাপ করিতেছিলেন। আমাদের দেখিয়া স্মিতহাস্যে আগাইয়া আসিলেন।

পরিচয় করিয়া জানিলাম, তিনিই মালবাবু--- দুইটি গাধাবোট তাঁহারই জিম্মায় আছে। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া জলপথেই তাঁহার যাতায়াত চলিতেছে ; নদীই তাঁহার ঘরবাড়ী। নাম রামপদ জানিলাম।

তিনি হাসিয়া বলিলেন, 'এপথে চাষা-ভুষো ছাড়া বড় একটা কেউ যায় না ; আপনাদের দেখে বড় আশ্চর্য্য হলাম।'

বিমল বলিল, 'আমরা যে চাষা-ভুষো নই তাই বা কেমন ক'রে জানলেন !'

রামপদবাবু হাসিয়া বলিলেন, 'সে কি আর জানতে বাকী থাকে মশাই !'

ভদ্রলোক বড় অমায়িক। আমাদের সুবিধা অসুবিধার খোঁজ লইয়া আপ্যায়িত করিয়া দিলেন। আসিবার সময় চা আনিতে ভুলিয়াছি শুনিয়া বিমলকে তাহার ভাণ্ডার হইতে চা আনাইয়া দিবেন বলিয়াও আশ্বাস দিয়া গেলেন।

সামান্য মালবাবু হইলেও দেখিলাম, ষ্টীমারে তাঁহার প্রতিপত্তি খুব বেশী। সারেঙ হইতে নিম্নতম খালাসী পর্য্যন্ত তাঁহাকে সমীহ করিয়া চলে। তাহার প্রত্যক্ষ কারণ অনেকগুলি। খালাসীদের কাছে শুনিলাম ইংরেজী জানার দরুণ সাহেবদের কাছে তাহাদের হইয়া তিনিই দু'এক কথা বলিয়া থাকেন, সময়ে অসময়ে আবার দরখাস্ত ইত্যাদিও লিখিয়া দেন, দু'চার টাকা ধার দিতেও তাঁহার কৃপণতা নাই।

প্রথম দর্শনে লোকটিকে ভালই লাগিল। রহস্যময় হাসির কথাটা তাঁহাকে প্রায় জিজ্ঞাসা করিয়াই ফেলিয়াছিলাম। কিন্তু কেমন শুনাইবে ভাবিয়া আর পারি নাই।

ষ্টীমারে আমাদের যথেচ্ছ গতিবিধি। সারেঙের সহিত বেশ ভাব হইয়াছে। সন্ধ্যার পর ষ্টীমারের উপরকার অবজারভেশন ব্রীজে গিয়া অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়াছিলাম। দিনের অসহ্য গরমের পর সমস্ত আকাশ জুড়িয়া ঘন মেঘ জমিয়াছে। লোকালয় ফেলিয়া নদী এবার সুন্দরবনের ভিতর দিয়া চলিয়াছে। অন্ধকার জল ও সুদূর তীর প্রায় একাকার মনে হয়। শুধু তৃতীয়ার ক্ষীণ চাঁদ মেঘের আড়ালে পশ্চিমে যেখানে ডুবিতেছে ঘন বনের মাথায় সেখানে নিভু-নিভু আগুনের মত একটু রক্তাভ ছোপ। দিকচক্রবালঘেরা নিস্তব্ধ নদী ও বনের ভিতর আমরাই বোধ হয় কয়েকজন মাত্র মানুষ। চারিধারে আঁধার অরণ্যে প্রাণী-জগতের কি অপরূপ বিচিত্র কাহিনী চলিয়াছে কে জানে। আমাদের ছোট্ট ষ্টীমারের এই কয়টি কাহিনীও কম বিচিত্র নয়। কিন্তু কোথাও কাহারো যোগ নাই।

বিমল একটু অস্থির হইয়া উঠিতেছিল। খানিক বাদে চাঁদ একবারে ডুবিয়া যাইবার পর আমাকে আর কিছু দেখিবার নাই বলিয়া জোর করিয়া নামাইয়া লইয়া আসিল।

নীচে আর যাত্রী নাই। সাধুরা ডায়মণ্ড হারবারে ও কৃষক পরিবার কাকদ্বীপে নামিয়া গিয়াছে।

বিমল বলিল,---'চল মালবাবুর বোটে যাই--- তিনি ত চা পাঠালেন না।'

গাধাবোট ও ষ্টীমারের মাঝে সাধারণ সময়ে কোন পার হইবার তক্তা থাকে না। তবু বিমলের অনুরোধ এড়ানো গেল না।

গাধাবোটের উপরে গিয়া স্তূপীকৃত মালপত্রের মাঝে পথ খুঁজিয়া মালবাবুর কেবিনের কাছে যখন উপস্থিত হইলাম তখন দরজা বন্ধ থাকিলেও ভিতর হইতে আলো দেখা যাইতেছিল।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় দরজায় ধাক্কা দিয়া কোন সাড়া পাইলাম না। মালবাবুর নাম ধরিয়া আরো জোরে ধাক্কা দিতে অনেকক্ষণ পরে যখন দরজা খুলিল তখন রামপদবাবুর চেহারা দেখিয়া আমরা ত অবাক্। প্রথম আলাপের সময়কার সে প্রসন্নমূর্ত্তি আর তাঁহার নাই। ক্রোধ-বিকৃত-মুখে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ রুক্ষ কণ্ঠে তিনি বলিলেন,---'এ সময়ে আপনারা এখানে এসেছেন কেন ?'

অকস্মাৎ তাঁহার এত রাগের কারণ কি হইতে পারে বুঝিতে না পারিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। বিমল বলিল,---'আপনি রাগ করছেন কেন রামবাবু? সময়টা কি এমন খারাপ!'

গলা আরো চড়াইয়া রামপদবাবু বলিলেন,---'রাগ করছি কেন তার কৈফিয়ৎ আপনাকে দিতে হবে নাকি? যাত্রীদের এখানে আসার অধিকার নেই জানেন!'

বিমল চটিয়া গিয়া বলিল, 'আপনার অত মেজাজ দেখাবারই বা কি অধিকার আছে?'

'অধিকার আলবৎ আছে। না ব'লে কয়ে আমার বোটে কি জন্যে উঠেছেন? এটাও কি ষ্টীমার নাকি?'

'না, এটা লাট সাহেবের অন্দর মহল।' বিমল আরো কিছু বলিত কিন্তু তাহাকে জোর করিয়া টানিয়া আনিলাম। মালবাবুর রাগটা যতই অস্বাভাবিক হউক না কেন, আমরাও যে আমাদের অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করিয়াছি একথা অস্বীকারের উপায় নাই। এক্ষেত্রে ঝগড়া করিয়া লাভ নাই। বিমলকে সেই কথাই বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু তাহার রাগ সহজে যাইবার নয়। বলিল, 'মাথাটা ঐখানে গুঁড়ো ক'রে দিয়ে আসাই উচিত ছিল---এমন অভদ্র জানোয়ার ত কখনো দেখিনি। আমরা যেন ওর বোটে চুরি করতে গেছি।'

সে রাত্রিটা তাহার পর সাধারণভাবেই কাটিল। হাস্যধ্বনির মত কোন কিছু শুনিবার ক্ষীণ আশা মনের ভিতর ছিল। কিন্তু তাহা পূর্ণ হইল না।

সমস্ত রহস্যের কতকটা মীমাংসা সকাল বেলা হইল। মাতলার খাঁড়ির ভিতর দিয়া ষ্টীমার চলিতেছে। চারিধারে অর্দ্ধজলমগ্ন নাতিউচচ উদ্ভিদে সমাচ্ছন্ন ছোট ছোট দ্বীপ। অবজারভেশন ব্রীজ হইতে অদূরে সমুদ্রের বিশাল দিগন্ত-বিস্তৃত মরকতনীলকান্তি দেখা যায়। কয়েকটা শঙ্খচিল আমাদের ষ্টীমারের অনেকক্ষণ ধরিয়া সঙ্গ লইয়াছে। ষ্টীমারের পিছনে, প্যাড্‌লে আলোড়িত হইয়া যেখানে বিক্ষুব্ধ জলের স্রোত বহিয়া যাইতেছে, সেখানেই তাহাদের দৃষ্টি। তাহার উপর বার বার ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া তাহারা মাছ ধরিবার চেষ্টা করিতেছিল। বেলা পড়িবার সঙ্গে অনাবৃত ব্রীজে রোদের তাত বেশী লাগায় নীচে আসিয়া একধারের রেলিঙ্ ধরিয়া দাঁড়াইলাম। দেখিবার অবশ্য কিছু নাই। সামনে মালবাবুর বোট। অন্যমনে ষ্টীমার ও বোটের মাঝের জলের ব্যবধানটুকুর দিকে চাহিয়াছিলাম। জল বেশ ঘোলা, কিন্তু কোনপ্রকার আবর্জনা নাই। সে জল এত স্থির মনে হয় যে, শুধু সে দিকে চাহিয়া ষ্টীমারের কোন্ দিকে গতি বুঝিবার উপায় নাই। জলের উপর নিজের মাথার ছায়া দেখিয়া বুঝিয়াছিলাম ষ্টীমার সোজা পূবমুখে চলিতেছে।

হঠাৎ অবাক হইয়া গেলাম। আমার মাথার ছায়ার কাছে অপর দিক হইতে আর একটি মাথার ছায়া পড়িয়াছে।

সবিস্ময়ে মুখ তুলিয়া দেখিলাম গাধাবোটের স্তূপাকার গাঁটরির একটি ফাঁক হইতে একটি মেয়ে মুখ বাড়াইয়া আমারই মত জলের দিকে চাহিয়া আছে। আমার সহিত চোখাচোখি হইতেই মেয়েটি খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল কিন্তু সেখান হইতে নড়িল না।

এ হাসি চিনিতে দেরী হইল না। দেখিলাম হাস্যধ্বনি হইতে তাহার মুখ সেদিন নিতান্ত ভুল অনুমান করি নাই। মেয়েটির বয়স বছর পনেরো ষোলোর বেশী নয় অবশ্য, কিন্তু মুখ চোখ দেখিয়া তাহাও বোঝা সহজ নয়। চোখের দৃষ্টিতে, মুখের হাসিতে এমন একটি সারল্য আছে শিশুর মুখেও যাহা বেশী দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। হাসিটি অপরূপ হইলেও মেয়েটির মুখখানিতে কেমন একটি রুগ্ন ম্লানিমা আছে। রুক্ষ চুলের রাশ শীর্ণ মুখটিকে যেন অতিরিক্ত পাণ্ডুরতা দান করিয়াছে।

হাসির শব্দ শুনিয়া বিমলও আছে আসিয়াছিল। মেয়েটি তখনও স্মিতমুখে সরল কৌতূহলী দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চাহিয়া আছে। এই লজ্জাবোধের অভাব হইতে তাহার সারল্যের স্পষ্টতর প্রমাণ পাইলাম।

তাহার পর কী যে হইল বুঝিতে পারিলাম না। অস্ফুট ভয়ের শব্দ করিয়া হঠাৎ একেবারে পাংশু-বর্ণ হইয়া মেয়েটি মুখ সরাইয়া লইল। আশে

পাশে চাহিয়া এই আকস্মিক ভয়ের কোন কারণই খুঁজিয়া পাইলাম না।

দুপুর বেলা হঠাৎ মালবাবু দেখা করিতে আসিলেন। তাঁহার আবার এক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। গত রাত্রের ঘটনার জন্য তাঁহার লজ্জা ও অনুশোচনার অন্ত নাই। কি বলিয়া আমাদের নিকট হইতে তিনি যে ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন তাহা ভাবিয়া পাইতেছেন না। জীবনভর ঘা খাইয়াই মেজাজ তাঁহার বিগড়াইয়া গিয়াছে--- একটা মানুষের আর কত সহে। আর ভদ্রতার তিনি জানেনই বা কি। দিন রাত্রি কুলী খালাসীর সঙ্গে মিশিয়া তাহাদের সামিল হইয়া গিয়াছেন। কাল ঘুমের ভিতর হঠাৎ জাগিয়া উঠিতে হওয়ার দরুণই মাথাটা ঠিক ছিল না। আমরা যেন তাঁহার এ অপরাধ মার্জনা করি এবং মার্জনা যে করিয়াছি তাহা প্রমাণ করিবার জন্য রাত্রের আহারটা তাঁহার কেবিনেই সমাধা করি। বিনয়ের এই আতিশয্যে অভিভূত হইয়া বিশেষ কিছু বলিতে পারিলাম না। রামপদবাবু আরো বার কয়েক অনুরোধ করিয়া বিদায় লইলেন।

বিমল সমস্তক্ষণ চুপ করিয়াছিল। রামপদবাবুর বাক্য-স্রোতের মাঝে দু'একটা উত্তর আমি দিবার চেষ্টা করিয়াছি। এবার সে আমার দিকে চাহিয়া বলিল, 'ব্যাপারটা কিছু বুঝতে পারলে দাদা?'

বুঝিতে কিছু পারি নাই। ওই মেয়েটির সহিত রামপদবাবুর গতরাত্রের রাগ ও এদিনের অনুশোচনার যদি কোন সম্বন্ধ থাকে তাহা হইলে সে সম্বন্ধ আমার বুদ্ধির এখনো অগোচর। মেয়েটির আকস্মিক ভয়ও আমার কাছে দুর্ব্বোধ্য।

ষ্টীমারের সেকেণ্ড মেট অত্যন্ত ভাল লোক। বয়সকালে সে বারদরিয়ায় অনেক ঘুরিয়াছে, এখন আর পারে না। দেশ হইতে দূরে থাকিতে ভালও লাগে না, তাই এই নদীর কাজ লইয়াছে। বুড়া প্রথম দিনই আমাদের কাছে একজোড়া ভাল শীতলপাটি অত্যন্ত সস্তায় বিক্রী করিবার প্রস্তাব করিয়াছিল। এমন খাঁটি জিনিষ আজকাল নাকি পাওয়া যায় না। পাটি ক্রয় করিতে পারি নাই কিন্তু আলাপ জমিয়া গিয়াছিল।

আজ আবার তাহাকে ধরিয়া বসিলাম। কথায় কথায় মালবাবুর কেবিনের রহস্যের কথা উঠিল। আশ্চর্য্যের বিষয় সেখানে যে একটি মেয়ে আছে এ কথা বুড়া প্রথমতঃ স্বীকার করিতেই চাহিল না। আমরা নিজের চক্ষে দেখিয়াছি বলার পর খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'তা হবে বাবু, আমরা জানি না। নিজের কাজকর্ম্ম নিয়েই থাকি, আমাদের ফুরসৎ কই?'

বাধ্য হইয়া শীতলপাটিটা ক্রয় করার প্রস্তাবটা আবার করিলাম। সেকেণ্ড মেট এবার একটু নরম হইল বোধ হয়। কিন্তু শীতলপাটি ক্রয় করিবার প্রস্তাবেও বেশী কিছু সে জানাইতে পারিল না। মালবাবুর স্ত্রী বহু দিন আগে আত্মহত্যা করিয়া মরিয়াছিল, না গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছিল এমনি একটা কথা সে শুনিয়াছে। এই মেয়েটি মালবাবুরই কন্যা। গত বৎসর হইতে তিনি ইহাকে সঙ্গে লইয়া ফিরিতেছেন। মেয়েটিকে ষ্টীমারেও মালবাবু বাহির হইতে দেন না। ভদ্রলোক কোন আরোহী থাকিলে তাহাকে ত দেখাই যায় না। মেয়েটি খুলনার জেটিতে যেবার ষ্টীমার হইতে লাফ দিয়া পলাইবার চেষ্টা করে, মাত্র সেইবার সে ভাল করিয়া মেয়েটিকে দেখিয়াছে। ইহার বেশী কিছু সে জানে না।

বিমল জিজ্ঞাসা করিল, 'মেয়েটি পালাতে চেয়েছিল কেন?'

'তা কি জানি বাবু! মালবাবুর নসীব নেহাৎ মন্দ, নইলে একটা মেয়ে, সেও অমন হয়', বলিয়া সেকেণ্ড মেট আবার তাহার পাটির গুণব্যাখ্যা আরম্ভ করিল। তাহার নিকট হইতে আর কিছুই বাহির করা গেল না।

সমুদ্রের দিকে আবার পিছু ফিরিয়া সুন্দরবনের গভীর অংশের ভিতর দিয়া আমরা চলিয়াছি। এখানে সঙ্কীর্ণ নদীপথ। একটু এদিক ওদিক হইলেই মনে হয়, ষ্টীমার পাড়ে লাগিয়া যাইবে। সূচিভেদ্য অন্ধকারের ভিতর সার্চলাইটের আলো শাণিত তরবারির মত এক পাড় হইতে অন্য পাড়ে

ঘুরাইতে ঘুরাইতে ধীরগতিতে ষ্টীমার চলিয়াছে। উপর হইতে সারেঙের আদেশের ঘণ্টা ক্ষণে ক্ষণে বাজিয়া উঠিতেছে। দুপাশে দুর্ভেদ্য গরান সুঁদরির জঙ্গল। তাহার উপর সার্চলাইটের আলো পড়িবামাত্র মন আপনা হইতেই উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠে---মনে হয় এই ক্ষণিক আলোয় অরণ্যের কি যে ভীষণ রহস্য আমাদের চোখের উপর এখনি উদ্‌ঘাটিত হইবে। আসলে কিছু তেমন না হইলেও সমস্তক্ষণ গা কেমন ছম ছম করিতে থাকে। অরণ্যের এই গোপন নির্জন প্রদেশে আমরা যে অনধিকার প্রবেশ করিয়া ক্ষমাহীন অপরাধ করিয়াছি। মনে হয় ষ্টীমারের আওয়াজের ভিতরেও বিশাল অরণ্য-ভূমির কেমন একটা ক্ষুব্ধ আক্রোশের গুমরানি শোনা যায়। সমস্ত দেহমন তাহাতে অস্পষ্ট আশঙ্কায় আড়ষ্ট হইয়া পড়ে।

আজ রাতে আর লাফাইয়া মালবাবুর বোটে উঠিতে হইল না। একজন খালাসী আমাদের অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া গেল। সামান্য গাধাবোটের ভিতরও মালবাবুর ঘরটি দেখিলাম নিতান্ত মন্দ নয়। গৃহের সমস্ত উপকরণই সেখানে আছে।

কাঠের মেঝের উপর সতরঞ্চি পাতা ছিল। সেখানেই রামবাবু বসিতে বলিলেন। ঘরের চারিদিকে চাহিয়া দেখিতেছিলাম। আমাদের সামনেই একটি দরজা চোখে পড়িল। পাশে আরো একটি ঘর তাহা হইলে আছে। কিন্তু সে ঘরের দরজার এদিক হইতে খিল দেওয়া।

রামবাবুকে আজ কেমন যেন বিচলিত মনে হইতেছিল। আহারের যোগাড় নিজেই করিতে করিতে মাঝে মাঝে অসংলগ্ন দু'একটি কথা বলিতেছিলেন। আমাদের মনও স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল না, আলাপ জমিতেছিল না বোধ হয় সেই জন্যই।

বন্ধ দরজার ওধারে কি একটা শব্দ হইল একবার। রামবাবু একটু যেন চমকাইয়া উঠিলেন। আমরাও উৎকীর্ণ হইয়া উঠিয়াছিলাম।

রামবাবু হঠাৎ অন্য কথা পাড়িলেন। এখন আমরা যেখান দিয়া চলিয়াছি এত গহন জঙ্গল সুন্দরবনে নাকি খুব কম স্থানেই আছে। দিনের বেলা কখন কখন ষ্টীমার হইতেই এখানে বাঘ দেখা গিয়াছে। একবার একটা বাঘ নদী পার হইবার সময় ষ্টীমারের সামনে পড়িয়া কি রকম নাকাল হইয়াছিল তাহার গল্পও তিনি করিলেন।

সহজ হইবার চেষ্টা করিলেও বুঝিতে পারিতেছিলাম, রামবাবুর মন অস্থির হইয়া আছে।

আহার করিতে বসাইয়া রামবাবু প্রথম তাঁহার কন্যার কথা উল্লেখ করিলেন। বলিলেন, 'আপনাদের জন্য কিছুই করতে পারলাম না। মেয়েটার আজ অসুখ, উঠতে পারছে না, নইলে তার হাতের রান্না খেয়ে খুসী হতেন।'

বিমল আসনের উপর হইতে হাত গুটাইয়া বসিয়াছিল। হঠাৎ তাহার কথায় চমকাইয়া উঠিলাম। 'আপনি মিথ্যে কথা বলছেন রামবাবু।'

একটি কথায় ঘরের ভিতর কি যে পরিবর্ত্তন হইয়া গেল তাহা বোঝান কঠিন।

রামবাবুর মুখ একেবারে দেখিলাম ছাইএর মত সাদা হইয়া গিয়াছে। অস্ফুট স্বরে বলিলেন--- 'মিথ্যে কথা। কেন?'

বিমল দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, 'হ্যাঁ, মিথ্যে কথা, আপনার মেয়ের অসুখ করেনি।'

রামবাবু মাথা নীচু করিয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন। বিমল বলিতে লাগিল, 'আপনার মেয়েকে আপনি ঘরে বন্ধ ক'রে পায়ে শেকল দিয়ে রেখেছেন। শুধু এখন নয়, এ রকম ভাবে শেকল দিয়ে তাকে অনেক সময়েই আপনি রাখেন।'

এবার আমিই প্রতিবাদ করিলাম---'কি বলছ বিমল?'

'ঠিকই বলছি, কাল থেকেই আমার কি রকম সন্দেহ ছিল। আজ সন্ধ্যায় আমি নিজে গাধাবোটের ধার দিয়ে ঘুরে গোপনে দেখে গেছি। ঘর অন্ধকার হ'লেও পায়ের শেকল দেখতে আমার ভুল হয়নি।'

রামবাবু এতক্ষণের মধ্যে একবারও মাথা তোলেন নাই। একবার কাতরভাবে আমাদের দিকে চাহিয়া কি যেন বলিতে চাহিলেন। বিমল তাঁহাকে সুযোগ দিল না।

তীব্র কণ্ঠে সে বলিল, 'আর মিথ্যে কৈফিয়ৎ তৈরি করবার চেষ্টা করবেন না। আমরা সবই

বুঝতে পেরেছি। আপনার মত পিশাচকে ডাল-কুত্তা দিয়ে খাওয়ালেও উপযুক্ত শাস্তি হয় না। আপনার স্ত্রী আত্মহত্যা ক'রে আপনার উৎপীড়ন থেকে বেঁচেছে। আপনার অসহায় মেয়ে পালাবার চেষ্টা ক'রে বিফল হয়েছে, হয়ত শেষ পর্য্যন্ত তাকে'ও মার পথ নিতে হবে।'

স্তব্ধ হইয়া বিমলের কথা শুনিতেছিলাম। রামবাবুর বহু রেখাঙ্কিত কাতর মুখের দিকে চাহিয়া সত্যই বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলাম না যে, সে মুখের পিছনে এত বড় পৈশাচিক মন আত্মগোপন করিয়া আছে। ভাবিতেছিলাম, নিজের স্ত্রী ও নিজের কন্যাকে এভাবে যন্ত্রণা দিবার কি হেতু তাঁহার থাকিতে পারে। ইহা যদি তাঁহার অহেতুক বিলাস হয় তাহা হইলে সত্যই তাঁহার পৈশাচিকতা আমাদের ধারণার অতীত।

বিমল বলিতেছিল, 'এই নির্জন নদীপথে মানুষের দৃষ্টি এড়িয়ে গোপন থাকার সুবিধে আপনি অনেকদিন পেয়েছেন। কিন্তু এবার আর নিষ্কৃতি নেই জানবেন।'

রামবাবু হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলাম তাঁহার মুখ হইতে পূর্ব্বের সেই গাঢ় ছায়া অনেকটা সরিয়া গিয়াছে। নিজেকে তিনি যেন ইতিমধ্যে শান্ত করিয়াছেন। এবার তিনি কি করিবেন বুঝিতে না পারিয়া আমরাও সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। কেবিনের দেওয়াল হইতে বাতিটা পাড়িয়া লইয়া বন্ধ দরজার দিকে অগ্রসর হইয়া রামবাবু বলিলেন, 'আসুন'।

তাঁহার এই আকস্মিক আচরণে বিমলও কেমন বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল। আমরা নীরবে তাঁহাকে অনুসরণ করিলাম।

দরজা খুলিয়া যে ঘরে রামবাবু প্রবেশ করিলেন আকারে সেটি অত্যন্ত ছোট। লণ্ঠনের আলোয় দেখা গেল, আসবাবপত্র সেখানে কিছুই নাই এবং সত্যই কাঠের মেঝের একটি শিকলের সহিত বদ্ধ হইয়া মেয়েটি সেখানে বসিয়া আছে।

আমাদের দেখিয়াই মেয়েটি উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল। সেই অপরূপ হাসি। রামবাবু নত হইয়া তাহার শিকলটাই বুঝি খুলিতে গেলেন।

সহসা আমাদের স্তম্ভিত করিয়া মেয়েটি তাঁহার হাত কামড়াইয়া ধরিল। আহত হাত অতি কষ্টে ছাড়াইয়া তাহার শিকল খুলিয়া রামবাবু যখন সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন তখন তাঁহার ক্ষতস্থান হইতে রক্ত পড়িতেছে।

কিন্তু তাঁহার আহত হাতের চেয়ে বিস্ময়কর দৃশ্য তখন আমাদের বিহ্বল করিয়া দিয়াছে। শিকল খোলা হইতেই আবার খিল খিল করিয়া হাসিয়া মেয়েটি একদিকের দেওয়ালে ভর দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। এ পর্য্যন্ত তাহার মুখটুকুই দেখিয়াছি। লণ্ঠনের আলোয় তাহার সম্পূর্ণ চেহারা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। সৃষ্টির পরমাশ্চর্য্য নারীদেহ লইয়া প্রকৃতির ইহার চেয়ে নিষ্ঠুর পরিহাস বুঝি আর হইতে পারে না। কোমল এবং প্রায় স্বাভাবিক মুখখানির জন্য বিকলাঙ্গ দেহের বীভৎস ছন্দহীনতা আরো যেন অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। বুঝিলাম, তাহার চোখে সরলতা বলিয়া যাহা ভুল করিয়া-ছিলাম তাহা মনের মহাশূন্যতার আভাস মাত্র। কণ্ঠের অপরূপ হাসি দিয়া নির্ম্মম বিধাতা তাঁহার সৃষ্টি-বিভীষিকার উপর ব্যঙ্গের চরম ছাপ রাখিয়াছেন।

বিমল সহসা অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহার পর দ্রুতবেগে ঘরের বাহিরে গিয়া তীব্রস্বরে যেন আর্ত্তনাদ করিয়া বলিল, 'চলে এস, শীগ্‌গির চলে এস---এ আর দেখা যায় না।'

মেয়েটি শূন্যদৃষ্টিতে তখনও আমাদের দিকে তাকাইয়া আছে। আমাকে বাহিরে লইয়া গিয়া রামবাবু দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। নিঃশব্দে আমরা আবার আসনে গিয়া বসিলাম।

খানিকক্ষণ সব চুপচাপ ছিল। হঠাৎ ভিতর হইতে মেয়েটি দরজার উপর তাহার সমস্ত শক্তি দিয়া আঘাত করিতে লাগিল। হঠাৎ সে আস্ফালন শুনিলে মনে হয় হিংস্র কোন পশুকে বুঝি পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। এ তাহারই ক্ষুদ্র আক্রোশের পরিচয়।

রামবাবুর চোখ দেখিলাম অশ্রুসজল হইয়া আসিয়াছে। বলিলেন, 'ওই জন্যেই মাঝে মাঝে

শেকল দিয়ে রাখতে হয়। ছাড়া থাকলে এ সময় জলে ঝাঁপ দিয়েও পড়তে পারে।'

মেয়েটি খানিক এইভাবে আস্ফালন করার পর শ্রান্ত হইয়াই বোধ হয় চুপ করিল। বিমল অনুতপ্ত কণ্ঠে বলিল, 'আমায় ক্ষমা করুন রামবাবু!'

রামবাবু বিষণ্নমুখে বলিলেন, 'আপনার দোষ ত' কিছু নেই বিমলবাবু। আপনি একটু ভুল বুঝেছিলেন মাত্র। কিন্তু আমায় সামান্য যে ভর্ৎসনা করেছেন তার চেয়ে অনেক বেশী আমার প্রাপ্য। বিধাতার কাছে সেই পাওনা মিলছেও আজ পনেরো বছর।'

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া রামবাবু আবার বলিলেন, 'নিজের সন্তানের এই রূপ দিনের পর দিন দেখার যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে উন্মাদ হয়ে আমার স্ত্রী আত্মহত্যা করে। সে রেহাই পেয়েছে কিন্তু আমার মুক্তি নেই। সংসারের মাঝে ওকে নিয়ে প্রতিদিন মানুষের কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে থাকা একেবারে অসহ্য। এই ষ্টীমারে ত নিজের যন্ত্রণা নিয়ে নির্জনে থাকতে পাই। খালাসীদের কাছে আমার তেমন সঙ্কোচ নেই---তাদের কৌতূহল পরিমিত। তারা অভ্যস্ত হয়ে গেছে। আপনাদের মত আমার সমকক্ষ লোকদেরই আমার ভয়।'

রামবাবু থামিলেন। ভিতরে মেয়েটি আবার অশান্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাহাকে দরজার বাহির হইতে বার দুই ধমক দিয়া একটু শান্ত করিয়া আসিয়া রামবাবু আবার তাঁহার কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সমশ্রেণীর কোন যাত্রী ষ্টীমারে উঠিলে তাঁহার উদ্বেগের সীমা থাকে না। তাহাদের কৌতূহলী দৃষ্টি হইতে প্রাণপণে তিনি মেয়েটিকে আড়ালে রাখিবার চেষ্টা করেন। তাহার দিকে কেহ ঘৃণাভরে তাকাইতেছে একথা ভাবিলে তাঁহার যন্ত্রণা দ্বিগুণ হইয়া উঠে।

'ও যে আমারি অপরাধের প্রত্যক্ষ শাস্তি তা জানি। কিন্তু নিজের প্রায়শ্চিত্তকে সাধারণের চোখের সামনে প্রকাশ ক'রে রাখার শক্তি আমার নেই।'---রুদ্ধ গলায় শেষ কথাগুলি বলিয়া রামবাবু দুই হাঁটুর ভিতর মাথা গুঁজিয়া চুপ করিলেন।

স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলাম---করুণায় নয়, হতাশায়।

জনহীন শ্বাপদ-সঙ্কুল গহন অরণ্যের ভিতর দিয়া তখন ষ্টীমার চলিতেছে। সে অরণ্য ভয়ঙ্কর, কিন্তু মনে হইল মানুষের মনের অরণ্য রহস্য-বিভীষিকায় তাহাকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে।

পাপ করিতে পারে এত বড় অহঙ্কার ত পশুর নাই।

অর্থহীন এ দুর্ব্বল দম্ভ শুধু মানুষের। মনের গহন অন্ধকারে এ দম্ভের নিরর্থক নিদারুণ শাস্তিও তাই তাহার একার।

দুর্লঙ্ঘ্য

বিনয়বাবু আমার কথায় একটু হাসলেন ; তার পর সামনের দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে বল্লেন---তোমার কথাটা একেবারে ভুল নয়। আজকালকার ছেলেমেয়েরা জীবনের স্বরূপ যেন জেনে নিয়েই আসে, তাদের মনে কোন ভ্রান্তি, কোন মরীচিকা-মোহ নেই। কিন্তু তা' ব'লে ট্র্যাজিডিকে তারা এড়িয়ে যেতে পারে মনে করো না। আমাদের ছিল স্বপ্নভঙ্গের আকস্মিক আঘাত, আর তোমাদের হচ্ছে, মন্থর অবিরাম প্রাত্যহিক নিরাশার ট্র্যাজিডি। যদি তুলনা করতে চাও তা হ'লে বলব, আমাদেরই ছিল শ্রেয়।

সামনের জানালা দিয়ে বন্ধুর উপত্যকার পারে পাদপহীন পর্ব্বতের রুক্ষ ধূসর রেখা দেখা যাচ্ছে। ওই রেখাটুকুই এখানকার প্রকৃতির কঠোরতাকে যথেষ্ট স্পষ্ট ক'রে তুলেছে। বাড়ীর পেছনের দিকে বিশাল খনির উদ্ধত যন্ত্র-দানব আকাশের দিকে আস্ফালন ক'রে উঠে সমস্ত নিসর্গ দৃশ্যকে কি রকম ভয়াবহ ক'রে তুলেছে তা না দেখতে পেলেও ক্ষতি নেই। সে দিকে চাইলেই মনে পড়ে বাঙ্গলার সরল মাটি ছাড়িয়ে অনেক দূরে আমরা প্রবাসী, নইলে ঘরের ভেতর কোন আরামের উপকরণের অভাব নেই। বাঙ্গালীর ঘরের একটি নিজস্ব শ্রীও সেখানে আছে। দেখে কে বুঝবে যে, এটি চিরকুমার এক প্রৌঢ়ের দীর্ঘ বিশ বৎসরের আশ্রয় মনে হয় যেন মেয়েদের হাতের কল্যাণ-চিহ্ন ঘরটির সব জায়গায় পরিস্ফুট।

বন্ধ্যা রুক্ষ মাটির দেশে আমরা দুটি মাত্র বাঙ্গালী, একত্র হয়েছি জীবিকা অন্বেষণের প্রয়োজনে। বিনয়বাবু এখানকার ডাক্তার, আমি নিম্নপদস্থ ইঞ্জিনিয়ার। আমার সম্বন্ধে জীবিকা অন্বেষণের কথাটা সম্পূর্ণভাবে সত্য কিন্তু বিনয়বাবু সম্বন্ধে সে কথা ঠিক বলা চলে কি না সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আমার এক এক সময়ে মনে হয়, বিনয়বাবু জীবিকা অর্জনের জন্যে এই সুদূর স্বজনহীন প্রবাস বেছে নেন নি---বেছে নিয়েছেন আত্মগোপনের প্রয়োজনে, ---জীবনের অবিস্মরণীয় কোন ঘটনাকে একান্ত গোপন মনে লালন করবার অভিপ্রায়ে।

বিদেশে আমরা দুটি মাত্র বাঙ্গালী, বয়সের পার্থক্য অনায়াসে ভুলে মিলতে পেরেছি। বিনয়বাবু অতি সহজে আমার কাছে নিজেকে উন্মুক্ত করেছেন। বার্দ্ধক্যকে সমীহ করার প্রয়োজনে আমায় আড়ষ্ট থাকতে হয় নি।

বিনয়বাবুকে'ও নিজেকে আমার বয়সের স্তরে নামবার জন্য যে বিশেষ চেষ্টা করতে হয়েছে তা মনে হয় না। বিনয়বাবু বৃদ্ধ হয়েছেন খালি বয়সেই---মাথার চুলের শুভ্রতাই তাঁর বয়সের একমাত্র সাক্ষ্য, নইলে দেহ 'ও মনে কোথাও তাঁর কোন ভাঁজ পড়েছে ব'লে বোঝা যায় না।

বন্ধ্যা দেশের শুষ্ক হাওয়াই তাঁকে এমন সজীব রেখেছে কি না কে জানে।

বিনয়বাবুর পরিচয় দিতে গিয়ে গল্পের ভূমিকা প্রায় ক'রেই ফেলেছি---এবার আসল ধারায় নেমে এলেই হয়।

বিনয়বাবুর কথায় বললাম---আমি ত 'ওই কথাই বল্‌ছি। আপনাদের সময়ে মরীচিকা মিলিয়ে যাবার আগে পর্য্যন্ত তবু আপনারা কল্পনার স্বর্গে নিশ্চিন্ত আরামে থাকতে পেতেন, আমাদের

আগাগোড়াই হতাশা। জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাবার প্রায়শ্চিত্ত আমাদের প্রতিদিনই করতে হচ্ছে।

বিনয়বাবু বললেন---অবশ্য যাকে জ্ঞানবৃক্ষ বলছ, সে যদি সত্যি জ্ঞানবৃক্ষ হয়। স্বষ্টিটা দুঃখবাদের উদাহরণ নাও হ'তে পারে।

আমি একটু হাসলাম, বল্লাম---আপনি নিজের প্রতিবাদ করছেন।

---করছি? তা করছি বটে! এক এক সময়ে করতেও ইচ্ছে করে। জ্ঞান যতই নির্ভুল ও সম্পূর্ণ হোক তাতে সান্ত্বনা ত নেই! তার চেয়ে মরীচিকাও যে ক্ষণিক হ'লেও ঢের সুখের। এক এক সময়ে নিজেকে প্রবঞ্চনা করার লোভ দুর্নিবার হয়ে ওঠে।

চুপ ক'রে ছিলাম। বিনয়বাবু আবার বল্লেন---কিন্তু যাই বল, আমাদের সে মোহের যুগে পৃথিবীতে রঙ্ ছিল, রেখার বৈচিত্র্য ছিল। তোমরা মোহ-মুদ্গর দিয়ে সব সমতল ক'রে ফেলেছ---সব এক-রঙা। তোমাদের যুগ নিয়ে আর গল্প হয় না।

হেসে বল্লাম---আপনাদের যুগের একটা গল্প শুনি না।

বিনয়বাবু আমার দিকে চেয়ে একটু হেসে বল্লেন---নেহাৎই শুনবে? বল্‌তে আমার অবশ্য আপত্তি নেই। তবে সেই একঘেয়ে ট্র্যাজিডি।

তা ত জানি। তবু বলুন না।

বিনয়বাবু বাইরের দিকে চেয়ে বল্লেন---গল্প একালের নয়, এদেশেরও নয়, কিন্তু একালের না হোক, এদেশেরই বুঝি হওয়া উচিত ছিল। এমনি শুক্‌নো রুক্ষ তার রূপ, কোথাও সরসতা নেই, শুধু কাঠিন্য। তা ছাড়া আমি গুছিয়েও বল্‌তে পারব না বোধ হয়। তবু শোন।

তারপর একটু চুপ ক'রে থেকে বিনয়বাবু আবার আরম্ভ করলেন: সে যুগের কথা খুব সুন্দর নয় কিন্তু তবু তোমরা তার কিছুই জান না। তোমরা সে যুগের কথা বইয়েই পড়েছ। হয়ত মনে কর, সব তোমরা বোঝ কিন্তু আসলে সে যুগের বাঙ্গলার কিছুই তোমরা জান না। বাঙ্গলা দেশের উনবিংশ শতাব্দী আর বিংশ শতাব্দীতে এমন একটা তফাৎ আছে যে, আমার এক এক সময় মনে হয় এদুটোর ব্যবধান মাত্র এক সেকেণ্ড নয়---একটা গোটা শতাব্দী। এই দেখ, বৃদ্ধ বয়সের যা দোষ গল্প বল্‌তে বসে সেই বাচালতাই কর্‌ছি।

তোমাদের কাছে চিন্তার স্বাধীনতা একটা স্বাভাবিক স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার---এতে তোমরা আশ্চর্য্যও হও না, কোন থ্রিলও পাও না, কিন্তু আমরা তখন সবে মনের খোলসে ঠোকর মেরে একটু আধটু ফুটো করেছি, ঠোকর মারাতেই আমাদের ছিল রোমাঞ্চ! আমাদের মনে তার নিজস্ব একটা মোহ ছিল। দোকানে লুকিয়ে চা খেয়েই আমাদের বুক ভরে উঠত গর্ব্বে, ফাউল খেতে পারলে নিজেকে আমরা নেপোলিয়ানের সমান মনে করতাম! ধুতির বদলে প্যাণ্ট পরা আমাদের কাছে ছিল দিগ্বিজয়ের সমান। তোমরা এখন এসব শুনে হয়ত হাসবে---কিন্তু সে যুগের আবহাওয়া তোমরা জান না তাই।

পুরুষের বেলায় যখন এই, তখন মেয়েদের ব্যাপারটা বোধ হয় আঁচ কর্‌তে পারো। দশের জায়গায় চৌদ্দ পর্য্যন্ত রেখে যে বাপ মেয়ের বিয়ে দেয়, সে একটা মস্তবড় সংস্কারক। কথামালা ছাড়িয়ে যে মেয়ে ইংরেজী ফাষ্ট বুক ধরে তার মর্য্যাদা ও নিন্দার অবধি নেই।

সেই যুগে সূর্য্যকান্ত ব'লে একটি ছেলে নলিনী ব'লে একটি মেয়েকে ভালবেসেছিল।

আমি একটু হাসলাম।

বিনয়বাবু সেটুকু লক্ষ্য ক'রে বল্লেন---আচ্ছা, আচ্ছা, বকলম আর চালাব না। তোমরা এ যুগের ছেলে, সন্দেহ তোমাদের ঘোচান কঠিন। তা ছাড়া সূর্য্যকান্ত নামটাও বড় কটমট। বার বার উচ্চারণ করলে গল্পের রস ভঙ্গ হবার সম্ভাবনা। কিন্তু নলিনী নামটা থাক।

আমি মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম।

আমিই ভালবেসেছিলাম নলিনী ব'লে একটি মেয়েকে। তের চৌদ্দ বছরের মেয়েকে ভালবাসার কথা শুন্‌লে তোমাদের আবার হাসি পাবে হয় ত। কিন্তু আমি তোমায় বল্‌ছি, সে যুগে তা সম্ভব ছিল। বঙ্কিমবাবুর রাধারাণীর বয়স কত ছিল জান? প্রথম সংস্করণে বোধ হয় ছিল দশ এগার। পরের

সংস্করণে বদলেছিলেন কিন্তু বারোর বেশী বাড়াতে পারেন নি।

যাক্, নলিনী মেয়েটির কথাই বলি। নলিনী সে যুগের মেয়েদের অগ্রবর্ত্তিনী। তার বাবা ব্রাহ্ম না হয়েও ছিলেন সে যুগে অত্যন্ত অগ্রসর। নলিনী জানালা-সার্সি বন্ধ করা ছ্যাকরা গাড়ী ক'রে প্রত্যহ মেয়েদের স্কুলে গিয়ে সমস্ত পাড়ার জিহ্বার খোরাক জোগাত।

বল্‌তে পার অবশ্য কি সুযোগ ছিল সে যুগে প্রেমের। কিন্তু প্রেমের জন্যে কতটা সুযোগের দরকার হয়? ওপারে ওরা দেহ-সংলগ্ন হয়ে নাচবার সুযোগ পেয়ে অক্ষত হৃদয় নিয়ে সারা জীবন কৌমার্য্যে কাটিয়ে দেয়, আবার নদীর জলে চুলের ছায়া দেখেও এককালে রাজপুত্রেরা পাগল হ'য়ে যেত। সে রাজপুত্রেরা রূপকথাতেই বন্দী হয়ে আছে মনে করো না।

তাছাড়া নলিনীর সঙ্গে আমার দেখা হবার সুযোগের অভাব কি? বিশেষ ক'রে আমি ছিলুম তাদের জ্ঞাতি এবং সে যুগের সংস্কারকে জয় ক'রে মেডিক্যাল কলেজে মড়া কাটার বিদ্যে শিখতে সাহস করেছিলাম ব'লে তার বাবার অত্যন্ত প্রিয়।

আজকের দিনে থিয়েটার, বায়স্কোপ, একজিবিশন তোমাদের যে সুযোগ দেয়, আমাদের যুগে তাই দিত বিয়ে-বাড়ী। বিয়ে-বাড়ীতে সেকালেও ছিল অবাধ গোপন মিলনের সুযোগ ও স্বাধীনতা। পরিবারের বিবাহ, উপনয়নের মত শুভকর্ম্ম নিত্য হয় না বটে, কিন্তু তা'তে কি আসে যায়---হৃদয় বিনিময়ের পক্ষে একটি মুহূর্ত্তই যথেষ্ট।

না, নীরব প্রেমনিবেদন আমার ছিল না---প্রতিদানহীন ব'লেও আমার ধারণা নয়।

বিবাহের উৎসবের রাতে পরিত্যক্ত ছাদের অন্ধকার আলসের ধারে আমি এসে দাঁড়িয়েছি---সমস্ত বাড়ীতে হাওয়া না পেয়ে নলিনীও উঠে এসেছে অন্যমনস্কভাবে ছাদের ওপর। এধারে এমন কিছু গাঢ় নয় যে কিছু দূরে মানুষ আছে কি না বোঝা যায় না, তবু বিশ্বাস করতে হবে যে, নলিনী আমায় দেখতে না পেয়েই আমার অত্যন্ত কাছ ঘেঁসে এসে দাঁড়িয়েছে, তখনকার জম্‌কালো, জরীতে ভারী বেনারসী শাড়ীটি গুছিয়ে প'রে।

আমি সামনের অন্ধকারের দিকে চেয়ে বলেছি---বাবা! নীচে কি গণ্ডগোল! টেকা যায় না!---এবং নলিনী সে স্বরে চমকে উঠে বলেছে,---ওমা, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আছ! কখন থেকে?

এই ত এলাম---ব'লে আমি সান্নিধ্যের উত্তেজনায় একটু কেঁপে উঠেছি। সদ্য পেটিকামুক্ত বেনারসী শাড়ীর অপূর্ব্ব গন্ধের নেশায় মাথায় আমার ঘোর লেগেছে।

তারপর আর কথা নেই।

নলিনী খানিক বাদে বলেছে---মাগো! ওইটুকু মেয়ের কি ক'রে বিয়ে হচ্ছে! আমি হ'লে কক্ষণ বিয়ে করতাম না।

রাঙা টুক্‌টুকে একটি বর হ'লেও না?

আমার বয়ে গেছে! অমন মাকাল ফল আমার চাই না।

আর এরকম নিষ্ফল হ'লে!---(অনুপ্রাস দেখে অবাক হয়ো না, দাশুরায় তখন আমাদের মন থেকে মরেনি)।

নলিনী বলেছে---ধ্যেৎ!

লক্ষ্য করলে বোধ হয় যে, আমাদের প্রেমের আলাপেও ছিল তখন সে যুগের সংস্কার-উন্মাদনার প্রভাব। তোমাদের যা গা সওয়া হয়ে গেছে আমরা তখন নতুন স্বাদ পেয়ে জাগরণে নিদ্রাতেও তা ভুলতে পারছি না।

এমনি প্রেমের চিত্র বেশী দেখবার আশা রেখো না---আমি সে আশা মেটাতে পারব না। বেশী পেড়াপীড়ি করলে মিথ্যে বানিয়ে বল্‌তে হবে। বুঝতেই ত পারছ যে তের বছরের মেয়ে আর আঠারো উনিশ বছরের ছেলে তখনকার বাধার ভেতর যা প্রেম করতে পারে, তা' নিয়ে চমকপ্রদ তেমন কোন পূর্ব্বরাগের ছবি তৈরী হ'তে পারে না, যাতে বুদ্ধিদীপ্ত বাণী করবে ঝলমল, ভাবাবেগের সমুদ্র উঠবে দুলে। তের বছরের মেয়ে কটা কথাই বা জানে? আর যা জানে তার কটাই বা বল্‌তে পারে গুছিয়ে। তোমায় ব্যাপারটা অনুমান ক'রে নিতে হবে।

কিন্তু তাই ব'লে প্রেম আমাদের কিছু কম গভীর মনে করো না, মৌন হ'লেও সে অতল।

আমি তখন ভবিষ্যতের কি সব অপরূপ স্বপ্নই দেখছি নলিনীকে কেন্দ্র ক'রে। স্বপ্নই বা তাকে বলি কেন। ভাগ্যকে তখন আমি মনে মনে ভাবী জীবনের ফরমাজ দিয়ে ফেলেছি, সে ফরমাজ যে অক্ষরে অক্ষরে পালিত হবে সে সম্বন্ধে আমার কিছু মাত্র সন্দেহ নেই। আগামী যুগের আমরা অগ্রদূত---প্রগতির বার্ত্তা বহন ক'রে চলব এগিয়ে! পৃথিবী তখন আমাদের কেন্দ্র ক'রে আবর্ত্তিত হ'তে সুরু করেছে।

নলিনী কি স্বপ্ন দেখেছিল সেই জানে, কিন্তু আমার থেকে বিশেষ তার তফাৎ ছিল ব'লে মনে হয় না।

এইবার গল্পকে আমি তিন চারটে বছরের উপর দিয়ে চোখ-কাণ বুজে টেনে নিয়ে যাব। এখানে রইল তোমার কল্পনার অবসর। তুমি ইচ্ছামত বিবরণে এটি ভরিয়ে নিতে পার। শুধু মনে রেখো, মরা মানুষের বুকের সমস্ত তথ্য জেনেও জীবিত মানুষের হৃদয় সম্বন্ধে আমি হতাশ হইনি এবং নলিনীও তার পাঠ্য পুস্তকে সৃষ্টির মূলে বিষ আছে এমন কোন তথ্য পায়নি। আমরা পরস্পরের আরো কাছে ঘেঁসে এসেছি এবং স্বপ্ন আমাদের তখন বর্ণবাহুল্যে আরো ঘোরালো হয়ে এসেছে।

এমন সময়ে ডাক্তারী পরীক্ষায় আমি হ'লাম সসম্মানে উত্তীর্ণ এবং সুদূর পশ্চিমে মোটা মাইনের এমন একটা চাকরীর সুযোগ পেলাম যা ইতিপূর্ব্বে নাকি কোন নেটিভের ভাগ্যে জোটেনি। নলিনীর বাবাই উৎসাহ দিয়ে আমায় পাঠিয়ে দিলেন। বাঙ্গালীর নাকি এমনি দুঃসাহসী হবারই বিশেষ প্রয়োজন আছে। প্রেম ও কর্ত্তব্য দুইএর মাঝে পড়ে কর্ত্তব্যের টানে ও নলিনীর বাবার উৎসাহে আমি চলে গেলাম এমন সুদূর এক জায়গায়, যেখানে সে সময়ে বৃথা অপব্যয়ের আশঙ্কায় লোকে চিঠি পাঠাতে পর্য্যন্ত সাহস করত না।

গল্প অত্যন্ত মামুলি প্রণালীতে চলেছে কিন্তু সে আমার দোষ নয়।

সে সুদূর প্রবাস থেকে চেষ্টা চরিত্র ক'রেও বছর দুয়েকের আগে আমি ফিরতে পারলাম না। কিন্তু ফিরতে না পারলেও মনে আমার কোন আশঙ্কা ছিল না। নলিনীর বাবার সাহস ও মানসিক সরলতায় আমার ছিল অটুট বিশ্বাস। আর যেই টলুক---মানুষের জিহ্বা সঞ্চালনে তিনি যে টলবেন না এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ ছিল না। কিন্তু হায় মানুষের মন!

দু' বছর বাদে ফিরে এসে দেখলাম, দুনিয়ায় অপ্রত্যাশিত সব পরিবর্ত্তন হ'য়ে গেছে। পৃথিবী হঠাৎ আমাকে অবজ্ঞাভরে পরিত্যাগ ক'রে সূর্য্যকেই করছে প্রদক্ষিণ, পল বিপল হিসেব ক'রে। কাল আমার জন্যে অপেক্ষা করেনি, নলিনীর বাবা'ও না। জ্ঞাতি-কুটুম্বের ভর্ৎসনায় অতিষ্ঠ হয়ে নলিনীর তিনি বিবাহ দিয়ে দিয়েছেন।

কিন্তু আঘাত এইখানে নয়---আঘাত এই যে, নলিনী এক বৎসরের মধ্যে ফিরেছে বিধবা হয়ে!

মামুলি হোক, সেকেলে হোক, গল্প এইবার জমকালো হয়ে আরম্ভ হ'ল ভেবে তুমি বোধ হয় উল্লসিত হয়ে উঠছ। কিন্তু ভুল করলে, গল্প এবার প্রায় শেষ হয়ে এল। নলিনীর বাবার সংস্কারক-সত্তা আবার প্রবলভাবে জাগ্রত হওয়া সত্ত্বেও গল্প এল শেষ হয়ে।

একান্ত আদরের মেয়ের অশ্রুমোচনের সঙ্গে সমাজের গোঁড়ামির মূলে আঘাত দেবার জন্যে নলিনীর বাবা উঠলেন মেতে, ভালবাসার পাত্রীকে ফিরে পাওয়ার সঙ্গে উদারতার এতবড় কীর্ত্তি রাখবার সম্ভাবনায় আমার মন আনন্দে উঠল নেচে। কিন্তু নলিনী সেই যে ঘাড় বেঁকিয়ে দাঁড়াল সে ঘাড় আর সোজা করা গেলো না।

বিয়ে, দু'বার বিয়ে---কারুর হ'তে পারে না, না পুরুষ, না মেয়ের এই তার মত।

সেযুগে যা অসম্ভব, নলিনীর বাপ সে সুযোগও আমায় দিলেন। নলিনীর সঙ্গে দেখা ক'রে বুঝিয়ে বলার সুযোগ আমি পেলাম।

না, স্বামীর পাদুকা সামনে রেখে সে পূজোয় বসে ছিল না---তা হ'লে বুঝি কিছু আশা থাকত। তার বদলে তার মুখে দেখলাম অপরূপ সঙ্কল্পের

দৃঢ়তা, চোখে প্রেমের গভীর তন্ময়তা। যেন তার কাছে এপার-ওপারের যবনিকা গেছে সরে। প্রেমাস্পদের বিরহ সে জানে না।

ব্যথাও যেমন পেলাম, তেমনি পেলাম লজ্জা—হ্যাঁ লজ্জা, আমার সমস্ত কথা গেল ম্লান হয়ে মনের মধ্যে মিলিয়ে। কোন মতে সাধারণ দুটো আলাপ ক'রে বেরিয়ে এলাম।

বুঝলাম তেরো বছরের যে কিশোরীটির সঙ্গে আমি প্রেমের ছেলেখেলা করেছিলাম, সে কোথায় গেছে হারিয়ে। পূর্ণযৌবনা নলিনীর মন সত্যকার আর এক প্রেমের অমৃত-স্বাদ পেয়ে মধুময় হয়ে আছে। সে মনে আমার স্থান নেই।

বিনয়বাবু থামলেন।

আমি হতাশ হয়ে বল্লাম—এই! এই আপনার ট্র্যাজিডি!

ম্লান হেসে বিনয়বাবু বল্লেন—অত অধীর হ'লে চলবে কেন? গল্প শেষ হয়ে এসেছে, কিন্তু এইখানেই নয়।

দেশ থেকে এবার বিদায় নিলাম দীর্ঘ দিনের জন্যে—চিরদিনের জন্যেই ইচ্ছে ছিল কিন্তু হয়ে উঠলো না। বছর পনেরো পরে আবার ফিরলাম। সে বেশী দিনের কথা নয়। কলকাতার রাস্তায় মৃগাঙ্কের সঙ্গে দেখা। ঠিকানা দিয়ে বল্লে, আমরা এখানে আছি। এক দিন আসুন না।

মৃগাঙ্ক নলিনীর ছোট ভাই।

কোন আশা নিয়ে নয়, অমনিই গেলাম একদিন। আহিরীটোলার গঙ্গার ধারে ছোট একটা বাড়ী ভাড়া ক'রে তারা আছে। দরজায় গিয়ে মৃগাঙ্কের নাম ধ'রে ডাকাডাকি করছি, পেছন থেকে শুনলাম—একটু পাশ দেবেন ত।

গঙ্গায় স্নান ক'রে ভিজে কাপড়ে একটি শীর্ণ চেহারার মহিলা পেছনে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি তাড়াতাড়ি পাশ কাটাতেই, ভিজে কাপড় নিংড়ে সামনে জলের ছিটে দিতে দিতে তিনি ভিতরে চলে গেছেন।

তুমি শুনেই চিন্‌তে পেরেছ নিশ্চয় কিন্তু প্রথমটা আমি পারিনি। মাথার চুল ছোট ক'রে ছাঁটা, খাটো কাপড়ে শরীরের অতি কষ্টে লজ্জা নিবারণ হয়েছে—তার উপর সমস্ত মুখে চোখে অকাল-প্রৌঢ়ত্বের এমন একটা ছাপ পড়েছে যে, নলিনীকে চেনা কঠিন। চিনলাম আমি শুধু তার চলার ভঙ্গি দেখে।

আমি চিন্‌লেও নলিনী যে চেনেনি একথা ঠিক। কারণ আমি নলিনী ব'লে ডাকলেও সে পেছন ফিরে খানিক বিস্মিত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

বল্লাম—চিন্‌তে পারছ না!

ওঃ—বিনুদা!—বিশেষ কিছু উল্লাস থাকবার কথা নয় সে স্বরে—আমি তা আশাও করিনি।

বল্লাম—মৃগাঙ্কের সঙ্গে সেদিন রাস্তায় দেখা! বলেছিল, তাই দেখা করতে এলাম। বাড়ীতে আছে সে?

আছে বোধ হয়। এস না, তুমি ভিতরে।

নলিনী এগিয়ে চল্ল—আমি তার পিছু নিলাম। লক্ষ্য ক'রে দেখলাম, এযাবৎ সে প্রত্যেকবার পা ফেলবার আগে ভিজে কাপড় নিংড়ে গঙ্গাজল সামনে ছিটোতে ছিটোতে চলেছে।

বাইরের দরজা থেকে একটা লম্বা গলির মত রাস্তা পার হয়ে নলিনীদের বাড়ীর ভিতর ঢুকতে হয়। গলিটা থাকার দরুণই নলিনীর এ আচরণ আমার চোখে পড়ল। দেখলাম এক একবার সে পিছনে ফিরে সন্ত্রস্তভাবে তাকাচ্ছে।

প্রথমটা মানে বুঝতে পারিনি, কিন্তু গলি-পথ শেষ হবার আগেই সেটা পরিষ্কার হয়ে গেল।

ভেতরের দরজার কাছাকাছি এসে নলিনী হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। একটু ইতস্তত: ক'রে কুণ্ঠিতভাবে বল্লে,—তুমি, তুমি ভেতরে যাও। আমি একটু আসছি।

আবার কোথায় যাবে?

অত্যন্ত সঙ্কুচিতভাবে নলিনী বল্লে,—কি একটা যেন মাড়ালাম, আর একটা ডুব দিয়ে আসছি।

তার পায়ের দিকে তাকিয়ে বল্লাম—কিছু ত মাড়াও নি। ওটা একটা কাঠি।

তেমনি কুণ্ঠিতভাবে সে বল্লে---কি এঁটো কাঁটা হবে। আমি,---আমি যাই। তুমি যাও না, মৃগাঙ্ক আছে।

তার মুখের দিকে এবার ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখবার সুযোগ পেলাম। কোথায় গেছে সে প্রেমের আনন্দের জ্যোতি, কোথায় সে তপস্যার কাঠিন্য। সমস্ত মুখে অকাল-বার্দ্ধক্যের ছাপ, চোখের কোণে, অধরের দু'পাশে ক্লান্তি ও দুর্ব্বলতার গভীর রেখা। কে বলবে এই সেই তেজস্বিনী নারী, যা'কে দেখে একদিন মনে হয়েছিল যে ভালবাসার মহিমায় জীবন-মৃত্যুর যবনিকাও এর কাছে সরে গেছে।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। কুণ্ঠিত পদে নলিনী আবার ফিরে গেল গঙ্গার দিকে।

মৃগাঙ্ক এসে দরজায় দাঁড়িয়েছিল, আমায় ভেতরে নিয়ে যেতে যেতে বল্লে---দিদি আবার গঙ্গায় ডুব দিতে গেল ত! সকাল থেকে এই চারবার, এখনো সমস্ত দিন আছে। জ্বালিয়ে খেলে বাবা!

আমাকে ভাল ক'রে বোঝাবার জন্যই তারপর সে আবার বল্লে,---এর কোন ব্যবস্থা আছে বলতে পারেন? ওই ত দেখুন না ঘর, ভেতর পচে যাচেছ তবু দরজা, জানালা খুলবে না! বাইরে থেকে যদি নোংরা জলের ছিটে যায় ঘরের ভেতর! এত ক'রেও তবু কিন্তু সন্দেহ যায় না। আধ ঘণ্টা অন্তর গঙ্গায় গিয়ে ডুব দিয়ে আসছে। সারাদিন এই ছুঁলে, সেই ছিটে লাগল এ ছাড়া কোন চিন্তা নেই। একেবারে জ্বালাতন হয়ে গেলাম।

নলিনীদের বাড়ী তারপর আর যাইনি।

বিনয়বাবু এবার চুপ করলেন।

বল্লাম---আপনি যে শেষ পর্য্যন্ত ডাক্তারী শাস্ত্রই এনে ফেল্লেন।

বিনয়বাবু ম্লান হেসে বল্লেন---ট্র্যাজিডি ত সেইখানেই! অপরূপ, রহস্যময় এই মানব-আত্মা, শূন্য আকাশ যে দেবতায় ভরিয়ে তোলে, প্রেমকে মৃত্যুর ওপারেও জয়ী করবার যে স্পর্দ্ধা করে শেষ পর্য্যন্ত সেও একটা শুকনো, কুৎসিত ডাক্তারী শাস্ত্রের অধীন। ডাক্তারী শাস্ত্রের দুর্লঙ্ঘ্য বিধান তার সমস্ত আদর্শ, সমস্ত স্বপ্নকে নির্ম্মমভাবে গুঁড়িয়ে থেঁৎলে নিজের নির্দ্দিষ্ট পথে চলে যায়।

এটা কি ঠিক সেকালের ট্র্যাজিডি হ'ল?---জিজ্ঞাসা করলাম।

বিনয়বাবু বল্লেন---হ্যাঁ, সেকালের ট্র্যাজিডি, একালের দৃষ্টিতে দেখা।

নতুন বাসা

শীর্ণ কঙ্কালসার বেড়ালছানাটা পাশের নর্দ্দমা থেকে সারা গায়ে কাদা মেখে কোন মতে রাস্তার ধারে উঠে এসে কাতরভাবে ডাকছে। গলা তার অবশ্য এখন অত্যন্ত ক্ষীণ---একেবারে থেমে যাবার আর দেরী নেই।

অমল নোংরা সরকারী কলতলার পাশ দিয়ে সরু গলিটায় ঢোকবার আগে এক মুহূর্ত্তের জন্যে বুঝি একটু থমকে দাঁড়ায়। গত দুই রাত বেড়াল-ছানাটা বড় জ্বালিয়েছে---কোথা থেকে কে ছানাটাকে এই নর্দ্দমায় ফেলে দিয়ে গেছল কে জানে---সারা দিন রাত তার কাতর একঘেয়ে ডাকে কান ঝালাপালা হয়ে গেছে।

কিন্তু অমলের অস্বস্তিটা শুধু বিরক্তির দরুণ নয়, মনের কোথায় একটা অক্ষমতার গ্লানিও যেন তাকে বিঁধছে। সেটা আমল দেবার জিনিষ নয় অমল বুঝেছে---একটা আধমরা নোংরা বেড়াল-ছানা, অমল তার কি করতে পারে! কিছু করতেই বা তাকে হবে কেন? যতই কাতর-ভাবে সেটা চেঁচাক, তাকে বাঁচান ত আর অমলের দায় নয়!

নর্দ্দমার ধারের জানালাটা ভাল ক'রে বন্ধ ক'রে দিয়ে অমল কাল রাত্রে শুয়ে পড়েছিল। তাকে ঘুমোতে হবেই। সকাল থেকে তার অনেক কাজ। কিন্তু তবু অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ঘুম কিছুতেই আসেনি।

বেড়ালছানাটার দিকে একবার তাকিয়েই অমল আবার হন হন ক'রে এগিয়ে যায়। একটা আধমরা বেড়ালছানার কথা ভাবলে তার চলবে না।

বাইরের দরজাটা ঠেলে উঠোনে পা দিতেই পিসিমা চেঁচিয়ে ওঠেন---হ্যাঁরে, ক'টা মুটে আর একটা গরুর গাড়ী ডাকতে এই এত দেরী! কখন জিনিষপত্র তোলা হবে, আর কখনই বা সেখানে গিয়ে ঘর-দোর গুছোব!

গরুর গাড়ী পাইনি, একটা লরী ঠিক ক'রে এসেছি---ব'লে অমল উঠোন পার হয়ে তাদের দিকের রকে গিয়ে উঠে।

লরী!---পিসিমা প্রথমটা একেবারে স্তম্ভিত হয়ে যান, লরী--সে যে অনেক ভাড়া!

অনেক ভাড়া নয়! তোমার এই রাজ্যের মাল ত আর একটা গরুর গাড়ীতে হ'ত না---লরীতে এক খেপেই হয়ে যাবে, তাড়াতাড়িও হবে।---দুটো টাকা বেশী তাতে লাগলই বা।

অন্যদিন হ'লে পিসিমা বোধ হয় এত সহজে প্রবোধ মানতেন না। দুটো টাকা যে কতখানি, কতদিক সামলে কি পরিশ্রমে, কি ভাবে দুটো টাকা যে তাঁকে সংসারে সঞ্চয় করতে হয়, কি সামান্য আয় থেকে কি ভাবে তিনটি অনাথ ভাইপোকে তিনি মানুষ ক'রে তুলেছেন, সমস্ত সুদীর্ঘ ইতিহাসই হয়ত অমলকে শুনতে হ'ত। কিন্তু আজ তাঁর মেজাজটা অত্যন্ত প্রসন্ন, তিনি একটু উদারভাবেই বলেন,---তা বেশ করেছিস, তাড়াতাড়ি গিয়ে ওঠা যাবে ত।

পাশের ঘরের ভাড়াটেদের বৌ মানদা কপাল পর্য্যন্ত ঘোমটা টেনে, এঁটো বাসন-কোসন হাতে নিয়ে কলতলায় যেতে একটু কৌতূহল ভরে থেমে দাঁড়িয়েছিল, তাকে উদ্দেশ ক'রে পিসিমা বলেন---গরুর গাড়ীর যা ঢিমে চাল---সেই এবেলা আর ওবেলা; তাতে কি আর আজকের মধ্যে ঘর-দোর গুছোন হ'ত। যেমন তেমন দুটো

খুপরি ত নয় যে এখানকার মত জিনিষ-পত্র ঠাসাঠাসি ক'রে রাখলেই হবে---পাকা ঘর, অঢেল জায়গা, ভালো ক'রে একটু গুছিয়ে না বসলে পাড়াপড়শী বলবে কি।

নতুন ভাড়া করা বাসার গুণ বর্ণনা একবার সুরু হ'লে আর শেষ হবে না জেনে মানদা তাড়াতাড়ি সরে পড়ে। এ কয়দিন পিসিমার কাছে নতুন বাসার বর্ণনা সবিস্তারে শুনতে এ বাড়ীর কোন ভাড়াটের বাকী নেই। সে যে এমন টিনে-ছাওয়া কাঁচা গাঁখুনির পাঁচ ভাড়াটের একত্র করা বাড়ী নয়, দস্তরমত ভালো রাস্তায় ভদ্র পাড়ায় একখানা আলাদা পাকা বাড়ী,---তার আশে পাশে এমন নোংরা নর্দমা যে নেই---যত রাজ্যের উড়ে-খোট্টা ছোটলোকের সঙ্গে সেখানে যে কলতলায় জল নিতে যেতে হয় না, ইত্যাদি সকল সংবাদই তাবা পেয়েছে।

পিসিমার কাছে বাড়ী বদল একটা বাহাদুরীর ব্যাপার---প্রতিবেশীদের একটু ঈর্ষ্যা, একটু বিস্ময় জাগাতে পেরেই তিনি সুখী। কিন্তু অমলের কাছে সত্যিই এই বাড়ী বদল একটা মুক্তি---একটা পরিত্রাণ।

এই আবেষ্টনের মধ্যেই সে মানুষ হয়েছে সত্য, কিন্তু তবু এখানে সে হাঁপিয়ে ওঠে, এর চেয়ে বিস্তৃত মুক্ত জীবনের স্বাদ তার মনে আছে।

তাদের তিনটি অনাথ ভাইকেই পিসিমা কোন রকমে মানুষ করেছেন। তাই এরা সাবালক হ'তে না হ'তেই কাজে ঢুকেছে, তাদের রোজগারে ও পিসিমার হিসাবী পরিচালনাতেই এ সংসার দিন দিন উন্নতি করেছে। অমলকে তাই আর পড়াশুনা ছেড়ে অল্প বয়সে রোজগারেব চেষ্টা করতে হয়নি, সে কলেজে পড়ে।

একটি ছোট খুপরীর মত ঘর তার জন্য এ বাড়ীতে নির্দ্দিষ্ট। একটি প্রমাণ তক্তপোষেই ঘরটি জুড়ে যায়, জামা-কাপড়ের আলনাটা থেকে কাপড়-চোপড় তার বিছানার ওপরই ঝুলে থাকে। বই কাগজ রাখবার একটা চৌকী আছে এক পাশে। পড়াশুনা করতে হ'লে তক্তপোষের ওপরে করতে হয়।

ঘরে একটি মাত্র জানালা। পেছনের খোলা নর্দ্দমার দুর্গন্ধের দরুণ সেটা অধিকাংশ সময়েই বন্ধ রাখতে হয়। দুর্গন্ধ যখন না আসে তখনও নিস্তার নেই। পাশের বাড়ীর একটি কলহপ্রবণ দম্পতীর প্রতিদিনের ঝগড়া লেগেই আছে।

নতুন যে বাড়ীতে তারা উঠে যাচেছ, সেখানে একটি চমৎকার ঘর সে নিজের জন্যে ঠিক ক'রে নিয়েছে। দোতলার ওপর প্রকাণ্ড বড় বড় দুটি জানালা সমেত ঘর। একদিকের জানালা দিয়ে আবার পাশের বাড়ীর সাজান একটি বাগান পেরিয়ে কাদের রাস্তাটুকু দেখা যায়।

সে ঘরটুকুই যেন এই দুঃসহ আবেষ্টন থেকে মুক্তির প্রতীক। অন্ততঃ সে ঘরে গভীর রাত্রে দেয়াল ভেদ ক'রে পাশের কুঠরির অসহায় মেয়ের রুদ্ধ কান্না ত' শোনা যাবে না।

পাশের ঘরের এই চাপা কান্নায় কতদিন তার ঘুম ভেঙ্গে গেছে গভীর রাত্রে। এ যেন কোন একজন বিশেষ মানুষের নয়, সমস্ত নোংরা দরিদ্র দুর্ব্বল বসতিটারই রুদ্ধ আক্ষেপ।

কান্না যেদিন বাড়ে সেদিন এখানে অস্থিরভাবে তাকে পায়চারী ক'রে বেড়াতে হয় নিজের ঘরে। কি করতে পারে সে। কিছুই না। পৃথিবীতে এত অবিচার, এত দুঃখ, এত শোক---তার তা নিয়ে অস্থির হয়ে লাভ কি।

কার বেকার স্বামী দেনার দায়ে স্ত্রী-পুত্র ফেলে পলাতক হয়েছে, কোন্ হৃতভাগিনী সারাদিন মুখ বুজে পরের বাড়ী দাসীগিরি ক'রে কোনমতে ছেলেমেয়ের মুখে অন্ন দেবার চেষ্টা করে, গভীর রাত্রে নির্জ্জনে নিজেকে আর সম্বরণ করতে পারে না---তা নিয়ে তার মাথা ঘামাবার কি দরকার।

মেয়েটিকে সে দিনের বেলায় ভালো ক'রেই দেখেছে। প্রতিবেশী হিসেবে ভাল ক'রেই তাকে জানে। অত্যন্ত ঝাঁজালো তার মুখ,---তার দিনের বেলার সে উগ্র চেহারা দেখে মনে হয় না গভীর রাত্রে তার কণ্ঠ থেকে অমন কাতর কান্না বা'র হ'তে পারে।

হয়ত নিষ্ঠুর পৃথিবীর সামনে এই মুখোস তুলে ধ'রে মেয়েটি ভালোই করেছে। কিন্তু

এই মুখোস দিয়েই সে পার হয়ে যাবে কি। এ বাড়ীর লোকেরা তার সম্বন্ধে বলাবলি করে---তার চাল-চলন নাকি ভালো নয়।

হবেও বা। কিন্তু কি দরকার তার এ সব দুর্ভাবনার। সে এই আবেষ্টন থেকে সরে যেতে চায়---যেখানে এ সব ভাবনা তার দরকার হবে না---যেখানে প্রতিদিন বাড়ীর দরজা দিয়ে বা'র হ'তে রুগ্ন অবিনাশের সঙ্গে দেখা হবে না।

লাঠিটায় ভর ক'রে প্রতিদিন সকালে প্রৌঢ় অবিনাশ গলিটার মুখে পৈঠেটার ওপর গিয়ে বসে হাঁপায়। তার বেশী তার যাবার ক্ষমতা নেই।

কলেজে যাচ্ছ বুঝি অমল---ব'লে অবিনাশ কাশতে থাকে।

অমলের সত্যি এই রুগ্ন লোকটার পাশে দাঁড়াতে কেমন একটা অস্বস্তি হয়। কি রোগ তার কে জানে।

কিন্তু তবু তাকে দাঁড়াতে হয়।

অবিনাশ কাশি থামিয়ে বলে,---তোমার সেই ডাক্তারের কাছে আর ত নিয়ে গেলে না ভাই!

অমল একদিন তার দুর্ব্বলতার মুহূর্ত্তে নিজে থেকেই এ প্রস্তাব করেছিল। তারপর আর সময় হয়নি।

অমল নিজের ত্রুটিটাকে চাপা দিবার জন্যে বলে---আপনাকে নিয়ে গিয়ে লাভ কি বলুন, আপনি ত অত্যাচার ছাড়বেন না। অত কুপথ্যি করলে রোগ সারে?

কুপথ্যি, বল কি অমল! আমার মেয়েটা বুঝি লাগিয়েছে।---অবিনাশের কাশির বেগ অত্যন্ত বেড়ে ওঠে। অমলকে ধৈর্য্য ধ'রে তবু দাঁড়িয়ে থাকতে হয়।

অনেকক্ষণ পরে নিজেকে সামলে অবিনাশ বলে---পথ্যিরই পয়সা জোটে না, তা কুপথ্যি করব কোথা থেকে বল!

কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়, অমল জানে।

আচ্ছা এবার ঠিক নিয়ে যাব। ব'লে সে চলে যাবার উপক্রম করতেই অবিনাশ তার জামার প্রান্তটা নোংরা জীর্ণ আঙ্গুলে ধ'রে ফেলে।

একটু ভালো ওষুধ হ'লেই আমার এ রোগ সেরে যায়, প্রেসের চাকরীটা এখনো তাহ'লে করতে পারি। আমায় না হয় একটা হাসপাতালেই ব্যবস্থা ক'রে দাও না ভাই।

হাসপাতালে কি সহজে যাকে তাকে নিতে চায়!---অমল জামার প্রান্তটা এক রকম জোর ক'রে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে, কিন্তু অবিনাশ নাছোড়-বান্দা। এবার গলা যথাসাধ্য নামিয়ে আসল প্রস্তাবটা সে ক'রে ফেলে,---চারটে খুচরো পয়সা তোমার কাছে হবে ভাই? আমি কালই দিয়ে দেব।

অমলের কাছে কলেজে যাবার ট্রাম ভাড়ার বেশী পয়সা সত্যিই থাকে না। পিসিমা সে দিকে অত্যন্ত সাবধানী। তবু অবিনাশের কবল থেকে মুক্তি পাবার জন্যেই সে চারটে পয়সা তাড়াতাড়ি বা'র ক'রে দেয়। হপ্তা খানেক অন্ততঃ অবিনাশ আর তাহ'লে তাকে বিরক্ত করবে না সে জানে। এক হপ্তাই বা তার আর পরমায়ু।

রাস্তায় বেরিয়ে প'ড়ে অমলের মনে হয় রাস্তার কলে হাতটা ধুয়ে ফেল্লে হয়। পয়সা দেবার সময় অবিনাশের ঘর্ম্মাক্ত ভিজে ঠাণ্ডা হাতটার স্পর্শ লেগে কি রকম যেন অস্বস্তি বোধ হ'তে থাকে।

কিন্তু অমলের হাত ধোয়াও হয় না। কোন একটা সঙ্কোচ বোধ হয়। নিজের সম্বন্ধে কেমন একটা লজ্জা।

লরীতে সমস্ত মাল বোঝাই ক'রে অমলই সবার শেষে এ বাড়ী ছেড়ে যায়। পিসিমা আর সকলের সঙ্গে ঘর-দোর গুছোবার জন্যে আগেই নতুন বাসায় গিয়ে উঠেছেন।

শেষ মালপত্র তুলে, বোঝাই করা লরীর ড্রাইভারের পাশের সীটে উঠে ব'সে সে হুকুম দেয়, 'চালাও'।

পিছন ফিরে আর সে তাকাতেও চায় না। এখানকার কোন ভাবনা তার মনে অস্বস্তিও যেন না জাগায়, তার নতুন পাওয়া মুক্তির অনুভূতি যেন ক্ষুণ্ন না করে।

আসবার সময় সকলের কাছে সে নেহাৎ আলগাভাবে বিদায় নিয়ে এসেছে।

সকলের সঙ্গে অবশ্য দেখা হয়নি। দিনের বেলাকার মুখোশ খুলে গভীর রাত্রে যে মেয়েটি লুকিয়ে কাঁদে, সে তখন সম্ভবত নিজের কাজের ধান্দাতেই বাড়ী ফেরেনি। শুধু রুগ্ন অবিনাশ মানা সত্ত্বেও জোর ক'রে হাঁপাতে হাঁপাতে গলির মুখ পর্য্যন্ত তাকে এগিয়ে দিয়ে চার আনা পয়সা ধার চেয়ে নিয়েছে, ডাক্তার দেখাবার কথাটা আর একবার স্মরণ করিয়ে দিতেও ভোলেনি।

অমল কোন উত্তর দেয়নি। সত্য মিথ্যা কোন উত্তরই সে আর দিতে চায় না। এখানকার সঙ্গে সকল সম্পর্ক তার শেষ। এ আবেষ্টন থেকে সে মুক্তি পেয়েছে এইটুকু শুধু সে মনে রাখতে চায়।

এ ভাড়াটে বাড়ীর জীবনযাত্রা আবার এমনি ক'রেই চলবে সে জানে। তাদের খালি করা ঘরে আর কোন দুঃস্থ পরিবার এসে কালই হয়ত আশ্রয় নেবে---কি দরকার এ সব ভাবনার---ভেবে সে কিছু করতে পারে!

লরীতে ষ্টার্ট দেওয়া হয়। সশব্দে রাস্তা কাঁপিয়ে লরীটা যাত্রা করবার সঙ্গে সঙ্গে অমলের দৃষ্টি হঠাৎ আপনা থেকে রাস্তার ধারে গিয়ে পড়ে।

কাদামাখা বেড়ালছানাটা কখন সেখানে ম'রে প'ড়ে আছে।

বৃষ্টি

এমন বর্ষা বুঝি আর কখনো আসে নি। আকাশের জল যেন আর ফুরোয় না। দিনের পর দিন চলেছে অবিশ্রান্ত বর্ষণ : ছেদ নেই, বিরাম নেই। গ্রীষ্মের তপ্ত আকাশে প্রথম কালো কাজলের মতো মেঘের আবির্ভাবের আনন্দ কবে মানুষ ভুলে গেছে। বর্ষার সে মোহ আর নেই। এখন শুধু অবসাদ, শুধু হতাশা। মেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিকে তাকিয়ে শুধু হতাশ প্রতীক্ষা।

একটুখানি নীল আকাশ, একটুখানি সোনালী রোদ,---প্রতুলের মনে হয় যেন কতো যুগ সে এই অপরূপ দৃশ্য দেখেনি। এই মেঘ কেটে গিয়ে সমস্ত সৃষ্টি আবার প্রখর সূর্য্যালোকে হেসে উঠবে একথা এখন আর বিশ্বাস করা যায় না। মনে হয় পৃথিবী বুঝি আবার তার আদিম শৈশবে ফিরে গেছে---ঘন মেঘাচ্ছন্ন আকাশ যখন দিনের সূর্য্যালোককে আর রাতের আকাশকে অবিরাম আচ্ছন্ন ক'রে থাকত।

তার মনে হয় এমনি কোন সুদীর্ঘ বর্ষা ঋতুর মাঝে আদিম কালের কোন কবি প্রথম সূর্য্যোপাসনার মন্ত্র রচনা করেছিল। তার মনের ভেতরও অমনি প্রার্থনা ধ্বনিত হ'য়ে ওঠে---আলো আর জীবন আর শক্তির জন্য প্রার্থনা। সূর্য্যকে কেন মানুষ দেবতা করেছে, আজ যেন সে প্রথম ভালো ক'রে বুঝতে পারে।

আজ যখন মেঘে মেঘে আকাশ হয়েছে অন্ধকার, সমস্ত প্রকৃতি বিবর্ণ ম্লান হয়ে এসেছে নিরবচ্ছিন্ন বৃষ্টিধারায় তখনই সে বুঝতে পারে সূর্য্যের মূল্য। বুঝতে পারে কেন প্রাচীন মিশরে 'রা' ছিল দেবাদিদেব, কেন দেশে দেশে যুগে যুগে নব নব গায়ত্রী রচিত হয়েছে বিভিন্ন ছন্দে।

জানালার ধারে সে আজ চেয়ার টেনে বসেছে। ভিজে মরা আলো জানালা দিয়ে এসেছে ঘরের মাঝে। সে স্তিমিত আলোয় ভালো ক'রে কিছু দেখা যায় না, কিছু বোঝা যায় না। তার মনের দীপও আজ অমনি নিষ্প্রভ। আকাশের আলোর সঙ্গে তারও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে যেন। নিজের কাছে নিজেই সে আজ অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নিজেকে ভাল ক'রে চেনবার তার শক্তি নেই, উৎসাহ নেই।

বাইরের বৃষ্টিধারায় ঝাপসা নগরশিখরের বিস্তৃত রেখা দেখা যাচেছ। ছাই রঙের আকাশ মৃত মুখের মত বিবর্ণ। সমস্ত নগর সে আকাশের তলায় যেন মৃত্যুশয্যা নিয়েছে। তার প্রাণস্পন্দন আছে কি না বোঝা যায় না।

প্রতুলের মনে হয় সে নিজেও যেন অর্দ্ধমৃত। চারিধারের অন্ধকারে তার চেতনার দ্বীপ ক্রমেই নিমজ্জিত হয়ে যাচেছ। তবু তার সাড়া নেই, উৎসাহ নেই এতটুকু নিজেকে উদ্ধার করবার। বর্ষার গাঢ় মৃত্যুগভীর অবসাদ তার মনে সঞ্চারিত হ'য়ে যাচেছ। আজ বুঝি কিছুতেই কিছু আসে যায় না। বাইরের আকাশের দিকে চেয়ে কে আজ বলবে এই পৃথিবী কিছুদিন আগে ছিলো আলোকে আনন্দে উজ্জ্বল, প্রাণের চাঞ্চল্যে স্পন্দমান। পরিত্যক্ত মৃত ধরণী যেন বহুকাল ধরে এমনি পড়ে আছে নির্জীব হয়ে। প্রাণের সমস্ত অঙ্কুর তার দেহ থেকে ধুয়ে গেছে নিশ্চিহ্ন হয়ে। প্রতুলের জীবনও যেন তেমনি। রূপে বর্ণে ঝলমল

দিনগুলি কবে তার জীবনে এসেছিল তা আজ স্মরণও হয় না। বর্ষার অবিরাম ধারায় সব ধুয়ে গেছে।

ঝুপ্‌ঝুপ্‌ ঝুপ্‌ একঘেয়ে বৃষ্টির আওয়াজ শুনতে শুনতে দেহ-মন অবশ হয়ে আসে। তন্দ্রা আসে চেতনার ওপর। সে তন্দ্রার জড়িমায় মনে হয় সমস্ত নিরর্থক, জীবন নিয়ে এত আস্ফালন, এত উদ্বেগ, এত ব্যস্ততা কিছুরই মানে হয় না। শেষে ত সেই উদাসীন অন্ধকার অপেক্ষা ক'রে আছে সমস্ত স্ফুলিঙ্গকে গ্রাস করতে। এত ভাবনা, এত বেদনা, এত ছুট্‌ফটানি সমস্ত বৃথা। সে অতল অন্ধকারে কে জানবে তুমি কেমন ক'রে কত সূক্ষ্ম ক'রে জীবনের তুলি চালিয়েছ, কোথায় তুমি পেলে আঘাত আর কোথায় আনন্দ! তোমার জীবনের এই পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ অন্ধকারে সমস্ত মিলিয়ে একাকার হয়ে যাবে।

অথচ তিন মাস আগে এই জীবনের তুচ্ছতম ঘটনাটিও কি অমূল্য মনে হয়েছিল তার। মনে হয়েছিল মহাকাশের বুকে তার জীবনের এ সোনার জলে লেখা কাহিনী অক্ষয় হয়ে রইল। সৃষ্টির তখন সে কেন্দ্র। অন্ধকারকে বিচিত্র ক'রে রাত্রি তার তারার ঐশ্বর্য্য ছিটিয়ে দেয় শুধু তারই জন্যে। সূর্য্যাস্তের বর্ণসমারোহে যেন তাকেই প্রসন্ন করার জন্যে আকাশের আয়োজন। কি সযত্ন অনুরাগে সে সেদিন প্রতিদিনের তুচ্ছতম ঘটনাটি সঞ্চয় ক'রে রেখেছে। কিছু সে হারিয়ে যেতে দেবে না, এই বুঝি ছিলো তার গোপন মনের অহঙ্কার।

তার মনে পড়ে গভীর রাত্রে সেই প্রতিদিনের কথাগুলি লিখতে বসা। সমস্ত দিনের ঘটনাগুলি যেন সে লেখার মধ্যে দ্বিতীয়বার উপভোগ করতো। বাইরে স্তব্ধ নিদ্রিত নগর। ঘরের ভেতর সে নিঃশব্দে লিখে যাচেছ;----

----রাস্তার লোকগুলো কি ভাবছিলো কে জানে!

একঘণ্টা ধরে দাঁড়িয়ে আছি রাস্তার ধারে। ট্রামের পর ট্রাম, বাসের পর বাস পার হয়ে যাচেছ, তবু কোনটাতেই আমার ওঠবার নাম নেই। সত্যি এক এক সময়ে একটু লজ্জা হচিছল বৈ কি। তবে সেটা হয়ত আমার অকারণ লজ্জা। লক্ষ্য করবার কেই বা ছিল, কেই বা জানতো কি চলেছে আমার মনের মধ্যে!

ওপারের রাস্তায় ওকে দেখা যেতেই অত্যন্ত ব্যস্ত হ'য়ে বাস দাঁড়াবার জায়গার কাছে পায়চারী করতে লাগলাম। এখুনি একটা বাস আমার পাওয়া দরকার।

ও কি এ চাতুরী বুঝতে পেরেছিল? কে জানে? রাস্তা পার হ'য়ে আমার কাছে এসে একটু হাসল।

বললাম,---আজকে ও ঠিক এক সময়ে দু'জনে এসে পড়েছি! কি কোয়েনসিডেন্স!

খানিকটা কথা অবশ্য গোপন রাখলাম। এই কোয়েনসিডেন্সের জন্য ভাগ্যকে আমার একটু সাহায্য করতে হয়েছে, ঘণ্টাখানেক রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থেকে।

ও একবার একটু হাসল। বল্লাম---আজ আপনার একটু দেরী হয়ে যাবে বোধ হয়।

---না, দেরী ত হয়নি! এখনও মিনিট দশেক সময় আছে। দশ মিনিটে পৌঁছন যাবে না?

---তা যেতে পারে! তবে বাসগুলো যা ঢিমে চালে চলে।

সামনে একটা বাস এসে পড়েছে, লতিকা উঠতে যাচিছল। দেরী হওয়া সম্বন্ধে নিজের আশঙ্কা হঠাৎ ভুলে বল্লাম--না না, এটায় বড় ভীড়!

---কিন্তু দেরী হয়ে যাবে যে!

অম্লান বদনে বল্লাম---বাঃ এখনো ত দশ মিনিট আছে।

লতিকা আবার হাসল; তার মুখ ভালো ক'রে লক্ষ্য ক'রে দেখলাম। না, বিদ্রূপের হাসি বোধ হয় নয়।

দ্বিতীয় বাসটিতেও ভীড়। কিন্তু আর না উঠলে চলে না। হঠাৎ অসম সাহসিক একটা কাজ ক'রে ফেল্লাম!---ট্যাক্সি! ট্যাক্সি!

লতিকা যদি আমার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে তা হ'লে ওর সামনে আর মুখ তুলতে পারব না। এইখান থেকেই এ পর্ব্বের ছেদ! একটি অনিশ্চয়তার ভয়ঙ্কর মুহূর্ত্ত। সমস্ত সৃষ্টি দুলছে সে মুহূর্ত্তটির

মাঝে। লতিকা কি অস্বীকার করবে ট্যাক্সিতে উঠতে!

ট্যাক্সি ড্রাইভার ঘুরে এসে সামনে দরজা খুলে গাড়ী দাঁড় করিয়েছে।

তৃতীয়বার নিজের কথায় প্রতিবাদ ক'রে বল্লাম---সময় বড্ড কম! চলুন ট্যাক্সিতেই যাই।

লতিকার মুখের দিকে চাইতে পারছি না। নিজের কাণ পর্য্যন্ত লাল হয়ে উঠছে।

লতিকা ট্যাক্সিতে উঠেছে বাঁ হাতে শাড়ীটাকে একটু সামলে নিয়ে। হেলান দিয়ে বসেছে। নিজের সৌভাগ্যকে বিশ্বাস করতে না পেরে আমি উঠলাম ঠিক অভিভূতের মত। তারপর ট্যাক্সির ষ্টার্ট নেবার ঝাঁকুনি। আচ্ছন্ন ভাব আমার কেটে গেল।

বাসে লাগত দশ মিনিট। ট্যাক্সিতে হয় ত সাত মিনিটের বেশী লাগবে না। সাতটি মাত্র মিনিট; সাত সপ্তাহ---না সাত সুদীর্ঘ বৎসরের চেয়ে মহার্ঘ সাতটি মিনিট। লতিকাকে প্রথম একান্ত-ভাবে পাওয়ার এই দুর্লভ অবসর। মনে হ'ল এই ক'টি মুহূর্ত্তকে সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগাতেই হবে। কত কথা আছে বলবার, জীবনের গভীরতম কথা। এই সাত মিনিটে লতিকার প্রতিদিনের ব্যবহারিক মুখোস সরিয়ে তার গোপন অন্তরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হবে। কি কথায়, কি ইঙ্গিতে লতিকার বাইরের মনের দ্বার যাবে খুলে?

কিন্তু হায়! মোটরের ঘূর্ণ্যমান চাকার সঙ্গে দ্রুত পায়ে সময় চলল এগিয়ে।

আমরা কি আলাপ করলাম---?

---আপনার ৭নং বেডের খবর কি?

---একটু ভালো! আপনি কিছু পেলেন নাকি পরীক্ষায়?

---সেপ্সিস নেই ব'লেই মনে হয়। করপাস্লের পারসেণ্টেজ্ নরম্যাল!

খানিক নীরবতা। চাকার শব্দ, মোটরের হর্ণ, ট্যাক্সি মোড় ফেরার দরুণ একটা টাল। লতিকার কাঁধটা আমায় স্পর্শ ক'রে গেল। মৃদু, কোমল একটু ভার বোধ।

লতিকা বল্লে--কি গরম দেখেছেন এরি মধ্যে! হাওয়াটাও যেন আগুনের হলকা। এবারে বৃষ্টি হবে কবে?•

বল্লাম---সমস্ত বৃষ্টি জমা হচেছ। যখন ঢালতে আরম্ভ করবে তখন আর বিশ্রাম থাকবে না। হাঁপিয়ে উঠতে হবে।

---সেও আমার ভাল! এ গরম আর সহ্য হয় না! আকাশের দিকে চাইলে চোখ ঝলসে যায়! মনে হয় কখনও যেন মেঘ দেখিনি।

আবার নীরবতা। ট্যাক্সি হাসপাতালের রাস্তায় এসে পড়েছে! সময় নেই, সময় নেই! এ সুযোগ আর কখন মিলবে না, কি করছ প্রতুল? লতিকার চোখে কি ব্যগ্র প্রতীক্ষার আভাস তুমি দেখতে পাওনি? বল, একটা কিছু বল; প্রতিদিনের এই তুচছ অর্থহীন আলাপের আবরণ সরে যাক্।

শুধু বল্লাম---এখন আপনার ডে-ডিউটি চলবে ত?

ট্যাক্সি হাসপাতালের দেউড়ি দিয়ে ঢুকল। লতিকা নামতে নামতে বললে,---না, এই হপ্তাটা বাদেই আবার নাইট-ডিউটি।

দু'জনে নেমে পড়েছি! ডাঃ মৈত্র সামনের ওয়েটিংরুমের দরজা খুলে একবার বেরুলেন। আমাদের দিকে কুটিলভাবে একবার চেয়ে আবার তিনি ভেতরে ঢুকে গেলেন। ট্যাক্সি ভাড়া মিটিয়ে দেখি লতিকা আর নেই।

মাইক্রসকোপের তলায় সৃষ্টির আণুবীক্ষণিক রসসু-সমুদ্রে একদিন আমি নিশ্চিন্তভাবে মগ্ন হয়ে থাকতে ভালবাসতাম। কাঁচের শ্লাইডের মাঝে রক্তবিন্দু, সে রক্তবিন্দুর মাঝে বিস্ময়কর জগৎ! বাইরের সমস্ত আবেষ্টন ভুলে আমি সেই জগতে নব নব অভিযান করবার চেষ্টা করছি। এই ছিল আমার একমাত্র আনন্দ। আজকাল কিন্তু আমার কি হয়েছে। থেকে থেকে বুকের ভেতর অদ্ভুত আনন্দ-শিহরণ অনুভব করি। মাইক্রসকোপের নলের ভেতর না গিয়ে দৃষ্টি চলে যায় জানালা পার হয়ে বাইরে। দূরে বড় রাস্তা, তার ওপারে ফাঁকা মাঠ। নতুন ক'টা

বাড়ী সেখানে তৈরী হ'তে আরম্ভ হয়েছে। মজুর-মজুরণী সুর ক'রে গান গাইতে গাইতে একটা ছাদ পিটছে। প্রখর সূর্য্যের আলো একটা চলন্ত মোটরের কাঁচে প্রতিফলিত হয়ে আমার চোখ ধাঁধিয়ে গেল। অপরূপ, সমস্ত অপরূপ! রক্ত---রক্ত--কি হবে গুণে তার করপাস্‌ল। বরং গুণি হৃদয়ের সমুদ্রবেলায় তার ঢেউ! রক্তকে বিশ্লেষণ ক'রে কে তার রহস্য জানতে পেরেছে! কে জানতে পেরেছে তার স্বরূপ!

নূতন একটা মেঘ বুঝি আরো কালো হয়ে নেমে এলো। ঘর আরো অন্ধকার হয়ে এসেছে। বৃষ্টি এবার প্রবল ধারে পড়ছে! ঝম্ ঝম্ ঝম্ ঝম্!

প্রতুলের মনে হয় চারিধার থেকে এই শব্দের কারাগার যেন তাকে ঘিরে ধরেছে। কারাগার ক্রমশঃ আসছে সঙ্কীর্ণ হয়ে। ঝম্ ঝম্ ঝম্---এ যেন তার শৃঙখলের শব্দ---তার শেষ চেতনার আশ্রয়টুকুও সে কেড়ে নেবে---তার সত্তার শেষ স্বাতন্ত্র্যটুকু ঘুচিয়ে।

প্রতুলের মন হতাশ হয়ে আবার সেই দিনগুলিতে বুঝি ফিরে যেতে চায়।

বিকেল না হ'তেই কোথা থেকে পশ্চিম আকাশে মেঘ এসে জমা হচেছ কদিন ধরে। তারপর কালো মোষের পালের মত সে মেঘ দুরন্তভাবে আসছে ছুটে সমস্ত আকাশ ঢেকে; দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্য্যন্ত ধূলোর আর জঞ্জালের রাশ উড়িয়ে।

--এই ঝড়ের ভেতর কোথায় বেরুচেছন? একটু অপেক্ষা ক'রে যান।

প্রতুল কি কাজে ঠিক সেই সময়টিতে ওয়ার্ডে গিয়ে পড়েছে বলা যায় না, লতিকা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে একটু হেসে বলে,---আমার বাড়ীতে বড় দরকার, যেতে ইহবে এখন।

--ঝড়ে, ধূলোয় যে নাকানি চোবানি খাবেন!

---তা একটু খেলামই বা। আমার কি জানি কেন, ছেলেবেলা থেকে ঝড়-জলের ভেতর বেরুতে ভাল লাগে; ছেলেবেলা আমরা এমনি ঝড়ে আম কুড়োতে বেরোতাম।

লৌকিকতার জন্যে যেটুকু দরকার তার বেশী অনেকখানি ব'লে ফেলেছে বুঝেই লজ্জিত হয়ে বোধ হয় লতিকা হঠাৎ থেমে যায়।

প্রতুল উৎসাহিত হয়ে ওঠে---আপনাদের বাড়ী বুঝি পাড়াগাঁয়ে? তা আপনার স্বাস্থ্য দেখেই বোঝা যায় আপনি সহুরে নন।

হেসে ফেলে লতিকা বলে---মাইক্রসকোপে চোখ ডুবিয়ে থাকতে থাকতে ডাক্তারি গুলিয়ে ফেলেছেন! আমাদের পাড়াগাঁ ম্যালেরিয়ার ডিপো, সেখানে মানুষ একবেলা ভাত খায়, অন্য বেলা কুইনিন।

মুখ গম্ভীর ক'রে বলে প্রতুল,---আহা, আমিও ত সেই কথাই বলছি। পাড়াগাঁয়ে বাড়ী না হ'লে আপনার স্বাস্থ্য আরো ভালো হ'ত।

এবার হঠাৎ দু'জনেই হেসে ওঠে। টপ্ টপ্ ক'রে কয়েকটা বড় বড় ফোঁটা বৃষ্টি পড়ে তাদের চারিধারে। রাস্তা থেকে একটা ধূলোর প্রবাহ হঠাৎ তাদের গেটের কাছে ঘুরপাক খেয়ে, খেয়ালভরে ভেতরে ঢুকে পড়ে তাদের গায়ের ওপর দিয়ে বয়ে যায়। সে ধূলো যেতে যেতেই চোখ-ধাঁধানো বিদ্যুৎ-চমক। তার পরেই মেঘের গুরুগম্ভীর আওয়াজ। আকাশের মেঝেতে মস্ত একটা ভারী লোহার গোলা কে যেন ফেলে দিয়েছে, তার আওয়াজটা গড়াতে গড়াতে আকাশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে মিলিয়ে যায়। বৃষ্টির ফোঁটা আরো জোরে পড়তে আরম্ভ হয়েছে। ধূলোর ওপর ছোট ছোট জলের দাগ পড়ে। নীচের দিকে চেয়ে থাকলে মনে হয় ধরণীর যেন রোমাঞ্চ হচেছ। সুস্নিগ্ধ একটি সোঁদা মাটির গন্ধ উঠতে থাকে---সে গন্ধে যেন নেশা ধরে মনে।

প্রতুল হঠাৎ উৎসাহিত হয়ে বলে---চলুন, আমিও আপনার সঙ্গে বেরুচিছ!

---এই না ঝড়ে বেরুতে আমায় মানা করছিলেন!

প্রতুল নিজের উল্টো কথার জন্য বিন্দুমাত্র লজ্জিত না হয়ে বলে---দু'জনে বেরুলে দোষ নেই!

---বৃষ্টি কিন্তু আরো জোরে পড়ছে।

---ঝড়ও আরও জোরে বইছে।

---সুতরাং দোষ নেই, কেমন না?

---নিশ্চয়ই নেই। ধুলো ওড়ে না, জল পড়ে না এমন ঝড়-বৃষ্টিতে বেড়াতে চান নাকি?

দু'জনে হাসতে হাসতে গেট দিয়ে বেরোয়, রাস্তায় যেন আজ অতিরিক্ত ব্যস্ততা। ঝোড়ো হাওয়ার শব্দে, মেঘাচ্ছন্ন আকাশের স্তিমিত আলোয় সমস্ত পরিচিত দৃশ্যের রূপ যেন বদলে গেছে।

দু'জনে ভিজতে ভিজতে একটা দোতালা বাসের মাথায় গিয়ে ওঠে। এবার ঝড়ের চেয়ে বৃষ্টির প্রকোপ বেশী। সজোরে ছাট এসে লাগছে কাঠের সাশিতে। সামনের কাঁচের জানালার ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে সুদীর্ঘ আর্দ্র পথের রেখা।

ওপরে তারা দু'জনেই মাত্র আরোহী। গাড়ীর ঝাঁকুনির সঙ্গে সঙ্গে পরস্পরের দেহ স্পর্শ করতে থাকে। বৃষ্টিমুখর এই সন্ধ্যায় পাশাপাশি বসে থাকার ভেতর কি যেন একটা ইঙ্গিত আছে ভাবী কালের।

লতিকা হঠাৎ বলে---আপনি আর ৭নং বেডের খোঁজ নেন না যে?

---তাই ত ভুল হয়ে গেছে। কিন্তু তিনি ত আজ ক'দিন হ'ল ডিস্‌চারজড্ হয়েছেন না?

---তা হ'লে বুঝি আর খোঁজ নিতে নেই?

---আছে; কিন্তু অত সময় কই? পৃথিবীর সবাকার খোঁজ কি রাখতে পারি।

লতিকা হেসে বলে,---আপনারা অদ্ভুত লোক, আপনাদের অণুবীক্ষণের তথায় না এলে আর কোন পরিচয়ের উৎসাহ নেই।

প্রতুল হেসে বললে---ঠিক তা নয়। কাউকে কাউকে দূরবীক্ষণ দিয়েও খুঁজে ফিরি এবং পাই না।

---বিশ্বাস ত হয় না।

---ওই ত আমাদের দুর্ভাগ্য। আমাদের বুক পকেটে লোক শুধু ষ্টেথিস্‌কোপই দেখে, তার নীচে আর কিছু আছে ব'লে মনে করে না। সে যা হোক। ৭নং বেডের মহিলাটির সঙ্গে আপনার সম্পর্ক আছে নাকি কোন?

---আছে বই কি। তিনি আমার দিদি হন।

---তাই নাকি।

প্রতুল হঠাৎ চুপ হয়ে যায়। মনে হয় সম্পর্কটুকু তার বোঝা উচিত ছিল। এই ৭নং বেডের সম্পর্কেই তার সঙ্গে লতিকার প্রথম পরিচয়। প্রসূতির শরীরে বিশেষ কোন ব্যাধির স্পষ্ট লক্ষণ নেই---অথচ জ্বর হচেছ নিয়মিত। ডাঃ মৈত্র তাকে রক্তটা পরীক্ষা করতে বলেছিলেন। সেই রক্ত নিতে গিয়েই বিশেষ ক'রে সে লতিকাকে সেদিন দেখতে পায়। তার আগে হাসপাতালের আরো বহু সেবিকার ভীড়ে লতিকা ছিল প্রচ্ছন্ন হয়ে। সেদিন সে একটি স্বতন্ত্র রূপে দেখা দিল। পরিচ্ছন্ন শুভ্র বেশ, দেহ সুস্থ সবল মনে হ'লেও মুখটি কেমন একটু শীর্ণ। সে মুখের ঈষৎ পাণ্ডুর আভাই সেদিন তাকে মুগ্ধ করেছিল। লতিকা সযত্নে ঝুঁকে পড়েছে রোগিণীর বিছানার ওপর; চোখে তার সস্নেহ ব্যাকুলতা। প্রতুলের দেখে মনে হয়েছিল এই যেন মূর্ত্তিমতী শুশ্রূষা। কাঁটা বিঁধিয়ে শ্লাইডের রক্ত নেবার সময় লতিকা এসে রোগিণীর শীর্ণ হাতটি ধরেছিল। ঠিক বৈজ্ঞানিক তন্ময়তা তখন আর প্রতুলের ছিল না; অনিচ্ছাসত্ত্বেও রোগিণীর বদলে লতিকার নিটোল মসৃণ হাত দুটির দিকে সে একবার না চেয়ে পারে নি। হাত দুটি নিরাভরণ বল্লেই হয়---দুটি প্লেন বালা সে বাহুর সৌষ্ঠবের সঙ্গে যেন মিশে গেছে।

প্রতুল তার বর্ণহীন ডাক্তারি কণ্ঠে অভ্যাস মত বলতে যাচ্ছিল--কিছু ভয় নেই আপনার। মুখটা ওদিকে ফিরিয়ে থাকুন। পিঁপড়ের কামড় সয়েছেন ত। তবে আর কি?

লতিকা তার মাঝেই স্নিগ্ধকণ্ঠে বল্লে,---উনি ত শুধু একটু আঁচড় দেবেন। কিছু লাগবে না। হাতটা আলগা ক'রে রাখ।

কণ্ঠস্বর সত্যি বলতে গেলে ঠিক মধুর বীণানিন্দিত নয়---ঈষৎ ধরা ব'লেই মনে হয়---স্বরের প্রান্তগুলি যেন মসৃণ নয়, একটু খস্‌খসে---কিন্তু প্রতুলের সমস্ত মন স্নিগ্ধ হয়ে গেছল। লতিকার অবর্ণনীয় সুষমার সঙ্গে কণ্ঠস্বরটিরও অপরূপ সামঞ্জস্য আছে। প্রতুল সেই মুহূর্ত্তেই বুঝতে

পেরেছিল তার জীবন নূতন এক পাতা ওলটালে। প্রতিদিন কত মানুষের সংস্রবেই ত আসত হয়, তবু আমাদের গোপন সত্তা থাকে অবিকৃত; অবিচলিত। কিন্তু এবার বুঝি আর তা হবার যো নেই। রুদ্ধদ্বার সেই যে মনের গোপন মহল, যেখানে সমস্ত সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মানুষ একাকী বাস করে সেখানকার নিঃসঙ্গতা এইবার গেল ঘুচে। মনের বাইরের ঘর থেকে এই মেয়েটিকে বিদায় দেওয়া যাবে না। কেন যে যাবে না তা সে নিজেই ভাল ক'রে জানে না। কিন্তু হঠাৎ জীবনে ভোজ-বাজীর মত অদ্ভুত ব্যাপার যে একটা হয়েছে এ বিষয়ে তার আর কোন সন্দেহ ছিল না।

স্লাইডে বেডের নম্বর লিখে, সেটা ব্যাগ-জাত ক'রে উঠে আসবার সময় লতিকাও সঙ্গে সঙ্গে দরজা পর্য্যন্ত এসেছিল; মাথা নীচু ক'রে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কুণ্ঠিত স্বরে বলেছিল,--রিপোর্টটা একটু তাড়াতাড়ি পাওয়া যাবে ত? ডাঃ মৈত্র বলেছেন, রিপোর্ট না পেলে কিছু করতে পারবেন না।

সাধারণ একজন রোগিণীর জন্যে নার্সের এতখানি ব্যাকুলতার কোনো অর্থ হয় না। তখনই ভেতরে আরো কিছু আছে তার বোঝা উচিত ছিল। কিন্তু সে তেমন কিছু বোঝেনি। কণ্ঠকে যতদূর সম্ভব ডাক্তারী মর্য্যাদানুযায়ী উদাসীন করবার চেষ্টা ক'রে বলেছিল--ভয় নেই. ঠিক সময়ে পাবেন। তারপর লতিকার মিনতিকাতর দৃষ্টির সামনে হঠাৎ কেমন অস্বস্তি অনুভব ক'রে তর্ তর্ ক'রে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেছল----

প্রতুল হঠাৎ বুঝতে পারে খানিকক্ষণ সে অস্বাভাবিকভাবে চুপ ক'রে আছে। বাইরে বৃষ্টি আর ঝড়ের মধ্যে চলেছে প্রতিযোগিতা; বৃষ্টি একটু আসর জমিয়ে বসতে না বসতেই দমকা ঝড় নিয়ে যাচেছ তাকে হাঁকিয়ে। বৃষ্টিধারা হাওয়ার খেয়ালে নানাভাবে এঁকে বেঁকে পড়েছে। ঘনবর্ষণ হঠাৎ ফিকে হয়ে হাল্কা গুঁড়ি গুঁড়ি জলকণায় মিলিয়ে যাচেছ।

প্রতুল আগের কথায় খেই টেনে বলে---তিনি আপনার দিদি হন তা তখন ত বলেন নি---

---বলা কি দরকার ছিল! তাছাড়া তখন ত আলাপ হয়নি। শেষ কথাটা ব'লে লতিকা যেন একটু লজ্জিত হয়ে অন্য দিকে মুখ ফেরায়। পাটকরা চুলের তলায় তার কাণের দুলের দিকে চেয়ে প্রতুল বলে,---আলাপ কি এখনই হয়েছে?

কোন উত্তর নেই। লতিকা মুখ ফিরিয়ে অন্য কথা পাড়ে---হাওয়ায় সব মেঘ উড়িয়ে নিয়ে যাচেছ--তেমন বৃষ্টি হ'ল না।

---আমার যেমন ভাগ্য। কোথায় মুষলধারে বৃষ্টি পড়বে, পথঘাট ডুবে যাবে, বাস থাকবে নৌকোর মত মাঝ রাস্তায় আটকে, কেউ নামতে পারবে না; তা নয় দু'ফোঁটা জল ফেলে আকাশ একটু রসিকতা ক'রে গেল।

আপনার ত খুব সখ! ব'লে লতিকা হাসে!

তারপর পাতার পর পাতা উল্টে যায় মনের ভেতর---বর্ষার প্রতীক্ষা-ব্যাকুল ও আগমনী-মুখর দিনের পাতা।

দিনের অসহ্য উত্তাপের পর রাত্রের দুঃসহ গুমোট। সমস্ত সৃষ্টি স্তব্ধ, থমথম করছে সমস্ত প্রকৃতি কার আবির্ভাবের অপেক্ষায়। আসছে, সে আসছে! আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত শব্দ ভয়ে বিস্ময়ে গেছে থেমে। সে আসছে! অন্ধকার দিগন্তে জমা হচেছ নিঃশব্দে তার পুঞ্জ পুঞ্জ সৈন্য-বাহিনী। থেকে থেকে দেখা যাচেছ সুদূর তাদের মশালের আলো। তারপর মধ্যরাত্রে হঠাৎ স্তব্ধতা গেল ভেঙে, আকাশের সমস্ত তারা নিভিয়ে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদকে লুণ্ঠন ক'রে ছুটল কালো ঘোড়সোওয়ারের দল, তীক্ষ্ণ বৃষ্টিধারার দীর্ঘ তীর ছুঁড়তে ছুঁড়তে আকাশের এক তীর থেকে আর এক তীরে; গুরু গুরু বাজতে লাগল রণ-দামামা, মশাল উঠতে লাগল ঝলসে। আকাশ জয় হয়ে গেল।

এমন রাতে কি ঘুমোন যায়! ছাদ থেকে নেমে এসে প্রতুল আকাশের দিকে চেয়ে থাকে জানালা দিয়ে। অপরূপ, অপরূপ এই লীলা। তারা-খচিত আকাশের বিস্ময় যতই থাক, তার

নিশ্চলতা, তার চিরন্তন স্থৈর্য্য মনকে এমন ক'রে দোলা দিতে পারে না। আজ যেন সমস্ত আকাশই উঠেছে দুলে, চলেছে অস্থিরভাবে ভেসে। সূর্য্যের উত্তাপে মেরুর তুষার-প্রান্তর যেমন ফেটে, ভেঙে, দুরন্ত বিশাল ভয়ঙ্কর স্রোত-ধারায় বয়ে যায়, তেমনি যেন বয়ে যাচেছ আজ আকাশ। কোথায় ধরেছে তার ভাঙ্গন, নেমেছে বিপুল ঢল, বড় বড় পাষাণের চাই যাচেছ তীরবেগে সে স্রোতে ভেসে। শিলার সঙ্গে শিলার ধাক্কায় ঠিকরে উঠ্ছে আগুনের স্ফুলিঙ্গ।

সত্যি তা হ'লে এলো বর্ষা। কাল লতিকাকে কি নাকালই করা যাবে। আজই তাদের কথা হয়েছে। লতিকা বলেছে, কদিন একটু কাল-বৈশাখীর হাক ডাক দিয়ে আকাশ কেমন বেমালুম চুপ ক'রে গেছে দেখেছ। একটা মেঘের টুকরোও দেখা যায় না। এ গরম আর সহ্য হয় না বাপু।

---আজ কিন্তু যে রকম গুমোট, রাত্রে ঠিক বৃষ্টি হবে মনে হচেছ!---বলেছে প্রতুল।

---আজ ত কিছুতেই হবে না।

---ঠিক হবে দেখো রাত্রে।

---কখ্খন না।

---আচছা বাজী রাখ।

--বাজী রেখে কেন হারবে। পোকা-মাকড়ের ডাক্তার, তুমি মেঘ-বৃষ্টির কি জান?

---পোকা-মাকড় ছাড়া আরো অনেক কিছু আজকাল জানতে হচেছ!

---কেন বলো দেখি?

প্রতুল চট্ ক'রে ব'লে ফেলেছিল---তোমার জন্যে!

আরো কয়েকটা পাতা। দিনরাত এবার মেঘের বাহিনী চলেছে অলস মন্থর গতিতে দিনের আলোকে স্নিগ্ধ আর রাত্রের অন্ধকারকে প্রগাঢ় ক'রে। সে মেঘ কখনও খেয়াল ভরে থামে, আকস্মিক করুণায় নেমে আসে কালো হয়ে আরো নীচে, গলে পড়ে দরবিগলিত ধারায়। কখনও বা দিনের পর দিন শুধু ভেসে চলে। আকাশ কিন্তু আর নিরবচিছন্নভাবে নীল হবার সুযোগ পায় না, তাতে রঙের রেখার বৈচিত্র্য এসেছে। অন্য সময়ে পৃথিবী থাকে চঞ্চল, আর শান্ত, সমাহিত, ধ্যানমগ্ন, আকাশ থাকে নিস্পন্দ। আজ আকাশের ধ্যান ভেঙেছে---পৃথিবীর চেয়ে সেখানে বেশী চঞ্চলতা, বেশী ব্যস্ততা। খেয়ালের তার অন্ত নেই।

---বাঃ বর্ষাতিটা না নিয়েই বেরিয়েছ। বেশ লোক ত। খুব ভিজেছ নাকি?

---না, বৃষ্টি জোরে আসবার আগেই পৌঁছে গেলাম যে!

---তবু ওটা সঙ্গে রাখতে ক্ষতি কি? আর একটু আগে বৃষ্টি হ'লে ত ভিজতে।

---তাহ'লে খারাপ আর কি হ'ত? ভিজে হয়ত জ্বর হ'ত। জ্বর হ'লে নার্স রাখতাম একটা।

---নার্স রাখলে সে শুধু জল বার্লি খাইয়ে রাখত। আর কিছু দিত না।

---তাই সুশীল সুবোধ বালক হয়ে খেতাম। এবং কিছুতেই ভালো হ'তে চাইতাম না! কিন্তু এখন যখন জ্বর হয়নি, তখন দিদির হাতের চা চাই!

---রক্তপাত ক'রে দিয়ে আবার চা চাইতে লজ্জা করে না!

---রক্তপাত ক'রেই ত চায়ের হাত মিষ্টি ক'রে দিয়েছি। এখন চা করতে হাঙ্গামা হবে না ত দিদি?

দিদি যেমন নিরীহ, তেমনি মুখচোরা। কোলের ছেলেটাকে লতিকার হাতে দিয়ে একটু হেসে বলেন---আমি চা করতেই যাচিছলুম। উনি এখুনি আসবেন।

লতিকা ঠাট্টা ক'রে বলে,---কথাটা বুঝলে ত! তোমার জন্যে নয়, 'উনি' আসবেন ব'লেই দিদি চা করতে যাচিছলেন।

দিদি অপ্রস্তুত হয়ে চলে যেতে যেতে বলেন,---আহা আমি বুঝি তাই বলছি!

দিদি চলে যাবার পরে হঠাৎ লতিকা মাথা নীচু ক'রে মৃদুস্বরে বলে---তোমার পাসপোর্ট পেয়েছ?

প্রতুল জিজ্ঞাসুভাবে তার দিকে তাকাতেই সে আবার বলে---আমায় লুকোচ্ছ কেন? আমি সব ত শুনেছি।

মুখে তার হাসি কিন্তু স্বরে কাতরতা নয় কি?

প্রতুল বলে, কি তুমি শুনেছ?

তুমি গ্র্যাণ্ট পেয়ে গেছ, জার্ম্মাণী যাচ্ছ, সেখানকার ডিগ্রীর জন্য!

দু'জনের নীরবতা বাইরের প্রবল ধারাপতনের শব্দে ভরে উঠেছে। প্রতুল ধীর ধীরে বলে----গ্র্যাণ্ট পেয়েছি কিন্তু আমি কোথাও যাব না লতা।

তারপর একটু থেমে আবার বলে---ভালো চাকরী বা পয়সার জন্যই বিদেশের ডিগ্রী দরকার, রিসার্চ্চ এদেশেই করা যায় ইচ্ছে করলে!

কয়েকটা অত্যন্ত ভিজে ঠাণ্ডা দিনের পাতা! তারপর কাল রাত থেকে যে বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে এখনও তার বিরাম নেই। পড়ছে ত পড়ছে অবিশ্রান্তভাবে। আকাশের মেঘে সে গতি, সে লীলা গেছে থেমে, বৈচিত্র্য গেছে মুছে। এখন সমস্ত একাকার হয়ে গেছে---সব বর্ণ সমন্বয় হয়ে আকাশ হয়েছে একরঙ্গা! যেন পুরু সীসার পাতে মোড়া ব'লে মনে হচ্ছে। সে পাতের কোথাও জোড় নেই, তা নিশ্ছিদ্র। সেই ফ্যাকাশে আকাশ থেকে অবিশ্রান্ত ঝরে পড়ছে জল। রাস্তার ধারে ছোট ছোট জলের স্রোত চলেছে কল কল ক'রে। ছাদের জল একঘেয়ে ঐক্যতান সুরে পড়ছে ছড়ছড়িয়ে। পৃথিবীর ওপর কে যেন শব্দের একটা আবরণ দিয়েছে টেনে। রাত্রির অন্ধকারে বিরামহীন ধ্বনির এই আচ্ছাদন ভারী ভালো লেগেছিল, সমস্ত চেতনাকে কোমলভাবে অতি অন্তরঙ্গভাবে সে আচ্ছাদন ছিল জড়িয়ে, ঢেকে। সেই শব্দের মধ্যে চাদর মুড়ি দিয়ে মন নিশ্চিন্ত আয়াসে কল্পনা-বিলাস উপভোগ করছে। এখন কিন্তু ব্যাপারটা একটু একঘেয়ে হয়ে পড়েছে, শব্দের সে সুরও যাচ্ছে থেকে থেকে কেটে। ভিজে কাকের দলের কোলাহল, বাইরে গাড়ীর চাকার আওয়াজ, জাগ্রত মানুষের নানা ব্যস্ততার শব্দ, বৃষ্টির সুরকে কর্কশ ক'রে তুলছে, তবু প্রতুলের ভালো লাগছে না এমন কথা বলা যায় না।

বর্ষাতি গায়ে এঁটে মাথায় ছাতা ধরে সে যখন বেরিয়ে পড়ল তখনও বৃষ্টি পড়ছে সমানভাবে। এমন সুরক্ষিতভাবে বৃষ্টির ভেতর বেরুবার ভারী একটি আনন্দ আছে--ছেলেমানুষী আনন্দ! শত্রুর দুর্ব্বল আঘাত তোমার বর্ম্মে ঠেকে নিষ্ফল হয়ে যাচ্ছে, তুমি অক্ষত দেহে নিরাপদে ঘুরে বেড়াচ্ছ এমনি একটা ভাব যেন হয় মনে। পিচ্ ঢালা রাস্তার ওপর বৃষ্টির দীর্ঘ প্রবল ধারা আঘাত করছে। নীচের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে মনে হয় বৃষ্টি বুঝি ওপর থেকে পড়ছে না; মাটির নীচে থেকেই জাগছে অদ্ভুত জলের ফুল, মুহূর্ত্তের আয়ু নিয়ে জাগছে আর যাচ্ছে মরে।

প্রতুল ল্যাবরেটারিতে পৌঁছল একটু দেরিতে। ছাতাটা মুড়ে রেখে বর্ষাতিটা খুলে টাঙিয়ে রাখছে, এমন সময় সহকারী এসে খবর দিলে, ডাঃ মৈত্র দুবার খোঁজ নিয়েছেন। প্রতুল এসেই যেন তাঁর সঙ্গে দেখা করে।

প্রতুলের মুখ উঠল কঠিন হয়ে এক মুহূর্ত্তে। বল্লে--যাচ্ছি বলগে যাও। এ খোঁজ নেওয়ার অর্থ সে জানে। ডাঃ মৈত্র কি বলবেন তাও তার অজানা নয়। ক'দিন ধরেই সে এটির জন্যে অপেক্ষা করছিল। এর মধ্যে অনেক কাণাঘুষা, অনেক গুঞ্জন তার কাণে এসেছে। কাজটা নাকি ভাল হচ্ছে না, ষ্টাফের প্রেষ্টিজ যায়, হাসপাতালের সুনামে দাগ ধরে। ডাঃ মৈত্র অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়েছেন নাকি---এতটা বাড়াবাড়ি তিনি পছন্দ করেন না ইত্যাদি। প্রতুলের অপরাধ এই যে, নিজের মনের ভেতর গ্লানি নেই ব'লে ব্যাপারটাকে আর পাঁচজনের মত লুকিয়ে রাখবার ব্যবস্থা সে করেনি। সে অনায়াসে স্পষ্ট দিবালোকে নিজেকে অসঙ্কোচে প্রকাশ করেছে। প্রতুলের ঘোরতর অপরাধ এই যে, সে শুধু মজা ক'রে সন্তুষ্ট থাকতে পারেনি, সাধু উদ্দেশ্য নিয়ে গভীরভাবে ভালবেসেছে!

কঠিন মুখ নিয়ে সে ডাঃ মৈত্রের ঘরে গেল। মনে মনে সঙ্কল্প তার স্থির হয়ে গেছে। ডাঃ

মৈত্র যেই হোন, তাঁর বাঁকা হাসি, শাণিত বিদ্রূপ সে সহ্য করবে না কিছুতেই। লতিকার অপমান সে হ'তে দেবে না। ঘরে ঢুকেই কিন্তু সে অবাক হয়ে গেল। ডঃ মৈত্র সহাস্যে চেয়ার থেকে দাঁড়িয়ে তাকে অভ্যর্থনা করলেন--তোমাকে সকাল থেকে খুঁজছি কন্‌গ্র্যাচুলেট করবার জন্যে। চমৎকার! তোমার পেপার চমৎকার হয়েছে। কোলাইগ্রুপ সম্বন্ধে এমন দামী গবেষণা আর কেউ করেনি।

প্রতুল অভিভূতের মত বসে পড়ল একটা চেয়ারে। ডাঃ মৈত্রের শীর্ণ, কুৎসিত মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে আনন্দে,---আমি গোড়া থেকেই জানতুম প্রতুল, তোমার ভেতর অসাধারণ পার্টস্ আছে। তুমি আমাদের হাসপাতালের গৌরব। কিছুদিন বাদে বলব দেশের গৌরব।

প্রতুল লজ্জিত হয়েই এবার কথা বলতে পারে না।

---তারপর! তোমার সব আয়োজন সম্পূর্ণ হয়েছে তো? এই মাসেই ষ্টার্ট ক'রে ফেল। একটু রাফ প্যাসেজ হবে---তাতে কি ভয়?

প্রতুল একটু চুপ ক'রে থেকে হঠাৎ গম্ভীরভাবে বল্লে---আমি যাব না ঠিক করেছি।

---যাবে না? বলছ কি হে?

---ডিগ্রীতে আমার দরকার নেই, রিসার্চ্চ ত আমি এখানেই করতে পারি।

---পাগল! তোমায় ডিগ্রীর জন্যে আমি যেতে বলছি মনে করছ--মোটেই না! ডিগ্রীর দরকার আমাদের মত সাধারণ লোকের, তোমার নয়---রিসার্চের জন্যই তোমাকে যেতে বলছি। সেখানে কত ফেসিলিটিজ্। কত নতুন টেকনিকের সঙ্গে হাতে-কলমে পরিচিত হয়ে আসবে। ছি ছি প্রতুল, এমন কাজ কোরো না, নিজেকে অপব্যয় করবার তোমার অধিকার নেই।

একটু হেসে ডাঃ মৈত্র আবার বল্লেন---হট্ ক'রে একটা কিছু ঠিক কোরো না; একটু ভেবে দেখো গে যাও। এই সঙ্গে আর একবার বলছি---তোমার পেপার অদ্ভুত হয়েছে!

প্রতুল উঠে বেরিয়ে আসছিল। ডাঃ মৈত্র তার দিকে এক চোক বন্ধ ক'রে ঘাড় কাৎ ক'রে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে দুষ্টামির হাসি হেসে বল্লেন---তোমার সম্বন্ধে ওরা সব নানান কথা বলছে যে প্রতুল! ভালো, ভালো, তার জন্যও কন্‌গ্র্যাচুলেশন।

মুখের হাসি নিভিয়ে একটু গম্ভীরভাবে ডাঃ মৈত্র আবার বল্লেন, কিন্তু দেখো তলিয়ে যেও না বাপু! বড় কঠিন সাধনা তোমার! একটু আধটু সাধনায় ওরা লাগে বটে কিন্তু দরকার হ'লেই ছেদ করতে হবে। এ তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করতে গেলে নির্ম্মম হ'তে হবে। নীচের তলায় যা হচ্ছে হোক কিন্তু ওপরের ঠাকুর ঘরে কোন গোল না পৌঁছয়!

আকাশের মুখ সমান ফ্যাকাশে হয়ে রইল। মেঘের পর্দ্দার আড়াল দিয়ে সূর্য্য গেল আকাশ পার হয়ে। বৃষ্টি কখন একটু থামল, কখনও আবার এল প্রবলভাবে। প্রতুল সারাদিন রইল অনিশ্চয়তার দোলায় দোদুল্যমান। ডাঃ মৈত্র সত্যি তাকে ভাবিয়ে তুলেছেন। সে যাবে কি না?

দুদিন বাদে সঙ্কল্প যখন তার স্থির হ'ল তখন আকাশের সীসের পাতা গলে যেতে সুরু করেছে, নানা জায়গায় দেখা দিয়েছে ফাটল। এখানে সেখানে উঠেছে ধোঁয়ার কুণ্ডলি। বৃষ্টি কিন্তু গেছে ধরে। এই দুদিন সে লতিকার সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করেনি। আজ খোঁজ নিতে গিয়ে অবাক হয়ে গেল। এ ওয়ার্ডে সে নেই। কোথায় সে? কে একজন বল্লে---বোধ হয় টি বি ওয়ার্ডে ট্রান্সফারড্ হয়েছে।

টি বি ওয়ার্ডে! স্তব্ধ হয়ে খানিক প্রতুল দাঁড়িয়ে রইল, তারপর অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে চল্‌ল ডাঃ মৈত্রের ঘরের দিকে। এ ব্যাপারের কৈফিয়ৎ চাই। কাটা দরজা ঠেলে সে একটু তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ডাকলে---ডাঃ মৈত্র! টেবিলে বসে হাতের কাগজটা থেকে মুখ তুলে ডাঃ মৈত্র স্মিতমুখে বললেন---কে প্রতুল! এস এস!

প্রতুল কিন্তু আর কিছু বলতে পারলে না। সে স্তব্ধ হয়ে গেছে। ডাঃ মৈত্রের টেবিলের ধারে কাগজপত্রের ফাইল হাতে দাঁড়িয়ে লতিকা প্রতুলের

দিকে সবিস্ময়ে একবার তাকিয়ে সে মুখ নীচু ক'রে সলজ্জ হাসি গোপন করলে।

না, প্রতুলের পক্ষ থেকে এখন কিছু বলা সম্ভব নয়। লতিকার সামনে তারই কথা তুলে কৈফিয়ৎ চাওয়া যায় না। আর তা ছাড়া কি কৈফিয়ৎ সে দাবী করতে পারে? টি বি ওয়ার্ডে কি নার্স থাকে না? লতিকা বিশেষ সুবিধাই বা পাবে কেন? প্রতুল খানিক ইতস্ততঃ ক'রে হঠাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

গাঢ় ছায়াচ্ছন্ন কয়েকটি দিন পার হয়ে গেল। আকাশের সীসের পাতের ফাটল গেছে জুড়ে। বৃষ্টির আর বিরাম নেই, ছেদ নেই। মন এবার ক্লান্ত হ'তে সুরু করেছে প্রকৃতির এই একঘেয়ে রূপে; রাত্রে আশা হয় সকালে হয় ত মেঘ কেটে যাবে, দেখা যাবে একটু নীল আকাশ। সকালবেলা হতাশ হ'লেও মনে হয় এ বৃষ্টি সারাদিন কখনও থাকতে পারে না, বিকেলের দিকে নিশ্চয়ই ধরে যাবে। একটু হাঁপ ছেড়ে বাঁচা যাবে, কিন্তু বৃষ্টি পড়তে থাকে অবিশ্রান্তভাবে;---আকাশে এতটুকু পরিবর্ত্তন নেই। পৃথিবী এরই মধ্যে ম্লান হয়ে এসেছে, তার ঔজ্জ্বল্য গেছে মুছে। রাস্তাঘাটগুলো কেমন অত্যন্ত নোংরা মনে হয়, পথের ধারের বাড়ীগুলো শ্রী হারিয়েছে, সর্ব্বাঙ্গে বার্দ্ধক্যের নেচেতার দাগ।

কদিন ধরে প্রতুল লতিকার সুবিধামত দেখা পাচ্ছে না, হাসপাতালে দেখা করার অত্যন্ত অসুবিধে। লতিকার নতুন ওয়ার্ডে গিয়ে কাজ বেড়েছে। বাড়ীতে বৃষ্টির ভেতরই প্রতুল যায়। কখনও দিদি, কখনও দিদির স্বামী বিনোদবাবু তাকে অভ্যর্থনা করেন, কিন্তু লতিকার দেখা মেলে না। হয়ত সে এই মাত্র বেরিয়ে গেছে। নয়ত সে এখনও ফেরেনি। হাসপাতালে যাবার সময়ও তাব বদলে গেছে। এক দিন তবু পথে দেখা হ'ল।

---বাঃ বেশ ত তুমি!---প্রতুলের কণ্ঠস্বরে অভিমান, বেদনা, অভিযোগ। লতিকা কেমন যেন একটু আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার চোখে কি অস্পষ্ট আতঙ্কের ছায়া!

প্রতুল আবার বল্লে,---তোমার সঙ্গে গত শতাব্দীতে দেখা হয়েছিল, তারপর কত কথা জমে উঠেছে জান?

লতিকা একটু হাসল। সে হাসিও যেন তার গভীর আতঙ্ক ও বেদনাকে স্পষ্ট ক'রে তুললে।

---কাল বিকেলে বাড়ী থাকা চাই, বুঝেছ?

লতিকা অস্পষ্ট স্বরে বললে,---আচ্ছা!

লতিকা রাজী হয়েছিল বিকেলে বাড়ী থাকতে, কিন্তু তাকে পাওয়া গেল না সে সময়ে; ডাঃ মৈত্র কি জরুরী কাজে তাকে আটকে রেখেছেন।

পাঁচ দিন ধরে সূর্য্যের মুখ দেখা যায় নি। এই সৃষ্টির ভেতর সূর্য্য আছে ব'লে আর মনে হয় না। ছানিপড়া চোখের মত ঘোলাটে কুৎসিত আকাশের দৃষ্টি; জল পড়ছে আর পড়ছে, ধীরে ধীরে ক্লান্ত একটানা সুরে। মুষলধারে এক পশলা হয়ে গেলেও বুঝি একটু স্বস্তি পাওয়া যেত। কিন্তু তা হবে না। প্রতি মুহূর্ত্তে মনকে আরো আচ্ছন্ন, আরো নিস্তেজ ক'রে ধীরে ধীরে বৃষ্টি ঝরছে।

ভাল ক'রে ভোর না হ'তেই প্রতুল সেদিন বেরিয়ে পড়ল, আজ সে লতিকার সঙ্গে দেখা করবেই। ভোরের সদ্যোজাত আলোতেও রুগ্ন নগরের কেমন একটা আচ্ছন্ন ভাব। ওপর থেকে পড়ছে বৃষ্টি, নীচে থেকে উঠছে একটা কুৎসিত ধোঁয়াটে কুয়াশা! প্রতুল লতিকাদের কড়া নাড়ল। বিনোদবাবু এসে দরজা খুললেন---আসুন! খুব সকালে এসেছেন ত!

দু'জনে ঘরের ভেতর ঢুকল। প্রতুল জিজ্ঞাসা করবার আগেই বিনোদবাবু বল্লেন,---লতিকা এখনও বাড়ী ফেরে নি।---তিনি যেন চিন্তিত।

---বাড়ী ফেরেনি! এখন ত তার নাইট-ডিউটি নয়!

---না, কোন একটা কেসে ডাক্তারবাবু ডেকে নিয়ে গেলেন। গেছে সেই সন্ধ্যের সময়। আপনি বসুন, এখুনি হয়ত আসবে।

প্রতুল বসল। ভেতর থেকে এখনও রাত্রি যেন বিদায় নেয় নি। অস্পষ্ট অন্ধকারে সব আব-

ছায়া দেখাচেছ। মনের ভেতরেও অমনি আবছায়া সব চিন্তা।

দাঁড়ান, চা করতে বলিগে---বিনোদবাবু ভেতরে গেলেন। প্রতুল রইল বসে। অনেকক্ষণ, সুদীর্ঘ যুগ ধরে যেন রইল বসে।

হঠাৎ বাইরে মোটর থামার আওয়াজ। প্রতুল নিজের অজ্ঞাতেই উঠে দাঁড়াল গিয়ে দরজায়। মোটর থেকে লতিকা উঠে আসছে, ডাঃ মৈত্র তাকে হাত নেড়ে বিদায় সম্ভাষণ জানাচেছন।

লতিকা আরো কাছে এলো, হঠাৎ প্রতুলকে দেখে চমকে উঠে বল্লে---কে? ওঃ আপনি!

লতিকাকে অত্যন্ত ক্লান্ত দেখাচেছ, তার দুর্ব্বলতা যেন অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এবার; মুখ তার অস্বাভাবিক রকম শীর্ণ! সারারাত্রি জেগে সেবা করার পরিশ্রম নিশ্চয়।

লতিকা ক্লান্ত পা টেনে টেনে এসে ঢুকল, তারপর এলিয়ে পড়ল একটা চেয়ারে।

---বড় ক্লান্ত হয়েছ লতিকা?

লতিকা চোখ খুলে তার দিকে তাকাল। দৃষ্টিটা কেমন একটু অদ্ভুত না? সত্যি কি সে চোখে গভীর ভয়ের আভাষ!

---কদিন তোমার দেখা পাইনি, তাই আজ ভোরেই চলে এলাম। কথার মাঝখানে হঠাৎ লতিকা উঠে পড়ল,---বোসো, কাপড় ছেড়ে আসছি।

না, না, তারই ভুল; এই ত লতিকা বেশ সহজভাবে কথা কইলে। অন্ধকার কত ভ্রান্তির সৃষ্টি করে।

লতিকা কাপড় চোপড় ছেড়ে এসেছে, কিন্তু চেহারা বদলাতে পারেনি। মুখ তার আরো শীর্ণ, কয়েকটি অদৃষ্টপূর্ব্ব রেখা তাকে যেন আরো কঠিন ক'রে তুলেছে, লতিকা এসে চেয়ারে বসে সহজভাবেই বোধ হয় বল্লে,---চা পাওনি ত এখনও?

---না।

খানিক নীরবতা। বাইরে থেকে বৃষ্টির চাপা শব্দ আসছে, হিংস্র কোন শ্বাপদের সতর্ক সঞ্চরণের মত।

--লতিকা!

লতিকা মুখ ফেরাল।

--তোমায় আজ কটা কথা বলতে এলাম। প্রথম হচেছ---আমি গ্র্যাণ্ট প্রত্যাখ্যান করেছি!

---কেন?

প্রতুল একটু হেসে বল্লে---কেন জিজ্ঞাসা করছ?

হঠাৎ লতিকার একি হ'ল! তীক্ষ্ণ তীব্র স্বরে বল্লে---হ্যাঁ, কেন জিজ্ঞাসা করছি। তুমি যা বলবে তাও জানি অবশ্য। বলবে---আমার জন্যে! কিন্তু কেন আমার জন্যে তুমি এত বড় ত্যাগ করবে? এ তোমার ত্যাগ তো নয়, আমার ওপর তোমার এ অত্যাচার। সারাজীবন ধরে তুমি এই ভেবে গর্ব্ব করবে যে, আমার জন্য তুমি তোমার সমস্ত ভবিষ্যৎ বিসর্জন দিয়েছ, আমার জন্যে করেছ অসামান্য আত্মত্যাগ। সমস্ত জীবন আমায় তুমি রাখতে চাও অপরাধী ক'রে। তোমার সে আত্মপ্রসাদের দৃষ্টির বিষে আমার জীবন জর্জ্জরিত করতে দেব না, কিছুতেই আমি দেব না তোমায় তা করতে, তোমার এই ত্যাগ আমি চাই না।

যেমন অকস্মাৎ আরম্ভ হয়েছিল তেমনি অকস্মাৎ লতিকার তীব্র স্বর গেল মিলিয়ে উচছ্বসিত কান্নায়। চেয়ারের ধারে লুটিয়ে পড়া তার দেহ দুলে দুলে উঠতে লাগল কান্নার জোয়ারে।

স্তম্ভিত হয়ে প্রতুল একবার বল্লে,---আমি কিন্তু তা' ত বলতে চাইনি লতিকা! আমার আরো কথা ছিল যে!

লতিকা সোজা হয়ে উঠে বসল। দুঃসহ যন্ত্রণার রেখা তার মুখে। কিন্তু স্বর তার কঠিন---না, না, আমি কোন কথা শুনতে চাই না! তুমি যাও, তুমি এখান থেকে যাও!

দুর্বোধ, সমস্ত একেবারে দুর্বোধ। প্রতুলের সমস্ত যেন ঘুলিয়ে যেতে থাকে চোখের সামনে, মনের ভেতর।

নতিকা আবার বল্লে,---তোমায় মিনতি ক'রে বলছি, তুমি এখান থেকে যাও, আর আমার সঙ্গে দেখা কোরো না, কখনও না! নিজেকে আর অপমান তুমি কোরো না।

শেষ কথাগুলি আবার কান্নায় ভারী হয়ে এসেছে। আচ্ছন্নের মত প্রতুল উঠে দাঁড়াল, তারপর রাস্তায় বেরিয়ে এল।

একঘেয়ে একটানাভাবে তখনও মৃত মুখের মত পাংশুবর্ণ আকাশ থেকে বৃষ্টি পড়ছে অবিশ্রান্ত।

পরোপকার

আমাদের বেদ উপনিষদ পুরাণে কেন যে পরোপকারের এত প্রশংসা তা আজ আমি বুঝেছি। সেই যে মাণ্ডুক্য পুরাণে বলেছে,--"ততো--- না, না 'ততো---' নয়, ইয়ম্---ইয়ম্--- ইয়ম্ কি? যাকগে।

আসল কথা পরোপকারের চেয়ে বড় ধর্ম্ম আর কিছু নেই। আর এমন বিমল আনন্দ জীবনের আর কিছুতেই কখনও পাওয়া যায়?"

আমি অন্ততঃ তা স্বীকার করব না, আর আমার চেয়ে বড় সাক্ষী এ ব্যাপারের কেউ থাকা সম্ভব নয়, কারণ পরোপকারের ফল সদ্য সদ্য আমি প্রত্যক্ষ দেখে আসছি।

হ্যাঁ, সত্যিই আমি পরোপকার করেছি শেষ পর্য্যন্ত এবং করেছি আর কারুর নয়, আমার বাল্যবন্ধু মহিতোষের। অনেকদিন ধরে এটা অবশ্য তার পাওনা ছিল, কারণ ছেলেবেলা থেকে সে বরাবর আমার উপকার ক'রে এসেছে।

নিতান্ত স্বার্থপর নীচ ব'লেই আমি তার প্রতিদান দেবার কোন চেষ্টা এ-পর্য্যন্ত করিনি। কিন্তু বিবেকের দংশন শেষ পর্য্যন্ত আমার অসহ্য হয়ে উঠেছে। আত্মহারা হয়ে আমি তার উপকারের কিছুটা শোধ দিয়েছি।

মহিতোষের মত পরোপকারী ছেলে অবশ্য পৃথিবীতে খুব কমই দেখা যায়। পরের উপকার করবার জন্যেই যেন তার জন্ম। সারাক্ষণ পরের উপকার ছাড়া আর তার কোন চিন্তা নেই এবং এ মহত্ত্ব ছেলেবেলা থেকেই তার মধ্যে পরিস্ফুট। একই স্কুলে আমরা দু'জনে পড়েছি এবং তখন থেকেই তার কাছে যে সব উপকার পেয়েছি তা কোনদিন ভোলবার নয়। উপকার অবশ্য সে শুধু আমার একারই করত না, তার সামনে পড়লে উপকার না পেয়ে কারুর পার পাবার উপায় ছিল না।

উপকার করা তার চরিত্রের এক রকম কণ্ডূয়ন বলা যায়। কাউকে দেখলেই তা চুলকে উঠে। প্রথম যেদিন স্কুলে ভর্ত্তি হই, সেদিনই তার চরিত্রের এ চর্ম্মরোগের পরিচয় পাই। সবে সেই ক্লাসে এসে অপরিচিত ছেলেদের ভেতর বসেছি। বই-পত্র কিছুই সঙ্গে নেই। সংস্কৃতের ঘণ্টায় পণ্ডিত মশাই ক্লাসে এসে কটা শব্দরূপ লিখতে হুকুম করলেন; তাঁর চেহারা আর বচন যা শুনলাম তাতে আমার তখন হৃদকম্প সুরু হয়ে গেছে। আজ সবে স্কুলে নতুন ভর্ত্তি হয়েছি একথা তাঁকে সাহস ক'রে বলা আমার ক্ষমতায় কুলোবে না। আর নতুন ছেলে হ'লেও বই খাতা পত্তর না নিয়ে স্কুলে আসা তিনি বরদাস্ত করবেন ব'লে মনে হ'ল না। যে রকম বিছের কামড়ের মত তাঁর টিপ্পনির নমুনা, তাতে হয়ত ব'লে বসবেন, এখানে কি তাহ'লে হাওয়া খেতে এসেছ নবাব সাহেব! গড়ের মাঠে গেলেই পারতে!

কি করব ভেবে না পেয়ে চোখে অন্ধকার দেখছি, এমন সময় বেঞ্চির নীচে পায়ে একটা জুতোর ঠোক্কর অনুভব করলাম। নেহাৎ পণ্ডিত মশাই-এর প্রতাপ তখন বুঝে নিয়েছি; নইলে হয়ত আর্ত্তনাদ ক'রে উঠতাম। উদ্গত চীৎকারটা কোন রকম দাঁতে চেপে পাশের দিকে চেয়ে দেখি, গোলগাল নাদুস নুদুস একটি ছেলে হায়ার বেঞ্চের তলায় বাঁ হাতে আমার দিকে একটি খাতা ও

পেন্সিল এগিয়ে ধরে আছে। তার হস্তী-বিনিন্দিত চোখে সে কি অসীম করুণা! খাতা পেন্সিল পেয়ে কৃতজ্ঞতায় একেবারে গলে গেলাম। তখনো জানি না কৃতজ্ঞতার সেই সবে শুরু। সারাজীবন যার উপকারের ধারা আমার উপর অবিরাম বর্ষিত হবে তার নাম যে মহিতোষ তাও তখনও জানি না। শব্দরূপ আমার ভাল রকম মুখস্থ। অনেকের আগেই তাই পণ্ডিত মশাই-এর টেবিলের ওপর খাতা রেখে এলাম। সকলের খাতা দেওয়া হয়ে গেলে পণ্ডিত মশাই দেখা শুরু করলেন। খাতা দেখা তো নয়,---অস্ত্র নিক্ষেপ ও তা থেকে আত্মরক্ষার একটা মহড়া। পণ্ডিত মশাই এক একটি খাতার ওপর একটু চোখ বোলান আর এক একটি বোলতার হুলের মত টিপ্পনির সঙ্গে সেটি লেখকের উদ্দেশে ছুঁড়ে মারেন। মাথা বাঁচিয়ে সে খাতা উদ্ধার করা বেশ কৌশল সাপেক্ষ। পণ্ডিত মশাই-এর টিপ প্রায় অব্যর্থ। এরই মধ্যে খাতা না ছুঁড়ে হঠাৎ যদি কারুর নাম ধরে ডাকা হয় তাহ'লে একটু গর্ব্ববোধ করা বোধ হয় স্বাভাবিক। শব্দরূপটা আমার ভালোই আসে এবং পণ্ডিত মশাই নিশ্চয় তাতে মুগ্ধ হয়েছেন বুঝে একটু বিনয়ের হাসি হেসেই কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। পর মুহূর্ত্তে মাথায় একটি কড়া গাঁট্টা খেয়ে সে হাসি মিলিয়ে গেল।---ওহে, মাইকেল এঞ্জেলো না নন্দলাল! এটা কি আর্ট স্কুল? লাল নীল পেন্সিলে চাল-চিত্তির আঁকা হয়েছে!

কানমলা সহযোগে আরো কয়েকটা গাঁট্টা খেয়ে খাতা নিয়ে নীরবে বেঞ্চিতে ফিরে এলাম। মহিতোষ আমায় লাল-নীল পেন্সিলই দিয়েছিল।

ক্লাস শেষ হবার পর টিফিনের ছুটিতে মহিতোষের সে কি আক্ষেপ। পরস্পরের প্রাথমিক পরিচয় তখন হয়ে গেছে। মহিতোষের আফশোষ আর থামে না দেখে আমাকেই তাকে সান্ত্বনা দিতে হ'ল---তোমার কি দোষ ভাই, তুমি ত ভালো করতেই গেছলে।

সত্যি ভাই।--মহিতোষের কণ্ঠ অত্যন্ত করুণ। পণ্ডিত মশাই যে লাল-নীলের ওপর অত খাপ্পা তা কি আমি জানি! আর আমার কাছে তাছাড়া আর বাড়তি পেন্সিল ছিল না।

যাক্ কি আর হয়েছে।---ব'লে একটু এগিয়ে যেতেই মহিতোষ ব্যস্ত হয়ে উঠল, ওকি, খোঁড়াচ্ছ কেন ভাই?

ও কিছু নয়।---ব'লে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু মহিতোষকে কি অত সহজে ঠকান যায়? তার জুতোর ঠোক্করে পায়ের যে জায়গাটা ছড়ে গিয়েছিল সেটা তাকে না দেখিয়ে ছাড়া পেলাম না।

এবার মহিতোষ একেবারে অস্থির হয়ে উঠল,---ছিঃ ছিঃ এত জোরে পা ছুঁড়েছি তা আমি বুঝতেই পারিনি।

তারপর এদিকে ওদিকে ব্যাকুলভাবে চেয়ে হঠাৎ উল্লসিত হয়ে বললে,---দাঁড়াও একটা জিনিষ দিচ্ছি, এখুনি ভালো হয়ে যাবে। খেলার মাঠের ধার থেকে কি একটা গাছের পাতা ছিঁড়ে এনে তার রস বেশ ভালো ক'রে ছড়া জায়গায় ঘষে দিলে।

সত্যি ছড়াটা শেষ পর্য্যন্ত ভালো হয়ে গেল। মাসখানেক বাদে একটু খুঁড়িয়ে হ'লেও আবার স্কুলে যেতে পারলাম। জায়গাটা পেকে উঠেছিল ব'লে ডাক্তারকে একটু কাটাকাটি করতে হয়েছিল এই যা। পা'টাই কাটতে হবে ডাক্তার একবার বলেছিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তার দরকার হয়নি। মাঝে মাঝে এখনও একটু খুঁড়িয়ে চলি, এইমাত্র।

স্কুলের পর কলেজ, তারপর জীবনের বিশাল ক্ষেত্র। মহিতোষ এখনো আমার সঙ্গে সঙ্গে না হোক কাছে কাছেই আছে। তার উপকার সমানেই পেয়ে আসছি। সে উপাখ্যান বলতে গেলে একটা কুরুক্ষেত্র মানে মহাভারত হয়ে যায়।

আমার বিয়ের ব্যাপারেই কি উপকারটা না সে করেছে।

সেদিন হঠাৎ ঘুম থেকে উঠেই দেখি, আমার মেসের ঘরে মহিতোষ এসে হাজির। মুখখানা তার বড় বেশী গম্ভীর, নীচের রেস্তোরাঁ থেকে চা, টোষ্ট, ডবল অমলেট আনিয়ে খাইয়েও তাকে প্রসন্ন করতে পারলাম না। কারণটা জানতে অবশ্য দেরী হ'ল না। খাওয়া দাওয়া শেষ ক'রে আমার

দিকে ফিরে প্রায় কাঁদ কাঁদ হয়ে বললে,---তুই আমাকে এত পর ভাবিস তা জানতাম না। এত বড় একটা ব্যাপার তুই আমায় ঘুণাক্ষরে কিছু জানাস নি !

ব্যাপারটা যে কি তা আমার বুঝতে বাকি নেই। আমতা আমতা ক'রে একটু লজ্জিত হয়েই বল্লাম,---মানে, এখনো সব ঠিক হয়নি কিনা। একটা বড় মুস্কিল - - - আর কিছু বলবার দরকার হ'ল না। মহিতোষের চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। আমার মুখের কথাটা কেড়ে নিয়ে সে বললে,---মুস্কিল, তবু আমায় বলিসনি !

এবার তাকে সব ভেঙ্গে বলতেই হ'ল। বিয়ে আমাদের অনেকদিন ঠিক হয়ে গেছে. শুধু গোল বেধেছে বিয়ের পর স্ত্রীকে কোথায় নিয়ে গিয়ে রাখব, তাই নিয়ে। মার ইচ্ছে বিয়ের পর বৌকে নিয়ে দেশে যাই। অন্ততঃ কিছুদিন সেখানে শ্বশুরের ভিটেয় নতুন বৌ নিয়ে তিনি আমোদ-আহ্লাদ যাতে করতে পান। আমার ভাবী স্ত্রী অপর্ণার তাতে কিছুমাত্র আপত্তি না থাকলেও তার বাবা তাতে রাজি ন'ন। একে একরোখা লোক, তার ওপর পয়সার কোন অভাব নেই। একমাত্র মেয়ে তাঁর একেবারে চোখের মণি। তিনি তাই কলকাতায় একটা বাড়ীই আমাদের জন্যে বন্দোবস্ত করতে চান কিন্তু মেয়েকে দুদিনের জন্যেও গ্রামে কিছুতেই পাঠাবেন না। এই মত-বিরোধের জন্যেই বিয়েটা আটকে আছে।

এই কথা ! কিছু ভাবিসনি। আমি সব ঠিক ক'রে দেব। আমি থাকতে তোর ভাবনা কি ?---ব'লে মহিতোষ অগ্নিকাণ্ডের অকুস্থলে দমকলের মত আশ্বাস-নিনাদ শুনিয়ে বেরিয়ে গেল।

সাত দিন বাদে অফিসের সময় খালি বাসের মত সত্যিই সে এসে হাজির।

যাক সব ঠিক ক'রে এসেছি।

অবাক হয়ে বল্লাম,---সে কি! কি ক'রে!

হুঁ, হুঁ, কম পরিশ্রমটা কি সেজন্য করতে হয়েছে ? মেয়েটির নাম অপর্ণা ত ? স্কটিশে পড়ত ? দু'দিন ধরে প্রথম তার খোঁজ-খবর নিলাম। তারপর গিয়ে তোর ভাবী শ্বশুরকে এক প্যাঁচেই কাবু।

আমার বিস্ময় বিস্ফারিত দৃষ্টি লক্ষ্য ক'রে মহিতোষ এবার বুঝিয়ে বললে,---অপর্ণা দেবীর ইতিহাসে একটু গলদ আছে কিনা। সেইটে খুঁজে বার করেছি। স্কটিশে পড়বার সময় কে একটি ছেলের সঙ্গে প্রায়ই কফি হাউসে, মিউজিয়ামে, বোটানিকসে যেত।

আমার মুখের চেহারাটা দেখতে পেয়ে থেমে পড়ে একটু গর্ব্বের চালে বললে,---তুইও নিশ্চয় এ সব কথা জানতিস না ?

শুকনো গলায় বল্লাম,---জানতাম।

জানতিস ?

হ্যাঁ, সে ছেলে আর কেউ নয়, আমি।

ওঃ, ব'লে কথাটা গায়েই না মেখে মহিতোষ বললে,---যে-ই হোক। ওতেই কাজ হয়ে গেল। তোর ভাবী শ্বশুর মশাইকে গিয়ে সব জানিয়ে বল্লাম, বেশী ট্যাণ্ডাই ম্যাণ্ডাই করবেন না মশাই, ও মেয়ের বিয়ে দেওয়াই ভার হবে তাহ'লে। যাক্ আর তুই কিছু ভাবিস না. তোর শ্বশুর মশাই নিজে না আসুন চিঠি তাঁর আজকালের মধ্যে পাবি-ই।

চিঠি ঠিকই পেলাম। বিয়ে ভেঙে দেওয়ার চিঠি। শ্বশুর মশাই জানিয়েছেন, তাঁর মেয়ের সঙ্গে কোন সম্পর্ক যেন আর না রাখি।

বিয়ে আমাদের এখনো হয়নি। অপর্ণা ও আমি তাঁর রাগ পড়বার জন্যে অপেক্ষা ক'রে আছি। এরপর মহিতোষের একটা উপকার না ক'রে কখন থাকা যায়! কিছুমাত্র কৃতজ্ঞতার বাষ্প যার মনে আছে সে অন্ততঃ পারে না।

মহিতোষের মাঝে একটু সর্দ্দিজ্বরের মত হয়েছিল। কবিরাজ মশাইয়ের সঙ্গে তাই তার আলাপ করিয়ে দিয়েছি।

পেশাদার কবিরাজ ইনি নন, চিকিৎসা করেন সখ ক'রে। কিন্তু এ রকম বিচক্ষণ সর্ব্ববিদ্যা-বিশারদ কবিরাজ আর দুটি মিলবে না। মানুষের দেহ যে কি ভয়ঙ্কর বস্তু তা বুঝিয়ে দিতে তাঁর জোড়া নেই। তাঁর সঙ্গে ঘণ্টাখানেক আলাপ করলে

সত্যি বেঁচে আছি কিনা সন্দেহ হয়। মনে হয়, নখের ডগা থেকে মাথার চুল পর্য্যন্ত প্রতি রোমকূপে রোগের বীজ কিলবিল করছে।

আলাপ করিয়ে দেবার ক'দিন বাদে মহিতোষের সঙ্গে দেখা করতে গেছলাম। দেখলাম, বিপুল দেহভার নিয়ে মেঝের ওপর উবু হয়ে বসে হাঁপাতে হাঁপাতে মহি পাথরের খলে কি একটা ওষুধ মাড়ছে।

আমায় দেখে কপালের ঘামটা বাঁ হাতে মুছে করুণ স্বরে বললে,---একটু বোস ভাই, আর তিপান্নবার বাকি।

তিপান্নবার?

হ্যাঁ, এই বসন্ত সুকুমার বটিকাটা ঠিক তিনশ তিপান্ন বার মাড়তে হবে কিনা। একটু কম কি বেশী হ'লে আর ফল হবে না, প্রায় হয়ে এসেছে। একটু বোস।---ব'লেই মহি হঠাৎ মাথায় হাত দিয়ে মেঝের ওপর বসে পড়ল।

কি হ'ল কি?---জিজ্ঞাসা করলাম অবাক হয়ে।

সর্ব্বনাশ হয়েছে, আর কি হবে?---হতাশ-ভাবে বললে মহি---তিনশ সাত, না আটবার মেড়েছি। ভুলে গেছি।

তাহ'লে?

তাহ'লে আর কি? আবার নতুন বড়ি নিয়ে গোড়া থেকে সুরু করতে হবে।

কেন, এক কাজ করলে হয় না? তিনশ' সাত ধরে একবার তিপান্ন পর্য্যন্ত পৌঁছে অর্দ্ধেকটা আর আট ধরে আরেকবার তাই ক'রে অর্দ্ধেকটা খেলে হয় না? অর্দ্ধেকের কাজ ত হবে।

মহি একেবারে জ্বলে উঠল,--শাস্ত্র নিয়ে ওসব ছেলেখেলা চলে না।

তারপর কবিরাজ মশাইকে আমিই তার কাছে এনে দিয়েছি মনে পড়ায় বোধ হয় কৃতজ্ঞতায় একটু নরম হয়ে বললে,---কবিরাজ মশাই-এর কাছে যদি শুনিস তাহ'লে বুঝবি, এক চুল এদিক ওদিকের জন্যে কি আকাশ-পাতাল তফাৎ হয়ে যায়।

খলটল ধুয়ে মহিকে আবার তিনশ' তিপান্ন বার ওষুধ মাড়তে বসতে দেখে আমি চলে এলাম।

তারপর কাল আবার গেছলাম মহিকে দেখতে। গিয়ে দেখি, বাড়ীর ভেতরে একটা যজ্ঞ সুরু হয়ে গেছে।

ব্যাপার কি মহি? বাড়ীতে বিয়ে টিয়ে নাকি?

মহি খাটের ওপর চীৎ হয়ে শুয়ে আছে। আমায় দেখে ক্লান্তভাবে মাথাটা তুলে করুণ স্বরে বললে,---না ভাই, বাড়ীতে ওষুধ তৈরী করাচ্ছি, বাজারের ওষুধের উপর কোন বিশ্বাস নেই।

কিন্তু এত ওষুধ খাবার মত অসুখ তোর হ'ল কবে? বেশ ত সুস্থ সবল ছিলিই জানতাম।

কাটা ঘায়ে নুনের ছিটার মত হ'ল কি না কে জানে? মহি একেবারে চিড়বিড়িয়ে উঠল, তোরা আর জানবি কি ক'রে? কবিরাজ মশাই সময় মত না ধরে ফেললে আমিই কি আমার রোগ জানতে পারতাম? ছেলেবেলা থেকে আমি যে এই রকম মোটা, তাতে কবে মারা যেতে পারতাম তা জানিস?

এটা একটা গভীর দুশ্চিন্তার কথা বটে। বল্লাম,---কিন্তু তোকে যে আর দেখতেই পাই না, কাজে টাজে বেরুচ্ছিস না নাকি?

কখন আর বেরুব ভাই, আধ ঘণ্টা পনেরো মিনিট অন্তর এক একটা ওষুধ খেতে হয়, সময় পাই না।

মহিকে এই অবস্থায় দেখে চলে এসেছি। এ অবস্থা বেশীদিন হয়ত নাও থাকতে পারে। কবিরাজ মশাই যে ভাবে ওষুধ জ্বাল দেওয়া সুরু করেছেন, তাতে রুদ্ধ বাষ্প শীগ্গিরই হয়ত ফেটে বেরুবে। কবিরাজ মশাই তাতে হয়ত আর টিকবেন না। তবে এ ধাক্কা সামলে ওঠার পরও মহিতোষের ব্যবস্থা আমি ভেবে রেখেছি।

সেলে কেনা আমার সেকেণ্ডহ্যাণ্ড মোটরটা ওকে দান ক'রে দেব, ঠিক করেছি। হ্যাঁ, দানই ক'রে দেব বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসাবে, যাতে কোন-দিন বিক্রী করবার কথা ও ভাবতেও না পারে।

কিছুদিন গাড়ীটা আমি চড়েছি।

অকালে চুল পাকাবার এমন মহৌষধি আর আমার জানা নেই।

একটি কড়া টোষ্ট

গত ১৯৪৫-এর জানুয়ারী থেকে আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত খবরের কাগজের ওপর যদি চোখ বুলিয়ে থাকেন, তাহ'লে একটি বিজ্ঞাপন নিশ্চয়ই আপনাকে চঞ্চল ক'রে তুলেছে। খবরের কাগজই বা কেন, আপনার বাড়ী বা কর্ম্মক্ষেত্র যদি কোলকাতার শহর হয় তা হ'লে অন্যান্য সহযাত্রীর সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে দলিত, মর্দ্দিত ও পিষ্ট হ'তে হ'তে কোন এক সুযোগে ট্রামগাড়ির প্যানেলের একটি চাঞ্চল্যকর সংবাদ আপনাকে নিশ্চয়ই ক্ষণিকের জন্য আত্ম-বিস্মৃত করেছে। ট্রামে যদি না'ও চড়েন, তবে বিশেষ ধরণের লরীর অনুকম্পা থেকে নিজেকে রক্ষা করবার তাগিয়ে ফুটপাতের একেপারে সুদূর প্রান্ত ঘেঁষে যেতে যেতেও বাসের পৃষ্ঠদেশে কিম্বা বাড়ীর দেওয়ালে দেওয়ালে, থামে থামে, নানা বর্ণের সে ঘোষণা অবশ্যই আপনার হৃদয়কে বিচলিত ক'রে তুলেছে।

সত্যিই গত বৎসর যুদ্ধ-বিরতির সংবাদকে ছাপিয়েও যে বিষয়টি দেশের জনসাধারণের মন অধিকার করেছিল তা হ'ল---'বনবিহঙ্গ'।

''বনবিহঙ্গ'' কি---কেউ যদি জিজ্ঞাসা করেন তাহ'লে তাঁকে বাংলা দেশ থেকে, শুধু বাংলা দেশই বা কেন, দেশীয় রাজ্য সমন্বিত সমগ্র ভারতবর্ষ থেকে নির্ব্বাসিত করা উচিত ব'লে আমি মনে করি। আবালবৃদ্ধবনিতা, 'বনবিহঙ্গের' নাম এদেশে কে না শুনছে! কলেজের ছেলে কিংবা স্কুলের বালক শুধু নয়, ক্লাস থ্রির যে কোনও অপোগণ্ড শিশুকে জিজ্ঞাসা করুন,---পাঁচের নামতা মুখস্থ বলতে তার ভুল হ'তে পারে, কিন্তু ''বনবিহঙ্গ'' কি বস্তু একদমে সে ব'লে দেবে অনায়াসে। 'বনবিহঙ্গ' যে এদেশের যুগান্তকারী নির্ম্মিয়মান চিত্র তাতে চিত্র-জগতের দুই চন্দ্র-সূর্য্য কল্পনাতীত ঘটনা-সংযোগে যে একত্রিত, এ সংবাদ তারও জানা। শুধু তাই নয়, এ চিত্রের পরিকল্পনা থেকে সুরু ক'রে একেবারে হালের টাট্‌কা ষ্টুডিও-সংবাদ পর্য্যন্ত তার কণ্ঠস্থ আছে জানলে অবাক হবার কিছু নেই।

'বনবিহঙ্গের' প্রথম পরিকল্পনার কথা আশা করি কেউই বিস্মৃত হননি। ''অগ্রগামী পিকচার্সের'' অদ্বিতীয় প্রচার-সচিব ধীরানন্দ গোস্বামীর সুনিপুণ প্রচার-কৌশলে বাংলার প্রতিটি দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা সাগ্রহে সে কাহিনী প্রকাশ করেছে। তবে স্বীকার করতে হয় যে, সত্যের অনুরোধে সে কাহিনীর কিঞ্চিৎ সংশোধন অবশ্য প্রয়োজন। চিত্ররাজ্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রযোজক ও পরিচালক 'অগ্রগামী পিকচার্সের' একমাত্র স্বত্বাধিকারী শ্রীবংশীলাল মোদক মানস-সরোবরের তীরে পর্য্যটন করতে করতে তাঁরই বন্দুকের গুলীতে আহত একটি বন-হংসকে তিব্বতী একটি বালিকাকে সাশ্রুনয়নে বুকে তুলে নিতে দেখে প্রথম 'বনবিহঙ্গের' পরিকল্পনা করেন, একথা সর্ব্বাংশে সত্য নয়। অকুস্থানটি সরোবর সন্দেহ নেই, কিন্তু মানস-সরোবর থেকে সামান্য কিছু দূরে ডায়মণ্ড হারবারের নিকটস্থ কোন গ্রামে। স্বনামধন্য বংশীলাল সেখানে শিকারে যাননি, যাচ্ছিলেন সেই পথ দিয়ে ডায়মণ্ড হারবারের ডাক বাংলোয় তাঁর সাপ্তাহিক সফরে।

যাযাবর বনহংস ঠিক নয়, পথের ধারের ডোবায় একটি পাতিহাঁস---তাঁর বন্দুকের গুলীতে নয়---তাঁর মোটরে আহত হয়। কোন তিব্বতী বেদিনী বালিকা নয়---একটি বাগ্দী মেয়ে সেই পাতিহাঁসের আর্ত্ত চীৎকারে সেখানে উপস্থিত হয়ে আহত হাঁসটিকে ঠিক কোলে তুলে নিয়েছিল বলা যায় না এবং তীব্র তীক্ষ্ণ স্বরে ব্যাকরণ-বর্জিত ভাষায় তাঁর পিতৃমাতৃকুল সম্বন্ধে এমন কয়েকটি উক্তি করে যা শূন্যময় বেতারেও পুনরুক্তি করা যায় না। বলাই বাহুল্য, শ্রীযুক্ত বংশীলাল সেখানে অযথা কালক্ষেপ করেননি। যথাসম্ভব দ্রুত মোটর সহযোগে সে স্থান ত্যাগ করেছিলেন। স্থান, কাল ও ঘটনার সামান্য একটু হেরফের হ'লেও ব্যাপারটা যে মূলতঃ সত্য, সেই চাঞ্চল্যকর মুহূর্ত্তেই যে 'বনবিহঙ্গের' অপরূপ কল্পনা বাল্মীকির প্রথম শ্লোকের মত তাঁর মানসপটে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

'বনবিহঙ্গের' পরিকল্পনার পর সে চরিত্রে রূপ দেবার জন্যে কেমন ক'রে সমস্ত চিত্ররাজ্য তোলপাড় ক'রে তুলে বংশীলাল শেষ পর্য্যন্ত অভিনেত্রী-কুলসম্রাজ্ঞী শুভ্রা দেবীকে ...নীত করেন, কি ক'রে এই যুগান্তকারী চিত্রে অবতীর্ণ হওয়ার আগ্রহে মাত্র অর্দ্ধলক্ষ মুদ্রার বিনিময়ে শুভ্রা দেবী নিজের অসামান্য প্রতিভা বংশীলালের তাঁবেদারীতে সমর্পণ করতে প্রস্তুত হন, কি ভাবে চিত্রজগতের এই দুই উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্কের সম্মিলনের সম্ভাবনায় সমস্ত দেশ অধীর আগ্রহে ষ্টুডিও-নীড় থেকে 'বনবিহঙ্গে'র প্রথম পক্ষ সঞ্চালনের জন্যে অপেক্ষা ক'রে থাকে---সে কথা কারুরই অবিদিত নেই।

প্রতিদিন প্রতি হপ্তায় কাগজের 'ষ্টপপ্রেস' পড়ার আগে চিত্রানুরাগী দর্শক-সাধারণ ধীরানন্দ গোস্বামী বিরচিত 'বনবিহঙ্গের' ষ্টুডিও-সংবাদ সাগ্রহে চায়ের সঙ্গে গলাধঃকরণ করেন। বংশীলাল অলকা ষ্টুডিওতে 'বনবিহঙ্গের' প্রথম মহরৎ সম্পন্ন করলেন। 'বনবিহঙ্গের' বেশভূষা নিখুঁতভাবে পরিকল্পনা করবার জন্য নিযুক্ত বিখ্যাত কাপড়ের পাড়ের শিল্পী মঙ্গল মহাপাত্রের সঙ্গে তিব্বতের দালাই লামার কতগুলি পত্র ব্যবহার হ'ল। সঠিক পরিবেশ রচনার জন্য তিব্বত থেকে অর্থব্যয় ক'রে আনা চমরী গাই দুটিকে কোন Air conditioned গোহালে রাখার ব্যবস্থা হয়েছে। 'বনবিহঙ্গের' ভূমিকায় নিজের সত্তা সম্পূর্ণ নিমগ্ন করার জন্যে শুভ্রা দেবী সম্প্রতি কি যোগ-সাধনায় নিরত---এসব উপাদেয় খবরাখবরের জন্যে জনসাধারণ তৃষিত চাতকের মত অপেক্ষা করেছে।

কিন্তু তারপর। জানুয়ারী থেকে আগষ্ট পর্য্যন্ত আটমাস চিত্রামোদীদের অখণ্ড মনোযোগ আকর্ষণ ক'রে হঠাৎ সেপ্টেম্বর মাসে 'বনবিহঙ্গ' স্তব্ধ হয়ে গেল কেন? উৎসুক জনসাধারণ ব্যাকুলভাবে মাসের পর মাস অপেক্ষা করেছে। 'বনবিহঙ্গের' তবু কোন সংবাদ নেই। অগ্রগামী পিকচার্সের অদ্বিতীয় প্রচার-সচিব ধীরানন্দ গোস্বামীর কণ্ঠ একেবারে রুদ্ধ।

বনবিহঙ্গের এ হেন পরিণতির মূলে কি রহস্য নিহিত তা জানবার জন্যে অনেকেই নিশ্চয়ই উৎসুক। এতদিন বাদে সে রহস্য উদ্‌ঘাটন করবার জন্যেই এ কাহিনীর অবতারণা। রুদ্ধ-নিঃশ্বাসে এ রহস্যের মীমাংসার জন্যে যাঁরা অপেক্ষা ক'রে আছেন, অত্যন্ত ব্যথিত চিত্তে তাঁদের হতাশ ক'রে গোড়াতেই কিন্তু ব'লে রাখতে হচ্ছে যে, এ রহস্যের মূলে গভীর জটিল ভয়ঙ্কর লোমহর্ষণ কিছু নেই, আছে শুধু একটি কড়া টোষ্ট---হ্যাঁ, আর কিছু নয়---কড়া ক'রে সেঁকা এক স্লাইস পাউরুটি টোষ্ট। শুনতে সামান্য হ'লে কি হয়, এই এক-টুকরো পাউরুটিই আগষ্ট মাসের এক ১০৮ ডিগ্রি উত্তপ্ত বিকাল বেলা প্রলয়ঙ্কর হয়ে দাঁড়ায়। তার রুদ্রমূর্ত্তি দেখাবার জন্যে আঠারই আগষ্ট তারিখে অলকা ষ্টুডিওর পাঁচ নম্বর ফ্লোরে আমাদের উপস্থিত হওয়া প্রয়োজন। মঞ্চশিল্পীর ইন্দ্রজালে পাঁচ নম্বর ফ্লোরের একটি অংশ তিব্বতের পার্ব্বত্য তুষার-প্রান্তরে পরিণত হয়েছে। বিরাট প্রপেলারের প্রচণ্ড আবর্ত্তনে তার ওপর দিয়ে চূর্ণ লবণ তুষার-ঝড় হয়ে বয়ে যাচ্ছে। এক পাশে দেখা যাচ্ছে একটি তিব্বতী তাঁবু। দু'টি চমরী তার প্রবেশ-দ্বারে তিব্বতী হাম্বারবে এ দৃশ্য সম্বন্ধে তাদের

আলোচনা জ্ঞাপন করছে। সাউণ্ড, ক্যামেরা, আলো---সবই সাজান, শুধু তিব্বতী বেদিনীরূপী শুভ্রা দেবীর আবির্ভাব হ'লেই ক্ল্যাপষ্টিকের বাদ্য-ধ্বনির সঙ্গে চিত্র গ্রহণ সুরু হয়। কিন্তু শুভ্রা দেবী, তাঁরই জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট আরামকেদারায় গম্ভীর মুখে শায়িত। স্বয়ং প্রযোজক ও পরিচালক বংশীলাল থেকে সুরু ক'রে বড়, মেজ, সেজ, ছোট সহকারী ও টেকনিসিয়নবৃন্দ নিজ নিজ পদমর্যাদা অনুযায়ী দূরত্ব রক্ষা ক'রে তাঁর চারিপাশে মধুভাণ্ডের চতুর্দ্দিকে মৌমাছি, বোল্‌তা ও ভ্রমরের মত সমবেত। সবাই উদ্বিগ্ন, সবাই ব্যাকুল। কারণ সমস্যা নিদারুণ। মোটরে ষ্টুডিওতে আসতে আসতে হঠাৎ কোন পথের মোড়ে শুভ্রা দেবী তাঁর অভিনয়ের 'মুড' হারিয়ে এসেছেন। অপরাধ অবশ্য এক সৌজন্যহীন ট্রাফিক কনষ্টেবলের। পৌর রাজ-পথের তুচ্ছ একটা নিয়ম-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করার জন্যে সেই দুর্বিনীত লাল পাগড়ীধারী নাকি স্বয়ং শুভ্রা দেবীর গাড়ি দাঁড় করিয়ে তাঁর নম্বর টুকে নিয়েছে।

শুভ্রা দেবীর মুখ সেই থেকে কঠিন। তাঁর মুক্তার মত দন্তপাতি ক্ষণে ক্ষণে আর মধুর হাস্যে বিকশিত হচ্ছে না।

শুভ্রা দেবীর নাম সার্থক কিন্তু সে তাঁর ম্যাক্স-ফ্যাক্টর লেপিত গাঢ় শ্যাম গাত্রবর্ণের জন্যে নয়। তিনি শুভ্রা---তাঁর অপরূপ দন্তরুচি কৌমুদীর জন্যে। সেই দন্তরুচি না দেখা গেলে তাঁর অভিনয়ের আসল মাধুর্য্যই লুপ্ত।

বংশীলাল অবশেষে হারানো 'মুড' ফিরে পাওয়ার আশায় চায়ের কথা পাড়েন,---আপনি একটু চা খাবেন শুভ্রা দেবী?

শুভ্রা দেবী ক্লান্তভাবে জিজ্ঞাসা করেন,---চা খেতে বলছেন?

প্রায় অর্দ্ধশত কণ্ঠের কোরাস্ শোনা যায়---খান না একটু।

আর দুটো টোষ্ট,---বলেন বংশীলাল।

না, না, টোষ্ট নয়---প্রবল আপত্তি জানান শুভ্রা দেবী।

কিন্তু তার আগেই চোখের ইঙ্গিতে তিনজন চাকর বেরিয়ে গেছে হুকুম তামিল করতে।

দেখতে না দেখতে চা আসে, আসে টোষ্ট, আসে কেক ও পেইষ্ট্রি।

শুভ্রা দেবী শুধু চায়ের পেয়ালাটি হাতে তুলে নেন, কিন্তু বংশীলাল নাছোড়বান্দা! একটু টোষ্ট আপনাকে খেতেই হবে---এ আপনার জন্যে তৈরী স্পেশাল টোষ্ট।

অর্দ্ধশত কণ্ঠ তাঁর কথা সমর্থন করে।

শুভ্রা দেবী ক্লান্তভাবে বলেন---জানেন ত, ষ্টুডিওতে আমি কিছুই খাই না।

সেই জন্যই ত এত ক'রে অনুরোধ করছি, একটা টোষ্ট অন্ততঃ আজ দাঁতে কাটুন। আপনার জন্যে বিশেষ ক'রে তৈরী।

তাহ'লে বরং একটা পেষ্ট্রি খাই---বলেন শুভ্রা দেবী। স্বরটা যেন একটু ভীত।

না, না, একটা টোষ্ট---অকারণে জেদ ধরেন বংশীলাল। শুভ্রা দেবী সকলের দিকে তাকান। মনে হয় এ যেন তাঁর পরীক্ষা।

মরিয়া হয়েই তিনি টোষ্টে কামড় দেন।

তারপর? তারপর খট্ ক'রে একটা শব্দ হয়---সঙ্গে সঙ্গে চায়ের ট্রের ওপর কি একটা এসে পড়ে---পঞ্চাশজোড়া স্তম্ভিত চোখ সেই দিকে নিবদ্ধ।

ট্রের ওপর দু'পাটি কুন্দশুভ্র বাঁধানো দাঁত পড়ে আছে।

সেই দিন থেকে শুভ্রা দেবী ছায়ালোক থেকে নিরুদ্দেশ। তিন মাস ধরে তাঁর জন্যে ব্যর্থ সন্ধান ক'রে ভগ্ন-হৃদয় প্রযোজক ও পরিচালক শ্রীবংশীলাল মার্কিণ প্লেনে তার বার্থ বুক করেছেন এই সেদিন।

নিরুদ্দেশ

দিনটা ভারী বিশ্রী। শীতের দিনে বাদলার মত এত অস্বস্তিকর আর কিছু বোধ হয় নাই। বৃষ্টি ঠিক যে পড়িতেছে তাহা নয়। কিন্তু মেঘাচ্ছন্ন আকাশ ও ম্লান পৃথিবী কেমন মৃতের মত অসাড় হইয়া আছে। সোমেশ হঠাৎ আজ আসিয়া না পড়িলে কেমন করিয়া দুপুরটা কাটাইতাম বলিতে পারি না। কিন্তু সোমেশও আজ যেন কেমন হইয়া আসিয়াছে।

খবরের কাগজটা দু' একবার উল্‌টাইয়া পাল্‌টাইয়া সোমেশের সামনে ফেলিয়া দিয়া বলিলাম ---"একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখেছ ?"

"কি ?"

"আজকের কাগজে একসঙ্গে সাত সাতটা 'নিরুদ্দেশ'-এর বিজ্ঞাপন।"

সোমেশ কোন কৌতূহলই প্রকাশ করিল না। যেমন বসিয়া ছিল, তেমনি উদাসীনভাবেই শুধু সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়িতে লাগিল। নিস্তব্ধ ঘরের ভিতর ধোঁয়ার কুণ্ডলী শুধু ধীরে ধীরে পাক খাইতে খাইতে উর্দ্ধে উঠিতেছে। আর সমস্তই নিশ্চল স্তব্ধ। বাইরের অসাড়তা যেন আমাদের মনের উপরও চাপিয়া ধরিয়াছে।

নেহাৎ একটা কিছু করিয়া এই অস্বস্তিকর স্তব্ধতা ভাঙ্গিবার প্রয়োজনেই আরম্ভ করিলাম--- 'নিরুদ্দেশ'-এর এই বিজ্ঞাপনগুলো দেখলে কিন্তু আমার হাসি পায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যাপারটা কি হয় জান ত ? ছেলে হয়ত রাত ক'রে থিয়েটার দেখে বাড়ী ফিরেছেন। এমন তিনি প্রায় ফিরে থাকেন আজকাল। খেতে বসবার সময় বাবা কয়েকদিন খোঁজ করেছেন---"কোথায় গেলেন বাবু ! তোমার গুণধর পুত্রটি ?"

লুকোন পুঁজি থেকে মা বিকেলে ছেলের পেড়াপীড়িতে টাকা কটা বার ক'রে দিয়েছেন। সুতরাং তিনি জেনে শুনে মিথ্যে আর বলতে পারেন না---চুপ ক'রে থাকেন।

বাবা ব'লে যান,---"এত রাত্রেও বাবুর আসবার সময় হ'ল না। আরবারে ত ফেল ক'রে মাথা কিনেছেন। এবারও কি ক'রে কৃতার্থ করবেন বুঝতেই পারছি। পয়সাগুলো আমার খোলামকুচি কিনা তাই নবাবপুত্তুর যা খুসী তাই করছেন। দূর ক'রে দেব, এবার দূর ক'রে দেব।"

এই মৌখিক আস্ফালনেই হয়ত ব্যাপারটা শেষ হ'তে পারত। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে গুণধর পুত্রের প্রবেশ।

বাবা ঝোঁকটা আর কাটিয়ে উঠতে পারেন না। নিজের কাছে মান রাখবার জন্যেও কিছু বলতে হয়।

কতটা রাগ দেখান উচিত ঠিক করতে না পেরে বলার মাত্রাটা একটু বেশী হয়ে পড়ে।

শেষ পর্য্যন্ত বাবা বলেন, "এমন ছেলের আমার দরকার নেই---বেরিয়ে যা !"

অভিমানী ছেলে আর কিছু না হোক পিতৃদেবের এ আদেশ তৎক্ষণাৎ পালন করতে উদ্যত হয়।

মা কোন্ দিক সামলাবেন বুঝতে না পেরে কাতরভাবে শুধু বলেন---"আহা খাওয়া-দাওয়ার সময় কেন এসব বল ত। পরে বললেই ত হ'ত।"

বাবা এবার মা'র ওপর মারমুখী হয়ে উঠেন---"তোমার আস্কারাতেই ত উচছন্নে গেছে! মাথাটি ত তুমিই খেয়েছ আদর দিয়ে।

মা আঁচলে চোখ মোছেন। ছেলে বিশাল পৃথিবীতে নিরুদ্দেশ যাত্রায় বেরিয়ে পড়ে।

পরের দিন ভয়ানক কাণ্ড। মা সেই রাত থেকে দাঁতে কুটি কাটেন নি। আজকের দিনও বিছানা থেকে উঠবেন মনে হয় না। বাবার'ও হয়ত রাত্রে ঘুম হয়নি। কিন্তু সে কথা প্রকাশ করবেন কোন্ মুখে!

গৃহিণীকে ধমক দিয়ে বলেন, "মিছিমিছি প্যান্ প্যান্ কোরো না। অমন ছেলে যাওয়াই ভালো।"

মা'র কান্না আবার উচ্ছ্সিত হয়ে ওঠে।

বাবা এবার দাঁত খিঁচিয়ে বল্লে'ও নিজের মনের আশার কথাটাই বোধ হয় জানান---"তা'ও গেলে ত বাঁচতাম। এ বেলাই দেখো সুড় সুড় ক'রে আবার ফিরে আসবে! এমন বিনি পয়সার হোটেলখানা পাবে কোথায়?"

মা এবার অশ্রুসিক্ত স্বরে বলেন---"এই দারুণ শীতে কাল সারা রাত কোথায় রইল কে জানে! কি ক'রে বসে আমার তাই ভয়!"

"হ্যাঁ ভয়!" বাবা কথাটাকে ব্যঙ্গ ক'রে উড়িয়ে দিতে চান---"তোমার ছেলে কিছু করেনি গো, কিছু করেনি। দিব্যি আছে কোন বন্ধুর বাড়ী। অসুবিধে হ'লেই এসে দেখা দেবে।"

মা'র কান্না তবু থামে না। "কি রকম অভিমানী জান ত!"

বিরক্ত হয়ে বাবা বেরিয়ে যান। সন্ধ্যাবেলা অফিস থেকে ফিরে এসে দেখেন অবস্থা গুরুতর। ছেলে ফেরেনি। মা শয্যা থেকে আর উঠবেন না ব'লেই পণ করেছেন।

"না, আর থাকতে দিলে না! এ অশান্তির চেয়ে বনবাস ভালো।" ব'লে বাবা বেরিয়ে পড়েন এবং ওঠেন গিয়ে একেবারে খবরের কাগজের অফিসে।

খবরের কাগজের অফিসের ব্যাপারটা বড় জটিল। কোন্ দিকে কি করতে হয় কিছু বোঝা যায় না। খানিক এদিক ওদিক বিমূঢ়ভাবে ঘুরে এক দিকের একটা অফিস-ঘরে ঢুকে প'ড়ে নিরীহ চেহারার এক ভদ্রলোককে বেছে নিয়ে সাহস ক'রে জিজ্ঞাসা করেন---"আপনাদের কাগজে এই---এই একটা খবর বার করতে চাই।"

নিরীহ চেহারার লোকটি হঠাৎ মুখ তুলে ব্যঙ্গের স্বরে বলেন---"খবর! কেন, আমাদের খবরগুলো পছন্দ হচেছ না! আমরা কি এতদিন রাম-যাত্রা বার করেছি!"

বাবা একটু হতভম্ব হয়ে একবার অসহায়ভাবে চারিদিকে তাকান। পাশের যে ভদ্রলোকটির মুখ দেখে অত্যন্ত রূঢ় প্রকৃতির মনে হয়েছিল, তিনিই সহানুভূতির স্বরে বলেন, "আহা কি করছ! ভদ্রলোক কি বলতে চান, শোনোই না! বসুন আপনি।"

বাবা একটা চেয়ারে একটু অপ্রস্তুতভাবে বসবার পর তিনি বলেন---"কি খবর বলছিলেন!"

"আজ্ঞে ঠিক খবর নয়, এই---এই একটু বিজ্ঞাপন!"

"বিজ্ঞাপন? কিসের বিজ্ঞাপন? কতটা স্পেস দরকার? কপি এনেছেন?"

বাবা আরো বিমূঢ়ভাবে বলেন, "আজ্ঞে ঠিক বিজ্ঞাপন নয়---এই আমার ছেলে বাড়ী থেকে চলে গিয়েছে---"

তাঁকে আর কথা শেষ করতে হয় না। টেবিলের অপর দিক থেকে ভদ্রলোক বলেন---"ও বুঝেছি, নিরুদ্দেশ! কি দেবেন---চেহারার বর্ণনা, না ফিরে আসবার অনুরোধ!"

বাবা যেন এতক্ষণে কূল পেয়ে বলেন---"আজ্ঞে হ্যাঁ, ফিরে আসবার অনুরোধ! ওর মা বড় কাঁদাকাটি করছে!"

"বুঝেছি বুঝেছি! রাগারাগি ক'রে গিয়েছে বুঝি!" ভদ্রলোক একটা কাগজের প্যাড্ বাবার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলেন---"নিন, লিখে দিন।"

"লিখে!" বাবার মুখের বিপদগ্রস্ত ভাব অত্যন্ত স্পষ্ট।

ভদ্রলোক দয়াপরবশ হয়ে বলেন---"আচছা, আমরা লিখে দেব'খন। আপনি শুধু নামটামগুলো দিয়ে যান।"

পরিচয় ইত্যাদি দিয়ে যাবার সময় বাবা অনুরোধ করেন, "একটু ভালো ক'রে লিখে দেবেন। ওর মা কাল থেকে জলগ্রহণ করেনি।"

"সে বলতে হবে না, এমন লিখে দেব যে পড়ে আপনার ছেলে কেঁদে ভাসিয়ে দেবে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

আশ্বস্ত হয়ে বাবা ঘরে ফেরেন। কিন্তু অশ্রুসজল বিজ্ঞাপন বার হবার আগেই দেখেন ছেলে ঘরে এসে হাজির।

অনুতপ্ত হয়ে সে এসেছে মনে করো না; সে বাড়ীতে থাকতে আসেনি। শুধু একবার চলে যাবার আগে তার গোটাকতক বই নিয়ে যেতে এসেছে।

এবার মা'র ক্রুদ্ধস্বরে শোনা যায়, "তা যাবি বই কি; অমনি কুলাঙ্গার তুই ত হয়েছিস্। কোনো ছেলে যেন আর বকুনি খায় না। তুই একেবারে পীর হয়েছিস্? কাল সারারাত দুচোখের পাতা এক করেননি তা জানিস্? ভেবে ভেবে চেহারাটা আজ কি হয়েছে দেখে আয়! উনি তেজ ক'রে চলে যাবেন!"

বাবা একবার ভেতরে ঢুকে মৃদুস্বরে বলেন---"আঃ আব বকাবকি কেন?"

মা ধমক দিয়ে বলেন---"তুমি থাম। অত আদর ভাল নয়। একটু বকুনি খেয়েছে ব'লে ছেলে বাড়ী ছেড়ে চলে যাবে, এত বড় আস্পর্দ্ধা।"

অধিকাংশ নিরুদ্দেশের বিজ্ঞাপনের ইতিহাসই এই।

সোমেশের সিগারেটটা তখন শেষ হইয়াছে। এতক্ষণ ধরিয়া আমার কথা সে মোটেই শুনিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। একবার একটু নড়িয়া বসিতেও তাহাকে দেখা যায় নাই।

একটু বিরক্ত স্বরেই বলিলাম---"কি হয়েছে তোমার বল ত? মিছিমিছিই আমি একলা বকে মরছি।"

সে কথার কোন উত্তর না দিয়া সোমেশ হঠাৎ ছড়ান পা গুটাইয়া লইয়া সোজা হইয়া বসিয়া সিগারেটের অবশিষ্টটুকু ফেলিয়া দিল। তারপর বলিল,---"তুমি জান না। এই বিজ্ঞাপনের পেছনে অনেক সত্যকার ট্র্যাজিডি থাকে।"

"তা থাকে যে আমি অস্বীকার করিছ না। কখন কখন সত্যিই যে যায় সে আর ফেরে না।"

সোমেশ একটু হাসিয়া বলিল, "না, তা বলছি না। ফিরে আসারই ভয়ানক একটা ট্র্যাজিডির কথা আমি জানি।"

আমি উৎসুকভাবে তাহার দিকে চাহিয়া বলিলাম---"তার মানে?"

"শোনো বলছি।"

বাহিরে এতক্ষণে বৃষ্টি আবার আরম্ভ হইয়াছে। কাঁচের সার্সির ভিতর দিয়া বাহিরের রাস্তাঘাট ঝাপ্‌সা অবাস্তব দেখাইতেছে। মনে হইতেছে আমরা যেন সমস্ত পৃথিবী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছি।

"পুরোন খবরের কাগজের ফাইল যদি উল্টে দেখ, তাহ'লে দেখতে পাবে বহু বছর আগে এখানকার একটি প্রধান সংবাদপত্রের পাতায় দিনের পর দিন একটি বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে। সে বিজ্ঞাপন নয়, সম্পূর্ণ একটি ইতিহাস। দিনের পর দিন ধারাবাহিকভাবে পড়ে গেলে একটা সম্পূর্ণ কাহিনী যেন জানা যায়। মনে হয় ছাপার লেখায় সত্যি যেন কান পাতলে কাতর আর্ত্তনাদ শোনা যাবে। সে বিজ্ঞাপন অবশ্য 'নিরুদ্দেশের'। প্রথম দেখা যায় মায়ের কাতর অনুরোধ ছেলের প্রতি ফিরে আসবার জন্যে। অস্পষ্ট আড়ষ্ট ভাষা, কিন্তু তার ভেতর দিয়ে কি ব্যাকুলতা যে প্রকাশ পেয়েছে তা না পড়লে বোঝা যায় না। ধীরে ধীরে মায়ের কাতর অনুরোধ হতাশ দীর্ঘশ্বাসের মত খবরের কাগজের পাতায় যেন মিল্লিয়ে যেতেও দেখা গেল। তারপর শোনা গেল পিতার গম্ভীর স্বর, একটু যেন কম্পিত তবু ধীর ও শান্ত---"শোভন ফিরে এস। তোমার মা শয্যাগত। তোমার কি এতটুকু কর্ত্তব্য-বোধও নেই।"

বিজ্ঞাপন তার পরেও কিন্তু থামল না। পিতার স্বর ভারী হয়ে আসছে যেন; মনে হয় যেন গলাটা ধরা। "শোভন, এখন না এলে তোমার মাকে আর দেখতে পাবে না।"

কিন্তু শোভনের হৃদয় এতে বুঝি গল্‌ল না। দেখা গেল বিজ্ঞাপন সমানভাবে চলেছে; শুধু পিতার নিজেকে সামলাবার আর ক্ষমতা নাই। এবার তাঁর স্বরে কাতরতা---শুধু কাতরতা নয়, একান্ত দুর্ব্বলতা---"শোভন, জান না আমাদের কেমন ক'রে দিন যাচ্ছে! এস, আর আমাদের দুঃখ দিও না।"

বিজ্ঞাপন ক্রমশঃ হতাশ হাহাকার হ'য়ে উঠল। তারপর একেবারে গেল বদলে। এবার আর শোভনকে উদ্দেশ ক'রে কিছু লেখা নেই। সাধারণ একটি বিজ্ঞপ্তি মাত্র। এই ধরণের এই চেহারার এই বয়সের একটি ছেলে। আজ এক বৎসর তার কোন সন্ধান নেই। সন্ধান দিতে পারলে পুরস্কার পাওয়া যাবে।

পুরস্কারের পরিমাণ ক্রমশঃই বাড়তে লাগল খবরের কাগজের পাতায়। দোহারা ছিপ্‌ছিপে একটি বছর ষোল সতেরোর ছেলে। পরিচয়-চিহ্ন ঘাড়ের দিকে ডান কাণের কাছে একটি বড় জড়ুল। জীবিত না মৃত এইটুকু যদি কেউ সন্ধান দিতে পারে, তাহ'লেও পুরস্কার পাওয়া যাবে।

সোমেশ চুপ করলে খানিকক্ষণের জন্যে। জলের ছাটে সার্সির কাঁচ একেবারে ঝাপ্‌সা হয়ে গেছে। ঘরের ভেতর ঠাণ্ডায় মনে হচ্ছে একটা কম্বল-টম্বল জড়াতে পারলে ভাল হয়।

বলিলাম---"এ ত গেল বিজ্ঞাপনের উপাখ্যান। আসল ব্যাপারের কিছু জান নাকি!"

"জানি! শোভনকে আমি জানতাম। সে যে কোনো ভয়ঙ্কর অভিমানের বশে বাড়ী ছেড়ে এসেছিল তা মনে কোরো না। বাড়ী ছাড়াটাই তার কাছে একান্ত সহজ। ছুতোটা যা হোক কিছু হ'লেই হ'ল। পৃথিবীতে দু' একটা লোক আসে জন্ম থেকেই একেবারে নির্লিপ্ত মন নিয়ে। তারা ঠিক কঠিন-হৃদয় নয়। বরং বলা যেতে পারে তাদের মন তৈলাক্ত। পিচ্ছিল ব'লে তারা কোথাও ধরা পড়ে না, কিছুই তাদের মনে দাগ দিতে পারে না। শুনলে আশ্চর্য্য হবে, খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনের সংবাদ জানলেও সেগুলো সে অনুসরণই করেনি। কোন দিন চোখে পড়েছিল হয়ত---তারপর অনায়াসে সেগুলো গেছল ভুলে। বাড়ীর বাহিরে যে সমস্ত দুঃখ অসুবিধায় অন্য কেউ হ'লে হয়রাণ হয়ে পড়ত তার ভেতরেই সে পেয়েছে মুক্তির স্বাদ। অন্য কেউ যাই ভাবুক, সে নিজেকে একটি ছোট সংসারের আদরের ছেলে হিসেবে শুধু ভাবতে পারে নি। কিন্তু বিজ্ঞাপন যেদিন হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল, সেদিন কেন বলা যায় না তার উদাসীন মনও বিচলিত হয়ে উঠল। বিজ্ঞাপন বন্ধ হয়েছিল একটু অসাধারণভাবে। ক্লান্তভাবে চলতে চলতে একদিন হঠাৎ তা থেমে যায়নি, হঠাৎ যেন একটা ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনায় সংবাদপত্রের পাতা স্তব্ধ হয়ে গেল। শোভনের চেহারার বর্ণনার বদলে হঠাৎ একদিন দেখা গেল,---

"শোভন, তোমার মা'র সঙ্গে আর তোমার বুঝি দেখা হ'ল না। তিনি শুধু তোমার নামই করছেন এখনো।" তারপর আর কোন বিজ্ঞাপন দেখা গেল না।

প্রায় দুই বৎসর তখন কেটে গেছে। শোভন একদিন হঠাৎ গিয়ে হাজির তার দেশে। একটা ব্যাপারে শোভনের প্রকৃতির খানিকটা পরিচয় পাবে। সে কথাটা আগে বলিনি। শোভন সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে নয়। সম্পন্ন বল্লেও তাদের ঠিক বর্ণনা করা হয় না। তাদের প্রাচীন জমিদারী অনেক দুর্দ্দিনের ভেতর দিয়ে এসেও তখন তেমন ক্ষয় পায়নি। শোভনই তার একমাত্র উত্তরাধিকারী।"

সোমেশ একটু থামতেই আমি বল্লাম---"যাক্ শেষটুকু আর না বল্লেও চলবে। বুঝতে পেরেছি।"

সোমেশ একটু হেসে কোন উত্তর না দিয়ে ব'লে চলল---"দু'বছর স্বাধীন জীবনের দুঃখ-কষ্ট গায়ে না মাখলেও তার ছাপ শোভনের ওপর তখন পড়েছে। দু'বছরে সে অনেক পরিবর্ত্তিত হয়েছে। কিন্তু তাই ব'লে তাদের কর্ম্মচারীরা তাকে চিনতে পারবে না এতটা সে আশা করেনি।

শোভন দেশে পৌঁছে সোজাসুজি তাদের বাড়ী ঢুকছিল---প্রথমে তাকে বাধা দিলেন তাদের পুরাণো নায়েব মশাই।

"কাকে চান?"

শোভন হেসে বল্লে---"কাউকে না, বাড়ীতে যেতে চাই।"

নায়েব মশাই তার দিকে খানিক তীক্ষ্দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে তারপর একটু স্মিতহাস্যে বল্লেন ---"ওঃ কিন্তু এত তাড়াতাড়ি কেন। আসুন বার-বাড়ীতে একটু বিশ্রাম করুন।"

শোভন অবাক হয়ে বল্লে,---"সে কি? কি হয়েছে নায়েব মশাই।"

"না, না, হয়নি কিছু।"

"মা ভালো আছেন?" শোভনের প্রশ্নে এবার সত্যি ব্যাকুলতা ছিল।

নায়েব মশাই তেমনি অদ্ভুত হাসি হেসে বল্লেন ---"ভালো আছেন বইকি। আসুন। আসুন আমার সঙ্গে।"

শোভন তবু বল্লে,---"কিন্তু ভেতরে গেলেই ত হয়।"

নায়েব মশাই একটু যেন কঠিন স্বরে বল্লেন, ---"না, হয় না; আপনি আমার সঙ্গে আসুন।"

শোভন রীতিমত বিমূঢ় অবস্থায় এবার নায়েব মশাইকে অনুসরণ ক'রে বার বাড়ীতে গিয়ে উঠল। দু'বছরে সেখানে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হয়েছে। পুরোনো সরকার তাদের নেই। নতুন দুটি লোক সেখানে বসে খাতা লিখছে। তার পরিচিত বৃদ্ধ খাজাঞ্চি মশাইকে দেখে সে যেন আশ্বস্ত হ'ল।

নায়েব মশাই তাকে একটা চেয়ারে বসতে ব'লে খাজাঞ্চি মশাইকে উদ্দেশ ক'রে বল্লেন---"ইনি ভেতরে যেতে চাইছেন।"

শোভনের কাছে নায়েব মশাইএর গলার স্বর কেমন যেন অস্বাভাবিক মনে হ'ল। খাজাঞ্চি মশাই নাকের ওপরকার চশমাটা একটু আঙ্গুল দিয়ে তুলে তার দিকে চেয়ে বল্লেন---"ওঃ ইনি আজই এসেছেন বুঝি।"

"হ্যাঁ, এই মাত্র।"

শোভন এবার অধীরভাবে ব'লে উঠল---"আপনারা কি বলতে চান স্পষ্ট ক'রে বলুন। মা'র কি কিছু হয়েছে? বাবা কেমন আছেন?"

চারিধারের সব ক'টা দৃষ্টি তার ওপর অদ্ভুতভাবে নিবদ্ধ। খানিকক্ষণ সকলেই নীরব। তারপর নায়েব মশাই বল্লেন,---"তাঁরা সবাই ভালো আছেন। কিন্তু এখন ত আপনার সঙ্গে দেখা হবে না।"

এবার শোভন ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল---"কেন দেখা হবে না? আপনাদের কি মাথা খারাপ হয়েছে। আমি চল্লুম।"

শোভন উঠল। কিন্তু নায়েব মশাই দরজার আছে সামান্য একটু এগিয়ে গিয়ে শান্তভাবে বল্লেন, "দেখুন, মিছিমিছি কেলেঙ্কারী ক'রে লাভ নেই। তাতে ফল হবে না কিছু।"

হঠাৎ শোভনের কাছে সমস্ত ব্যাপারটা ভয়ঙ্কর-ভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠল। সে বিস্মিত ভীত কণ্ঠে বল্লে---"আপনারা কি আমাকে চিনতে পারছেন না।"

সকলে নীরব।

"আমি শোভন,---বুঝতে পারছেন না আমি শোভন।"

নায়েব মশাই এবার বল্লেন---"আপনি একটু দাঁড়ান, আমি আসছি।" পাশের ঘরে গিয়ে টেবিলের একটা ড্রয়ার খুলে তিনি একটা জিনিষ এনে শোভনের হাতে দিলেন। তারই একটা পুরোণো ফটো, সাধারণভাবে তোলা। এখন অস্পষ্ট হয়ে এসেছে একটু।

নায়েব মশাই বল্লেন,---"চেনেন একে।"

শোভন বিস্মিত কণ্ঠে বল্লে---"এ ত আমারই ফটো। দেখুন ভালো ক'রে আপনারাই মিলিয়ে। নাঃ, এ অসহ্য।"

চুলগুলো মুঠি ক'রে ধরে সে বসে পড়ল।

নায়েব মশাই তার সঙ্গে বসে বল্লেন---"দেখুন, কিছু মনে করবেন না। আপনার সঙ্গে একটু মিল আছে সত্যি। কিন্তু এর আগে আরো দু'-জনের সঙ্গে ছিল। মায় জড়ুল পর্য্যন্ত। আমাদের এ নিয়ে গোলমাল করতে মানা আছে। আমরা কিছু হাঙ্গামা করব না। আপনি এখন চলে যেতে পারেন।"

শোভন উদ্ভ্রান্তভাবে সকলের দিকে চেয়ে দেখলে। সকলের দৃষ্টিতে অবিশ্বাস।

কাতরভাবে বল্লে,---"একবার শুধু আমি মা-বাবার সঙ্গে দেখা করব। আপনারা বিশ্বাস করছেন না। কিন্তু একবার আমায় শুধু দেখা করতে দিন।"

নায়েব মশাই হতাশভাবে হাতের ভঙ্গি ক'রে বল্লেন,---"শুনুন তাহ'লে। সাত দিন আগে শোভন মারা গেছে। তার মৃত্যুর খবর আমরা পেয়েছি।"

শোভন এই অবস্থাতে না হেসে পারলে না, ---বল্লে,---"কেমন ক'রে মারা গেল!"

তার কণ্ঠস্বরের বিদ্রূপ উপেক্ষা ক'রে নায়েব মশাই বল্লেন---"মারা গিয়েছে রাস্তায় গাড়ী চাপা পড়ে অপঘাতে। নাম-ধাম পরিচয় পাওয়া সম্ভব হয়নি। কিন্তু যারা দুর্ঘটনার সময় উপস্থিত ছিল তাদের কয়েকজন খবরের কাগজে আমাদের বিজ্ঞাপন দেখে আমাদের সব কথা জানিয়েছে। হাসপাতালেও আমরা খবর নিয়েছি। সেখানকার ডাক্তারের বর্ণনাও আমাদের সঙ্গে মিলে গিয়েছে।"

শোভন এর পর কি করত বলা যায় না, কিন্তু সেই সময় দেখা গেল তার বাবা বাড়ী থেকে বেরুচেছন। মানুষের সঙ্গে ঝড়ে ভাঙ্গা গাছের যে এতদূর সাদৃশ্য হ'তে পারে, সাহিত্যের উপমা পড়েও কখন তার মনে হয়নি। তাঁর চলার গতিতে পর্য্যন্ত যেন ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার পরিচয় আছে।

সকলে কিছু বুঝে ওঠবার আগেই শোভন দৌড়ে ঘর থেকে বার হয়ে গেল। নায়েব ও কর্ম্মচারীরা ব্যাপারটা বুঝে যখন তার পিছু নিলে, তখন সে বাবার কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে।

"বাবা!"

বৃদ্ধ থমকে দাঁড়ালেন। সে মুখের বেদনাময় বিমূঢ়তা শোভনের বুকে ছুরির মত বিঁধল।

"বাবা, আমায় চিনতে পারছ?"

বৃদ্ধ স্খলিত-পদে এক পা এগিয়ে আবার থমকে গেলেন। প্রবল ভাবাবেগ তাঁর বার্দ্ধক্যের শিথিল মুখকে বিকৃত ক'রে দিচেছ।

তখন নায়েব মশাই ও কর্ম্মচারীরা এসে পড়েছেন।

বৃদ্ধ কম্পিত হাত তুলে, কম্পিত স্বরে বল্লেন, ---"কে!"

নায়েব মশাই শোভনের কাঁধে দৃঢ়ভাবে হাত রেখে বল্লেন,---"না, কেউ না। সেই সেবারের মত---এই নিয়ে তিন বার হ'ল।"

একজন কর্ম্মচারী বল্লে,---"আমরা আসতে দিইনি, হঠাৎ আমাদের হাত ছাড়িয়ে---"

বৃদ্ধ তাকে থামিয়ে বল্লেন---"কিছু বোলো না, চলে যেতে দাও।"---বৃদ্ধ শেষ বার শোভনের দিকে কাতরভাবে চেয়ে আবার ঘরের দিকে ফিরলেন।

শোভন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। নায়েব মশাই তাকে কি বলছিলেন। অনেকক্ষণ সে কিছু শুনতে পায়নি। কখন সে আবার বার-বাড়ীতে এসে বসেছে, তাও তার মনে নেই।

আচছন্নতা তার কাটল খানিক বাদে। ভেতর বাড়ী থেকে একজন কর্ম্মচারী নায়েব মশাইকে এসে কি বলছে। নায়েব মশাই তাকে কি বলছেন ঠিক শোনা যাচেছ না। না, এইবার বোঝা যাচেছ। নায়েব মশাইএর হাতে অনেকগুলো টাকার নোট। কণ্ঠস্বরে তাঁর মিনতি।

শোভনকে একটা কাজ করতে হবে। বাড়ীর কর্ত্রী মুমূর্ষু, ছেলের মৃত্যুসংবাদ তিনি শোনেননি। তাঁকে কিছু জানানো হয়নি। এখনো তিনি তাকে দেখবার আশা ক'রে আছেন---সেই জন্যেই বুঝি তিনি মৃত্যুতেও শান্তি পেতে পাচেছন না। শোভনকে তাঁর হারানো ছেলে হয়ে একবার দেখা

দিতে হবে। মুমূর্ষুর নিষ্প্রভ দৃষ্টিতে কোন কিছু ধরা পড়বে না। হারানো ছেলের সঙ্গে তার সত্যি সাদৃশ্য আছে। মৃত্যুপথ-যাত্রীকে এই শেষ সান্ত্বনাটুকু দেবার জন্যে জমিদার নিজে তাকে কাতর অনুরোধ জানিয়েছেন। তার এতে কোন ক্ষতি নেই- - -

নায়েব মশাই নোটের তাড়াটা শেভনের হাতে গুঁজে দিলেন।

* * * *

সোমেশ চুপ করিল। খানিকক্ষণ বাইরের বৃষ্টির শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নাই। আমি অবশেষে বলিলাম---''সোমেশ, তোমার কাণের কাছে একটা জড়ুল আছে।''

সোমেশ হাসিয়া বলিল,---''সেই জন্যেই গল্প বানান সহজ হ'ল।''

কিন্তু কেন বলা যায় না---শীতের বাদলের এই শীতল প্রায়ান্ধকার অস্বাভাবিক অপরাহ্নে তার হাসিটাই বিশ্বাস করিতে আমার প্রবৃত্তি হইল না।

পান্থশালা

এমন বিপদে আর কখনও পড়ি নাই।

সময় বেশ হাতে রাখিয়াই ষ্টেশনের জন্য রওনা হইয়াছিলাম। কিন্তু সন্ধ্যার কিছু আগে হইতে সামান্য যে একটু মেঘ আকাশের কোণে দেখা গিয়াছিল, তাহা হঠাৎ এমন তুফানরূপে আত্মপ্রকাশ করিবে কে জানিত !

অর্দ্ধেক পথও তখনও পার হইতে পারি নাই। হঠাৎ পাঞ্জাব হইতে বুঝি সমস্ত যুক্তপ্রদেশেরই ধূলি উড়াইয়া পশ্চিমের ভয়ঙ্কর ঝটিকা আসিয়া সমস্ত পৃথিবী আচ্ছন্ন করিয়া দিল।

উন্মুক্ত মাঠের মাঝখান দিয়া পথ। তাহাতে বাতাসের বেগে চলা দূরে থাক, দাঁড়াইয়া থাকাই দু:সাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। মাথা নীচু করিয়া বসিয়া পড়িয়াও ধূলাবালির উদ্দাম স্রোত হইতে আত্মরক্ষা করা কঠিন। এক সঙ্গে মুখ-নাক বাঁচান অসম্ভব বলিয়া বেশ খানিকটা যুক্তপ্রদেশের মৃত্তিকার স্বাদ গ্রহণ করিতে হইল। বালির জন্য চোখ বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম। তাহাতেও নিস্তার পাওয়া গেল না।

চোখ খুলিয়া রাখিতে পারিলেও যে বিশেষ কিছু লাভ হইত, এমন নয়। চারিদিক একেবারে অন্ধকার। গায়ের উপর দিয়া সেই অন্ধকারেই তীব্র স্রোতের যেন স্পর্শ পাইতেছি। দিগ্বিদিক তাহার আলোড়নে ঘুলাইয়া যেন লোপ পাইয়াছে।

ঝড়ের পিছনেই বৃষ্টির আবির্ভাব ঘটিল। বৃষ্টি ত নয়, আকাশের অগণন তীরন্দাজবাহিনী যেন বিদ্যুদগতি তুরঙ্গে চড়িয়া শরজালে পৃথিবী আচ্ছন্ন করিয়া চলিয়াছে। প্রত্যেকটি ফোঁটা গায়ে তীক্ষ্নভাবে আসিয়া বিঁধে।

প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের সহিত এমনভাবে মুখোমুখী দেখা হইলেই বুঝিতে পারা যায়, দেবতার অপরূপ পরিকল্পনার প্রেরণা মানুষ কোথায় পাইয়াছে। সমস্ত আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া এই যে ভয়ঙ্কর ঝটিকা পৃথিবীর ভিত্তিকেও যেন নাড়া দিয়া বহিয়া চলিয়াছে, শুধু নগরের আশ্রয় হইতে অসম্পূর্ণ পরিচয় লাভ করিয়াই ইহাকে জড় প্রকৃতির লীলামাত্র বলিয়া মনে করা যায়। উন্মুক্ত এই প্রান্তরের মাঝে তাহার রূপ সত্যই আলাদা, মুক্তকেশী শ্যামার রণরঙ্গিণী-মূর্ত্তি আপনা হইতে মনে উদয় হওয়া অসম্ভব কিছুই নয়।

বৃষ্টি ক্রমশ: বাড়িয়া উঠিল। জামা-কাপড় ভিজিয়া একাকার হইল কাদায়, জলে। তাহার উপর হাওয়াতে মনে হইল, হাড়ের ভিতর পর্য্যন্ত শীতে কাঁপাইয়া দিতেছে। কিন্তু বৃষ্টির অসুবিধা যতই হোক, ধূলার উপদ্রবটা যাওয়াতে অনেকটা স্বস্তি বোধ করিতেছিলাম।

ঘড়ি খুলিয়া টর্চ্চ জ্বালিয়া দেখিলাম, ঝড়ের ভয়েই বোধ হয় আগেই তাহা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এখান হইতে ষ্টেশন পর্য্যন্ত এই ঝড়-বৃষ্টি মাথায় করিয়া যাওয়া এখন অসম্ভব। সম্ভব হইলেও, ট্রেণ যে আর ধরিতে পারিব না, তাহা বুঝা কঠিন নয়।

ফিরিবার বেলায় কেন যে এ পথটা গাড়ীর সামান্য খরচা বাঁচাইতে গিয়াছিলাম, তাহা ভাবিয়া নিজেকে তখন ধিক্কার দিতেছি। অবশ্য এদেশী এক্কাও এই ঝড়ের ভিতর অগ্রসর হইতে পারিত কি না সন্দেহ, কিন্তু এই বিপদের মুহূর্ত্তে মানুষ ও পশুর আশ্বাসকর সঙ্গ ত পাইতাম। আশ্রয়

কোথায় পাওয়া যাইতে পারে, সে সম্বন্ধে একটা পরামর্শ ত করা যাইত।

আশ্রয় পাওয়াই এখন সবচেয়ে বড় সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই অন্ধকার দুর্যোগের রাত্রে এই অপরিচিত জায়গায় কোথায় গিয়া দাঁড়াইব!

দাঁড়াইবার মত বাড়ী কাছে-পিঠে কোথাও ত নাই। নগরকে পিছনে ফেলিয়া প্রায় মাইল তিনেক বোধ হয় চলিয়া আসিয়াছি। মনে পড়ে, ঝড় উঠিবার আগে চারিধারে ধূ ধূ প্রান্তরই দেখিয়াছিলাম। একটা গ্রামও কাছে-পিঠে চোখে পড়ে নাই।

ফিরিয়া নগরে পৌঁছিতে পারিলেও আশ্রয় পাইব কিনা সন্দেহ। একেবারে অপরিচিত হিন্দুস্থানী সহর। এই দুর্যোগের রাতে সেখানে কাহার দরজা ঠেলিয়া হাঙ্গামা বাধাইব!

মাত্র আজ দুপুর বেলা এই ছোট সহরটিতে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। দুপুর হইতে সমস্ত বিকাল আলাপ কম লোকের সঙ্গে করি নাই। কিন্তু মাথার তেল ও সাবানের দালালীর আলাপ বিদেশী বণিকের সহিত হৃদ্যতা গড়িয়া উঠিবার পক্ষে ঠিক অনুকূল বলা চলে না। সে আলাপের জোরে আতিথেয়তা দাবী করা যায় না। রাত্রের ট্রেণেই চলিয়া আসিব, জানিতাম। তাই কোথাও আস্তানার সন্ধানও করি নাই। এখন তাই কোন উপায়ই দেখিতে পাইলাম না। ভ্রাম্যমান দালাল হিসাবে পথে পথে জীবনের অনেক বৎসর কাটিয়াছে; কিন্তু এমন অকূল পাথারে কখনও বুঝি পড়ি নাই!

তবু এই দারুণ বৃষ্টির ভিতর মাঠের মাঝে সারা রাত বসিয়া থাকা চলে না। নিরুপায় হইয়া শেষে ষ্টেশনের দিকেই চলিতে আরম্ভ করিলাম। ট্রেণ পাওয়া যাইবে না সত্য, কিন্তু মাথা গুঁজিবার মত একটু আশ্রয় ত মিলিবে।

কি ভাগ্য, টর্চটা সঙ্গে ছিল। এই নীরন্ধ্র অন্ধকারে নহিলে বুঝি পথটুকুও চিনিয়া লইতে পারিতাম না!

বৃষ্টি সমানভাবেই পড়িতেছে। ভিজে জামা-কাপড়ের অস্বস্তিকর ভার ত আছেই; তাহার উপর আবার সঙ্গের ব্যাগটা জল লাগিয়া ওজনে দ্বিগুণ হইয়াছে। বহন করিয়া লইয়া যাওয়া একটা শাস্তি। কোন রকম পৌঁছিবার আশা না রাখিয়া, শুধু যন্ত্রের মতই পা দুইটা চালাইয়া যাইতেছিলাম।

এই মন্থর গতিতে ষ্টেশনে পৌঁছাইতে কতক্ষণ লাগিবে কে জানে! টর্চের ব্যাটারীর পরমায়ু আর খুব বেশী যে নাই, তাহা আলোর লালচে রঙ দেখিয়াই বুঝিতে পারিতেছিলাম। যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে ভরসা হইতেছিল না। মাঝে মাঝে একটুখানি জ্বালিয়া পথের সীমানাটুকু দেখিয়া লইয়াই আবার তাহা নিভাইয়া দিতেছিলাম।

শরীর ও মনের অবস্থা এমন না হইলে, হয়ত আলো-অন্ধকারের এ রূপ উপভোগ করা যাইত। প্রত্যেক বার টর্চের আলো যেন ঘন অন্ধকারকে সবলে সরাইয়া, ছোট একটি মায়া-প্রকোষ্ঠ আমার চারিধারে সাজাইয়া তুলিতেছে। চারিধারে বৃষ্টির ধারা নয়, সোনালি চিকই কেন ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। পথের কাঁকর ও নুড়িগুলি ঝক্ ঝক্ করিয়া উঠিতেছে, অপরূপ মণি-মাণিক্যের মত। তারপর টর্চ নিভিবার সঙ্গে সঙ্গে আবার শুধু শব্দময় অন্ধকার। তাহাতে সমস্ত পৃথিবী শুধু নয়, চেতনাও যেন লুপ্ত হইয়া যাইতেছে।

কতক্ষণ এভাবে চলিয়াছিলাম, ঠিক বলিতে পারি না। ঘড়ি বন্ধ, মন সময়ের সমস্ত অনুভূতি হারাইয়াছে। শাশ্বত রাত্রি যেন দেশ-কাল সমস্ত মুছিয়া দিয়াছে।

হঠাৎ একবার আলো জ্বালিয়া মনে হইল, খানিক দূরে পথের ডান ধারে বৃষ্টির চিকের ভিতর হইতে একটা অস্পষ্ট কিসের আয়তন যেন দেখা গেল। চিহ্নহীন প্রান্তরের মাঝে এমন কিছু দেখিবার আশা করি নাই। টর্চটা পথ হইতে সেই দিকে তুলিয়া ধরিলাম। পথের ধারে একটা বাড়ীই যেন দেখা যাইতেছে। মন্দিরের মত একদিকে ছোট একটি চূড়াও যেন চোখে পড়িল।

অত্যন্ত আশ্চর্য্যের কথা। মাঠের মাঝখানে এমন নিঃসঙ্গ বাড়ী থাকিবার কথা নয়। মন্দিরের চূড়াটি না থাকিলে তাহার নিঃসঙ্গতা একেবারেই দুর্ব্বোধ হইয়া উঠিত। শহরের এক্কা করিয়া আসিয়াছিলাম। তখন অন্ততঃ বাড়ীটি লক্ষ্য করি নাই।

যাহাই হউক, এখন সে বিচার করিবার সময় নয়। যে কোন রকম একটা আস্তানা পাইলেই হয়। দ্বিধামাত্র না করিয়া তাই সেদিকে অগ্রসর হইলাম।

টর্চের অস্পষ্ট আলোয় কাছে গিয়া দেখিলাম, সাধারণ হিন্দুস্থানী ধরণের নীচু একটি কোঠা-বাড়ী। মন্দির বলিয়া যাহা মনে হয়, তাহা বাড়ীটির সঙ্গেই সংলগ্ন। ছাদের খানিকটা অংশ সামান্য একটু উঁচু হইয়া উঠিয়া তাহাকে এই গৌরব দিয়াছে। ভগ্নদশা না হইলেও, বাড়ীতে কেহ বাস করে বলিয়া বিশ্বাস করা কঠিন। সাড়া-শব্দ এই বৃষ্টিতে না পাওয়ারই কথা; কিন্তু ভিতর হইতে কোথাও একটু আলোর রেখাও দেখিতে পাইলাম না।

তবু সামনের একটিমাত্র দরজা যখন ভিতর হইতে বন্ধ, তখন অধিবাসী কেহ থাকাই সম্ভব। সেই দরজাতেই গিয়া উপরের শিকলি ধরিয়া নাড়া দিলাম। কোন সাড়াশব্দ নাই। আরো জোরে শিকলি নাড়া দিয়াও কোন ফল হইল না।

সেখান হইতে সরিয়া আসিয়া আর কোথাও দরজা আছে কিনা সন্ধান করিতেছি, হঠাৎ টর্চের আলোয় একটা জিনিষ দেখিয়া অবাক যেমন হইলাম, তেমনি দুঃখের ভিতর হাসিও পাইল। বাড়ীটির মাথায় আলকাতরা দিয়া বড় বড় করিয়া লেখা---'পান্থনিবাস।' লেখাটা অনেক কালের। অস্পষ্ট হইয়া আসিলেও, পড়া যায়। এই হিন্দুস্থানীর দেশে বাঙ্গালা অক্ষর দেখিয়া বিস্মিত হইবারই কথা; কিন্তু সেই সঙ্গে রুদ্ধদ্বার পান্থনিবাসের আতিথেয়তার নমুনায় অত্যন্ত বিরক্ত-মিশ্রিত কৌতুকও বোধ করিলাম।

কিন্তু আতিথেয়তা আজ জোর করিয়া আদায় করিতেও আমার আপত্তি নাই। আর কোন দিকে দরজা না দেখিতে পাইয়া, আবার সেই রুদ্ধদ্বারে গিয়াই আঘাত করিলাম। করাঘাত হইতে যখন মরিয়া হইয়া পদাঘাতে নামিয়াছি---দরজা প্রায় ভাঙ্গিবার উপক্রম, তখন ভিতর হইতে আলোর রেখা দেখা গেল।

শরীর ও মনের উপর দিয়া যে ধকল গিয়াছে, তাহাতে চিত্ত প্রসন্ন থাকিবার কথা নয়। ভিতর হইতে দরজা খুলিবার আগেই কর্কশ কণ্ঠে বলিলাম, "কি রকম লোক মশাই! আধঘণ্টা ধরে ডাকাডাকি করছি, শুনতে পান না!"

আলকাতরার অস্পষ্ট লেখাটুকু হইতেই বোধ হয় এতখানি রূঢ় হইবার ক্ষমতা সংগ্রহ করিয়াছিলাম।

ভিতর হইতে দরজা এবার খুলিল। লণ্ঠন হাতে যে লোকটিকে এবার দেখিলাম, মেজাজ অত খারাপ না থাকিলে, তাঁহাকে সৌম্য-দর্শন প্রশান্ত-মূর্ত্তি প্রৌঢ় বলিয়া বোধ হয় বর্ণনা করিতে পারিতাম। কিন্তু তখন তাঁহার পরণের গেরুয়াটাও ভণ্ডামীর প্রচণ্ড নিদর্শনরূপে সমস্ত মন তিক্ত করিয়া দিয়াছে।

অনুমতির অপেক্ষা না রাখিয়া, ভিতরে ঢুকিয়া পড়িয়া বলিলাম, "বেড়ে পান্থনিবাস ত মশাই! বিপদের দিনে মানুষ আশ্রয় চাইতে এলে দরজাই খোলে না!"

প্রৌঢ় কুণ্ঠিত স্বরেই যেন বলিলেন, "বৃষ্টির আওয়াজে শুনতে পাইনি। এমন সময়ে কেউ তা ছাড়া আসে না।"

"এমন সময়ে আসবে কেন! পান্থনিবাস সকাল-বিকাল তাস-পাসা খেলবার জায়গা কিনা!"

তিনি মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "কিছু মনে করবেন না, আমার আর একটু সজাগ থাকা সত্যি উচিত ছিল।"

বিনয়েও মন তখন নরম হইবার নয়। 'নিশ্চয় ছিল' বলিয়া ঘরের চারিদিকে এবার ভালো করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম। এদেশী ধরণের তৈয়ারী পুরাণো ঘর। জানালা-দরজার বেশী বালাই নাই। ঘরে আসবাবপত্রও অল্প। এক-

ধারে একটা খাটিয়া ও আর একদিকে ঘটি, গেলাস ও একটা জলের কলসী ছাড়া কিছু নাই। ঘরটি পরিষ্কারই বলা চলে। দেয়ালে নতুন চূণকাম করা আছে, মেঝেটিও নোংরা নয়।

ভিজা ব্যাগটা মেঝের উপর নামাইয়া দিয়া বলিলাম, "এই ঘরেই থাকতে হবে ত?"

"আর একটা ঘর আছে। কিন্তু এইটেই ভাল।"

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে তাকাইয়া ব্যঙ্গের স্বরেই বলিলাম, "তাই নাকি। তাহ'লেও খারাপ ঘরটা একবার দেখিয়ে দিন। নিজের চোখেই সন্দেহ-ভঞ্জন হয়ে যাক। অনেক মুল্লুক এরি মধ্যে দেখা হয়েছে মশাই। ধর্ম্মশালা অতিথশালার খারাপ ঘরগুলোর ওপর টান আমার বেশী।"

লোকটি নিতান্ত সহজ নয়। ইহাতেও তাঁহার মুখের ম্লান প্রশান্তির কোন পরিবর্ত্তন দেখা গেল না। তেমনি মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "চলুন, দেখিয়ে আনি।"

মন্দিরের পাশে ছোট একখানি ঘর। ঘরখানি সত্যই নিকৃষ্ট। ফিরিয়া আসিয়া পূর্ব্বের ঘরের খাটিয়ার উপর বসিয়া পড়িয়া, ব্যাগ খুলিয়া ভিজা জামা-কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে বলিলাম, "বিছানা-টিছানা আছে, না এই দড়ির ওপরই শুতে হবে?"

"আপনি ততক্ষণ কাপড় ছাড়ুন; আমি বিছানা-পত্র এনে দিচ্ছি।" বলিয়া তিনি মেঝের উপর লণ্ঠনটা নামাইয়া দিয়া বাহিরে চলিয়া যাইতেছিলেন। ডাকিয়া বলিলাম, "আর শুনুন। ভিজে ত একেবারে নিমোনিয়া হবার জোগাড়। একটু চায়ের ব্যবস্থা করতে হবে।"

"চা।"

"কেন, চা এমন কি খারাপ জিনিষ। গাঁজা-টাজা খাওয়ার যে অভ্যাস নেই।"

ভদ্রলোকের মুখের ওপর দিয়া মনে হইল, সামান্য একটু বেদনার ছায়া সরিয়া গেল। কথাটা বলিয়া ফেলিবার পর নিজের কাণেই যেন একটু বেশী কুৎসিত শোনাইয়াছিল; কিন্তু অনেকদিন দালালী করিয়া লজ্জা-সঙ্কোচের বৃত্তিগুলা প্রায় উচ্ছেদ করিয়া ফেলিয়াছি। অনায়াসেই অস্বস্তিটা জয় করিয়া ফেলিলাম। তা ছাড়া ভণ্ডামীর মুখোসে একটু আধটু খোঁচা দেওয়া এমন কিছু অন্যায় নয়; স্পষ্টবাদিত্ব সম্বন্ধে নিজের মনে একটু অহঙ্কারই আছে।

তাঁহাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া বরং একটু বিরক্ত হইয়া উঠিলাম, "কি রকম আপনাদের অতিথসৎকারের ব্যবস্থা মশাই। ঠাণ্ডা লেগে মারা যাবার জোগাড় হ'লে লোকে একটু চা'ও পাবে না।"

"না না, পাবেন বইকি! আমি ব্যবস্থা করছি।" বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। পিছন হইতে হাঁকিয়া বলিলাম, "চা কড়া হয় যেন মশাই। খানিকটা গরম জলে গুড় গুলে যেন আনবেন না।"

জামা-কাপড় ছাড়িয়া বেশ একটু স্বস্তিই বোধ হইতেছিল। ঘরটা এমন কিছু খারাপ নয়, সমস্ত বাড়ীটায় একটা ছম্‌ছমে ভাব অবশ্য আছে, কেমন একটা দুঃসহ গুমোট যেন তার উপর চাপিয়া ধরিয়া আছে, মনে হয়। কাণ পাতিয়া শুনিলে, কোথায় যেন গুমরাণির আওয়াজও শোনা যায়। কিন্তু সে নিশ্চয়ই আমার মনের ভুল। বর্ষার রাতে অজানা জায়গায় এমন একটু অস্বস্তি হওয়া স্বাভাবিক। সে এমন কিছুই নয়। এই দুর্য্যোগের ভিতর এমন আশ্রয়কে অবজ্ঞা করা যায় না। আর সত্য কথা বলিতে গেলে, ভ্রাম্যমান জীবনে ইহার চেয়ে অনেক বেশী অসুবিধার অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে।

গরম চা আসিবার পর সমস্ত পৃথিবী এবং সেই সঙ্গে গেরুয়াধারী গৃহস্বামীর প্রতিও প্রসন্ন বোধ করিলাম।

চায়ের স্বাদ ও গন্ধ সম্বন্ধে কঠিন কয়েকটা মন্তব্য হয়ত করিতে পারিতাম। কিন্তু আত্ম-সংবরণ করিয়া গৃহস্বামীকে একটু আপ্যায়িতই করিলাম।

"এদেশে কতদিন এ ব্যবসা করছেন?"

বিস্মিতভাবে আমার দিকে তাকাইয়া তিনি বলিলেন, "কি বলছেন?"

"বলছি, আপনি ত বাঙালী। এদেশে আছেন কতদিন?"

"তা' অনেক বছর হবে। বিশ বছরের কম নয়।"

"এ মেড়ুয়ার দেশে এখনও ভক্তি-শ্রদ্ধা একটু-আধটু মেলে, কি বলেন! সাধু-সন্ন্যাসীর এখনও এখানে বেশ পসার আছে!"

ম্লান হাসিয়া গৃহস্বামী বলিলেন, "আমি সন্ন্যাসী নই।"

"সন্ন্যাসী নন!"

আমাকে তাঁহার গেরুয়া-বাসের দিকে সকৌতুকে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিলেন, "ওটা কিছু নয়, এমনি পরি। আমি গৃহস্থ।"

হাসিয়া ফেলিলাম। "হুঁ, গাছের বা তলার কিছুই বাদ দিতে চান না!"

ভদ্রলোক তেমনি উদাস করুণ মুখে চুপ করিয়া রহিলেন। মনে যেটুকু প্রসন্নতা দেখা দিয়াছিল, লোকটার এই উদাস কারুণ্যের ভাণে তাহা বজায় রাখা কঠিন হইয়া উঠিল। লোকটার এ মিথ্যা মুখোস কোন রকমে ফাঁক করিয়া দিবার জন্য একটা জেদই অনুভব করিতেছিলাম।

বলিলাম, "তাহ'লেও ব্যবসা বেশ চলছে নিশ্চয়! নইলে বিশ বছর আর দেশে যাবার দরকার বোধ করেননি!"

"না, এইখানেই ঘর-বাড়ী ক'রে ফেলেছি। আর যাওয়া হয়নি।"

হাসিয়া বলিলাম, "তা ত করবেনই। গাড়ী-ঘোড়া যে করেননি, এই আশ্চর্য্য! তা' যা করেছেন করেছেন, লোক দেখান ভড়ংটা অন্ততঃ রাখবেন। ব্যবসায় বাইরের চটক ত একটু দরকার। অতিথি-সজ্জন এসে একটু-আধটু যত্ন না পেলে সব ফাঁস হয়ে যাবে যে!"

"যথাসাধ্য করবার ত চেষ্টা করি।" সেই ক্লান্ত বেদনাময় স্বর।

হাড় পর্য্যন্ত জ্বলিয়া গেল। বলিলাম, "যথাটা ত দেখতে পাচ্ছিনে। এই চা খেয়েই কি রাত কাটাতে হবে নাকি।"

লোকটা অত বেদনাময় সহিষ্ণুতার ভাণ না করিলে এত রূঢ় আমিও হইতে পারিতাম না নিশ্চয়।

"না, না, খাবার ব্যবস্থা করতেই যাচ্ছি।"

"তাই করুন একটু তাড়াতাড়ি।"

কুণ্ঠিতস্বরে তিনি এবার বলিলেন, "দেখুন, একটু অসুবিধে আছে।"

তীক্ষ্ণস্বরে বলিলাম, "অসুবিধা একটু কেন, অনেক আছে। যা' হয় নিয়ে আসুন মশাই। রাতটা ত কাটাতে হবে। আর দুটো কম্বল অন্ততঃ আনবেন।"

কম্বল ও খাবার আসিবার পর দেখিলাম, আয়োজন একেবারে অবজ্ঞা করিবার মত নয়। ঠাণ্ডার দিন না হইলে চিড়া-দুধ-কলার ফলারে আরও পরিতৃপ্তি অবশ্য লাভ করিতে পারিতাম।

বৃষ্টি এখনও সমানভাবে পড়িতেছে। খাইতে বসিয়া হঠাৎ আর না জিজ্ঞাসা করিয়া পারিলাম না।

"কি রকম একটা শব্দ হচ্ছে না? শুনতে পাচ্ছেন?"

চোখের ভুল কি না জানি না; কিন্তু মনে হইল, গৃহস্বামী একবার যেন চমকাইয়া উঠিলেন।

আবার বলিলাম, "কি রকম একটা গুমরাণি কান্নার মত শব্দ! ভুতুড়ে বাড়ী নাকি মশাই!"

"ও: কিছু নয়, আপনি খেতে বসুন।"

"সে কথা বলতে হবে না, ভূত-প্রেত-ডাকিনী-যোগিনী কেঁদে পৃথিবী ভাসিয়ে দিলেও পাত ফেলে উঠে পড়ব এমন আশা করবেন না।" জোর করিয়া হাসিয়া উঠিলাম। কিন্তু সে হাসিতে যোগ দেওয়া দূরে থাক, তাঁহার মুখে কোন পরিবর্ত্তনও দেখা গেল না।

মুখে যাহাই বলি, খাওয়া-দাওয়ার পর একলা শুইতে যাইবার সময়ে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম। উদার প্রান্তরের মাঝে এই নি:সঙ্গ বাড়ীটার উপর সত্যই যেন একটা ভয়ঙ্কর রহস্যের

ভার চাপিয়া আছে। বাহিরে বৃষ্টির সঙ্গে আবার হাওয়াও উঠিয়াছে। দরজাটা ক্ষণে ক্ষণে নাড়া খাইয়া শিকলিটা ঝন্-ঝন্ করিয়া বাজিয়া উঠিতেছে; মন্দিরের চূড়ায় ব্যাহত হইয়াই বায়ুস্রোত ক্ষণে ক্ষণে অদ্ভুত তীক্ষ্ণ শব্দ করিয়া উঠিতেছে। কিন্তু সে সমস্ত আওয়াজ ছাপাইয়াও মাঝে মাঝে যে করুণ একটা গুমরাণি মত ধ্বনি উঠিতেছে, তাহাকে কিছুতেই মনের ভুল বলিয়া উড়াইয়া দিতে আর পারিতেছিলাম না।

এলোমেলো ঝোড়ো হাওয়ায় বিক্ষিপ্ত শব্দের দিক্ নির্ণয় করা কঠিন। খানিক কাণ পাতিয়া শুনিতে শুনিতে মনে হয়, বাড়ীটার গভীর ভিত্তি হইতেই প্রেতায়িত একটা চাপা ক্রন্দন-রোল সুদূর আকাশে উত্থিত হইতে চাহিতেছে, ঝোড়ো হাওয়া কোন মনে যেন তাহাকে নীরব করিয়া দিবার জন্য ব্যাকুল।

নিশ্চিন্ত হইয়া কিছুতেই ঘুমাইবার চেষ্টা করিতে পারিলাম না। ঘরে হ্যারিকেনটা বেশ উজ্জ্বলভাবেই জ্বলিতেছে। তবু মনে হইতেছিল, অন্ধকার যেন একেবারেই দূর হয় নাই। বাইরের বৃষ্টির শব্দে বহু আততায়ীর পদধ্বনিরই যেন আভাষ।

সমস্ত গাটা ছম্ ছম্ করিতেছে। খাটের উপর উঠিয়া বসিলাম। কিন্তু স্থির হইয়া বসিয়া থাকাও বেশীক্ষণ চলিল না।

ঝোড়ো হাওয়ার ক্ষণিক বিরতির মাঝে কান্নার স্পষ্ট শব্দ এবার মনে হইল, শুনিয়াছি। হ্যারিকেনটা হাতে লইয়া ভিরের দিকে দরজা খুলিয়া অগ্রসর হইলাম।

লোকটার আবার নামও জানা নাই।

তবু চীৎকার করিয়া ডাকিলাম, "মশাই, ও মশাই!"

কোন সাড়া-শব্দ নাই। বাতিটা তুলিয়া আর একটু আগাইয়া গেলাম। সামনে খোলা উঠান। ইহার পূর্ব্বে অন্ধকারে তাহার ওপারে কি আছে, চোখে পড়ে নাই। এবার দেখিলাম, উঠানের পরেই খোলায় ছাওয়া দুটি ঘর ---গৃহস্বামীর বাসস্থান হইবে নিশ্চয়। বাহিরের দিকে দেওয়াল থাকায় সমস্ত বাড়ীটাকেই কোঠা বলিয়া যে মনে করিয়াছিলাম, তাহা ভুল। খোলা উঠান পার হইতে গিয়া বৃষ্টিতে ভিজিতে প্রথমটা ইচ্ছা হইল না। আর একবার চীৎকার করিয়া ডাক দিলাম।

এবার সাড়া মিলিল। প্রৌঢ় একটা তেলের ডিবিয়া জ্বালিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

বলিলাম, "এদিকে শুনে যান মশাই, উঠানে আর ভিজতে পারি না।"

গৃহস্বামী এধারে আসিয়া পৌছাইতেই বলিলাম, "ব্যাপারটা কি, বলুন দেখি?"

"কেন?"

"কেন আবার! এ ভূতুড়ে বাড়ীতে কেউ ঘুমোতে পারে! অতিথিদের সুবিধের জন্যে বুঝি এই ব্যবস্থা ক'রে রেখেছেন! একবার থেকে কেউ যাতে আর এমুখো না হয়।"

"আপনার কি অসুবিধে হচেছ বলুন!"

"কি আবার! সৃষ্টিছাড়া আওয়াজ! কেন আপনি টের পাচেছন না নাকি?"

ভদ্রলোক চুপ করিয়া ছিলেন, হঠাৎ একটা কথা মনে হওয়ায় কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনারা ক'জন থাকেন এখানে?"

সামান্য একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে ভদ্রলোক কেন এত বিলম্ব করিলেন, কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বিস্মিত হইলাম। বেশ একটু থামিয়া তিনি যেন অনেক কষ্টে বলিলেন, "আমি আর আমার স্ত্রী।"

"আর কেউ না।"

'না'---এবারও কথাটা যেন তাঁহার গলায় আটকাইয়া গেল।

হঠাৎ কেমন যেন একটা ভয়ে আমার বুক কাঁপিয়া উঠিল। যে লোকটিকে এতক্ষণ ধরিয়া অবজ্ঞা ও উপহাস করিয়াছি, তাহার দিকে শঙ্কিতভাবে দৃষ্টিপাত করিলাম। সৌম্য প্রশান্ত মূর্ত্তি, মুখে গাঢ় বেদনার ছায়া। কিন্তু এ সমস্তের তলায় আরও সাঙ্ঘাতিক কোন রহস্য ত থাকিতে পারে!

মাঠের মাঝে নির্জন নিঃসঙ্গ বাড়ী। চাপা অদ্ভুত ক্রন্দন-ধ্বনি। লোকটির অদ্ভুত অবিচলিত

ভাব। এ সমস্তই যেন গভীর কোন প্রহেলিকার নির্দ্দেশ দিতেছে।

বলিলাম, "এ রকম আওয়াজ আর হ'লে আমায় সারা রাত্রি ত জেগে কাটাতে হবে। যাই হোক, একটা তালা চাবি দিতে পারেন?"

"তালা চাবি?"

"হ্যাঁ, সাবধানের বিনাশ নেই মশাই। ভেতর থেকে দরজার কড়ায় লাগিয়ে রাখি। এই ধরুন, আপনাকেই বিশ্বাস কি! মাঠের মাঝে চমৎকার আড্ডা পেতে রেখেছেন। এখন রাত্রে লোক লাগিয়ে মেরে পুঁতে ফেললেও কেউ টের পাবে না। কিন্তু লাভ কিছু হবে না মশাই। একটা রিটার্ণ টিকেট আর টাকা দু'এক খুচরা আছে। বড়লোক হবে না কেউ তাতে।- -"

মনের স্পষ্ট আতঙ্কে বিচলিত হইয়া এমন আরও হয়ত বকিয়া যাইতাম। ভদ্রলোক বলিলেন, "আপনি ঘুমোন গে যান। অমন আওয়াজ আর হবে না।"

চটিয়া উঠিয়া বলিলাম, "হবে কি না হবে, আপনি ত তাও জানেন দেখছি। না মশাই, আপনি তালা এনে দেবেন ত দিন, নইলে এ বৃষ্টির মধ্যেই আমি বেরিয়ে পড়ব।"

"না না, তা বেরোতে হবে না। দেখি তালা কোথায় পাই।"

ভদ্রলোক হাত দিয়া ডিবিয়াটিকে বাঁচাইয়া আবার উঠান পার হইয়া গেলেন---পিছন হইতে বলিলাম, "কোথায় পাই নয়, পেতেই হবে।"

তালা সত্যই পাওয়া গেল। এবং ভিতর হইতে একদিকে খিল ও আর দিকে তালা দিয়া, টর্চ হাতে করিয়া কতকটা যেন নিশ্চিন্ত হইয়া বিছানায় বসিলাম।

আশ্চর্য্যের বিষয়, কান্নার আওয়াজ সত্যই আর নাই, মাঝে মাঝে অত্যন্ত চাপা সেই ধরণের যে আওয়াজ আসিতেছে, তাহা অত্যন্ত ক্ষণিক। বাতাসের উপদ্রব ছাড়া আর কিছু তাকে বলা যায় না। কিন্তু তবু প্রথমটা নিশ্চিন্ত হইতে পারিলাম না। এই থামিয়া যাওয়াটা আরও রহস্যময় লাগিতেছিল।

অনেকক্ষণ জাগিয়া ছিলাম, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ঘুম আসিলই।

ঝড়-বৃষ্টির সহিত খুন-ডাকাতির একটা জড়ান অর্থহীন দুঃস্বপ্ন দেখিয়া যখন জাগিয়া উঠিলাম, তখন ভোর হইয়া গিয়াছে, দরজার ফাঁক দিয়া বাহিরের আলো দেখা যাইতেছে। আওয়াজের অভাবে বুঝিলাম, বৃষ্টি আর নাই।

সাহস করিয়া এবার দুধারেরই দরজা খুলিলাম।

বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, বৃষ্টি থামিয়া গেলেও আকাশের মুখ ভার। যে কোন মুহূর্ত্তে আবার বর্ষণ সুরু করিতে পারে।

সকালেই একটা ট্রেণ আছে। সেটাকে কোনমতেই ছাড়া চলিবে না বুঝিয়া ভিজা কাপড় যেমন শুকাইয়াছিল, সেই অবস্থাতেই ব্যাগে ভরিয়া প্রস্তুত হইয়াছি, এমন সময়ে গৃহস্বামী আসিয়া দেখা দিলেন। রাত্রের চেয়ে এখন তাঁহাকে আরও যেন ক্লান্ত দেখাইতেছে। চোখের অবস্থা দেখিয়া সন্দেহ হয়, সমস্ত রাত্রি ঘুমাইতে তিনি পারেন নাই।

জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখনি যাবেন?"

"আর থাকে মশাই! এক রাত্রে এক বচ্ছরের আয়ু কমে গেছে!"

তিনি কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন, "সত্যি আপনার বড় কষ্ট হয়েছে, কিছুই করতে পারিনি!"

"বিনয়ের দরকার নেই মশাই। যা করেছেন তার জন্য কত প্রণামী লাগবে বলুন?"

ভদ্রলোকের মুখে গভীর বিস্ময় ও বেদনার চিহ্ন দেখিয়া একটু যেন অপ্রতিভ হইলাম এবার।

নিজেকে যেন সামলাইয়া লইয়া তিনি বলিলেন,---"কিছু লাগবে না! এখানে কিছু লাগে না।"

তবু দমিবার পাত্র আমি নই। বলিলাম, "মাঝে মাঝে এ চালও দরকার। আচ্ছা, তা-হ'লে আসি।"

ব্যাগটা তুলিয়া বাহিরে পা দিয়াছি, এমন সময়ে রাস্তার আওয়াজে চমকাইয়া উঠিলাম।

"রাম নাম সাচ্ হ্যায়!"

শহরের দিকের রাস্তা হইতে ছেলে-বুড়ো, স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়া বিপুল এক জনতা ভীড় করিয়া এই দিকেই আসিতেছে। সঙ্গে মৃতদেহ না দেখিয়া বুঝিলাম, সৎকার শেষ করিয়া তাহারা এখন ফিরিবার মুখে।

কাছাকাছি আসিয়া সামনের শব-বাহকেরাই বোধ হয় আবার চীৎকার করিয়া উঠিল।

হঠাৎ চমকিত হইয়া ফিরিয়া তাকাইলাম। রাত্রে যে কাতর কান্নার শব্দ অমন রহস্যের স্বষ্টি করিয়াছিল, পিছনে আবার তাহাই শুনিতে পাওয়া গেল।

স্খলিত পদে, আলুথালু বেশে ভিতর হইতে একজন প্রৌঢ়া ছুটিয়া আসিতেছেন।

গৃহস্বামীর শান্ত সৌম্য মুখেও এখন যেন বেদনার ছায়া আরও গাঢ় হইয়াছে। চোখে অশ্রুর স্পষ্ট আভাষ।

উত্তেজিতভাবে কাতর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি হয়েছে, বলুন? বলুন কি হয়েছে?"

শবযাত্রীর দল একেবারে কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে।

গৃহস্বামী স্তব্ধ পাষাণ-মূর্তির মত দাঁড়াইয়া আছেন। কোন কথা তাঁহার মুখ হইতে শোনা গেল না।

কিন্তু উত্তর আমার মিলিল। প্রৌঢ়া দরজার কাছে আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার উচ্ছ্বসিত উন্মত্ত বিলাপ হইতে একটু একটু করিয়া আমার প্রশ্নের ভয়ঙ্কর উত্তর স্পষ্ট হইয়া উঠিল।

এই প্রৌঢ়-দম্পতির একটিমাত্র পুত্র কাল বিকালে মারা গিয়াছে। সমবেত লোকেরা দুর্য্যোগের রাত্রের মধ্যে তাহারই সৎকার করিয়া এখন ফিরিল।

ছোট গল্পে রবীন্দ্রনাথ

"----এবং নৌকা ছাড়িয়া দিল,---বর্ষা-বিস্ফারিত নদী ধরণীর উচ্ছলিত অশ্রুরাশির মতো চারিদিকে ছল-ছল করিতে লাগিল, তখন হৃদয়ের মধ্যে অত্যন্ত একটা বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন---একটি সামান্য গ্রাম্যবালিকার করুণ মুখচ্ছবি যেন এক বিশ্বব্যাপী বৃহৎ অব্যক্ত মর্ম্মব্যথা প্রকাশ করিতে লাগিল। একবার নিতান্ত ইচ্ছা হইল ফিরিয়া যাই, জগতের ক্রোড়বিচ্যুত সেই অনাথিনীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসি---কিন্তু তখন পালে বাতাস পাইয়াছে, বর্ষার স্রোত খরতর বেগে বহিতেছে, গ্রাম অতিক্রম করিয়া নদীকূলের শ্মশান দেখা দিয়াছে---এবং নদী প্রবাহে ভাসমান পথিকের উদাস হৃদয়ে এই তত্ত্বের উদয় হইল, জীবনে এমন কত বিচ্ছেদ, কত মৃত্যু আছে, ফিরিয়া ফল কী। পৃথিবীতে কে কাহার।"

'পোষ্ট মাষ্টারের' মত হৃদয়ের গভীর আবেদনে আর্দ্র গল্পের শেষে এই প্রায় অপ্রত্যাশিত নিষ্ঠুর মন্তব্যটি জুড়ে দেবার লোভ সম্বরণ করতে না পেরে রবীন্দ্রনাথ যদি গল্পটির আত্মাকে কিছু আঘাত ক'রে থাকেন, তাহ'লে তার ক্ষতিপূরণস্বরূপ সেই সঙ্গে মনে হয় তাঁর সমস্ত গল্প-সাহিত্যের পেছনকার দৃষ্টিভঙ্গিকেও আশ্চর্য্যভাবে ওই মন্তব্যে প্রকাশ করেছেন।

নদী যে দৃষ্টিতে তীরকে দেখে গল্প-রচয়িতা হিসেবে মানুষের অসংখ্য আনন্দ-বেদনা জড়ানো সংসার ও জীবন সম্বন্ধে তাঁরও সেই দৃষ্টি। লোকালয়-সংলগ্ন অথচ তা থেকে বিচ্ছিন্ন বিশাল বেগবান নদীর মতই একদিকে পরম অন্তরঙ্গ আর একদিকে একান্ত নির্লিপ্ত উদাসীনভাবে তিনি তাঁর গল্পে মানুষের খুঁটিনাটি থেকে বিরাট ও বিশেষ সমস্ত ঘটনা দেখে গেছেন। সে দেখার মধ্যে একদিকে যেমন আছে সুনিবিড় ঘনিষ্ঠতা ও ভালবাসা---তীরপ্রান্তবর্ত্তী স্থল-সংলগ্ন জীবনযাত্রার সঙ্গে নদীর চিরচঞ্চল ধারার যেমন সুগভীর সংযোগ,---তেমনি আবার আছে ক্ষণ পরিচয়ের পর নির্ব্বিকার, নির্লিপ্ত ঔদাসীন্য, যা এক এক সময় নিষ্ঠুরতার সামিল ব'লেই মনে হয়। নদীর স্রোতের মতই তিনি যেন তীরের অতি তুচ্ছ ঘটনাকেও অনুরাগের বেষ্টনে একবার নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আবার অনায়াসে অকুণ্ঠিতভাবে ছেড়ে চলে যান। একদিন নদীর ধারে কঞ্চির ছিপ নিয়ে মাছ ধরতে বসা একটি ছেলের ছবিও তার কল্পনায় পরম আকর্ষণ হয়ে ওঠে আবার তার পর দিন কাঁঠালিয়া গ্রামের সমস্ত স্নেহ প্রেম অনুরাগের বন্ধন অনায়াসে ছিন্ন ক'রে সোনামণির অসমাপ্ত কাহিনী অবজ্ঞা ক'রে চিরকালের মত বিদায় নিয়ে যেতে তাঁর বাধে না।

তীরের সঙ্গে নদীর এই যে সম্পর্ক, শুধু রবীন্দ্রনাথের নয়, পৃথিবীর সমস্ত সার্থক গল্প সৃষ্টির মূল রহস্য বোধ হয় এরই মধ্যে নিহিত আছে। গল্পমাত্রেই বোধ হয় নদীর চোখে তীরের গল্প।

মানুষের কাহিনী বলবার সন্দেহজনক সৌভাগ্য যারা লাভ করেন নদীর মত এক মুহূর্ত্তে গভীরভাবে আপন ক'রে নিয়ে পর মুহূর্ত্তে নির্দ্দয়ভাবে ছেড়ে যাবার নিয়তি তাঁদের মেনে নিতেই হয়। ভালবাসায় বাঁধা পড়ে গেলে, সংসার পাতা হয়ত হ'তে পারে কিন্তু এক কাহিনী থেকে আর কাহিনীতে

নিশ্চিহ্ন হয়ে বয়ে যাবার শক্তি বা অবসর আর থাকে না।

যে যুগে তাঁর অজস্র বিচিত্র দানের প্রাচুর্য্যে বাংলা সাহিত্যকে রবীন্দ্রনাথ সবচেয়ে সমৃদ্ধ করেছেন---বিশেষ ক'রে তাঁর গল্প রচনার যা স্বর্ণময় যুগ, সে সময়ে রবীন্দ্রনাথ ঠিক মনে হয় নদীর মতই জীবনের কূল ছুঁয়ে যেতে যেতে তাঁর অসংখ্য অফুরন্ত গল্পের ছায়া ক্ষণে ক্ষণে ধারা-স্রোতে ফুটিয়ে তুলে ক্ষণে আবার বিস্মৃত হয়ে গেছেন। চিরচঞ্চল প্রবাহ ছাড়া এত অজস্র ছবি আর কোথাও পাওয়া সম্ভব নয়।

আশ্চর্য্যের কথা এই যে, রবীন্দ্রনাথের গল্প রচনার বেলায়, নদীর উপমাটা শুধু উপমা নয়, তার মধ্যে ইতিহাসগত সত্য আছে।

বাংলা সাহিত্য যখন তিনি সম্পূর্ণ নূতন, সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত গল্পের সম্ভারে পূর্ণ ক'রে চলেছেন তখন নদীর বুকেই সত্যি তিনি ভাসমান। ১২৯৮ সাল থেকে তাঁর রচনায় গল্পের নূতন জোয়ারের সূত্রপাত হয়, বলা যায়। এ জোয়ার যখন এল তখন তিনি জমিদারীর তদারকী উপলক্ষে কখনও পদ্মার প্রশস্ত বক্ষে, কখনও কোন শীর্ণ শাখা নদীর মধ্যে বজরায় দিন কাটাচেছন।

নদীবক্ষে বাসের সঙ্গে তাঁর গল্প রচনার তারিখের এই মিল নেহাৎ অর্থহীন আকস্মিক ব্যাপার নয়, তার মধ্যে সুস্পষ্ট একটি সঙ্কেত আছে। রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প রচনার প্রেরণা সন্ধান করতে তাই আমাদের মনে হয় কোনো দূরদেশ বা শতাব্দীতে দুর্গম অভিযান করবার প্রয়োজন নেই। সে প্রেরণা স্বাভাবিকভাবে তাঁর এই নদী-সংশ্লিষ্ট জীবনের অধ্যায় থেকেই পাওয়া যায়। নদীর ওপরকার জীবনযাত্রাই সেদিন তাঁকে নিত্য নূতন গল্পের সূত্র জুগিয়েছে। মানুষের বিরাট বিস্তৃত জীবন-লীলা, গল্পের ছোট পরিসরে, খণ্ডিত অথচ স্বসম্পূর্ণভাবে দেখবার ভঙ্গি তিনি বজরার জানালা থেকেই শিখেছেন। ছোট গল্পে নিজের দেশের সাহিত্য থেকে তিনি কোন উৎসাহ পান নি বললেই হয়, কিন্তু বিদেশী সাহিত্যের কাছেও তাঁকে সে কারণে কিছু ধার করতে যেতে হয় নি।

সেদিক দিয়ে বিচার করলে রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলি সত্যিই আশ্চর্য্য সৃষ্টি। বিষয়-বস্তু ও বক্তব্যের দিক দিয়ে সেগুলি সম্পূর্ণ বাংলার নিজস্ব জিনিষ। পঞ্চাশ বৎসর আগে, রবীন্দ্রনাথের মনকে প্রভাবান্বিত করতে পারে এমন কোনো বিদেশী সাহিত্যে, সে-গল্পগুলির তুলনা পাই না। অথচ বাংলা সাহিত্যেও এ সমস্ত গল্পের কোনো বংশ পরিচয় নেই। এ গল্পগুলির উৎস সন্ধান করতে তাই নদীর ধারা অনুসরণ করা ছাড়া আমাদের গতি নেই।

পদ্মা-প্রবাসের এই দিনগুলি তাঁর মনকে কি ভাবে প্রভাবান্বিত করেছে ও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিকে কি নূতন রূপান্তর দিয়েছে সেই সময়কার 'ছিন্নপত্র'গুলি পড়লেই তার পরিচয় পাওয়া যাবে। তাঁর গল্পের প্রেরণা সম্বন্ধে নিজেই সেখানে তিনি যেকথা লিখেছেন তা আমাদের এই ধারণাকেই সমর্থন করে।

'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পটির সূত্রপাত সম্বন্ধে তাঁর বহুবার উদ্ধৃত চিঠিখানি আর একবার এখানে তুলে দিতে চাই না। শুধু এইটুকুই এই প্রসঙ্গে বললে যথেষ্ট হবে যে, পদ্মার বক্ষ থেকে বোটের জানালার ফাঁক দিয়ে নিত্য পরিবর্ত্তনশীল তীরের জীবনের যে ছোট ছোট টুকরো তিনি দেখেছেন, তাই সেদিন তাঁর বেগবান কল্পনাকে নতুন নতুন গল্প-বয়নের খেই জুগিয়েছে।

কে জানে পদ্মাতীরের কোন এক প্রান্তে খেলাচছলে ছিপ-ফেলতে-বসা কোন একটি মেয়ে সেদিন তাঁর কল্পনায় কি খেয়ালে মুখের ভাষা হারিয়ে সুভারূপে চিরন্তন নির্ব্বাক বেদনার মূর্ত্তি হয়ে উঠেছে, কে জানে কোথায় গাছের গুঁড়ি নিয়ে খেলায় রত ক'টি গ্রামের ছেলের ভেতর থেকে কৈশোরের সমস্ত অনাদর অবহেলা ও অবিচারের বেদনা নিয়ে ফটিক আমাদের হৃদয়ের মধ্যে ছুটি চেয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের সে যুগ বা পরেকার সব গল্পই তা ব'লে বাস্তবিক নদীর তীরে দেখা জীবনের গল্প নয়। তা হওয়াও অসম্ভব। নানা বিচিত্র আবেষ্টনে নানা বিভিন্ন রূপ নিয়ে তাঁর গল্পগুলি

গড়ে উঠেছে। সে গল্পের দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষ ক'রে পদ্মাতীরের হ'লেও তার ক্ষেত্র সমস্ত বাংলা-দেশময় বিস্তৃত। এই গল্পগুলির মধ্যেই বাংলা-দেশকে আমরা প্রথম দেখতে পাই, দেখতে পাই তার বৈশিষ্ট্য ও সমগ্রতায়।

সত্যি কথা বলতে গেলে বাংলাদেশকে রবীন্দ্র-নাথের এই গল্পগুলির আগে কোথাও সাহিত্যের আয়নায় দেখবার সুযোগ আমরা পাইনি। বঙ্কিম-চন্দ্র বাঙালীকে তাঁর নিজের মনোমত দেশাত্মবোধ শেখাতে চেয়েছিলেন কিন্তু দেশকে সাহিত্যের আয়নায় সম্পূর্ণ ক'রে দেখতে না পেলে সত্যিকার কোনো আত্মবোধ সম্ভব ব'লেই আমাদের মনে হয় না। রবীন্দ্রনাথের আগে দেশকে আমরা দেখতেই পাইনি,---না পেয়েছি তার প্রাকৃতিক রূপ, না তার হৃদয়ের।

বঙ্কিমচন্দ্রে ও তাঁর সমকালীন লেখকদের রচনায় প্রাকৃতিক বর্ণনা আছে, কিন্তু সে বর্ণনায় বাংলার নিজস্ব রূপটি মেলে না। সে বর্ণনায়,---

"তখন পূর্ণ বর্ষায় বাংলাদেশের চারিদিকেই ছোটবড় আঁকাবাঁকা সহস্র জলময় জাল বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। সরল শ্যামল বঙ্গভূমির শিরা উপশিরাগুলি পরিপূর্ণ হইয়া তরুলতা তৃণগুল্ম ঝোপঝাড় ধান পাট ইক্ষুতে দশদিকে উন্মত্ত যৌবনের প্রাচুর্য্য যেন একবারে উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছে।

শশিভূষণের নৌকা সেই সমস্ত সঙ্কীর্ণ বক্র জলস্রোতের মধ্য দিয়া চলিতে লাগিল। জল তখন তীরের সহিত সমতল হইয়া গিয়াছে। কাশবন শরবন এবং স্থানে স্থানে শস্যক্ষেত্র জলমগ্ন হইয়াছে। গ্রামের বেড়া, বাঁশঝাড় ও আম-বাগান একেবারে জলের অব্যবহিত ধারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে---দেবকন্যারা যেন বাংলাদেশের তরু-মূলবর্ত্তী আলবালগুলি জলসেচনে পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছেন।

যাত্রার আরম্ভকালে স্নানচিক্কণ বনশ্রী রৌদ্রে উজ্জ্বল হাস্যময় ছিল, অনতিবিলম্বেই মেঘ করিয়া বৃষ্টি আরম্ভ হইল। তখন যেদিকে দৃষ্টি পড়ে সেই দিকই বিষণ্ন এবং অপরিচ্ছন্ন দেখাইতে লাগিল। বন্যার সময়ে গোরুগুলি যেমন জলবেষ্টিত মলিন পঙ্কিল সঙ্কীর্ণ গোষ্ঠ-প্রাঙ্গণের মধ্যে ভিড় করিয়া করুণনেত্রে সহিষ্ণুভাবে দাঁড়াইয়া শ্রাবণের ধারাবর্ষণে ভিজিতে থাকে, বাংলাদেশ আপনার কর্দ্দমপিচ্ছিল ঘনসিক্ত রুদ্ধ জঙ্গলের মধ্যে মূক বিষণ্ন মুখে সেইরূপ পীড়িতভাবে অবিশ্রাম ভিজিতে লাগিল। চাষীরা টোকা মাথায় দিয়া বাহির হইয়াছে, স্ত্রীলোকেরা ভিজিতে ভিজিতে বাদলার শীতলবায়ুতে সঙ্কুচিত হইয়া কুটীর হইতে কুটীরান্তরে গৃহকার্য্যে যাতায়াত করিতেছে ও পিছল ঘাটে অত্যন্ত সাবধানে পা ফেলিয়া সিক্তবস্ত্রে জল তুলিতেছে, এবং গৃহস্থ পুরুষেরা দাওয়ায় বসিয়া তামাক খাইতেছে, নিতান্ত কাজের দায় থাকিলে কোমরে চাদর জড়াইয়া জুতা-হস্তে ছাতিমাথায় বাহির হইতেছে। অবলা রমণীর মস্তকে ছাতি এই রৌদ্রদগ্ধ বর্ষাপ্লাবিত বঙ্গদেশের সনাতন পবিত্র প্রথার মধ্যে নাই।"

কিম্বা,---

"বাহিরেও অত্যন্ত গুমট্, দুপ্রহরের সময় খুব এক পসলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। এখনো চারিদিকে মেঘ জমিয়া আছে। বাতাসের লেশমাত্র নাই। বর্ষায় ঘরের চারিদিকে জঙ্গল এবং আগাছাগুলা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে, সেখান হইতে এবং জলমগ্ন পাটের ক্ষেত হইতে সিক্ত উদ্ভিজ্জের ঘন গন্ধবাষ্প চতুর্দ্দিকে একটি নিশ্চল প্রাচীরের মতো জমাট হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। গোয়ালের পশ্চাদ্বর্ত্তী ডোবার মধ্য হইতে ভেক ডাকিতেছে এবং ঝিল্লিরবে সন্ধ্যার নিস্তব্ধ আকাশ একেবারে পরিপূর্ণ।

অদূরে বর্ষার পদ্মা নবমেঘচ্ছায়ায় বড়ো স্থির ভয়ঙ্কর ভাব ধারণ করিয়া চলিয়াছে। শস্যক্ষেত্রের অধিকাংশই ভাঙ্গিয়া লোকালয়ের কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে। এমন কি ভাঙনের ধারে দুই চারিটা আম কাঁঠাল গাছের শিকড় বাহির হইয়া দেখা দিয়াছে, যেন তাহাদের নিরুপায় মুষ্টির প্রসারিত অঙ্গুলিগুলি শূন্যে একটা-কিছু অন্তিম অবলম্বন আঁকড়িয়া ধরিবার চেষ্টা করিতেছে।"

এ ধরণের ছবিও আমরা কখন পেয়েছি ব'লে মনে পড়ে না।

শুধু দেশের বাইরের ছবি নয়, তার অন্তরের ছবিও প্রথম বিস্তারিতভাবে রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলির মধ্যেই ফুটে ওঠে বললে কোন পূর্ব্বতন সাহিত্য-নায়কের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করা হয় ব'লে মনে হয় না।

বাংলাদেশে ইতিপূর্ব্বে সামাজিক উপন্যাস কয়েকটি রচিত হয়েছে, সামাজিক নানা নক্সাতেও বাঙালীকে তার কয়েকটি বিশেষত্বে চিত্রিত করবার চেষ্টা হয়েছে কিন্তু সে সবও যেন বাইরের পোষাকের চিত্র। তা ছাড়া সে চিত্রে সহানুভূতির স্পর্শের চেয়ে বিদ্রূপের আঘাতই বেশী। যা বিসদৃশ তাই তখন প্রধানতঃ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে সাধারণ দর্শকের ; যা সহজ অথচ বাংলার অন্তরের সত্যকার রূপ তা দেখবার মত দরদী প্রতিভা তখনও দেখা দেয়নি।

রবীন্দ্রনাথই বাংলার এই এতদিনকার অনাবিষ্কৃত হৃদয়ের যেন প্রথম সন্ধান দিলেন। আজ আমাদের কাছে সে সময়কার গল্পগুলি কিছু পরিমাণে ভাবপ্রবণতার আতিশয্যদুষ্ট হয়ত মনে হ'তে পারে কিন্তু গল্পগুলির বিকাশ যেমনই হোক তার চরিত্রগুলি যে আমাদের এই বাংলাদেশের নিজস্ব তা কৃতজ্ঞচিত্তে আমরা স্বীকার না ক'রে পারব না।

কন্যাদায়গ্রস্ত অত্যাচারিত পিতার দুঃখের কাহিনী আমাদের কাছে আজ হয়ত মামুলি হয়ে গেছে কিন্তু 'দেনা পাওনা'য় বৃদ্ধ রামসুন্দর আর তাঁর কন্যা নিরুপমা, রায় বাহাদুর ও তাঁর উপযুক্ত সহধর্ম্মিণী যে সে সমস্ত গল্পের মূল প্রেরণা হিসাবে চিরকাল অমর হয়ে থাকবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ আমাদের নেই।

উলাপুর গ্রামের পোষ্ট মাষ্টার, সত্যবদ্ধ বিষয়-বুদ্ধিহীন রামকানাই, শশিভূষণ ও রাধামুকুন্দ, বৈদ্যনাথ ও মোক্ষদাসুন্দরী, হিমাংশু ও বনমালী, চন্দরা ছিদাম ও দুখিরাম এবং তাদের মত আরো অগণিত চরিত্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গল্পেই আমরা প্রথম সাহিত্যের ভেতরে পরিচিত হ'লাম। তাদের আমরা প্রতিদিন প্রতিবেশী হিসেবে হয়ত দেখেছি জীবনের নানা কাজে, তাদের সঙ্গে নানা সম্পর্কে হয়ত আমরা জড়িত তবু সাহিত্যের দৃষ্টি তাদের ওপর পড়বার আগে তাদের সত্যকার রূপ আমাদের কাছে সম্পূর্ণভাবে ফুটে ওঠা সম্ভব ছিল না।

বাংলাদেশকে রবীন্দ্রনাথ সকল দিক দিয়েই আমাদের চিনিয়েছেন, বিশেষ ক'রে চিনিয়েছেন তাঁর গল্পগুলির ভেতর দিয়ে। মজার কথা এই যে, বিশ্বপ্রেমের অভিযোগে যখন বাংলা-সাহিত্যের খাতা থেকে তাঁর নাম কেটে দেওয়ার মত উৎসাহী লোকের অভাব হয় নি, সত্যিকার বাংলাদেশাত্ম-বোধের ভূমিকা তিনিই তখন প্রথম করেছেন বাংলাকে আমাদের মানসগোচর ক'রে। তাঁর হৃদয় যদি বিশ্বকে আশ্রয় দেবার মত বিরাট হয় সেটা হয়ত তাঁর অপরাধ, কিন্তু বিশ্বের জন্য হৃদয় উন্মুক্ত রাখা সত্ত্বেও বাংলাদেশকে তাঁর চেয়ে গভীরভাবে ভালবেসে কে তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম এবং সমগ্র রূপ এমনভাবে ধারণা যে করেছে তাও জানি না।

সবচেয়ে আশ্চর্য্যের কথা এই যে, রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ গল্পে যাদের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা আঘাত-বেদনার ইতিহাস আমরা পাই তারা কেউই সমৃদ্ধি ও প্রতিপত্তির দিক দিয়ে তাঁর নিজের শ্রেণীর নয়। তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হয় ঈশান মজুমদারের মত কোন অখ্যাত ষ্টীমার ঘাটের নগণ্য কর্ম্মচারী, নয় উলাপুরের মত সামান্য পোষ্টাফিসের পোষ্টমাষ্টার। তারা সাধারণতঃ নিবারণের মত আফিসের সামান্য চাকরে বা শশিভূষণের মত ব্রীফ্-হীন উকিল। তারা বড় জোর কৈলাসচন্দ্রের মত হৃতগৌরব নয়ানজোড়ের জমিদার বাড়ির 'একটি নির্ব্বাপিত বাবু'---এবং তাঁর জীবনের যে কাহিনী, তাতে আভিজাত্য ও সম্পদের আড়ম্বরের করুণ অথচ হাস্যাস্পদ দিকটাই পরিস্ফুট।

শ্রেণী-বোধমুক্ত বলতে ঠিক যে রকম মন আজকের দিনে আমরা বুঝি তা হয়ত রবীন্দ্রনাথের ছিল না, থাকা সম্ভবও নয়, কিন্তু মানুষকে শ্রেণী, সমাজ, জাতি, ধর্ম্ম, বর্ণ সব কিছুর আবরণ সরিয়ে দেখাবার মত অন্তর্দৃষ্টি তাঁর ছিল ব'লে কোনদিন তাঁর রচনায় কোন সঙ্কীর্ণতার সুদূর ছায়াও পড়েনি, কোন শ্রেণী বা দলগত স্বার্থের আভাষ পর্য্যন্ত তাঁর লেখায় কোথাও কখন উঁকি দেয়নি। তিনি মাঠে ঘাটে গামে নগরে ধূলায় জলে রোদে কাদায় সব

স্তরের সব মানুষের সঙ্গে পরম আত্মীয়ের মত মিশে গেছেন, কোথাও কোন ভেদ থাকেনি। তিনি যখন দিনমজুর দুখিরাম ও ছিদাম রুই-এর কথা লিখতে বসেন, কি 'একরাত্রির' সম্ভব অসম্ভবের কিনারায় দোদুল্যমান কয়েকটি স্বপ্নোজ্জ্বল মুহূর্ত্তের নায়ক দরিদ্র স্কুল মাষ্টারের মনের কথা বলেন তখন মনে পড়ে কি যে জোড়াসাঁকোয় তাঁর বাড়ি, মনে পড়ে কি যে বাংলায় তাঁদের বনিয়াদী জমিদারী? সত্যি এ সব তাঁরও বাহ্য পরিচয়, অন্তরে তিনি এ সমস্ত থেকে অনেক দূরে, সব কিছুর বাইরে। তা না হ'লে তারাপদর মত সেই চিরযাবাবর ছেলেটিব অন্তরে অমন ক'রে প্রবেশ করতে তিনি বোধ হয় পারতেন না এবং 'দুর্বুদ্ধি'র মত গল্পের কল্পনাকে আমলই দিতেন না।

শ্রেণী-সচেতনতার একটা অপবাদের ক্ষীণ ঢেউ রবীন্দ্রনাথের কাণেও কোন রকমে তাঁর শেষ জীবনে বোধ হয় পৌঁচেছিল। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে তাই তিনি নিজে এক জায়গায় লিখে গেছেন,---

"এখানেই আমার শেষ কথাটা বলে নিই। আমার রচনায় যাঁরা মধ্যবিত্ততাব সন্ধান ক'রে পাননি ব'লে নালিশ করেন তাঁদের কাছে আমার একটা কৈফিয়ৎ দেবার সময় এল। পলিমাটি কোনো স্থায়ী কীর্ত্তির ভিত বহন করতে পারে না। বাংলার গাঙ্গেয় প্রদেশে এমন কোনো সৌধ পাওয়া যায় না যা প্রাচীনতার স্পর্ধা করতে পারে। এ দেশের আভিজাত্য সেই শ্রেণীর। আমরা যাদের বনেদি বংশীয় বলে আখ্যা দিই তাদের বনেদ বেশি নিচে পর্যন্ত পৌঁছয়নি। এরা অল্পকালের পরিসরের মধ্যে মাথা তুলে ওঠে তারপরে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যেতে বিলম্ব করে না। এই আভিজাত্য সেই জন্য একটা আপেক্ষিক শব্দ মাত্র। তার সেই ক্ষণভঙ্গুর ঐশ্বর্যকে বেশি উচ্চে স্থাপন করা বিড়ম্বনা, কেন না সেই কৃত্রিম উচ্চতা কালের বিদ্রূপের লক্ষ্য হয় মাত্র। এই কারণে আমাদের দেশের অভিজাত বংশ তার মনোবৃত্তিতে সাধারণের সঙ্গে অত্যন্ত স্বতন্ত্র হতে পারে না। একথা সত্য এই স্বল্পকালীন ধন-সম্পদের আত্ম-সচেতনতা অনেক সময়েই দুঃসহ অহঙ্কারের সঙ্গে আপনাকে জনসম্প্রদায় থেকে পৃথক রাখবার আড়ম্বর করে। এই হাস্যকর বক্ষস্ফীতি আমাদের বংশে অন্তত আমাদের কালে একেবারেই ছিল না। কাজেই আমরা কোনো দিন বড়লোকের প্রহসন অভিনয় করিনি। অতএব আমার মনে যদি কোনো স্বভাবগত বিশেষত্বের ছাপ পড়ে থাকে তা বিত্তপ্রাচুর্য কেন বিত্তগচ্ছলতারও নয়। তাকে বিশেষ পরিবারের পূর্বাপর সংস্কৃতির মধ্যে ফেলা যেতে পারে এবং এ রকম স্বাতন্ত্র্য হয়তো অন্য পরিবারেও কোনো বংশগত অভ্যাসবশত আত্ম-প্রকাশ করে থাকে। বস্তুত এটা আকস্মিক। আশ্চর্য এই যে সাহিত্যে এই মধ্যবিত্ততার অভিমান সহসা অত্যন্ত মেতে উঠেছে। কিছুকাল পূর্বে "তরুণ" শব্দটা এই রকম ফণা তুলে ধরেছিল। আমাদের দেশে সাহিত্যে এই রকম জাতে ঠেলাঠেলি আরম্ভ হয়েছে হালে। আমি যখন মস্কৌ গিয়েছিলুম, চেকভের রচনা সম্বন্ধে আমার অনুকূল অভিরুচি ব্যক্ত করতে গিয়ে হঠাৎ ঠোক্কর খেয়ে দেখলুম, চেকভের লেখায় সাহিত্যের মেল বন্ধনে জাতিচ্যুতি দোষ ঘটেছে সুতরাং তাঁর নাটক ষ্টেজের মঞ্চে পংক্তি পেল না। সাহিত্যে এই মনোভাব এত বেশি কৃত্রিম যে শুনতে পাই এখন আবার হাওয়া বদল হয়েছে। এক সময়ে মাসের পর মাস আমি পল্লীজীবনের গল্প রচনা করে এসেছি। আমার বিশ্বাস এর পূর্বে বাংলা সাহিত্যে পল্লীজীবনের চিত্র এমন ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ হয়নি। তখন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লেখকের অভাব ছিল না, তাঁরা প্রায় সকলেই প্রতাপ সিংহ বা প্রতাপাদিত্যের ধ্যানে নিবিষ্ট ছিলেন। আমার আশঙ্কা হয় এক সময়ে গল্পগুচ্ছ বুর্জোয়া লেখকের সংসর্গদোষে অসাহিত্য ব'লে অস্পৃশ্য হবে। এখনি যখন আমার লেখার শ্রেণী নির্ণয় করা হয় তখন এই লেখাগুলির উল্লেখমাত্র হয় না, যেন ওগুলির অস্তিত্বই নেই। জাতে ঠেলাঠেলি আমাদের রক্তের মধ্যে আছে তাই ভয় হয় এই আগাছাটাকে উপড়ে ফেলা শক্ত হবে।

কিছুকাল থেকে আমি দুঃসহ রোগ-ভোগ করে আসছি সেই জন্য যদি ব'লে বসি যাঁরা আমার শুশ্রূষায় নিযুক্ত তাঁরাও মুখে কালো রঙ মেখে অস্বাস্থ্যের বিকৃত চেহারা ধারণ করে এলে তবেই সেটা আমার পক্ষে আরামের হোতে পারে তাহলে মনোবিকারের আশঙ্কা কল্পনা করতে হবে। প্রকৃতির মধ্যে একটা নির্মম প্রসন্নতা আছে। ব্যক্তিগত জীবনে অবস্থার বিপ্লব ঘটে কিন্তু তাতে এই বিশ্বজনীন দানের মধ্যে বিকৃতি ঘটে না; সেই আমাদের সৌভাগ্য তাতে যদি আপত্তি করার একটা দল পাকাই তাহলে বলতে হয় যাঁরা নিঃস্ব তাঁদের জন্যে মরুভূমিতে উপনিবেশ স্থাপন করা উচিত নইলে তাঁদের মনের তুষ্টি অসম্ভব। নিঃস্ব শ্রেণীর পাঠকদের জন্য সাহিত্যেও কি মরু-উপনিবেশ স্থাপন করতে হবে ?''

রবীন্দ্রনাথের কৈফিয়ৎটা একটু দীর্ঘভাবে উদ্ধৃত করলাম বটে, কিন্তু তা আমাদের বক্তব্যের সম্পূর্ণ সমর্থনের জন্যে নয়। বরঞ্চ এই কৈফিয়ৎটি সরল সত্যের খানিকটা ভুল ওকালিতির একটা উদাহরণ বলা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ প্রথমতঃ অভিযোগটা অত্যন্ত ভুল শুনেছেন এবং তার যা জবাব দিয়েছেন তা যুক্তির দিক দিয়ে একটু কাঁচা।

প্রথমতঃ অভিযোগ যদি কিছু থাকেই তা-মধ্যবিত্ততা সম্পর্কে মোটেই নয়, দ্বিতীয়তঃ তাও যদি হয়, তাহ'লেও বাংলাদেশের নরম মাটিতে কোন বনেদ কায়েমী হয় না ব'লে এখানে বনিয়াদী মনও ভালোভাবে গজায় না, বাংলার স্বল্পায়ু অভিজাত শ্রেণীর স্বপক্ষে এ যুক্তি বেশ দুর্ব্বলই বলতে হয়। কৈফিয়ৎ যেমনই হোক, রবীন্দ্রনাথের নিজের বেলা কোন নালিশই সত্যি খাটে না একথা কেউ অস্বীকার করতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গল্পে, বিশেষ ক'রে প্রথম যুগের গল্পে, শুধু আমাদের হৃদয় স্পর্শ করবার চেষ্টাই একান্তভাবে করেছেন। দীন দরিদ্র অসহায় উৎপীড়িতের কথা তাই যখন তিনি লিখেছেন তখন আমাদের মন সমবেদনায় সহানুভূতিতে আর্দ্র ক'রে তুললেও এই সমস্ত ব্যর্থ বেদনাময় জীবনের পেছনে বিরাট বিশ্বব্যাপী অন্যায় সমাজ-ব্যবস্থার কি অচেতন অবিচার থাকতে পারে সে সম্বন্ধে কোন ইঙ্গিত অবশ্য তিনি করতে পারেন নি। তাঁর করুণ কাহিনী নেহাৎ ব্যক্তিগত জীবনকে কেন্দ্র ক'রেই প্রদক্ষিণ করে। আমাদের চোখে একটু জল এনেই যেন তার ছুটি। তার বেশী আর কোন দায়িত্বের কথা সেদিন রবীন্দ্রনাথ নিজেই জানতেন না। নগণ্য এক ষ্টিমার-ঘাটার ততোধিক নগণ্য এক কেরাণীবাবু ঈশানচন্দ্র যখন মেয়ের বিয়েতে যাবার ছুটি পান না, এবং তাঁর সেই অপ্রশস্ত টিনের ঘরের চারিদিকের পাটের বস্তার মাঝখানে নিতান্ত সঙ্কীর্ণ দায়ে-সারা গৃহস্থালীর স্থানটুকু মেয়ে জামাইয়ের অপ্রত্যাশিত আগমনের আনন্দে যখন দু'দিনের জন্যে উৎসবমুখর হয়ে আবার চিরদিনের মত অন্ধকার হয়ে যায়, তখন এই ভাগ্যহীন প্রৌঢ় কেরাণীর জন্যে আমাদের যে গভীর দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে তার পেছনে অত্যন্ত অস্পষ্ট কোন উত্তাপ যদি থাকে, তা সেই নিষ্ঠুর নিয়তি ছাড়া আর কারও বিরুদ্ধে নয়---যে নিয়তি এই স্নেহকাতর পিতাকে এই নিঃসঙ্গ প্রবাসে দুবেলা মাল ওঠানো নামানো এবং টিকিট বিক্রয়ের মত অতি সামান্য মাইনের কাজে নিযুক্ত থাকতে বাধ্য করে, যে নিয়তির বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ নিষ্ফল। নিয়তি ছাড়া এ গল্পে বিরাগ যদি আর কারুর ওপর হয় তাহ'লে সেই হেড অফিসের সাহেবের ওপর যে ঈশানচন্দ্রের ছুটি মঞ্জুর করে না, এবং এ গল্পের শেষে মনে যে ব্যথাটি জমে উঠে তা এমন যে, কোন মতে, ঈশানচন্দ্র হঠাৎ একটা লটারির টিকিট পেয়ে বড়লোক হয়ে বাড়ি ফিরে গিয়ে ঘটা ক'রে জামাই-মেয়ে আনিয়ে উৎসব করতে পারলেই বোধ হয় জুড়িয়ে যায়।

গল্প হিসেবে তা ব'লে 'সমাপ্তি'র কোন খুত ধরবার আছে ব'লে মনে করবার ধৃষ্টতা আমাদের নেই। ঈশানচন্দ্রের জীবনে টিনের ঘরের সেই মেয়ে-জামাই নিয়ে কটি অপ্রত্যাশিত উৎসবের দিন এবং নিরানন্দ সঙ্কীর্ণ ঘরে দিনের পর দিন তার সেই নিয়মিত মাল ওজন করবার করুণ চিত্র এমন একটি

রসের স্তরে উত্তীর্ণ যা আর কোন জিজ্ঞাসার তোয়াক্কা রাখে না।

শুধু নিয়তির বিরুদ্ধে নয়, রবীন্দ্রনাথের লেখনী আরো অনেক গল্পে অন্যায় অবিচার অত্যাচারের বিরুদ্ধে নির্ভীকভাবে কখনও শাণিত বিদ্রূপে, কখনও জ্বালাময় প্রতিবাদে দীপ্ত হয়ে উঠেছে। মেঘ ও রৌদ্র, দুর্বুদ্ধি প্রভৃতি গল্পের মধ্যে যে তেজোদৃপ্ত নির্ভীক লেখনীর সাক্ষাৎ পাই তাকে শ্রদ্ধা আপনা হ'তেই করতে হয়। কিন্তু এ সমস্ত গল্পের সমস্ত বিদ্রোহই এমন অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে যা সাধারণতঃ ব্যক্তিগত ও কখন কখন অস্পষ্টভাবে জাতিগত।

এ সমস্ত গল্পগুলি আমাদের সম্পদ, আমাদের সুপ্ত আত্মসম্মানবোধ জাগ্রত করার অভিযানে রবীন্দ্রনাথের এই সমস্ত রচনার দাম যে কত তার হিসাব এখনও হয় নি। কিন্তু সত্যের খাতিরে একথাও স্বীকার করতে হয় যে, গভীর বিশেষ একটি দৃষ্টি, সাধারণ মানুষের বর্তমান যুগের করুণ ব্যর্থতার কাহিনীকে যা স্বতন্ত্র একটি কাঠাম দেয় ও বিশেষ একটি ইঙ্গিত তার মধ্যে সঞ্চারিত ক'রে রাখে, তাঁর রচিত গল্পে তার সত্যি অভাব আছে।

রবীন্দ্রনাথের গল্প সম্বন্ধে আলোচনা করতে বসলে তাঁর ভাষার কথা এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব। এ ভাষা তাঁর গল্পের শুধু বাহন নয়, অনেক গল্পের প্রাণ।

তাঁর এ ভাষাকে আমরা চেষ্টা ক'রে বঙ্কিম-প্রবর্তিত ভাষার ধারার সঙ্গে সম্পর্কিত ক'রে দেখাতে পারি কিন্তু সে সম্পর্ক সত্যি এত ক্ষীণ যে এক এক সময়ে তাতে অবিশ্বাস আসে। মনে হয় রবীন্দ্রনাথ নিজেই যেন এ ভাষা নিজের মধ্য থেকে উদ্ভাবন ক'রে তুলেছেন, আগের ধারার সঙ্গে তাঁর যোগটা বাহ্যিক মাত্র।

'সারা জীবন', বিশেষ ক'রে জীবনের গত পঞ্চাশ বৎসর ধরে, তাঁর হাতে বাংলা ভাষার বহু পরিবর্তন হয়েছে। প্রশস্ত থেকে প্রশস্ততর, খরধার থেকে আরো খরধার প্রবাহ-পথে তিনি এ ভাষাকে নিয়ে গেছেন। তাঁর হাতেই বাংলা ভাষা একে একে তার সমস্ত আড়ষ্টতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পেয়েছে।

আজ বাংলা ভাষাকে যেখানে তিনি নিয়ে এসেছেন সেখান থেকে দীর্ঘ অতীতের পথের দিকে তাকিয়ে এই অসামান্য কীর্তিতে যেমন অবাক হ'তে হয় তেমনি হ'তে হয় এই কথা ভেবে যে, সেই সুদূর সূচনার দিনেও তাঁর ভেতর ভাষার যে অপরূপ শক্তি ছন্দ জ্ঞান দেখা যায় তার উৎপত্তি কোথায়।

বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে গদ্যের বেগবত্তা আমরা পাই নি এমন নয়, কিন্তু তাকে সম্পূর্ণ অকৃত্রিম বলতে বোধ হয় বাধে। কিন্তু গল্পের সেই প্রথম যুগেই 'নিশীথে', 'ক্ষুধিত পাষাণ' এমন কি 'রাজপথের' মত গল্পেও রবীন্দ্রনাথের ভাষা যেন জীবন্ত স্রোত হয়ে উঠেছে। শব্দগত অর্থ ছাড়িয়ে সাধারণ বিন্যাসগত ভঙ্গিকে অতিক্রম ক'রে তখনই তার মধ্যে গদ্য-কাব্যের সঙ্গীতময়তার সঙ্কেত যেন দেখা দিয়েছে।

সেই অন্তহীন শুভ্র বালির চরের উপর যখন অজস্র অবারিত উদ্ভাসিত জ্যোৎস্না একেবারে আকাশের সীমান্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়া গেল—তখন মনে হইল যেন জনশূন্য চন্দ্রালোকের অসীম স্বপ্নরাজ্যে কেবল আমরা দুইজন ভ্রমণ করিতেছি। একটি লাল শাল মনোরমার মাথার উপর হইতে নামিয়া তার মুখখানি বেষ্টন করিয়া তার শরীরটি আচ্ছন্ন নিস্তব্ধতা যখন নিবিড় হইয়া আসিল, কেবল একটি সীমাহীন দিশাহীন শুভ্রতা এবং শূন্যতা ছাড়া যখন আর কিছুই রহিল না তখন মনোরমা ধীরে ধীরে হাতটি বাহির করিয়া আমার হাত চাপিয়া ধরিল; অত্যন্ত কাছে আসিয়া সে যেন তাহার সমস্ত শরীর মন, জীবন যৌবন আমার উপর বিন্যস্ত করিয়া নিতান্ত নির্ভর করিয়া দাঁড়াইল। পুলকিত উদ্বেলিত হৃদয়ে মনে করিলাম, ঘরের মধ্যে কি যথেষ্ট ভালোবাসা যায়? এইরূপ অনাবৃত অবারিত অনন্ত আকাশ নহিলে কি দুটি মানুষকে কোথায় ধরে? তখন মনে হইল আমাদের ঘর নাই, দ্বার নাই, কোথাও ফিরিবার নাই, এমনি করিয়া হাতে হাতে ধরিয়া গম্যহীন পথে, উদ্দেশ্যহীন ভ্রমণে,

চন্দ্রালোকিত শূন্যতার উপর দিয়া অবারিত ভাবে চলিয়া যাইব।

এইরূপে চলিতে চলিতে এক জায়গায় আসিয়া দেখিলাম, সেই বালুকারাশির মাঝখানে অদূরে একটি জলাশয়ের মত হইয়াছে---পদ্মা সরিয়া যাওয়ার পর সেইখানে জল বাঁধিয়া আছে।

সেই মরুবালুকাবেষ্টিত নিস্তরঙ্গ নিষুপ্ত নিশ্চল জলটুকুর উপরে একটি সুদীর্ঘ জ্যোৎস্নার রেখা মূর্চ্ছিতভাবে পড়িয়া আছে। সেই জায়গাটাতে আসিয়া আমরা দুইজনে দাঁড়াইলাম---মনোরমা কি ভাবিয়া আমার দিকে চাহিল; তাহার মাথার উপর হইতে শালটা হঠাৎ খসিয়া পড়িল।

আমি তাহার সেই জ্যোৎস্না বিকশিত মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া চুম্বন করিলাম।

সেই সময় সেই জনমানবশূন্য নিঃসঙ্গ মরুভূমির মধ্যে গম্ভীর স্বরে কে তিনবার বলিয়া উঠিল ---"ও কে? ও কে? ও কে?"

কিম্বা---

গভীর রাত্রে কখন এক সময়ে বৃষ্টির ধারা এবং যাত্রার গান থামিয়া গেছে। ফণিভূষণ জানালার কাছে যেমন বসিয়া ছিল তেমনি বসিয়া আছে। বাতায়নের বাহিরে এমন একটা জগৎ-ব্যাপী নীরন্ধ্র অন্ধকার যে, তাহার মনে হইতেছিল যেন সম্মুখে যমালয়ের একটা অভ্রভেদী সিংহদ্বার, যেন এইখানে দাঁড়াইয়া কাঁদিয়া ডাকিলে চিরকালের লুপ্ত জিনিষ অচিরকালের মত একবার দেখা দিতেও পারে। এই মসীকৃষ্ণ মৃত্যুর পটে এই অতি কঠিন নিকষ পাষাণের উপর সেই হারানো সোনার একটি রেখা পড়িতেও পারে।

এমন সময় একটা ঠক্ ঠক্ শব্দের সঙ্গে সঙ্গে গহনার ঝম্ ঝম্ শব্দ শোনা গেল। ঠিক মনে হইল শব্দটা নদীর ঘাটের উপর হইতে উঠিয়া আসিতেছে। তখন নদীর জল এবং রাত্রির অন্ধকার এক হইয়া মিশিয়া গিয়াছিল। পুলকিত ফণিভূষণ দুই উৎসুক চক্ষু দিয়া অন্ধকার ঠেলিয়া ঠেলিয়া ফুঁড়িয়া ফুঁড়িয়া দেখিতে চেষ্টা করিতে লাগিল,---স্ফীত হৃদয় এবং ব্যগ্র দৃষ্টি ব্যথিত হইয়া উঠিল, কিছুই দেখা গেল না। দেখিবার চেষ্টা যতই একান্ত বাড়িয়া উঠিল অন্ধকার ততই যেন ঘনীভূত, জগৎ ততই যেন ছায়াবৎ হইয়া আসিল। প্রকৃতি নিশীথ রাত্রে আপন মৃত্যু নিকেতনের গবাক্ষ দ্বারে অকস্মাৎ অতিথি সমাগম দেখিয়া দ্রুত হস্তে আরও একটা বেশী করিয়া পর্দা ফেলিয়া দিল।

শব্দটা ক্রমে ঘাটের সর্ব্বোচ্চ সোপানতল ছাড়িয়া বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া থামিল। দেউড়ী বন্ধ করিয়া দরোয়ান যাত্রা শুনিতে গিয়াছিল। তখন সে রুদ্ধ দ্বারের উপর ঠক্ ঠক্ ঝম্ ঝম্ করিয়া ঘা পাড়িতে লাগিল। যেন অলঙ্কারের শব্দে শব্দে একটি শক্ত জিনিষ দ্বারের উপর আসিয়া পড়িতেছে। ফণিভূষণ আর থাকিতে পারিল না। নির্ব্বাণ-দীপ কক্ষগুলি পার হইয়া অন্ধকার সিঁড়ি দিয়া নামিয়া রুদ্ধদ্বারের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। দ্বার বাহির হইতে তালাবন্ধ ছিল। ফণিভূষণ দুই হাতে সেই দ্বার নাড়া দিতেই সেই সংঘাতে এবং তাহার শব্দে সে চমকিয়া জাগিয়া উঠিল। দেখিতে পাইল সে নিদ্রিত অবস্থায় উপর হইতে নীচে নামিয়া আসিয়াছিল। তাহার সর্ব্বশরীর ঘর্ম্মাক্ত, হাত পা বরফের মত ঠাণ্ডা এবং হৃৎপিণ্ড নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের মত স্ফুরিত হইতেছে। স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দেখিল বাহিরে আর কোন শব্দ নাই, কেবল শ্রাবণের ধারা তখনও ঝর্ ঝর্ শব্দে পড়িতেছিল এবং তাহারই সহিত মিশ্রিত হইয়া শুনা যাইতেছিল যাত্রার ছেলেরা ভোরের সুরে তান ধরিয়াছে।

যখন পড়ি তখন এ ভাষার আশ্চর্য্য ছন্দে তার ধ্বনির অপরূপ ইঙ্গিতময়তায় বিস্মিত না হয়ে পারি না।

রবীন্দ্রনাথের ভাষার গোড়ার দিকের এই দীর্ঘায়িত ছন্দ এখন অনেক বদলে গেছে বটে, কথ্য ভাষার জনতায় তাকে মিলিয়ে দিয়ে তিনি তার মধ্যে নতুন প্রাণ সঞ্চার করেছেন সত্য। তবু সেদিনের সেই গম্ভীর ধ্বনিময় ভাষা, যা না থাকলে 'নিশীথে', 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'মণিহারা' প্রভৃতির মত অতিপ্রাকৃত অনুভূতির কাহিনী সার্থকই হ'ত না ব'লে মনে হয়,---তা আজো আমাদের মনে একটি মোহ সৃষ্টি ক'রে রেখেছে।

রবীন্দ্রনাথের গল্প সম্বন্ধে অনেক কিছু যে এর পর বলবার আছে সে কথা বলাই বাহুল্য। এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় তার প্রান্তটুকু একটু ছুঁয়ে যাবার চেষ্টা হয়েছে মাত্র।

নির্জ্জন-বাস

কিছু দিন আগে, যাকে বলে হাওয়া বদলাতে অত্যন্ত নগণ্য একটি জায়গায় গেছলাম। জায়গাটি নগণ্য বলছি এই কারণে যে, সেখানে ট্রাম, মোটর ত নেই-ই এমন কি ঘোড়ার গাড়ী পর্য্যন্ত চলে না। না আছে সিনেমা, না আছে ব্যাঙ্ক, সনাতন একটি মুদির দোকান ছাড়া মনোহারী দোকান পর্য্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায় না। মানুষের ভীড় নেই, গোলমাল নেই, জীবনের দুরন্ত প্রবাহে ক্ষণে ক্ষণে সেখানে কোন আবর্ত্তের সৃষ্টি হয় না।

মন্দাক্রান্তা চালে সেখানকার জীবন চলে। দিনে ও রাতে দুবার লোকাল ট্রেনের আনাগোনা সেখানকার একমাত্র উত্তেজনা। ঢেউ খেলান রাঙা মাটির তেপান্তরে হারিয়ে যাওয়া টালিতে ছাওয়া একটি ছোট ষ্টেশনে সবশুদ্ধ মিনিট দুইএর জন্যে একটু চাঞ্চল্য এনে চারটি কি বড় জোর পাঁচটি গাড়ীর মোড়ল একটি ছোট ইঞ্জিন একবার বুকখালি করা ডাক দিয়ে, একরাশ কালো ধোঁয়া ছেড়ে দূরের শালবন ঢাকা পাহাড়ের আড়ালে উধাও হয়ে যায়। তারপর দিগন্ত-জোড়া নিস্তব্ধতায় শুধু হয়ত একটা ঘুঘুর ডাক, পৃথিবীর হৃদ্‌স্পন্দনের মত থেমে থেমে কোথায় কোন কাঠুরের কুড়ুলের ঘা।

গুটি দশেক মাত্র বাড়ী এই ছোট ষ্টেশনটিকে ঘিরে প্রত্যেকে প্রায় বিঘে আষ্টেক জমিতে হাত-পা মেলে দাঁড়িয়ে আছে। বাড়ীগুলি কোনটিই নতুন নয়। বছর ত্রিশ আগে বাংলার ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত কয়েকজন স্বাস্থ্যান্বেষী সস্তা দেখে এখানে এসে বোধ হয় এই সব ছুটির ডেরা তৈরী ক'রে গেছলেন। সে সস্তার দিন তারপর শেষ হয়ে গেছে। আইন-কানুনও এ দেশের কড়া হয়েছে। স্বাস্থ্যান্বেষীদের উপনিবেশ তাই আর প্রসারিত হ'তে পারে নি। লীলা-নিকেতন, শান্তি-কুলায় প্রভৃতি কাব্যময় নামের গুটি দশেক বাড়ীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে আছে।

এই গুটি দশেক বাড়ী প্রায় সারা বৎসর খালিই থাকে। জন কয়েক মালী মরজি মাফিক তাদের তত্ত্বাবধান করে। তারপর পূজোর মাস সুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে একটি দু'টি পরিবার সেখানে আসতে সুরু করে। শীতের কটা মাস বাড়ীগুলিতে একটু আধটু জীবনের চাঞ্চল্য দেখা যায়। ফাল্গুন চৈত্রে শিমূল বন ন্যাড়া হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই সে চাঞ্চল্য আবার যায় মিলিয়ে।

আমি যখন সেখানে গেছলাম তখন শীত সবে পড়তে সুরু করেছে। বাড়ীগুলির অধিকাংশই খালি। প্রায় একেশ্বর হয়েই কিছু দিন তাই থাকতে পেরেছিলাম।

শহরে জীবনের উর্দ্ধশ্বাস ব্যস্ততা থেকে এরকম জায়গায় গেলে প্রথমটা সকলেরই যা হয় আমারও তাই হ'ল। শরীর কতদূর সবল তা বলতে পারি না কিন্তু মনে হ'ল সমস্ত মনটা যেন জুড়িয়ে গেছে। শহরের অবিরাম আবর্ত্তে যে সমস্ত স্নায়ুমণ্ডলী জট্ পাকিয়ে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছল, সেখানকার সুগভীর নির্জনতা যেন তাদের সমস্ত গ্রন্থি খুলে দিয়ে আবার সুস্থ ক'রে তুলল। সেখানকার নিস্তব্ধতা শুধু গোলমালের অভাব নয়, ইন্দ্রিয়গোচর একটা সুস্পষ্ট বস্তু। ভোরের বেলায় আঁকা বাঁকা পাহাড়ী নদীর ধারে বেড়াতে গিয়ে সেখানকার নির্জনতা যেমন উপভোগ করি, রাত্রে দীপহীন বারান্দার ওপর আরাম কেদারায় বসে থাকতে থাকতে নক্ষত্র খচিত আকাশ থেকে ক্ষরিত গাঢ় নিস্তব্ধতা সমস্ত হৃদয়কে যেন তেমনি স্নিগ্ধ শুচি ক'রে দিয়ে যাচেছ ব'লে অনুভব করি।

এই নির্জনতা ও স্তব্ধতা, জীবনের এই শান্ত মন্থর মধুর ছন্দ সকলকেই বোধ হয় দু'একদিনে বেশ অভিভূত ক'রে ফেলে। সারাক্ষণ হন্তদন্ত হয়ে ছোটা হাঁসফাঁস ক'রে মরা জীবনের বিরুদ্ধে মন হঠাৎ বিমুখ হয়ে ওঠে। আমারও তাই হ'ল।

মনে হ'ল এমন জায়গা থাকতে আর কোথাও থাকার কোন মানে হয় না। এই শান্ত নিরুপদ্রব পরিবেশের মাঝে প্রকৃতির সঙ্গে মধুর একটি ঘনিষ্ঠতা স্থাপনের সঙ্গে নিজেকে ভালো ক'রে উপলব্ধি করা

---এর চেয়ে বড় লক্ষ্য জীবনের আর কিছু হওয়া উচিত নয়। সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক কথাই মনে পড়ল---সংসারের কোলাহল থেকে সাধকদের দূরে সরে যাওয়ার কথা, প্রাচীন কালের তপোবনের আদর্শ, জীবনের নিত্যকার সংগ্রামের ক্লান্তি ও গ্লানি থেকে মুক্তি নেবার জন্যে মানুষের চিরকালের ব্যাকুলতা, সব কিছুরই সুর বুঝি আমার মনের সঙ্গে মেলান।

মনের এমন অবস্থায় ঠিক 'শান্তি-কুলায়' না হোক ওই গোছের একটা নামের কিম্বা সম্পূর্ণ বেনামী একটা বাসা গড়বার চেষ্টায় আশে পাশে জমির খোঁজ করতে বার হওয়া বোধ হয় অস্বাভাবিক নয়। জমির খোঁজ করতে গিয়েই দেবনাথ বাবুর সঙ্গে পরিচয়।

দেবনাথ বাবু প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে এখানকার একমাত্র স্থায়ী বাসিন্দা। সস্তার দিনে প্রচুর জমি কিনে তার ওপর তিনি বিরাট বাড়ী করেছেন, কাঁটাতারের বেড়াঘেরা তাঁর বহুদূর বিস্তৃত বাগানে সব রকমের চাষই তিনি সযত্নে ক'রে থাকেন। এ অঞ্চলের ওপর তাঁর অসীম প্রভাব, সব কিছুর খোঁজও তিনি রাখেন।

বয়সে প্রৌঢ় হ'লেও দেবনাথ বাবুর বেশ শক্ত সমর্থ চেহারা। মুখে একটি সৌম্য প্রশান্তি আছে। কথাবার্তা খুব কমই বলেন, যা বলেন তা বেশ ওজনে ভারী। জমি কিনে বাড়ী করতে চাই শুনে জিজ্ঞাসা করলেন,---কি জন্যে বাড়ী করতে চাই। মাঝে মাঝে বেড়াতে আসবার জন্যে, না স্থায়ীভাবে বসবাস করতে?

বল্লাম---স্থায়ীভাবেই যদি থাকি?

মনে হ'ল একটু হাসির আভাষ যেন তাঁর মুখে দেখা গেল। বল্লেন,---পারবেন বরাবর থাকতে?

কেন পারব না---ব'লে হঠাৎ এ জায়গার প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলাম।

শান্তভাবে আমার সমস্ত কথা শুনে তিনি যা বল্লেন, 'শান্তি-কুলায়' বা ওই গোছের কিছু এই নির্জনতার মধ্যে গড়বার বাসনা তাইতেই পরিত্যাগ ক'রে এলাম। পরিত্যাগ ক'রে এলাম শুধু তাঁর বৈষয়িক যুক্তি শুনে নয়, এলাম হঠাৎ এই কথাই উপলব্ধি ক'রে যে জীবনের নিত্যকার সংগ্রাম যত গ্লানিকরই হোক তা থেকে সম্পূর্ণভাবে কোথাও পালিয়ে বাঁচা যায় না। শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে কয়েকজনের সুখ-সমৃদ্ধি-আলস্য-মন্থর অস্তিত্ব যেমন বহুর অভাবপীড়িত জীবনের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, এই নির্জনতায় শান্ত নিরুপদ্রব জীবন-যাপনের নেপথ্যেও তেমনি বহু দিকের বহুকালের নিত্য-জাগ্রত উদ্যোগ-আয়োজন না থাকলে চলে না।

দেবনাথ বাবু হয়ত পৈতৃক বা স্বোপার্জিত সম্পদের জোরে এখানে রাজার হালে নিশ্চিন্ত অবসর যাপন করতে পারেন, আমি হয়ত এখানকার নির্জনতার লোভে বহুদিকের ব্যয় সংক্ষেপ করবার চেষ্টা করতে পারি, তবু আমাদের শান্ত নিরুপদ্রব জীবনের নেপথ্যে সংগ্রাম সব সময়েই চলছে। সে সংগ্রামের দায়টুকু বাদ দিয়ে শুধু সুবিধেটুকু ভোগ করবার জন্যে আমরা তার প্রতি চোখ বুজে থাকতে পারি মাত্র।

এই নির্জনতার যারা সত্যকার সন্তান তাদের জীবন শান্তও নয়, নিরুপদ্রবও না। ঢেউ খেলান প্রান্তরের খাঁজে খাঁজে ছবির মত যে সমস্ত মানুষের বসতি সাজান আছে জীবন-নাট্যের গতি সেখানে দ্রুত না হ'লেও সঙ্ঘর্ষময় আবর্তের সেখানে অভাব নেই। মানুষের ও মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সংগ্রাম সেখানে নিত্য প্রখর। আকাশ সেখানে নিষ্করুণ হয়ে অভিশাপ বর্ষণ করে, মাঠের চোখ জুড়োন শ্যামলতার অন্তরালে কোন অজানা 'ভিরাস' সর্ব্বনাশের বিষ ছড়ায়, পশু ও মানুষের মহামারী আসে অজ্ঞতা ও অসাবধানতার সুযোগ নিয়ে। ধর্ম্মের খাদ মেশান সামাজিক অর্থনৈতিক বিন্যাসের বহু যুগসঞ্চিত সংস্কার ও শৃঙ্খল গায়ে গায়ে জড়িয়ে তাদের জীবনে নিত্য নতুন আবর্তের সৃষ্টি করে। ক্ষীরু মিয়ার কাছে সস্তায় তরিতরকারী কি ভিখু গোয়ালার কাছে দুধ নেবার সময় তাদের জীবনের সংগ্রাম আমরা টের পাই না কিন্তু আমাদের নিশ্চিন্ত অবসর তাদের জীবনের দামেই কেনা।

জর্জ্জিয়ান কবিতা

শুধু কবিতা কেন সাহিত্যের বা যে কোন শিল্পকলার ধারাকে প্রয়োজন মত যেমন খুসী কালের বন্ধনে ফেলে ভাগ করা যায় না। সাহিত্যের যুগান্ত হয় তার নিজের নিয়মে, বাইরের পঞ্জিকার তোয়াক্কা সে রাখে না।

জর্জিয়ান কবিতার কথা বলতে গিয়ে তেমন কোন মনগড়া যুগ দিয়ে কাব্যের ধারাকে কিন্তু ভাগ করার প্রয়োজন হয় না। এক কাব্য-যুগের সংক্রান্তি সেখানে সত্যই আশ্চর্য্যভাবে নূতন রাজত্বের আরম্ভের সঙ্গে মিলে গেছে। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে সুইনবার্ণের মৃত্যুর সঙ্গে সুরু হয়েছে সম্রাট পঞ্চম জর্জের অভিষেক উৎসব।

সুইনবার্ণের মৃত্যুতেই যে ইংরাজি কাব্যের একটি গৌরবময় যুগ শেষ হয়েছে একথা বলাই বাহুল্য। সে যুগকে শুধু ভিক্টোরিয়ান যুগই আমরা বলব, কারণ সত্য কথা বলতে গেলে সেটা উনবিংশ শতাব্দীরই প্রসারিত বাহু বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশককে গ্রাস ক'রে রেখেছে। প্রথম দশ বৎসরে নূতন শতাব্দী আপনাকে চেনবার অবসরই পায়নি, অদূর অতীতের চোখ ঝলসান মহিমায় এডওয়ারডিয়ান যুগ ভিক্টোরিয়ান যুগ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করবার কথা ভাবতেই পারে নি।

কিন্তু জর্জিয়ান যুগ আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে হাওয়া একেবারে গেল বদলে আশ্চর্য্যভাবে। জর্জিয়ান যুগ একেবারে নিজের বৈশিষ্ট্যে সুস্পষ্ট হয়ে দেখা দিলে। ব্যাপারটা যতটা মনে হয় তত বিস্ময়কর নয় মোটেও। কাব্যধারার এ পরিবর্ত্তন ছিল অবশ্যম্ভাবী। নিঃশব্দে অনেক দিন ধরে খাত খনন করা চলছিল। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ঘটনার ভেতর ছিল এ পরিবর্ত্তনের নির্ভুল নির্দ্দেশ। কাব্যের স্রোত অকস্মাৎ নিজের খেয়ালে নতুন পথ নেয় নি।

জর্জিয়ান যুগের কাব্যে প্রথমে যে নতুন হাওয়া বইতে সুরু করল সে হাওয়া সুদূর সমুদ্রের। ইংলণ্ডের বিশাল সাম্রাজ্যের সুদূর সমস্ত সীমা থেকে সে হাওয়া এল প্রবলবেগে বয়ে। কাব্যে লাগল দুরন্ত এক দোলা, তার সঙ্গীতে নতুন এক উন্মাদনা, তার ছন্দে প্রচণ্ড বেগ।

প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় এ কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল বিশালতা, বিষয়ের ও ছন্দের দক্ষতা আর নয়। নয় আর বাঁশীর মাধুর্য্য, এবার বিউগ্লের উদাত্ত ধ্বনি, পৌরুষ গর্ব্বে একটু কর্কশ কিন্তু সেইজন্যেই অপরূপ।

ইমার্স্যন লিখেছিলেন---The experience of each age requires a new confession and the world seems always wating for its poet.

ইংলণ্ড অন্তত নতুন যুগের কবির জন্যে সত্যি আসর সাজিয়ে বসেছিল; সে আসর তার বিশাল সাম্রাজ্যময় বিস্তৃত---আফ্রিকার গহন অরণ্য থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের মনোরম দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যন্ত তার পটভূমি। সে আসর অলঙ্কৃত করবে কে; কে বলতে পারে দৃপ্তকণ্ঠে What they know of England who only England know!

ইংলণ্ডের সাম্রাজ্যগর্ব্বের মূর্ত্তরূপ হয়ে দেখা দিলেন কবি রুডিয়ার্ড কিপলিং। এই ভারতবর্ষে তখনকার হুইলার প্রেসে বালির কাগজে ছাপা তাঁর প্রথম সঙ্গীত বিস্মৃতির বালুকালুপ্ত হয়ে রইলো না। সমস্ত সাম্রাজ্য সবিস্ময়ে তার ভেতর নিজেদের উল্লাসের অস্ফুট বাণী পেল খুঁজে! কিপলিংকে অজ্ঞাতবাস থেকে সোৎসাহে আবিষ্কার ক'রে তারা সাম্রাজ্যের কবিপদে অভিষিক্ত করলে রাতারাতি।

কবি হিসাবে কিপলিংএর আবির্ভাব যে এ যুগের সবচেয়ে বড় ঘটনা একথা কিছুতেই অস্বীকার করবার যো নেই। একাধারে তাঁর আবির্ভাবে ঘোষিত হয়েছে সাম্রাজ্যের যুগের পরিণতি ও নূতন কাব্যের যুগের সূচনা।

ইংলণ্ডের সাম্রাজ্য বিস্তারের সত্যকার কর্ম্মময় দিনে সাম্রাজ্যবাদী কোন শক্তিমান কবির আবির্ভাব হয়নি, সেদিন তার দরকারও ছিল না। অজানা দেশে প্রাণ হাতে নিয়ে যারা সেদিন দুর্গম পথে যাত্রা করেছে তাদের কাব্যে কান দেবার মত সময় ছিল কোথায়? সাম্রাজ্য প্রসারের দুর্ব্বার বেগ যখন শান্ত হয়ে এসেছে নিরাপদ শৃঙ্খলায় পৌঁছে তখনই অবসর হ'ল নিজের কীর্ত্তিকে সানন্দে স্মরণ করবার, অভিযানের উদ্দীপনায় নিঃশেষিত নেশা কাব্যে উঠল ফেনিয়ে। দূর সাগরে যারা পাড়ি দিয়েছিল তাদের সাগর অভিযানের শেষে ঘরে যাবার পথে চারণের কণ্ঠে উঠল গান।

সাম্রাজ্যবাদের চারণ হিসাবে কিপলিংকে স্বীকার করতে রাজী হ'লেও আধুনিক যুগের সূচনা তাঁর কাব্যে দেখা দিয়েছে একথা বিনা প্রতিবাদে কেউ কেউ বোধ হয় মেনে নিতে চাইবেন না। কবি হিসাবে কিপলিংএর সুনাম সত্যই ধোপে টেকেনি। তাঁর কাব্যে যে বিশালতার আভাষ পাওয়া গেছল তার সস্তাফাঁকি ধরা পড়ে গেছে কিছুদিনের মধ্যেই, ভেরীর আওয়াজে যারা সচকিত হয়ে উঠেছিল তারা আশাহত হয়ে আবিষ্কার করেছে যে, সে ভেরীর আওয়াজে গম্ভীর ধ্বনির পেছনে আছে অপরিণত একটি মন, শৈশবের অর্থহীন আত্মশ্লাঘার স্তর যে পার হ'তে পারে নি।

কিন্তু তবু জর্জিয়ান যুগের ওপর কিপলিংএর প্রভাব স্বীকার না ক'রে উপায় নেই। এ যুগ সম্বন্ধে একটি মজার কথা এই যে, যে দুজনের কাছ থেকে জর্জিয়ান কাব্য প্রথম প্রেরণা পেয়েছে, তাঁদের কাউকেই যথাযথভাবে শ্রেষ্ঠ জর্জিয়ান কবিদের তালিকায় ফেলা যায় না। হাউসম্যানকে ফেলা যায় না পঞ্জিকার হিসাবে আর কিপলিংকে ফেলা যায় না সত্যকার কবি-প্রতিভা তাঁর ভেতর মেলে না ব'লে। হাউসম্যান বিংশ শতাব্দীর কবি হ'লেও দেখা দিয়েছেন শতাব্দীর জন্মের আগে। ভিক্টোরিয়ান যুগের গৌরবময় সায়াহ্নে তাঁর নিঃসঙ্গ প্রতিভার যথার্থ মর্য্যাদা দেওয়া বোধ হয় সম্ভব হয় নি, তিনি সমধর্ম্মী সন্ধান পেয়েছেন জর্জিয়ান যুগে এসে। হাউসম্যান যদি নূতন কবিদের দীক্ষা-মন্ত্র দিয়ে থাকেন তাহ'লে কিপলিং তাদের দিয়েছেন ব্যঞ্জনার ভঙ্গি। সত্যকার কবি-প্রতিভার পরিচয় না থাকলেও ছন্দে তিনি যে নূতন দোলা দিয়েছেন, যে তীক্ষ্ণতা এনেছেন সহজ সজীব ভাষায়, ব্যঞ্জনার যে বলিষ্ঠ ভঙ্গিমা দেখিয়েছেন তা থেকে প্রথম দিকের সমস্ত কবিই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে প্রেরণা লাভ করেছেন।

কিপলিংএর কবি খ্যাতির ফাঁকা ফানুষ যাঁরা সবচেয়ে সুনিপুণভাবে ফাসিয়ে দিয়েছেন তাঁরাও তাঁর সুরের নেশা এড়াতে পারেন নি।

চেষ্টারটন যখন লেখেন---

Before the Roman came to Rye
or out to severn strode
The rolling English drunkard
made the rolling English road.
A reeling road, a rolling road,
that rambles round the shire,
And after him the person ran,
the sexton and the squire;
A merry road, a mazy road,
and such as we did tread
The night we went to Birmingham
by way of Beachy head.

I knew no harm of Bonaparte
and plenty of the squire,
And for to fight the Frenchman,
I did not much desire,
But I did bash their baggonets
because they came arrayed
To straighten out the crooked road
and English drunkard made,
Where you and I went down the lane
with ale-mugs in our hands,
The might we went to Glastonbury
by way of Goodwin sands.

তখন বোঝা যায় শুধু ইংলণ্ডের রাস্তা নয়, কিপলিংএর রাস্তাও তিনি নিয়েছেন।

জর্জিয়ান যুগের গোড়ার দিকের কবিরা অল্প বিস্তর সকলেই কিপলিংএর রাস্তা নিয়েছেন। তাকে সংস্কার ক'রে তার মোড় অবশ্য তাঁরা ঘুরিয়ে দিয়েছেন অর্থহীন আত্মম্ভরিতার নীরস মরু থেকে সার্থক কাব্য-লোকের দিকে। কিপলিংএর ভেতর যে অসম্পূর্ণ ইঙ্গিত আছে তা মধুর উপলব্ধিতে পরিণত হয়েছে পরবর্ত্তী কবিদের কাব্যে। ফ্লেকারের The old shipsএর মত কবিতায়---

I have seen old ships sail like
swans asleep
Beyond the village which men
still call Tyre,
With leaden age o'er cargoed,
dipping deep
For Famagusta and the hidden sun
That rings black cyprus with a lake
of fire
And all those ships were certainly
so old
Who knows how oft with squat and
noisy gun
Questing brown slaves or Syrian
oranges
The pirate Genoese
Hell-raked then till they rolled
Blood, water, fruit and cropses
up the hold.
But now through friendly seas they
softly run,
Painted the mid-sea blue or
shore sea green
Still palterned with the vine and
grapes in gold.

পড়লে বোঝা যায় কিপলিংএর স্থলভ বর্ণাঢ্যতা কি অপরূপ পরিণতি লাভ করতে পারে। কিপলিংএর সামুদ্রিক কাব্যে লোণা-জলের যে বাস্তব স্বাদ আছে তা থেকেই জন মেসফিল্ড লেখবার প্রেরণা পেয়েছেন।

---The dockside loafers talked
on the quay
The day that she towed down to sea.
"Lord what a handsome ship she be!
Cheer her, sonny boys, threetimes
three!"
And the dock-side loafers gave her
a shout
As the red funnelled tug-boat towed
her out ;
They gave her a cheer as the custom is,
And the crew yelled "Take our
loves to biz---
'N' the bloody stay-at-homes!"
they said.
Hear the yarn of a sailor
An old yarn learned at sea.

কিন্তু কিপলিংএর প্রভাব বেশী দূর এগিয়ে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। নূতন যুগকে অতীতের বন্ধন ছিন্ন করবাব খানিকটা প্রেরণা তিনি দিয়েছেন, তাঁর আবির্ভাবে ভিক্টোরিয়ান যুগের শেষে ছেদ দেওয়া সহজ হয়েছে কিন্তু তার বেশী এখন কিছু হয় নি। জর্জিয়ান যুগকে যাঁরা সার্থক ক'রে তুলবেন তাঁদের প্রেরণার ধারা তখন অন্য উৎস থেকে তাঁরা সংগ্রহ করতে আরম্ভ করেছেন। মেসফিল্ড পর্য্যন্ত সমুদ্র থেকে ফিরেছেন ঘরে।

কিন্তু ঘরে ফিরলেও মেসফিল্ড, ফ্লেকার প্রভৃতি কবি নূতন যুগকে স্পষ্টরূপ দিতে পারেন নি।

ফ্লেকার, মেসফিল্ড ব্রীজেস জর্জিয়ান যুগের কবি সন্দেহ নেই, কিন্তু দিকপাল তাঁদের কাউকে বলতে বাধে। তাঁরা এ যুগের স্রোতে ভেসেছেন যে স্রোত সৃষ্টি করতে পারেন নি। এ যুগের সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য প্রথম দেখা যায় হার্ডিতে। উচ্ছ্বাস ও উদ্বেল ভাবাবেগের তারল্যের পর হার্ডির কঠিন এমন কি খানিকটা রূঢ় প্রশান্তি প্রথমটা বুঝি একটু বিমূঢ়ই ক'রে দেয়! তাঁর কবিতা খানিকটা ভাস্কর্যের গা-ঘেঁষা, মসৃণ মার্বেলে নয়, কর্কশ গ্র্যানাইটে বলিষ্ঠ বাটালির ঘায়ে কোঁদা। কবিতার এই কঠিন পরিকল্পনা নিয়ে প্রথম সার্থক পরীক্ষা করেছেন হার্ডি। হার্ডির কবিতার কাঠিন্য খানিকটা হয়ত তাঁর দার্শনিক মতবাদের প্রতিফলিত রূপ কিন্তু সবটা নয়। কাব্যরচনার রীতিতেই তাঁর আছে পার্থক্য এবং সে রীতি রস সৃষ্টির পক্ষে কম মূল্যবান নয়।

রীতি নিয়ে জর্জিয়ান যুগের মত আর কোন যুগ বোধ হয় মাথা ঘামায় নি। কাব্য-সৃষ্টিতে রীতির এত বৈচিত্র্যও বুঝি আর কখন দেখা যায়নি। রীতি এবং রসকে এমন অচ্ছেদ্যভাবে মেলাতে, লক্ষ্য ও পথকে সমান মর্যাদা দিয়ে সার্থক করতে প্রথম জর্জিয়ান কবিরাই পেরেছেন। কথাটা বুঝি তবু ঠিক বলা হ'ল না। জর্জিয়ান কবিরা তার চেয়েও গিয়েছেন এগিয়ে, রীতিকে বুঝি তাঁরা প্রাধান্য দিয়েছেন সবচেয়ে বেশী, রীতিই রসকে সার্থক করে, পথই লক্ষ্যকে করে ধন্য এই বুঝি তাঁদের আবিষ্কার। তাঁদের আরেকটা আবিষ্কার বোধ হয় এই যে, শাশ্বত অচল সৌন্দর্য্য-লোক ব'লে কিছু নেই, রূপের নেই কোন নির্দ্দিষ্ট আদর্শ। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিই নিয়ত সৌন্দর্য্যকে রচনা ক'রে চলেছে, রচনা করছে অপ্রত্যাশিতভাবে অপরূপ উপকরণ থেকে।

এ যুগের নাতিপরিচিত একজন কবিও লিখতে পারেন---

Playing upon the hill three centaurs were
They lifted each a hoof! They stared at me!
And stamped the dust!
They stamped the dust! They snuffed upon the air!
And all their movements had the fierce glee
Of power, and pride and lust!
Of power and pride and lust!
Then with a shout,
They tossed their heads, and wheeled, and galloped round
In furious brotherhood!

জর্জিয়ান যুগে ছাড়া আর কোন সময়ে এ কবিতা যে রচিত হ'তে পারত না এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অহৈতুক রসসৃষ্টির এ ধারণাই অন্য যুগে ছিল না। কোন সিটওয়েল সে যুগে লিখতে পারত না---

A glass of milk as white as your hand,
The foam of seas that lie on the land,
Their grass runs swift in the wind like a wave;
A cup of this foam:---and then I crave
Snow-bread that the hills have ground their gold to!
The cheap shepherdess replied,
Her words still born-- dead drowned by the roar.
A railway engine ran across the field
Galloping like a swift horse down the rails.
As it came quicker the window-panes rattled,
The roof shook side to side: all its beams trembled,
Thundering hoofs were upon us---
glass chariots.

জর্জিয়ান কবিদের এই মুহূর্ত্ত-বিলাসবাদ কবিতার ক্ষেত্রকে বিস্তৃত ক'রে দিয়েছে সত্য কিন্তু তবু রসিক-চিত্তের গভীর পিপাসা মেটার পক্ষে তা যথেষ্ট নয় একথা সসঙ্কোচে স্বীকার করতেই হয়। এই মুহূর্ত্ত-বিলাসবাদে অনেকখানিই যেন খাদ আছে, আমাদের মস্তিষ্কের তাতে যতটা সায়

আছে সমস্ত হৃদয়ের ততটা নয়। তার ভেতর নির্লিপ্ততার যে অহঙ্কার আছে সেটা অধিকাংশ সময়েই ভাণ করা। ভাণ যেখানে নেই সেখানে এ কবিতা কত অপরূপ যে হয়ে উঠতে পারে তার একটা উদাহরণ দেবার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না---লরেন্স যখন লেখেন :---

I can imagine in some other world
Primeval-dumb, far back
In that most awful stillness, that only gasped and hummed,
Humming birds raced down the avenues.
Before anything had a soul,
While life was a heave of Matter, half inanimate
This little bit chipped off in brilliance
And went whizzing through the slow, vast succulent stems
I believe there were no flowers then,
In the world where the humming birds flashed ahead of creation.
I believe he pierced the slow vegetable veins with his long beak.

তখন বুঝতে পারি কেমন ক'রে। এ কবিতা নিজের 'হবনির' আদর্শ নিজেই স্বতন্ত্রভাবে সৃষ্টি ক'রে তুলেছে, মুহূর্ত্তের দৃষ্টি কেমন ক'রে হয়েছে শাশ্বত।

জর্জিয়ান যুগের তারা গৌরব, তাঁদের ভঙ্গিতে আধুনিক যুগের বৈশিষ্ট্য আছে সত্য কিন্তু কোন বিশেষ বাদের মধ্যে নিজেদের তাঁরা আবদ্ধ রাখেন নি। লরেন্স, ইয়েটস্ ও ডে, লা মেয়ার বিংশ শতাব্দীর কবি কিন্তু একেবারে বিভিন্ন, প্রত্যেকের জগৎ তাঁদের আলাদা।

ডেলা মেয়ারের জগৎ অবাস্তব। পরীর পাখার চেয়ে হাল্কা কল্পনা আর রেশমের সুতোর চেয়েও সূক্ষ্ম সুর দিয়ে তৈরী। ডে, লা, মেয়ার তাঁর সবচেয়ে মোটা কলমেও এর চেয়ে স্থূল কিছু লিখতে পারেন না----

Isled in the mid-night air
Musked with the dark's faint bloom
Out into glooming and secret haunts
The flame cries 'come !'
Lovely in dye and fan,
A-tremble in shimmering grace
A moth from her winter swoon
Uplifts her face---------

ডেলা মেয়ারের অবাস্তব সূক্ষ্মতা কখন কখনও যদি বা নির্ভেজাল কিনা সন্দেহ হয়, ইয়েটসের কবি-প্রতিভার সামনে কোন কিছুর অবকাশ থাকে না। রসের সাধনায় পরম সিদ্ধি তাঁর লাভ হয়ে গেছে, বিচ্যুতি তাঁর হবার নয়।

ইয়েটস সুরের কবি। সে সুর পুরাতন এবং চিরন্তন। আধুনিক যুগ সেইখানে তাঁকে জয় করতে পারেনি। আধুনিক হলেও তাঁর আত্মীয়তা পৃথিবীর সমস্ত কালের রাখাল-কবিদের সঙ্গে, সভ্যতাপ্রাপ্ত মন আমাদের হয় তাঁর গানে সাড়া দেবে না, মন পরম তৃপ্তিতে যাবে জুড়িয়ে।

The Island dreams under the dawn
And great boughs drop tranquility ;
The peahens dance on a smooth lawn,
A parrot sways upon a tree,
Raging at his image in the enamelled sea.
Here we will moor our lonely ship
And wander ever with woven hands,
Murmuring softly lip to lip,
Along the grass, along the sands.
Murmuring how far away are the unquet lands.

সুরের ভাষার ও ভঙ্গির এ অকৃত্রিম ও অলৌকিক সারল্য উপভোগ করবার মত মনের অবিকৃত শক্তি আমাদের সব সময়ে থাকে কি?

ইয়েটসের মত লরেন্স শুধু কবিই নন, তার চেয়ে বেশী কিছু। নবযুগের মন্ত্রদাতা তিনি, বুদ্ধির অতীত চেতনায় দুরবগাহ অতলতায় জীবনের যে দুর্জ্ঞেয় অর্থ তিনি উপলব্ধি করেছেন তারই রহস্য-প্রকাশের দুরন্ত ব্যাকুলতা তাঁর সমস্ত রচনায়। আবেগের দুঃসহ উত্তাপে তাঁর ভাষা শব্দের লৌকিক অর্থ ছাড়িয়ে বহ্নিময় স্রোত হয়ে

উঠেছে। তাঁর কবিতা কাণে বাজে না, মর্ম্মে গিয়ে অনুভূত হয় জীবন্ত স্পর্শ রূপে।

সামাজিক নৈতিক কোন তত্ত্ব তিনি বহন ক'রে আনেন নি, প্রচলিত অর্থে তাঁর উপলব্ধিকে আধ্যাত্মিক বল্লে অবিচার করা হয়। বার্ত্তা তাঁর অভিনব। চেতনার সীমান্ত ছাড়িয়ে আমাদের সত্তার যে গহন গভীর অনাবিষ্কৃত প্রদেশ আছে, অনাদৃত হয়ে তারই সংবাদ তিনি এনেছেন। বুদ্ধির ক্ষীণ অনিশ্চিত আলোয় নয় সমগ্র সত্তার গভীর নির্দ্দেশে গাঢ় অতল অস্তিত্বের সাগর-স্রোতে আমাদের বাঁচতে হবে। সমস্ত সৃষ্টি সেই উপলব্ধিতে হবে রূপান্তরিত।

লরেন্সের নিজের যে হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই কিন্তু সত্য কথা বলতে গেলে সেই জন্যেই বোধ হয় লরেন্সের বাণী আমাদের কাছে একটু দুর্ব্বোধ। তিনি যেন আমাদের জগতের নন, আর কোন গ্রহের, জীবনের অজ্ঞাত কোন স্তরের লোক। তাঁর বাণী আমাদের স্পর্শ করে কিন্তু তাঁর সমস্ত অর্থ আমরা বুঝি না, অপরিচিত তার গাঁথুনি, অস্পষ্ট তার ইঙ্গিত। আমাদের মন আলোড়িত হয়ে ওঠে কিন্তু সমস্ত অর্থ তার কাছে প্রতিভাত হয় না।

তাঁর বাণী থেকে লরেন্সের কাব্য পৃথক করা যায় না। Humming birdএর মত কবিতাও তিনি লিখেছেন কিন্তু সেখানেও মনে হয় ভাষার উৎক্ষিপ্ত আবেগের তলায় আছে লোকোত্তর অদ্ভুত কোন দৃষ্টি আমরা যার কোন দিন নাগাল পাব না।

শুধু তাঁর দৃষ্টি নয়, তাঁর ভঙ্গি, তাঁর ভাষার গঠন পর্য্যন্ত বুঝি আলাদা। পরিচিত শব্দ তাঁর কলম থেকে কল্পনাতীত ইঙ্গিত নিয়ে বেরোয়।

We have bit no forbidden apple
Eve and I
Yet the splashes of day and night
Falling round us, no longer dapple
The same valley with purple and white
This is our own still valley
Our Eden, our home
But day shows it vivid with feeling
And the pallor of night does not tally
With dark sleep that once
Covered the ceiling.

পড়লে মনে হয় শুধু আত্মার অতলতা নয়, ভাষার গভীর স্তর ভেদ ক'রেও নূতন অর্থ তিনি বার ক'রে আনছেন।

জর্জিয়ান যুগ একা লরেন্সেই নিজেকে ধন্য মনে করতে পারত, কিন্তু লরেন্সকে নিজের বলতে তার বোধ হয় বাধে। লরেন্স যে এ যুগের সৃষ্টি নয়, প্রবাসীর মত তিনি যে আশাতীতভাবে এসে আবির্ভূত হয়েছেন এ কথা ভোলা সহজ নয়। জর্জিয়ান যুগ এতদিনে লরেন্সকে শ্রদ্ধা করতে শিখেছে কিন্তু দাবী করতে সাহস পায়নি।

জর্জিয়ান কবিতা লরেন্সকে সসম্মানে পাশ কাটিয়েই অগ্রসর হয়েছে। এলিয়ট, এজরা পাউণ্ডের মধ্য দিয়ে যে কবিতা খুঁজছে নূতন কাব্যাদর্শ। লরেন্সের শ্রান্তি নয়, মহাযুদ্ধের স্মৃতিই তার প্রেরণা।

জর্জিয়ান যুগকে যুদ্ধের চারটি রক্তাক্ত বৎসর যে ভাবে নাড়া দিয়ে গেছে তার স্মৃতি সত্যই ত ভোলবার নয়। গণ্য ও নগণ্য কবিদের দুর্ব্বল মুহূর্ত্ত-বিলাসবাদ সে বিপর্য্যয়ে কোথায় মিলিয়ে গেছে। পৃথিবী যেদিন বিধ্বস্ত ও আকাশ যেদিন অন্ধকার সেদিন নিরাশ্রয় মানুষকে প্রাণপণে বিশ্বাসের নূতন সম্বল জীবনের গভীর আশ্রয় খুঁজতে হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি প্রথম যে মোহ-মুক্তি এনেছিল সেটা বাহ্যিক। তার খানিকটা দম্ভ আর খানিকটা বিলাস। সমস্ত আকাশ সেদিন সত্যই শূন্য হয়ে যায় নি। পুরাতন সৃষ্টিকে সেদিন শুধু নতুন নাম দেওয়া হয়েছিল হয়ত নতুন একটু ব্যাখ্যা। কিন্তু মৃত্যুর প্রলয় তাণ্ডবে যেদিন জীবনের সমস্ত ভিত্তি পর্য্যন্ত গেল ভেঙে গুঁড়ো হয়ে সেদিন রুপার্ট ব্রুকের মত কবির সমস্ত সত্তা মথিত ক'রে উঠল আর্ত্ত জিজ্ঞাসা---

How can we find ?
how can we rest ? how can
we, being Gods, win joy, or peace,
being man ?

We, the gaunt Zanies of a witless Fate,
Who love the unloving, and the lover hate,
Forget the moment ere the moment slips,
Kiss with blind lips that seek beyond the lips,
Who want, and know not what we want, and cry
With crooked mouths for Heaven, and throw it by.

জীবনের ধ্বংসস্তূপের মাঝে নিরাশ্রয় নিঃসম্বল আত্মার অসীম আকুতি প্রকাশ পেয়েছে নানা রূপে,---সুতীক্ষ্ণ আর্ত্তনাদে, অতল হতাশার আত্ম-বিদ্রূপে। কবিতার স্বপ্নময় মাধুর্য্য আর সৌষ্ঠবের দিকে দৃষ্টি দেবার কোথায় পায় অবকাশ। জীবন খুঁজছে নূতন ভিত্তি, কবিতা ও সেই সঙ্গে ভাষা ও ভঙ্গির কূল ভেঙে খুঁজছে নূতন পথ, নূতন ব্যঞ্জনার সমুদ্র-সঙ্গম।

সাগরের যে সুদূর কূলেই এলিয়টের কবি ও মানুষ হিসাবে জন্ম হোক এই বিধ্বস্ত সৃষ্টির শূন্য ভয়াবহ ঊষরতাই তাঁর প্রতিভাকে লালন করেছে।

We are the hollow men
We are the stuffed men
Leaning together
Headpiece filled with straw. Alas!
Our dried voices, when
We whisper together
Are quiet and meaningless
As wind in dry grass
Or rat's feet over broken glass
In our dry cellar

Shape without form, shade without colour
Paralysed force, gesture without motion;
Those who have crossed
With direct eyes, to death's other kingdom
Remember us---if at all---not as lost
Violent souls, but only
As the hollow men
The stuffed men.

এবং আধুনিক আর এক কবি এজরা পাউণ্ডের

"Empty are the ways,
Empty are the ways of this land
And the flowers
Bend over with heavy heads.
They bend in vain.
Empty are the ways of this land
Where lone
Walked once, and now does not walk
But seems like a person just gone!"

পড়লে একই সুরের আভাষ পাই---মনের নিছক নির্লিপ্ত সৌন্দর্য্য-লিপ্সা নয়, সমগ্র সত্তার ব্যাকুলতাই যার প্রেরণা। মানুষের হৃদয় আর মস্তিষ্ক একাকার হয়ে গেছে যুগান্তের প্রলয় মন্থনে। সহজ সরল ক'রে মনের নির্লিপ্ততায় আর কিছু দেখবার করবার শক্তি নেই। সুন্দরী রুষ নারী গ্রিস্‌চীন কিন্তু তাকে দেখেও আমাদের বলতে হয়---

Grishkin is nice: her Russian eye
Is underlined for emphasis
Uncorrected, her friendly bust
Gives promise of pneumatic bliss
The couched Brazilian jaguar
Compels the scampering marmoset
With subtle effluence of cat
Grishkin has a maisonette;

The leek Brazilian jaguar
Does not in its arboreal gloom
Distil so rank a feline smell
As Grishkin in a drawing-room

And even the Abstract Entities
Circumambulate her charm
But our lot crawls between dry ribs
To keep our metaphysics warm

নব যুগের মন্থন এখনও চলেছে। যেদিন তা থিতিয়ে যাবে সেদিন এই আলোড়ন থেকে কোন নতুন কাব্যাদর্শ কি ভাবে জাগ্রত হবে সে সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করবার ধৃষ্টতা আমাদের নেই।

সম্পূর্ণ